Registered No C. 65.

অসতোমা সদ্গময়,
তমসোমা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪২শ ভাগ। ১লা বৈশাখ, সোমবার ১৩২৬, ১৮৪১ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯০ অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲
১ম সংখ্যা। 14th April, 1919. প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵১

প্রার্থনা।

হে চিরনবীন, তোমার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তুমি নিত্য নূতন উন্নতির পথেই লইয়া যাইতেছ ; এখানে কিছুই পুরাতন লইয়া মৃত্যুর মধ্যে পড়িয়া থাকিতেছে না। আমরা যতই আলস্য ও জড়তার মধ্যে কাল কাটাই না কেন, তুমি আমাদের জন্য প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্তে নিত্য নূতন সুযোগ উপস্থিত কর। আমরা অনেক সময় সে সকল সুযোগের উপযুক্ত ব্যবহার করি না সত্য, কিন্তু তুমি ত আমাদিগকে তৃপ্ত থাকিতে দেও না—সময় সময় সে জন্য বেদনা উপস্থিত কর, প্রাণে নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগাও। সকল সময় সে আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে উন্নতির পথে লইয়া যায় না। তাই আমরা জীবন-পথে আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। কিন্তু আমরা যে একেবারে মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকি না, একটু যে চেষ্টা করি, তোমার নিকট যে মাঝে মাঝেও উপস্থিত হই, ইহাও তোমার করুণা। তোমার করুণা ভিন্ন আমাদের আর উপায় নাই। প্রাণে কত সময় কত নূতন সঙ্কল্প জাগাইলে, দুই দিন পরেই তাহা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। তবুও নিরাশ হইতে পারিতেছি না। আশার সহিতই নববর্ষের প্রারম্ভে তোমার দ্বারে উপস্থিত। তুমি আমাদিগকে নববর্ষে নূতন ভাবে নূতন উৎসাহে তোমার পথে চলিতে সমর্থ কর। আমাদিগকে যে কার্য্যভার প্রদান করিয়াছ, আমরা তাহার কিছুই করিতে পারি নাই, বৃথা জীবন ক্ষয় করিতেছি। কিন্তু আজ আর পশ্চাতের দিকে চাহিতে ইচ্ছা করি না। এখন হইতে আমাদের সকল দুর্ব্বলতার অবসান হউক। হে করুণাময় পিতা, আমরা যাহাতে এই নববর্ষে তোমার হইতে পারি, তোমার কার্য্য করিতে পারি, তুমি সেরূপ বল দেও। নূতন উৎসাহে ও নূতন শক্তিতে প্রাণ পূর্ণ কর। নূতন বর্ষ আমাদিগকে নূতন জীবন প্রদান করুক। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের সকল জীবনে ও কার্য্যে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

সম্পাদকীয়।

নববর্ষ—অনন্ত কালপ্রবাহে কত নববর্ষ আসিল আর গেল,—জীবনে কত নূতন সুযোগ উপস্থিত হইল, প্রাণে কত নব সঙ্কল্প জাগিল, আবার সে সকল কোথায় চলিয়া গেল! তাহারা আমাদিগকে উন্নতিপথে কতটুকু অগ্রসর করিয়া গেল, তাহা বলা অতি কঠিন। তাহাদের যে যথোপযুক্ত ব্যবহার আমরা করি নাই, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। তথাপি আবার নূতন সুযোগ লইয়া আর একটি বৎসর আমাদের নিকট উপস্থিত হইল। আমাদের শত বিফলতাসত্ত্বেও মঙ্গলময় বিধাতা আমাদিগকে সর্ব্বদাই নূতন সুযোগ প্রদান করেন। পুরাতন অভ্যাসের শৃঙ্খলে আমরা আপনাদিগকে যতই জড়িত করি না কেন, সে শৃঙ্খল আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই ভাঙ্গিতে পারি, প্রতি মুহূর্ত্তেই আমরা জীবনকে নূতন পথে চালিত করিতে পারি। জীবনবিধাতা আমাদিগকে সে শক্তি প্রচুর পরিমাণেই দিয়াছেন ; আমরা যদি সেই শক্তি পরিচালন না করিয়া, মৃতের ন্যায় পুরাতন অভ্যাসের স্রোতে ভাসিয়া চলি, তবে সে আমাদেরই দোষ। আরাম শয্যায় শয়ন করিয়া কাল কাটাইলে জীবন ও শক্তি লব্ধ হয় না—কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়াই তাহা লাভ করিতে হয়। বরং যতই নিদ্রায় কাল কাটাইব, সংগ্রাম ততই কঠিন হইবে। আদিকাল হইতে মানবের জীবনে মহাসংগ্রাম নিত্য নূতন আকারে উপস্থিত

হইতেছে—দেহ ও আত্মায়, সংসারে ও ধর্ম্মে বিরোধ। একদিকে দেখিতে গেলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেই এই উচ্চ ও নীচে বিরোধ চলিয়া আসিয়াছে এবং নানা বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ইহাই জগৎকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছে। জগতের গতি অপ্রতিহত ভাবে উন্নতির দিকেই চলিয়াছে; কেন না, সেখানে একমাত্র মঙ্গলময়ের ইচ্ছাই কার্য্য করিতেছে,—সেখানে সে ইচ্ছার বিরোধী আর কোন ইচ্ছা নাই। একমাত্র মানবজীবনেই এই বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়—একমাত্র মানবসন্তানই, যত সীমাবদ্ধ ভাবেই হউক, অন্ততঃ কিছুকালের জন্যও আপনার স্বাধীন ইচ্ছাকে সেই ইচ্ছার প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া আপনাকে অবনতির দিকে লইয়া যাইতে পারে, অথবা সে ইচ্ছার সহিত স্বাধীনভাবে আপনার ইচ্ছাকে মিলিত করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর করিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের দ্বন্দ্ব একমাত্র মানুষের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। তাই চিরকাল মানুষ উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়াই চলিয়াছে। তথাপি মানুষ যে মোটের উপর উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহা হউক, সে অন্য কথা। স্বভাবতঃ জড়জগৎ ও জড়দেহই সর্ব্বাগ্রে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ও প্রধানতঃ সকল চেষ্টাকে নিযুক্ত করে। আত্মার দিকে দৃষ্টি কিছু পরেই যায়—সুতরাং দেহের উপর আত্মার কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা, শ্রেয়ঃ অপেক্ষা প্রেয়কে উচ্চস্থান প্রদান করিবার, সংসারের উপর ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিবার, সঙ্কল্প ও প্রচেষ্টা পরেই আসে। কিন্তু এ সংগ্রাম না আসা পর্য্যন্ত, ইহাতে কিয়ৎ পরিমাণেও সফলতা লাভ না করা পর্য্যন্ত, প্রকৃত মানবজীবন আরম্ভই হয় না—পশুজীবনই থাকিয়া যায়। প্রতি মানবজীবনেরই—বিশেষ ভাবে প্রতি ধর্ম্মসমাজেরই—ইহাই প্রধান কাজ। পুরাকালে একের বিনাশ সাধন করিয়া—সংসারকে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়া—এই উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু বাহিরের সংসার পরিত্যাগ করা সম্ভবপর হইলেও অন্তরের সংসার পরিত্যাগ করা, উহার একান্ত বিলোপ সাধন করা, একেবারেই অসম্ভব। আর তাহার যে কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে এরূপও নহে। আপনার স্থানে থাকিলে, ধর্ম্মকে তাহার প্রাপ্য উচ্চাসন প্রদান করিয়া নিজে তাহার দাসত্ব গ্রহণ করিলে, তাহা উন্নতি পথের সহায়ই হইয়া থাকে। ধর্ম্মকে জীবনের রাজা না করিয়া সংসারকে রাজা করাতেই যত অকল্যাণ। আজকাল সমস্ত জগৎ যেরূপ উন্মত্ত ভাবে সংসারের সেবায় সমস্ত মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছে, তাহার ভীষণ পরিণাম বিগত মহাসমর আমাদের নিকট অতি উজ্জ্বল ভাবেই প্রকাশিত করিয়াছে। তথাপি মানুষের মোহ ভাঙ্গিতেছে না, মানুষ এখনও সেই মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাতে ছুটিয়া মৃত্যুর দিকেই অগ্রসর হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ সংসার ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাকেই আপনার প্রধান কাজ বলিয়া প্রথম হইতেই অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু চারিদিকের এই উন্মত্ত সাংসারিকতায় ভীষণ সংক্রামক ব্যাধির হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিতেছে না। এই সংগ্রাম যেন দিন দিন ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতেছে। এই সংগ্রামে জয়লাভ করিতে না পারিলে ধর্ম্মসমাজরূপে দাঁড়াইয়া থাকাই আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। নববর্ষ আমাদের নিকট এই পুরাতন সংগ্রামকে নূতন করিয়া উপস্থিত করিতেছে। সর্ব্ব প্রথমে ইহাকে পরাজিত করিয়া, ধর্ম্মকে জীবনে ও সমাজে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিবার দৃঢ়সংকল্প লইয়া, যদি এখনও আমরা মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত না হই, তবে অচিরে আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। সংসারের অপর দশটা সমাজের ন্যায় সাংসারিক অস্তিত্ব অবশ্য থাকিবে। কিন্তু ধর্ম্মসমাজ রূপে উহার যে বিশেষত্ব আছে, তাহা বিনষ্ট হইলে উহার থাকা অপেক্ষা না থাকাই ভাল। সে রূপ জীবন ধারণের কোনই মূল্য নাই, কোন প্রয়োজন নাই। নূতন বর্ষে এ দিকেই আমাদের সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক, এ বিষয়ে আমাদের সকল চেষ্টা ও শক্তি প্রযুক্ত হউক। আমরা নূতন আশা, নূতন সংকল্প, নূতন উৎসাহ ও বল লইয়া এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই। এই সুযোগ যেন আমরা ব্যর্থ হইতে না দেই। মঙ্গলময়ের রাজ্য আমাদের জীবনে ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হউক। তাঁহাকেই সর্ব্বোপরি রাজা ও প্রভু করিয়া আমরা সংসার-পথে চলি। তাঁহার ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

গতিতেই আনন্দ—জীবন সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা এই যে, থাকিতে হইলেই চলিতে হয়। আছে, অথচ চলিতেছে না, এমন দেখা যায় না। আকাশে যত গ্রহ নক্ষত্র আছে, সকলকেই চলিতে হইতেছে। অচল হইয়া আকাশে কেহই নাই। শুধু তাহাই নহে; থাকিতে হইলে যেমন চলিতে হয়, তেমনি আবার আনন্দ পাইতে হইলেও চলিতেই হয়। গতিহীন হইয়া কেহই সুখী হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত রূপে বলা যাইতে পারে, যে বালকটি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছুটাছুটি করিতেছে, তাহাতেই সে আরাম পাইতেছে, তাহাকে যদি কিছুকাল এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে বলা যায়, সে তাহাতে কোনও মতেই সম্মত হইবে না। বালক বালিকারা ক্রীড়ায় মত্ত হইয়া কতই দৌড়াদৌড়ি করে, তাহাতে ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই। তাহারা কতই চঞ্চলতা প্রকাশ করিতেছে! এমন কি তখন তাহাদিগকে স্থির হইয়া থাকিতে বলিলে তাহারা সে অনুরোধ পালন করিতেই চাহিবে না; নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিলে অনিচ্ছায় ক্ষণকাল হয় ত তাহারা একটু শান্ত হইয়া দাঁড়াইবে। সেই বালক বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে যখন অপরাধের শাস্তি দিবার জন্য শিক্ষক মহাশয় কিছুকাল দাঁড়াইয়া থাকিতে আদেশ করেন, তাহাতে তাহাদের কতই না কষ্ট হয়! সে দণ্ডকে তাহারা অতিশয় বিরক্তিকরই মনে করিয়া থাকে।

আরও দেখা যায়, ধনীর গৃহের দ্বারে যাহারা প্রতিহারীর কার্য্য করিয়া থাকে, তাহারা অথবা ধনাগারের প্রহরীরূপে যাহাদিগকে দাঁড়াইয়া অবস্থিতি করিতে হয়, তাহারা বেশী ক্ষণ এক স্থানে স্থির হইয়া থাকে না। এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকা তাহাদের পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়। এজন্য তাঁহারা গৃহের বা ধনাগারের দ্বারে অনবরত পায়চারি করিয়া বেড়ায়, একবার এ দিকে আর একবার ওদিকে তাহারা সর্ব্বদাই হাটাহাটি করিয়া সময় কাটায়। এক স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের পক্ষে সময় কাটান খুবই কষ্টকর। এজন্য তাহারা কেবলই এ দিকে ও দিকে চলিয়া চলিয়া আরামে সময় কাটাইতে থাকে।

আবার দেখা যায়, এক ব্যক্তি মোট মাথায় লইয়া হয়ত মাইলের পর মাইল পথ চলিতে পারে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এ ভাবে পথ চলিতেও লোকে সমর্থ হয়। কিন্তু কোন কারণে সে ব্যক্তিকে যদি বোঝা মাথায় লইয়া কিছুকাল এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়, তবে তাহাতে সে অতিশয় অসুবিধাই বোধ করে। কার্য্যের অনুরোধে এরূপ কোন ব্যক্তিকে যদি এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে বলা যায়, তবে সে এই আদেশকে একটা শাস্তি বলিয়াই মনে করে। সে ভাবে বোঝা মাথায় লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে কেহই সম্মত হয় না। কারণ, তাহাতে সে বিশেষ ক্লেশ পায়। বোঝা মাথায় লইয়া যে চলিতে ক্লেশ পায় না, সেও সেই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকাকে অতি কষ্টকরই মনে করে।

একজন পীড়িত ব্যক্তিকে আক্ষেপ করিয়া বলিতে হইয়াছিল, ঐ যে পথে বোঝা মাথায় লইয়া মুটিয়া পথে চলিতেছে, যদি উহার সহিত নিজের অবস্থার পরিবর্ত্তন পূর্ব্বকও কিছুক্ষণ পথ চলিতে সুযোগ পাওয়া যাইত, তবে তাহাও তাহার পক্ষে প্রার্থনীয়ই হইত। রোগী ব্যক্তি যখন রোগের প্রাবল্যের সময় একেবারে শয্যাশায়ী ছিল, তখন হয়ত তাহার মনের অবস্থা এমন প্রকারের হয় নাই। কিন্তু সে যখন কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া একটু একটু চলিতে সমর্থ হইল, যখন সে গৃহের প্রান্তে জানালার ধারে গিয়া পথে পথিকের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইল, তখনই তাহার ইচ্ছার উদয় হইয়াছিল যে ঐ পথের মুটিয়ার সহিত যদি নিজের অবস্থার বিনিময় হইত, তাহা হইলেও তাহাকে আরামের মনে হইত।

উপরে যাহার উল্লেখ করা গেল, তাহাদ্বারাই বুঝিতে পারা যাইবে যে, শুধু থাকিতে হইলেই যে চলিতে হয়, তাহা নহে। আরাম আনন্দ পাইতে হইলেও মানবকে নিয়তই চলিতে হইবে। আমাদের জীবন অনন্ত। আমাদের পথও অনন্ত। চিরদিনই আমাদিগকে পথ চলিয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে। যদি এমন হইত যে, থাকিতে হইবে অনন্তকাল, চলিতে হইবে সুদীর্ঘ পথ, আর তাহাতে কোন আরাম আনন্দ নাই, তবে তাহা যে কিরূপ বিষম ক্লেশের কারণ হইত, তাহাত কল্পনাও করা যায় না। এজন্য আমাদের জীবন দেবতা যেমন আমাদিগের জীবনকে অনন্ত করিয়া গড়িয়াছেন, আমাদের পথকে অনন্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তেমনি সেই নিয়ত চলাকে, নিয়ত অগ্রগতিকে আরামের ও আনন্দের হেতু করিয়া দিয়াছেন।

এজন্য আমাদের ধর্ম্ম যেমন আমাদিগকে পথের সীমায় আবদ্ধ থাকিতে নিষেধ করিতেছেন, এবং আমাদের জন্য পথের কোন পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখেন নাই, তেমনি আমাদের জন্য সিদ্ধির কোন একটা অবস্থার কথাও বলেন নাই। এ ধর্ম্মের সিদ্ধি বলিয়া কিছুই নাই। যতই অগ্রসর হওয়া যাইবে, যতই সোপানের পর সোপান অতিক্রম করা যাইবে, ততই উপরে আরও নূতন সোপান দৃষ্ট হইবে। আদর্শের সীমারেখা দৃষ্টিব্যাপিকা রেখার মত কেবলই অগ্রসর হইতেই থাকিবে। বিশ্রাম জীবনের সংজ্ঞায় নাই। গতিই জীবন ও তাহাতেই স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য লাভের উপায় নিহিত। এজন্য আমাদের কবি আমাদিগকে প্রেরণা দিয়া সতর্ক করিবার জন্য গীত রচনা করিয়াছেন—"যদি আলসভরে আমি বসি পথের পরে, যদি ধূলায় শয়ন পাতি সযতনে, যেন সকল পথই বাকি আছে, সে কথা রয় মনে, যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।" বাস্তবিকই মানবের জন্য এমন কোন অবস্থা নাই—এমন কোন আদর্শ নাই, যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বা যে আদর্শে উপনীত হইয়া মনে হইবে যে আর নহে, আর পাইবার কিছু নাই, আর জানিবার নাই, আর চলিবার পথ নাই। আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় অনন্ত, চলিবার পথ অনন্ত এবং জীবনও অনন্ত। এই অবস্থায় আমরা তাই সিদ্ধির কথা কল্পনা করিতে পারি না, মুক্তির কোন স্থায়িত্ব মনে আনিতে পারি না। আমাদিগকে কেবলই উন্নতির পথে চলিতে হইবে এবং চলিতে চলিতেই আনন্দ ও আরাম পাইয়া জীবনদাতাকে এরূপ মহাদানের জন্য ধন্যবাদ দিতে দিতে অগ্রসর হইতে হইবে। এবং নিয়তই উৎসাহের সহিত ঘোষণা করিতে হইবে—"সম্মুখেতে স্বর্গরাজ্য পশ্চাতে যেওনা ফিরে।" এই অনন্ত জীবন ও উন্নতির পথে অনন্ত গতির কথা কি অপরূপ! কি অতুল সৌন্দর্য্যপূর্ণ! ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে এইরূপে অনন্ত উন্নতির সংবাদ দিয়াছেন। ধন্য ধর্ম্মবিধান বিধাতা—ধন্য তাঁহার বিধান।

জ্ঞান যুক্তির ব্রহ্ম ও স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম।

বর্ত্তমান সময়ে প্রাচীন নাস্তিকের ন্যায়, ঈশ্বর নাই বলিয়া, ঈশ্বরকে উড়াইয়া দিতে কেহ চান না। তাঁহারা জ্ঞান ও যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া দেখেন, এই জগতের পশ্চাতে এক মহাশক্তি ক্রিয়া করিতেছেন এবং সে শক্তি জ্ঞানময়। তাই তাঁহারা ঈশ্বর নাই, এ কথা বলেন না। ইঁহারা ঈশ্বর মানেন, ঈশ্বর স্বীকার করেন, জ্ঞান ও যুক্তিদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। একবার কোনও সাধু লোক একজন ব্রাহ্ম প্রচারককে বলিয়াছিলেন,—"দেখুন, ঈশ্বর যে নাই আমি ইহা বলি না, তবে আপনারা যেরূপ ঈশ্বর মানেন, আমি সেরূপ ঈশ্বর বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমি ঈশ্বর মানি।" তখন প্রচারক মহাশয় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"যাহা হউক, যেরূপ ভাবেই ঈশ্বর মানুন, তাহাতে ঈশ্বরের প্রতি যে আপনার দয়া আছে, তাহা প্রকাশ পায়।" জ্ঞান যুক্তির ব্রহ্ম প্রায় সেরূপ, যেন ব্রহ্মের প্রতি দয়া আছে, ঈশ্বর মানিয়া যেন ঈশ্বরকে কৃতার্থ করিতেছেন, তিনি না মানিলে যেন ঈশ্বর থাকিতে পারিতেন না; ঈশ্বরের রাজ্য যেন বিলুপ্ত হইত! ঈশ্বর মানা নিজের জন্য নয়, যেন ঈশ্বরের জন্যই। জ্ঞানযুক্তি কিছু মন্দ জিনিস নয়, কি বর্জ্জনীয় বস্তু নয়, বরং জ্ঞান ও যুক্তির খুব আদর থাকাই উচিত। সাধারণ লোক ইহাকেই আশ্রয় করিবে। এ সাধারণ লোক অর্থে ঈশ্বরে প্রকৃত বিশ্বাসী ভিন্ন পণ্ডিত মূর্খ, ধনী দরিদ্রনির্ব্বিশেষে সকলকেই এই সাধারণ লোক মধ্যে ধরা যায়। বর্ত্তমান সময়ে নাস্তিক নাই। কিন্তু এরূপ আস্তিকের সংখ্যাই অধিক। ইঁহারা জীবনে ঈশ্বরের সাক্ষ্য দিতে অক্ষম।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাসের অপ্রকাশিত প্রবন্ধাবলী হইতে

ঈশ্বরবিশ্বাসীর নিকট তিনি আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। এমন কি, ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে দেখা যায়, তিনি তাঁহার বিরোধীর নিকটও আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। মানবজীবন তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বিশ্বাসীর নিকট যে প্রকাশ হন, ইহার ত সাক্ষ্যের কোনও অভাবই নাই। এই স্বপ্রকাশ ব্রহ্মই বিশ্বাসীর আশ্রয়, বিশ্বাসী ইহারই জন্য জগতে এত আদৃত, বিশ্বাসী ইহার জন্য অনায়াসে প্রাণ পর্য্যন্ত অর্পণ করিতে পারেন—যে প্রাণ রক্ষার জন্য জীব কি না সংগ্রাম করিতেছে! এখানে এই দেখা যায়, ঈশ্বর মানা কি বিশ্বাস করা কিছুই ঈশ্বরের জন্য নয়, সবই বিশ্বাসীর নিজের জন্য। এখানে জ্ঞানযুক্তির ঈশ্বর মানার ন্যায় মানা নয়। কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া জীব "অনলে পতঙ্গ যেমন" তেমনি তাঁহাতে আত্মসমর্পণ না করিয়া বিশ্বাসী স্থির থাকিতে পারেন না। এই ব্রহ্মপ্রকাশ ভিন্ন ধর্ম্মজীবনের সূচনা হয় না; বা ধর্ম্মের সব তত্ত্বই এখানে, ধর্ম্ম এখানে। ঈশ্বর মানবের নিকট আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া সমুদায় ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দেন। ধর্ম্মতত্ত্ব শিখিবার এই উপায়; যে ধর্ম্ম ব্রহ্মপ্রকাশে লব্ধ হয়, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। যাহা শুধু জ্ঞানযুক্তির ধর্ম্ম তাহাতে মানবাত্মা অভয় লাভ করিতে পারে না, তাহাতে মনুষ্য আত্মা তৃপ্তি বা শান্তি পাইতে পারে না। এই ব্রহ্মপ্রকাশে মানুষ জগতে এত ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতে সক্ষম হইয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম এই ঈশ্বরের স্বপ্রকাশ ধর্ম্ম। ইহা জ্ঞানযুক্তির ধর্ম্ম নয়, বা সমুদায় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শাস্ত্রবচনসংগ্রহের ধর্ম্ম নয়। অনেকে মনে করেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম শুধু জ্ঞানযুক্তির ধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম অবশ্য জ্ঞান-যুক্তিকে আদর করেন। শুধু অন্ধ বিশ্বাসের কথা বলিয়া লোককে বুঝাইতে চেষ্টা করেন না। কিন্তু ইহার স্থিরভূমি যেমন মানবের সহজ জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়, তেমনি ঈশ্বরের দিকে ইহা স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া জীবের পরিত্রাণের জন্য জগতে ও মানব-প্রাণে স্থিতি করিতেছে। অন্য সময় ঈশ্বর কোন বিশেষ লোকের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন, এখন ঈশ্বরমহিমায় তাঁহার মানবসন্তান সকলের নিকটই প্রকাশিত হইতেছেন। বিশ্বাসিগণ এখন এই সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক প্রভাব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ব্রহ্মসাধনার আরাধনা মন্ত্র বৈদিক ঋষিগণের মহাবাক্য হইতে গৃহীত হইলেও, তাঁহারা যে ভাবে উপাসনা করিতেন বর্ত্তমান সময়ে ঠিক সেইভাবে উপাসনা হয় না। বর্ত্তমান ব্রহ্মোপাসনা নব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। প্রাচীন কালে কেবল আত্মার সহিত পরমাত্মার যোগসাধন পথেই সাধকগণ গমন করিতেন। এজন্য দেখা যায়, এক দল ছিলেন অদ্বৈতবাদী, আর ছিলেন মূর্ত্তিপূজক, অবতারপূজক দ্বৈতবাদী; কিন্তু অদ্বৈতের মধ্যে দ্বৈতকে দেখা, প্রেমময় পরমেশ্বরকে বিশ্ব-মানবের মধ্যে উপলব্ধি করা অর্থাৎ ব্যক্তিরূপী পরম চৈতন্যকে ভক্তিদ্বারা পূজা করার ভাব প্রাচীন-কালে বীজাকারে থাকিলেও প্রস্ফুটিত হয় নাই। এই ভাব প্রস্ফুটিত হইয়াছে, ব্রাহ্মসাধনায়। তিনি অন্তরতর, অন্তরতম; আবার সীমায় মাঝে অসীম তিনি; আবার "বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো, সেখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।"

বৈষ্ণবগণ অদ্বৈতবাদ হইতে ভক্তিবাদকে রক্ষা করিবার জন্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ প্রভৃতি দ্বারা অদ্বৈতের মধ্যে দ্বৈতকে, অভেদের মধ্যে ভেদকে দেখাইবার চেষ্টা করিলেও অবশেষে মূর্ত্তি-পূজা, অবতারের আবর্জ্জনায় পড়িয়া স্বীয় মতের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে পারেন নাই নিরাকার চিন্ময় শিব সুন্দরের পূজা অবলম্বন করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্ম সাধনাই এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন পথে বর্ত্তমান সময়ে নরনারীর চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে।

পরব্রহ্ম সর্ব্বময়, সর্ব্বাশ্রয়, আবার সর্ব্বাতীত এবং সর্ব্বজ্ঞ। সর্ব্বাতীত ও সর্ব্বজ্ঞ এই দুইটি কথাতেই চিরন্তন ভেদ প্রকাশিত হইতেছে; কিন্তু এই ভেদ ব্রহ্মের মধ্যে,—বাহিরে নহে। তিনি চিন্ময়, রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শের অতীত অথচ রূপ রস গন্ধাদি তাঁহারই অনুপ্রকাশ। প্রত্যেক অপূর্ণ মানবাত্মার মধ্যে তিনি প্রকাশিত; মানবাত্মা তাঁহারই অংশ রূপে প্রকাশিত; সুতরাং অপূর্ণ; মানবাত্মা ব্রহ্মাংশ, এ জন্যই অপূর্ণ। মানবাত্মা অপূর্ণ বলিয়াই উন্নতিশীল। ব্রহ্মকে লাভ করাই মানবাত্মার ধর্ম্ম—ব্রহ্মলাভেই মানবাত্মা উন্নত হয়।

ব্রাহ্মসাধনার ফল—ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ-রসপান। মানব-প্রেম ও ঈশ্বরভক্তি ইহার অঙ্গকান্তি এবং কর্ম্ম ইহার বসন ভূষণ। এই সাধনার স্রোত জগতে প্রবাহিত হইতেছে। প্রাচীনের জ্ঞান ও তপস্যার ফল এই সাধনার মধ্যে আসিয়াছে, ক্রমবিকাশের ফলে নূতন অভ্যুদিত হইয়াছে। আজ ৮৯ বৎসর হইল ব্রাহ্মসমাজ আরম্ভ হইয়াছে। ইহার মধ্যে এই সাধনা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে না কি? রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্রকে ছাড়িয়া দিলেও অতীত ও বর্ত্তমানে কত ব্রাহ্মকে দেখিতে পাই, যাঁহাদের জীবনে "প্রীতি ও প্রিয়কার্য্যের" ফল দেখিতে পাওয়া যায়। এই নবসাধনা যে কেবল ব্রাহ্মসমাজেই আবদ্ধ আছে, তাহা নহে, ইহা জগৎময় ব্যাপ্ত হইতেছে। সভ্য ইউরোপ এবং আমেরিকায় চিন্তাশীল ব্যাকুলচিত্ত নরনারীগণ ব্রাহ্মসমাজের দিকে তাকাইতেছেন। যিনি যাহাই বলুন, এই আধ্যাত্মিকতার প্রভাব ধীরে ধীরে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইতেছে। সৈকততলবাহী স্রোতের ন্যায় এই নবভাব জগতের উন্নত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতেছে।

এখন ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সাধনার লক্ষ্য সম্বন্ধে দু একটি কথা বলিতেছি। ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রে নির্ব্বাণ, ব্রহ্মনির্ব্বাণ, পরিনির্ব্বাণ প্রভৃতি শব্দদ্বারা মানবজীবনের লক্ষ্যের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্ম, জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে কি বলিতেছেন? ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থাদিতে যাহা লিখিত আছে, সে সকল কথার উল্লেখ না করিয়া মানবজীবনের লক্ষ্য কি তাহার আলোচনা করা যাউক। এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত যে, উন্নত হওয়াই মানব জীবনের লক্ষ্য। অর্থাৎ অনন্তের সহিত যোগ অনুভব করিয়া অনন্ত যাত্রায় বহির্গত হইবার জন্যই মানব-জীবন রচিত হইয়াছে। "জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার মন ব্যাপ্ত হইবে, কর্ম্মদ্বারা সমস্ত জগতে আমার শক্তি ব্যাপ্ত হইবে এবং সৌন্দর্য্যবোধের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার-

আনন্দ ব্যাপ্ত হইবে, মনুষ্যত্বের ইহাই লক্ষ্য। অর্থাৎ জগতে জ্ঞানরূপে পাওয়া, শক্তিরূপে পাওয়া ও আনন্দরূপে পাওয়াকেই মানুষ হওয়া বলে।" *

জগতের ধর্ম্মসমাজে দুই শ্রেণীর সাধক দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণী জ্ঞানপথাবলম্বী, আর এক শ্রেণী বিশ্বাসপথাবলম্বী। বিশ্বাসপথাবলম্বীদিগের মধ্যে যে একবারে জ্ঞান নাই, তাহা নহে; কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, অতি সঙ্কীর্ণ। আমাদের নিকটেই তাঁহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। মহাভারতে, ভাগবত গ্রন্থে কৃষ্ণাবতারের কথা আছে বলিয়াই বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণকে পূজা করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে যাহা আছে, তাহাই জ্ঞান; এমন কি, সংস্কৃত ভাষায় যাহা লিখিত, তাহাই জ্ঞান। এই জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া হিন্দুগণ, মূর্ত্তি-পূজা, অবতার পূজা করিয়া থাকেন। সেইরূপ খ্রীষ্টানগণ বলেন,—বাইবেল গ্রন্থই জ্ঞানগ্রন্থ। তাহাতে যাহা লিখিত আছে, তাহা বিশ্বাস করিলেই মুক্তি। মুসলমানগণ বলেন,—কোরাণ গ্রন্থই শেষ-সুসমাচার। কোরাণই জ্ঞান। কোরাণকে বিশ্বাস করিলেই ইস্‌লামত্ব লাভ হয়। কিন্তু এবম্বিধ জ্ঞানদ্বারা কি সমস্ত জগতে মন ব্যাপ্ত হইতে পারে? অনন্তের সহিত যোগ অনুভব ভিন্ন সমস্ত জগতে মন কিরূপে ব্যাপ্ত হইবে? যখন মানবাত্মা সৌভাগ্যবশতঃ এই সত্য অনুভব করিতে সমর্থ হয় যে, সে অনন্তের অংশ হইয়া অনন্তেরই মধ্যে বাস করিতেছে, তখনই বিশ্বজগতে তাহার মন ব্যাপ্ত হয়। ব্রাহ্মসমাজেও এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা বিশ্বাসের পথকেই অবলম্বন করিয়াছেন। সৃষ্টিকৌশলে স্রষ্টার পরিচয়ে, তাঁহারা নিরাকার চিন্ময় ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন; কিন্তু এই উপায়ে কি নিখিল বিশ্বে মন ব্যাপ্ত হইতে পারে? ব্রাহ্মসমাজে যাঁহারা কেন্দ্রবাদ স্থাপন করিতে চাহেন, তাঁহাদের বিশ্বাসের মূলে আরো ক্ষীণ জ্ঞান। সকল মহাপুরুষদিগকে বিধানের অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়া একজন মহাপুরুষকে কেন্দ্ররূপে দেখাই যেন তাঁহাদের জ্ঞানের সীমা। এ স্থলে একটি কথা স্পষ্ট করিয়া বলা কর্ত্তব্য যে, যাঁহারা বিশ্বাসের পথে গমন করেন, তাঁহারা ত্যাগী, বৈরাগী, নরহিতকারী, ধার্ম্মিক, পূজনীয় এবং প্রেমিক হইতে পারেন; কিন্তু জ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া অনন্তের সহিত তাঁহাদের যোগের সম্ভাবনা আছে কি? কিরূপে তাঁহাদের মন নিখিল বিশ্বে ব্যাপ্ত হইবে? শোনা কথায় এবং বিশ্বাসের পথ অবলম্বনে অনন্তের সহিত যোগ অনুভূত হইতে পারে না; মন বিশ্বে ব্যাপ্ত হইতে পারে না।

দ্বিতীয়, কর্ম্মদ্বারা সমস্ত জগতে শক্তি ব্যাপ্ত হইবার অর্থ কি? কর্ম্ম কেন করিব? প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের মধ্যে কেহ বলেন, মানুষের অভ্যাসই কর্ম্ম করা, মানুষ কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। এই কর্ম্ম নিষ্কাম ভাবে করিতে হইবে। কেহ বলেন,—আপনাকে পবিত্র এবং নির্ম্মল করিতে হইবে, এইজন্য কর্ম্ম করার প্রয়োজন। কেহ বলেন,—পিতা পরমেশ্বর নিয়ত কর্ম্ম করিতেছেন, মানব তাঁহার সন্তান, সুতরাং কর্ম্ম না করিলে পিতার আদর্শ রক্ষা হয় না। প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মের জনক প্রেম। প্রেম হইতেই কর্ম্মের উৎপত্তি। আপনাকে ভাল রাখিবার জন্য, উন্নত করিবার জন্য যে কর্ম্মচেষ্টা, তাহার নাম আত্মপ্রেম। পরিবার রক্ষা ও পালনের জন্য যে কর্ম্ম, তাহার নাম স্বজন-প্রীতি। অপরের দুঃখ দূর করিবার জন্য যে কর্ম্ম, তাহার নাম মানব-প্রীতি। অন্তরে প্রেম না থাকিলে, অপরের দুঃখমোচনের জন্য বেদনার উদয় হয় না। এই বেদনাই কর্ম্মের মূল। কর্ম্ম ভিন্ন প্রেম, অর্থশূন্য বাক্যমাত্র। কর্ম্মদ্বারা বিশ্ব-সংসারে শক্তি ব্যাপ্ত হওয়ার অর্থ প্রেমে আত্ম-প্রসারণ। মানুষ কেবল নিজের জন্য, পরিবারের জন্য কর্ম্ম করিয়া বিরত থাকিবে না। অজ্ঞানকে জ্ঞান, নিরন্নকে অন্ন, রোগীকে সেবা করিয়া কর্ম্মদ্বারা প্রেম সাধন করিতে হইবে। প্রত্যেক অন্তরে ভগবান্ প্রকাশিত। ভগবান্ প্রত্যেকের প্রাণের প্রাণ। সুতরাং নরনারীর সেবা করিলে ভগবানেরই সেবা করা হয়। এখানে একটি কথা বলার প্রয়োজন। ব্রহ্মস্বরূপের দুইটি দিক্ আছে। একটি দিক্‌কে দার্শনিক দিক্ বলা হয়, আর একটিকে নৈতিক দিক্ বলা হয়; অর্থাৎ একটি তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধীয়, আর একটি তাঁহার গুণ সম্বন্ধীয়। অস্তিত্ব সম্বন্ধীয় দিক্‌টি এই,—সত্যং জ্ঞানমনন্তং অদ্বিতীয়; নৈতিক দিক্ হচ্ছে—প্রেম, আনন্দ, পবিত্র-সুন্দর। সত্য, জ্ঞান, অনন্ত অখণ্ডের ভাব ভারতীয় উপনিষদে বিকশিত হইয়াছে। নৈতিক স্বরূপগুলি বীজাকারে এ দেশের শাস্ত্রে আছে বটে; কিন্তু তাহা বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে খ্রীষ্টধর্ম্মে, যীশু-জীবনে। ব্রাহ্মসমাজ যে পূর্ব্ব পশ্চিমের সমন্বয়ের কথা বলিয়া থাকেন, এই স্বরূপ সাধনাতেই তাহার মিলন। যীশুকে অবতার রূপে দাঁড় করিয়া আমরা খ্রীষ্টানের ন্যায় মত ব্যক্তি করিব না; কিন্তু খ্রীষ্ট যে আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, সে আদর্শের নিকট সকল সাধকের মন নত। মানবের পাপ তাপ দেখিয়া, মানবের দুঃখ দেখিয়া তিনি এমনি ব্যথিত ছিলেন যে, তাঁহাকে কেহ হাসিতে—আনন্দ করিতে দেখে নাই। তিনি দুঃখী বলিয়া অভিহিত হইতেন। অন্যান্য ধর্ম্মে সাধকগণ রোগশোক পাপ-তাপ-ময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গগমনের জন্য লালায়িত; কিন্তু যীশু সকল পরিত্যাগ করিয়া আপনি স্বর্গ-গমন করিতে চাহেন না, স্বর্গকে টানিয়া ধরাতলে আনিতে চাহেন; সকলে যাহাতে স্বর্গে বাস করিতে পারে, তাহার উপায়ের জন্য ব্যস্ত। এজন্য তিনি পাপী তাপীর প্রতিনিধিস্বরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলেন; ক্রুশ কাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। যাহারা তাঁহাকে হত্যা করিতেছে, তাহাদের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিলেন। এই যে জগতে স্বর্গরাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা, পাপীর জন্য প্রায়শ্চিত্তসাধন, শত্রুর জন্য প্রার্থনা, এখানেই প্রেমের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। ভারতবর্ষে একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম সাধনার ভাব এক সময় যে জাগিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু খ্রীষ্টান্ ধর্ম্মে যেমন মানব-সেবা, নরহিত-সাধন, নরনারীকে উন্নত করিবার ভাব জাগিয়াছে, জগতের কোন ধর্ম্মে এরূপ হয় নাই। কর্ম্ম ভিন্ন বিশ্বসংসারে মানবের শক্তি ব্যাপ্ত হইতে পারে না; প্রেমময় পরমেশ্বরকে বাদ দিয়া, কর্ম্ম হইতে পারে না। পুনরায় বলিতেছি, প্রেমই কর্ম্মের জনক, বেদনাই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক।

* রবীন্দ্রনাথ প্রণীত—সাহিত্য ৭৯ পৃঃ

এ স্থলে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, প্রকৃত পক্ষে "জ্ঞান ও ভাব দুইটা বস্তু নহে; একই অভিজ্ঞতার দুই দিক্‌মাত্র।" * ভারতবর্ষে যে ব্রহ্মের নৈতিক স্বরূপের দিক্ প্রস্ফুটিত হয় নাই, তাহার কারণ এই যে, নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদে এবং বৌদ্ধগণের ক্ষণিকবাদে সাধকগণের চিত্ত আচ্ছন্ন হইয়াছিল। ব্রহ্ম সকল স্বরূপ সমন্বিত হইয়া বিরাজিত, কোন একদিকে জোর দিলে তাঁহার সাধনা নিষ্ফল হয়। যীশু যে বলিয়াছেন,—পিতা-পুত্র এক এবং পিতার ন্যায় পূর্ণ হও, সাধনরাজ্যের ইহা অতি গভীর ও উচ্চ কথা। এখানে তিনি ভারতীয় ঋষিগণের সহিত যুক্ত হইয়াছেন।

তৃতীয় কথা, সৌন্দর্য্যবোধের দ্বারা নিখিল জগতে আনন্দ ব্যাপ্ত হওয়া। এই যে রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ এ সকল অনিত্য বটে; কিন্তু মিথ্যা নহে, মায়া নহে, ভেল্‌কি-বাজি নহে। ইহা অসীমের সসীম প্রকাশ। অসীমের এই যে সসীম প্রকাশ ইহাই সৌন্দর্য্য। "তোমারি মধুর রূপে ভরেছ ভুবন, মুগ্ধ নয়ন মম পুলকিত মোহিত মন।" † * "মধুর রূপে বিরাজো হে বিশ্বরাজো, শোভন-শোভা নিরখি মনঃপ্রাণ ভুলে।"

সৌন্দর্য্যের মধ্যে অনন্তকে দর্শন করিলেই প্রকৃত আনন্দের উদয় হয়। সৌন্দর্য্যের মধ্যে অনন্তকে দর্শন করাই আমাদের সাধনার উদ্দেশ্য। সৌন্দর্য্যের মধ্যে শৃঙ্খলা, বিচিত্রতা এবং সামঞ্জস্য আছে। এই শৃঙ্খলা, বিচিত্রতা, সামঞ্জস্য অনন্তেরই প্রকাশ। ইউনিটির মধ্যে ডিফারেন্স—অদ্বৈতের মধ্যে দ্বৈত। অদ্বৈতকে ছাড়িয়া কেবল দ্বৈতকে দেখিলে প্রকৃত সৌন্দর্য্যানুভূতি হয় না।

দার্শনিক হ্যামিলটন বলেন,—"বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বই প্রকৃত সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্যের আনন্দ হইতে অন্যান্য সুখ পৃথক জিনিস।

সেইন্ট আগষ্টিন বলেন,—"একত্বই সৌন্দর্য্যের আকৃতি।" * * "ভগবৎ সৌন্দর্য্যই জড় ও জীবজগতের সৌন্দর্য্যের কারণ।"

বাস্তবিক অসীমের সসীম প্রকাশ রূপে দর্শন করাকেই সৌন্দর্য্যানুভূতি বলে। এই রূপে সৌন্দর্য্যকে দেখিলেই প্রাণে বিমলানন্দের উদয় হয়, ইহাকেই বলে নিখিল বিশ্বে আনন্দ ব্যাপ্ত হওয়া—অর্থাৎ সৌন্দর্য্যবোধের দ্বারা আনন্দ ব্যাপ্ত হওয়া। "জলে হরি স্থলে হরি অনলে অনিলে হরি, হরিময় এ ভূমণ্ডল।" এই দর্শনেই সর্ব্বত্র মন আনন্দে ব্যাপ্ত হয়।

অভেদের মধ্যে ভেদকে ভাল করিয়া দেখিতে হইবে, বুঝিতে হইবে, এখানেই ব্রাহ্মসাধনার আরম্ভ। এবং সকল ভেদের মধ্যে অভেদকে—অনন্তকে পাইতে হইবে, আস্বাদন করিতে হইবে, এখানেই ব্রাহ্মসাধনার বিকাশ! হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মদ্বারা যে একটি আবেষ্টন গঠিত হইয়াছে, তাহা হইতে এই নবসাধনা উদ্ভূত হইয়াছে। ইহা একটি ভুঁই-ফোঁড় নব-সাধনা নহে; কিন্তু ইহা পুরাতন হইতে উদ্ভূত নবীন মত ও সাধনা। ইহাকে বিশুদ্ধ দ্বৈতবাদ বা ভেদাভেদবাদ প্রভৃতি নামে অভিহিত করিলেও ইহাতে নূতনত্ব আছে। পুরাতনের ভিতর হইতে এই নূতন বাহির হইয়া। বিশ্বজনের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছে। ইহা অজেয়। এই মত ও সাধনা জগৎকে গ্রহণ করিতেই হইবে। তবে এখানে বৈষ্ণবগণের একটি মহাবাক্য স্মরণ হইতেছে—"আপনি আচরি ধর্ম্ম জগতে শিখায়।" এই মত ও সাধনা বাক্যদ্বারা নহে—আমাদের চরিত্র, কার্য্য, ব্যবহার-দ্বারা প্রকাশিত হউক। আমরা সীমার মধ্যে অসীমকে দেখিয়া, রূপের মধ্যে অপরূপকে দেখিয়া, শোকদুঃখের মধ্যে আনন্দময়ের আবির্ভাব দেখিয়া ধন্য হই, কৃতার্থ হই। আমাদের বাক্য ও জীবন সত্য হউক। আমরা অনন্তকে আস্বাদন করিয়া ইহ জীবনে স্বর্গের আনন্দ লাভ করি। প্রভু পরমেশ্বর এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

* ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের নারায়ণ পত্রিকায় প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

† সৌন্দর্য্য তত্ত্ব। বাবু অন্নদাচরণ গুহ প্রণীত।

পরিবারে ধর্ম্ম সাধন ও সন্তানগণের ধর্ম্মশিক্ষা।

(১১)

৩। মানসিক বিকাশ।

"The main business is the getting of experience, and not the getting of words."

জ্ঞান অভিজ্ঞতামূলক হওয়া চাই, শব্দমূলক নয়।

"Education founded upon words, is apt to generate intellectual snobbery."

শব্দমূলক শিক্ষা মানসিক লঘুতা উৎপন্ন করে।

জ্ঞানের লক্ষণ।

শরীর অপেক্ষা মন ধর্ম্ম সাধনের, সত্য লাভের আরও শ্রেষ্ঠতর যন্ত্র। মনের বৃত্তি সকল মার্জ্জিত ও বিকশিত না হ'লে সত্যের ধারণা হয় না। এজন্য গৃহে গৃহে ধর্ম্ম সাধনের উপকরণ স্বরূপ জ্ঞান সাধনের আয়োজন থাকা আবশ্যক। জ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে ধারণা সর্ব্বদা স্পষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয়। সকল শিক্ষারই প্রধান লক্ষ্য সত্যলাভ,—চরিত্রগঠন, মানুষ হওয়া। জ্ঞান উপার্জ্জনের লক্ষ্য কি? সংক্ষেপে বলা যায়—(১) চরিত্র গঠন—মানুষ হওয়া; (২) সত্য মিথ্যা বোধ বৃদ্ধি করা, (৩) জ্ঞানকে কাজে পরিণত করবার কৌশল ও শক্তি লাভ করা, (৪) জীবিকা অর্জ্জনের শক্তি লাভ করা, (৫) বিবিধ বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করা।

চরিত্র গঠন বা মনুষ্যত্বলাভ জ্ঞানসাধনের শ্রেষ্ঠ ফল; সত্য মিথ্যা নির্ণয়, সত্য বোধকে কাজে পরিণত করা ও জীবিকা অর্জ্জনের শক্তিলাভ করা তার মূল ও কাণ্ড প্রভৃতি। কোন লক্ষ্যই বাদ দিবার নয়, দুইই পরস্পর সাপেক্ষ।

অর্থকরী বিদ্যার জন্য আমরা সন্তানগণকে স্কুলে পাঠাই। স্কুলে শিক্ষার সঙ্গে গৃহের শিক্ষার যোগ রক্ষা করতে পারলে, সেই শিক্ষাই বহু পরিমাণে সকল লক্ষ্য সাধনের উপায় হ'তে পারে। স্কুলের শিক্ষায় অনেক সময় শক্তির বিকাশ হয় না, কেবল নানা বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করা হয়। গৃহে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যে স্কুলের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যেন বিবিধ মনোবৃত্তির বিকাশের সহায় হয়।

পর্য্যবেক্ষণ।

জ্ঞান উপার্জ্জনের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বনীয়। পর্য্যবেক্ষণ

—অর্থাৎ দেখে শুনে শেখা,—(১) বাড়ীতে নানা কাজের জন্য যত বস্তু দরকার হয়, সে সব কেমন, কোন্ বস্তুর কি গুণ, কত দাম, কোথায় পাওয়া যায়, কি ক'রে উৎপন্ন হয়, কেমন ক'রে রাখতে হয় ও ব্যবহার করতে হয়, ইত্যাদি দেখে শুনে শিখবার বিষয়।

(২) বাজার, দোকান, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, পাহাড়, জঙ্গল, সভাসমিতি ইত্যাদি নানা স্থানে দেখে শুনে বহু বিষয় শিখতে হয়। (৩) এজন্য একাগ্রতা ও তন্ন তন্ন ক'রে দেখার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করা আবশ্যক। কোন একটী বিষয়ের কোন একটী ঘটনার নানা দিক দিয়ে দেখবার, জানবার, বুঝবার, ও শিখবার ইচ্ছা ও অভ্যাস জাগ্রত করা আবশ্যক। (৪) এজন্য সরল বিজ্ঞানের সহায়তা প্রয়োজনীয়। এ উপায়ে জগতে জগদীশ্বরের লীলা সন্তানদের পক্ষে বোধগম্য করা যায়। (৫) বাগানের চিত্রাঙ্কণ প্রভৃতি এবিষয়ে বিশেষ সহায় হ'তে পারে। (৬) দিন, পক্ষ, ঋতু ভেদে কত পরিবর্ত্তন,—সকাল, সন্ধ্যা, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, গ্রীষ্ম, শীত; কত ফুলফল, খাদ্যপানীয়, পশুপক্ষী; কত দেশ, কত ভাষা—সবই মনোযোগের ও আনন্দসহকারে জানবার বিষয় করা যায়। এ শিক্ষার অভাবে অনেকে "চোখ থাকৃতে কাণা"—বিশ্বে বিশ্বপতিকে দেখতে পায় না।

অধ্যয়ন।

দেখে শুনে জ্ঞানলাভের ভিতর দিয়ে, পড়ে শিখবার আকাঙ্ক্ষা লাভ করা যায়। কিন্তু বই পড়ার ভিতর দিয়েও মনের বিবিধ বৃত্তির বিকাশ হওয়া চাই। স্মৃতিশক্তি, কল্পনা ও গঠনশক্তি, বিচারশক্তি, বর্ণনাশক্তি প্রভৃতি, বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যয়নের ফলে বিশেষরূপে বিকশিত হয়। গান জানে, কিন্তু বই না দেখে গাইতে পারে না, কারণ, গান মুখস্ত নাই, এরূপ প্রায়ই দেখা যায়। স্মৃতিশক্তির প্রতি ঔদাসীন্যই এর মূল।

এইরূপ নানা কাজে, অন্যান্য শক্তির অভাব দেখা যায়। কোন্ সন্তানের কোন্ বিষয়ে শক্তি কম, কি কি উপায় অবলম্বন করলে সে অভাব দূর হবে, সে বিষয়ে সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন—

উপায়।

স্মৃতি শক্তির বিকাশের জন্য (১) যা ভাল লাগে এমন গান, কবিতা, গল্প, ঘটনা প্রভৃতি মনে রাখিতে উৎসাহ দেওয়া। (২) প্রত্যহ যা কিছু ঘটনা সন্তানগণ দেখে, তার বর্ণনা শোনা।

কল্পনা ও গঠন শক্তি বিকাশের জন্য—(১) গল্প, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ঐতিহাসিক চিত্র ও উপন্যাসের ঘটনাবলী সুন্দররূপে বর্ণনা করতে বলা। (২) প্রত্যহ জনসমাজে যে সকল সুখদুঃখের ঘটনা ঘটছে তার সংস্পর্শ ও বর্ণনা।

বিচার শক্তি।

সাধারণ ঘটনাবলীর ও ছেলেদের ঝগড়া বিবাদের বিচার করতে দিয়ে বিচার শক্তি এবং আত্মদৃষ্টি উন্মুক্ত করা যায়।

লাইব্রেরী।

গৃহে অধ্যয়ন সজীব রাখবার জন্য সাহিত্য, গল্প, ইতিহাস, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, বিজ্ঞান—শরীরতত্ত্ব, জীবনচরিত, নীতি ও ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বিবিধ গ্রন্থসমন্বিত একটি পারিবারিক লাইব্রেরী থাকা বাঞ্ছনীয়। লাইব্রেরীর (১) বইগুলি সুন্দর রূপে সজ্জিত ও বিষয় অনুসারে বিভক্ত রাখা উচিত। (২) একটি পুস্তকের তালিকা, এবং (৩) কাহাকেও কোন বই ধার দিতে হ'লে তারিখ সহ তাঁর নাম ও বইএর নাম লিখে রাখবার একটি খাতা থাকা উচিত। (৪) সন্তানগণের উপযোগী, ছবির বই, গল্পের বই গ্লোব, মানচিত্র প্রভৃতিও লাইব্রেরীতে রাখা উচিত এবং (৫) সন্তানগণকে লাইব্রেরীর বই ব্যবহার করবার ও সাজিয়ে রাখবার নিয়ম শিক্ষা দিয়ে, (৬) একজনের হাতে লাইব্রেরী ঠিক রাখবার ভার দেওয়া উচিত। পিতামাতা যদি জ্ঞানানুরাগী, জ্ঞান অনুশীলনে তৎপর, বিধিপূর্ব্বক ও উন্নত প্রণালী অনুসারে জ্ঞানের চর্চ্চায় রত না হন, তা'হলে লাইব্রেরী থাকা না-থাকা প্রায়ই সমান। জ্ঞান স্পৃহা, জ্ঞান লাভের প্রণালী, জ্ঞান চর্চ্চার বিধি ব্যবস্থা ও আয়োজন এবং আলোচ্য বিষয় আসল জিনিষ।

(৭) সন্তানগণের হাতে যাতে সৎগ্রন্থ পড়ে সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সন্তানদের পক্ষে, ১৬ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত, বই পড়ার নিয়ম এই:—পিতা মাতার অনুমতি ব্যতীত তারা কোন বই পড়বে না, এবং পিতামাতাও না জেনে বা না দেখে কোন বই পড়ার অনুমতি দিবেন না।

(৮) পাঠের সময় ১৫ মিনিট হোক তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু সেই সময়টুকু শান্ত সংযতভাবে যাপন করা চাই—এটি পিতা মাতার আত্মজীবনে দেখাতে হবে।

(৯) পদ্য ও গদ্য অতি সুন্দরভাবে তন্ময় হ'য়ে পাঠ কর, আবৃত্তিকর, বিশেষ ভাল ভাল অংশ সন্তানদের ডেকে শুনাও; জ্ঞানচর্চ্চা করতে করতে পবিত্রভাবে, আনন্দে, গাম্ভীর্য্যে মগ্ন হও; মহৎ চরিত্র ও সৎ শাস্ত্রের উক্তি সরলভাবে ব্যক্ত কর;—তার সংস্পর্শে সন্তানদের অন্তরে সাধুভাব ও জ্ঞান স্পৃহা জাগ্রত হবে। এজন্য রুটিনবদ্ধ নির্দ্দিষ্ট সময় থাকা আবশ্যক।

(১০) সকলের পক্ষে সব বই কেনা সম্ভব নয়, এজন্য কোন ভাল পাবলিক লাইব্রেরীর সভ্য হওয়া উচিত।

(১১) বিবিধ বিষয়ে সংবাদ জানবার জন্য সপ্তাহের কোন সংবাদ পত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য এবং বয়স অনুসারে সন্তানগণকেও সে বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া উচিত।

(১২) সন্তানদের স্কুলের পড়াশুনার প্রতি ও বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। স্কুলের শিক্ষকগণ বা গৃহশিক্ষক সন্তানের শিক্ষা সম্বন্ধীয় সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে পারেন না। শিক্ষার কার্য্যগত ও চরিত্রগত অংশ প্রধানতঃ গৃহে জনক জননীর হাতে। এজন্য স্কুলের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়েও চোক রাখতে হবে—ছেলেরা যেন (ক) বই খাতা দোয়াত কলম প্রভৃতি যথাস্থানে গুছিয়ে রাখে, (খ) খাতা বই প্রভৃতি পরিষ্কার রাখে, (গ) প্রত্যেক বস্তুর যথা-নির্দ্দিষ্ট ব্যবহার করে, (ঘ) প্রত্যহ রুটিন্ অনুসারে যথা সময়ে উৎকৃষ্ট প্রণালী অনুসারে নিখুঁৎরূপে প্রত্যেক বিষয় শিক্ষা করে, (ঙ) সেই সঙ্গে শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা এবং (চ) সহপাঠীগণের প্রতি প্রীতি যেন বর্দ্ধিত হয়। (ছ) সন্তানদের পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে পিতামাতার যোগ থাকা আবশ্যক, (জ) পাঠ্য বিষয়, শিক্ষা-প্রণালী, শিক্ষক, স্কুলের ব্যবস্থা ও সন্তানদের সহপাঠিগণ সম্বন্ধে

সর্ব্বদা সংবাদ রাখা আবশ্যক এবং (ঝ) এসকল প্রসঙ্গে সর্ব্বদা সন্তানের মনে সাধুভাব জাগ্রত করার দিকে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

শনিবার, রবিবার এবং স্কুলের ছুটির দিনের স্বতন্ত্র রুটিন্ থাকা আবশ্যক; সে সব দিন কিছুক্ষণ গল্পের বই, মাসিক পত্র প্রভৃতি পড়া, এবং যে সব বিষয় স্কুলে শিক্ষা হয় না, সে সব বিষয় কিছু কিছু শিক্ষার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

আলোচনা ও সত্য নির্ণয়

নানা বিষয়ের আলোচনার জন্য গৃহে ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। আলোচনার ফলে সন্তানগণের মনের অনেক অন্ধকার সংশয় কেটে যায়, নূতন নূতন প্রশ্ন মনে জাগে, পরস্পরের মধ্যে পরিচয় হয়।

চিন্তা

নির্জ্জন চিন্তা ব্যতীত জীবন লঘু হ'য়ে থাকে। যেমন মেলা-মেশা, আলোচনা, অধ্যয়ন আবশ্যক, তেমনি নিরবে নির্জ্জনে চিন্তাও আবশ্যক। সন্তানগণকে গভীর চিন্তার বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত ক'রে দিলে, তারা স্বভাবতই চিন্তা না ক'রে পারে না। এবিষয়ে তিনদিকে লক্ষ্য রাখা চাই,—(১) অনুকূল স্থান, (২) অনুকূল সময় এবং (৩) উৎসাহজনক ও সাহায্য-কর আলোচনা। কে কি চিন্তা করে পিতামাতার সে বিষয়ে সন্ধান নিয়ে, সন্তানের সহায় হওয়া কর্ত্তব্য।

সংকল্প।

আলোচনা ও চিন্তার সঙ্গে ন্যায়পরতা, দায়িত্ববোধ, সংকল্প ও সাহস ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সত্যনির্ণয়, সত্যপালনে বাধ্যতা-বোধ, সেজন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং অসুবিধা ও পরিশ্রম বহন করতে নির্ভীক, প্রস্তুত, ইচ্ছুক—যাতে হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। সত্যজ্ঞান, কর্ত্তব্যবোধ নিয়ে যেন খেলা করবার অভ্যাস না হয়। সে বড় ভয়ানক নীতি ও ধর্ম্মের শত্রু।

রুটিন্।

দায়িত্ববোধ, কর্ত্তব্যজ্ঞান, শৃংখলা, সংকল্প ও দৃঢ়তা বৃদ্ধির জন্য রুটিন আবশ্যক। কাজ ও কাজের সময় ঠিক রাখার জন্যই রুটিন্। স্থান পর্য্যন্ত রুটিনের অন্তর্গত করা যেতে পারে। পাঁচ জনের পাঁচ রকম কাজের মধ্যে মিলন ও শৃংখলা রাখতে হ'লে, একপরিবার হ'য়ে পরস্পরের পক্ষে যোগ রক্ষণ করতে হ'লে রুটিন একান্ত আবশ্যক। প্রতি পরিবারে চার রকম রুটিন আবশ্যক। ১ম গৃহ পঞ্জিকা—স্থায়ী বাঁধানো খাতায়, পূর্ব্বপুরুষগণের নাম ধাম ইত্যাদি, গৃহের সকলের জন্ম, দীক্ষা, বিবাহ, মৃত্যু প্রভৃতির তারিখ, বিশেষ বিশেষ বন্ধু বা আত্মীয়গণের জন্ম মৃত্যু প্রভৃতির তারিখ, সাধুভক্তগণের জন্ম বা মৃত্যু দিন, পারিবারিক বিশেষ ঘটনার তারিখ, প্রভৃতি লিখে রাখা। মাসের ক্রম অনুসারে এ পঞ্জিকা প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য।

২য় পারিবারিক রুটিন—এক এক মাসের জন্য অথবা দুই তিন মাসের জন্য এই রুটিন করা যায়। ঋতুভেদে এ রুটিন বদলাতে হয়—শীতকালে এক রকম, গ্রীষ্মকালে অন্য রকম। এই রুটিনে পরিবারের সকলের জন্য—স্নান, আহার, উপাসনা, আমোদ আহ্লাদ, অনুষ্ঠান প্রভৃতির সময় নির্দ্দিষ্ট থাকবে। পরিবারের সকলে এ রুটিনের অনুগত হ'তে বাধ্য। এ রুটিন্ কর্ত্তা গিন্নীর আদেশ

৩য় ব্যক্তিগত রুটিন্—পারিবারিক রুটিনের সঙ্গে মিলিয়ে, নিজের নিজের কাজ অনুসারে, প্রত্যেকের স্নান আহার, পড়াশুনা, ধর্ম্মসাধন, খেলা আমোদ, শয়ন প্রভৃতির নির্দ্দিষ্ট সময় থাকা আবশ্যক। সন্তানদের রুটিন্ মাতাপিতার নির্দ্দেশ অনুযায়ী হওয়া উচিত।

৪র্থ বিশেষ বিশেষ কার্য্যের রুটিন—যেমন বিবাহ বা মাঘোৎ-সব বা কোন জায়গায় বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে যাওয়া উপলক্ষ্যে বিশেষ সময় ঐ কর্ম্ম ব্যবস্থা। ক্রমশঃ

শ্রীসুরেন্দ্রশশী গুপ্ত।

প্রাপ্ত।

আচার্য্য ও মণ্ডলী।

অভিধানে আছে, আচার্য্য শব্দের অর্থ বেদাধ্যাপক, শিক্ষা-গুরু এবং যজ্ঞাদি কার্য্যের প্রধান সম্পাদক। এই সকল অর্থই পুরাতন। বর্ত্তমান সময়ে এরূপ প্রয়োগ অল্পই দেখা যায়। কলেজের অধ্যাপকগণের নামের পূর্ব্বে কখনও কখনও আচার্য্য শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় এবং ব্রাহ্মসমাজে যিনি নিয়মিত উপাসনা করেন তাঁহাকে আচার্য্য নামে অভিহিত করা হয়।

ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্য শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কি অর্থে প্রথমে এই শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছিল নির্ণয় করা কঠিন। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অবস্থাতে বেদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করা হইত। সুতরাং বেদাধ্যাপক অর্থে এখানে আচার্য্য শব্দের প্রয়োগ করা অসম্ভব নয়। ধর্ম্ম শিক্ষক বা গুরু অর্থেও ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু বেদ পাঠ বা বেদ ব্যাখ্যা ব্রাহ্মসমাজে এখন আর হয় না। ব্রাহ্মসমাজ গুরু বাদের ও ভয়ানক বিরোধী। তত্রাচ আচার্য্য শব্দের প্রয়োগ পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময়ে ব্রাহ্মসমাজে এ দেশীয় ভাব প্রবল ছিল। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যভাব এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রভাব ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছে। এসময়েই খৃষ্টান সমাজের minister and congregationএর ভাব হইতে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও মণ্ডলীর ভাবের বিকাশ হইয়াছে। সুতরাং আচার্য্য এবং মণ্ডলীর মধ্যে প্রাচ্য গুরু শিষ্যের ভাব এবং প্রতীচ্য minister and congre-gationএর ভাব—দুএরই বিকাশ হওয়া স্বাভাবিক। একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

এদেশের ভাব ছিল গুরুকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করা এবং শিষ্যকে পুত্রবৎ দেখা। গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ, পিতা পুত্রের সম্বন্ধ। কিন্তু পিতা পুত্রের সম্বন্ধ কি? পিতার শরীর হইতে পুত্রের শরীরের উৎপত্তি। পিতার মনপ্রাণ হইতে পুত্রের মনপ্রাণ জাত, পিতার সেবায়, যত্নে, শিক্ষায় পুত্রের দেহ মনের বিকাশ। সুতরাং পিতা পুত্রের জনক রক্ষক, প্রতিপালক, নিস্বার্থ সেবক ও শিক্ষক। পিতার ন্যায় পুত্রের শ্রদ্ধা ভক্তি ও সম্মানের পাত্র আর কে আছে? তাই এ দেশীয় সাধকগণ গুরুকে পিতারতুল্য স্থান দান করিয়াছেন এবং পিতৃভক্তির ন্যায় শ্রেষ্ঠ ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্পণ করিয়াছেন

কেবল তাহা নয়, তাঁহারা মনে করিতেন গুরু ধর্ম্মজীবনের জনক, রক্ষক এবং প্রতিপালক। কারণ, গুরুর দীক্ষাদানে শিষ্যের ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ, গুরুর শিক্ষা ও পরিচালনায় শিষ্যের ধর্ম্মজীবনের বিকাশ এবং উন্নতি। পিতার ন্যায় গুরুও আমাদের মহা সেবক,—নিস্বার্থ সেবক। গুরুর সেবায় মানবাত্মার বিকাশ ও উন্নতি হয়।

এই সেবার ভাবই পাশ্চাত্য গুরু শিষ্যের সম্বন্ধের প্রধান লক্ষণ। সেবার ভাব হইতেই minister শব্দের উৎপত্তি। মিনিষ্টার অর্থ সেবক। তাঁহার সেবায়, যত্নে, পরিচালনায় মানবাত্মার বিকাশ, গতি ও উন্নতি। তিনি মোক্ষপথের পথ-প্রদর্শক। মেষপালক যেমন নিরীহ মেষগুলিকে আহার দানের জন্য সবুজ তৃণক্ষেত্রে লইয়া যায়, জল পান করাইবার জন্য স্বচ্ছসলীলা স্রোতস্বিনীর তীরে লইয়া যায় এবং হিংস্র জন্তুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া নিশাগমে স্ব স্ব গৃহে লইয়া যায়, তেমনই মিনিষ্টার মানবাত্মাকে আধ্যাত্মিক অন্ন জল দান করিবেন, আধ্যাত্মিক শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিবেন এবং স্বর্গ রাজ্যের পথ প্রদর্শন করিবেন—এইটী দ্বিগুর ভাব। এই ভাবেই খৃষ্টীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে minister and congregation অর্থাৎ আচার্য্য ও মণ্ডলীর ভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মসমাজে এ সকল ভাবের বিকাশ হইয়াছে কিনা আপনারা চিন্তা করিয়া দেখুন। পূর্ব্বোক্ত প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য উভয় ভাবের মধ্যেই পরস্পরমুখীন যে আকর্ষণ রহিয়াছে—এক দিকের শ্রদ্ধা, ভক্তি, নির্ভর—অন্যদিকের স্নেহ, সেবা, পরিচালনা,—ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্য ও মণ্ডলীর মধ্যে তাহার কতদূর বিকাশ হইয়াছে চিন্তা করিয়া দেখা উচিৎ। আমার মনে হয় ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা এ সকল ভাব বিকাশের অনুকূল নয়। যখন আমি মনে করিতে পারি, "ইনি আমার গুরু, ইহাঁর নিকট আমি শিক্ষা পাইয়াছি বা পাইব" তখনই তাঁহার উপর আমার শ্রদ্ধা, ভক্তি, নির্ভর জন্মিতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ গুরুবাদের ভয়ানক বিরোধী। কতকটা বর্ত্তমান শিক্ষা এবং সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া, কতকটা ব্রাহ্মসমাজের মতের প্রভাবে এখানে কেহ কাহাকেও গুরু স্বীকার করিবে, ইহা সম্ভবপর নয়। সুতরাং শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নির্ভরের ভাব কোথা হইতে আসিবে? আবার আমি যাহাকে ভক্তি করিতে পারি না, যাহার উপর একটুও নির্ভর করিতে পারি না, তিনি কোন সাহসে আসিয়া বলিবেন "আমি তোমার আত্মার সেবা করিতে বা তোমাকে ধর্ম্ম-পথে চালাইতে আসিলাম; আমি তোমার মেষপালক?" একদিকে ভক্তি ও নির্ভর না থাকিলে অন্য দিকে সেবা ও পরিচালনের ভাব জন্মে না। কারণ, ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ।

ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য নিয়োগের প্রণালীও এ সকল ভাব বিকাশের অনুকূল নয়। মণ্ডলীর লোক—নর নারী, যুবক বৃদ্ধ সকলে একত্র হইয়া এক দিন ভোট দিয়া এক বছরের জন্য একজনকে আচার্য্য নিযুক্ত করিলেন। এক বছর পরে আর তাঁহার পদ থাকিবে না। প্রয়োজন হইলে [illegible]শের মধ্যে তাঁহার পদচ্যুতি হইতে পারে। সুতরাং [illegible] উপর আচার্য্যের নিয়োগ বা বিনিয়োগ [illegible] তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধা এবং ভক্তি করিবে, বা ধর্ম্মজীবনের পরিচালনার জন্য তাঁহার উপর নির্ভর করিবে, ইহা স্বাভাবিক নয়। অতএব ইহাকে আচার্য্য নিয়োগের শ্রেষ্ঠ প্রণালী মনে করা যাইতে পারে না।

আচার্য্যের উপযুক্ততার উপরও এ সকল ভাবের বিকাশ কিয়ৎ পরিমাণে নির্ভর করে। আচার্য্য ব্রহ্মজ্ঞানে উন্নত হইবেন। শাস্ত্রপাঠজনিত জ্ঞানের প্রয়োজন আছে; কিন্তু সাধনলব্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রয়োজন আরও অধিক। আচার্য্য যেমন জ্ঞানবান হইবেন, তেমনই ধর্ম্মভাবসম্পন্ন হইবেন। ধর্ম্মজ্ঞান এবং ধর্ম্মভাব দুই-ই চাই। ধর্ম্মের পথেই তাঁহার প্রাণ নিত্য ধাবিত হইবে। ধর্ম্মই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য, ধর্ম্মই তাঁহার শান্তি এবং আরাম হইবে। আবার তিনি নিজে যেমন ধর্ম্ম লাভের জন্য ব্যাকুল হইবেন তেমনই অন্যের জীবনেও ধর্ম্মের আলোক দান করিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানে উন্নত, ধর্ম্মসাধন-নিরত ধর্ম্মভাবসম্পন্ন এবং ধর্ম্মপ্রচারে আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিই আচার্য্য হইবার যোগ্য। আচার্য্যের দুইটী প্রধান ভাব ধর্ম্মলাভ ও ধর্ম্মদান। তিনি ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর হইতে প্রত্যক্ষভাবে ধর্ম্মালোক লাভ করিবেন এবং তাঁহার মণ্ডলীর নর নারীকে তাহা দান করিয়া আনন্দিত হইবেন। জানিনা ইহাতে কেহ মধ্যবর্ত্তীবাদের ছায়া দেখিয়া ভয় পাইবেন কিনা। কিন্তু তাহার কোন কারণ নাই। কারণ এখানে পরমেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ যোগের কোন বাধা নাই। পক্ষান্তরে একথাও আমরা অস্বীকার করিতে পারি না যে, যেমন মহাপুরুষগণের মধ্য দিয়া, তেমনই আচার্য্য ও গুরুর মধ্য দিয়া, আমরা বহুল পরিমাণে ধর্ম্মের আলোক লাভ করি। ইহাদিগকে অভ্রান্ত মনে করাই ভ্রম; ইহাদের শিক্ষা গ্রহণ করা কিম্বা ইহাদিগের নিকট বিনীত বা কৃতজ্ঞ থাকা দূষনীয় নয়।

অনবসর আচার্য্যদ্বারাও দায়িত্বপূর্ণ আচার্য্যের গুরু কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং এ সকল ভাবের বিকাশও অসম্ভব। নিজের ও পরিবারের অন্ন সংস্থান করিতে যাহার সমস্ত দিন কাটিয়া যায়, তিনি কখন বা ধর্ম্ম চিন্তা বা ধর্ম্ম সাধন করিবেন, কখন বা মণ্ডলীর ধর্ম্ম জীবনের প্রতি দৃষ্টি করিবেন? অথচ আমাদের আচার্য্যগণ প্রায় সকলেই এই অবস্থাপন্ন। অনন্যকর্ম্মা আচার্য্য নাই বলিলেই হয়। অনন্যকর্ম্মা প্রচারক যেমন চাই, অনন্যকর্ম্মা আচার্য্যও চাই। প্রচারকের কার্য্য হইতে আচার্য্যের কার্য্য অনেক বেশী এবং দায়িত্বও গুরুতর। অথচ কার্য্যান্তরে লিপ্ত অর্থোপার্জ্জনে ও অন্ন সংস্থানে ব্যস্ত অবসরবিহীন ব্যক্তিগণকে সর্ব্বত্র আচার্য্যের গুরুভার অর্পিত হইতেছে। এই অবস্থায় আমরা ধর্ম্ম সমাজের বিশেষ কল্যাণ আশা করিতে পারি না। ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন, ধর্ম্ম চিন্তা, ধর্ম্ম সাধন ও মণ্ডলীর সেবা করা আচার্য্যের কার্য্য। এসকল কার্য্যে যথেষ্ট সময় দিতে না পারিলে আচার্য্যের কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন হয় না। সুতরাং অনন্যকর্ম্মা প্রচারকের ন্যায় অনন্যকর্ম্মা আচার্য্য নিয়োগ করা প্রয়োজক। তাই [illegible] জন্য [illegible] ব্যবস্থা করাও আবশ্যক। সমাজের অর্থাভাব আছে জানিতে পারি। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য উহাও [illegible] আবশ্যক। অর্থ [illegible] কোন কার্য্যই [illegible] যায় না। কেহ

শিক্ষাই দেওয়া যায় না, তবুও কি আমরা মনে করিব ধর্ম্মপ্রচারের জন্ম এবং ধর্ম্মশিক্ষার জন্ম অর্থের কিছুই প্রয়োজন নাই?

আচার্য্যেরাও প্রচারক। কিন্তু আচার্য্য এবং প্রচারকগণের কার্য্যপ্রণালী এক নয়। প্রচারকগণ তাঁহাদের বলিবার কথাগুলি বলিলেই—ধর্ম্মের সুসমাচার দিলেই, কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল। পরিচিত অপরিচিত মণ্ডলীর ভিতরের বা বাহিরের সকল নরনারীর নিকট তাঁহাদের সুসমাচার বিতরণ করিলেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল। তাঁহাদের কথা গৃহীত হইল কিনা, তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রতিপালিত হইল কিনা, তাহা দেখিতে তাঁহারা বাধ্য নন। তাঁহারা বীজ ছড়াইবেন, অঙ্কুরোদ্গম হইল কি না তাহা দেখা তাঁহাদের কাজ নয়। কিন্তু আচার্য্যগণ মেষপালকের ন্যায় মণ্ডলীর নরনারীর সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া পথ প্রদর্শন করিবেন; তাঁহাদিগকে আধ্যাত্মিক সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন। তাঁহারা পিতার ন্যায় ধর্ম্মপুত্রগণকে আধ্যাত্মিক অন্ন জল দিয়া, রোগে শোকে সেবা করিয়া, সংগ্রামে উৎসাহ এবং বল দান করিয়া তাহাদিগকে জীবনের পথে অগ্রসর করিবেন। সুতরাং প্রচারক হইতেও তাঁহাদের দায়িত্ব অনেক বেশী। প্রচারকেরা জীবন পরিবর্ত্তনের সহায়তা করেন, কিন্তু আচার্য্যেরা জীবন গঠন করেন। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এই দায়িত্বজ্ঞানের গভীরতা অল্পই দেখা যাইতেছে। আচার্য্য নিয়োগ প্রণালীও তাহা প্রকাশ করে না এবং আচার্য্যের কার্য্যেও তাহা লক্ষিত হয় না। কোন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় দায়িত্ববিহীন বহু আচার্য্য নিযুক্ত রহিয়াছেন। একজন আচার্য্য হয়ত সারা বছরে একবার কি দুই বার ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করিলেন বা উপদেশ দিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার সঙ্গে হয়ত মণ্ডলীর আর কোনও সম্বন্ধ রহিল না; হয়ত আর দেখা সাক্ষাৎও হইল না। এই অবস্থায় আচার্য্য এবং মণ্ডলীর মধ্যে কি সম্পর্ক হইতে পারে? হিন্দুসমাজে গুরু শিষ্যের সম্পর্কে যে পিতৃত্বের ভাব রহিয়াছে, খ্রীষ্টান সমাজের আচার্য্য ও মণ্ডলীর সম্পর্কের মধ্যে যে মেষ পালকত্বের ভাব রহিয়াছে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে আচার্য্যের জীবনে তাহার বিকাশ হওয়া অসম্ভব। মন্দিরে দুএক দিন উপাসনা করাই আচার্য্যের একমাত্র কাজ নয়।

পশ্চিম দেশে আচার্য্যের সঙ্গে মেষপালকের তুলনা করা হইয়াছে,—এদেশে আচার্য্যের সঙ্গে পিতার তুলনা করা হইয়াছে। আমি আচার্য্যের জীবনে মাতৃভাবের সাদৃশ্য দেখিতে পাই। মায়ের স্তন্য পান করিয়া সন্তানেরা বর্দ্ধিত হয়; মায়ের সেবায় যত্নে সন্তানেরা নিরাপদে থাকে; মায়ের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা সুখ এবং শান্তি লাভ করে। মাতাও তাহাদিগকে স্নেহ করিয়া, সেবা করিয়া, স্তন্য দান করিয়া সুখী হন। আবার একদিকে যেমন মাতৃস্তন্য এবং অপত্য স্নেহ ব্যতীত সন্তানের জীবন বাঁচে না তেমনই সন্তানকে ক্রোড়ে না পাইলে মাতার প্রাণে অপত্যস্নেহ জাগেনা এবং মাতার বক্ষে দুগ্ধধারা প্রবাহিত হয় না। জননী সন্তানের পবিত্র সম্পর্কের মধ্যে স্নেহধারা এবং দুগ্ধধারা যোগসূত্র। এই যোগসূত্র মানবকৃত [illegible]—ইহা বিশ্বেশ্বরের দয়ার দান। [illegible] ইচ্ছায় বা সন্তানের ইচ্ছায় দুগ্ধধারা বহেনা বা অপত্যস্নেহের উদয় হয় না। জননী এবং [illegible] পবিত্র সম্পর্ক রক্ষার জন্য ইহা ভগবানের ব্যবস্থা। ইহাতে সন্তানের জীবনরক্ষা হয় এবং মাতৃ হৃদয়ে দেবত্বের বিকাশ হয়। আচার্য্য এবং মণ্ডলীর মধ্যে এমনই একটী পবিত্র ভাব রহিয়াছে। আচার্য্য জননী এবং মণ্ডলীর নরনারী তাঁহার আধ্যাত্মিক পুত্রকন্যা। সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য যেমন মাতৃবক্ষে দুগ্ধধারা প্রবাহিত হয়, তেমনই মণ্ডলীর আত্মিক জীবন রক্ষার জন্য আচার্য্যের প্রাণে ধর্ম্মালোকধারা প্রবাহিত হয়, এবং মণ্ডলীর নরনারীর আত্মার সেবা করিবার জন্য আচার্য্যের প্রাণে ব্যাকুল [illegible] জাগে। এই ভগবৎপ্রেরণা এবং সেবাপ্রবণতা আচার্য্য এবং মণ্ডলীর মধ্যে যোগসূত্র। ক্ষুধার্ত্ত সন্তান ক্রোড়ে না থাকিলে যেমন স্তন্যধারা প্রবাহিত হয় না, তেমন ব্যাকুল ধর্ম্মপিপাসু মণ্ডলী ব্যতীত আচার্য্যের প্রাণে ভগবৎ প্রেরণার বিকাশ হয় না। আবার মাতৃহীন সন্তান যেমন স্তন্যাভাবে শুষ্ক হইয়া যায়, তেমনই ধর্ম্ম জীবনের পথে আচার্য্যবিহীন মণ্ডলীও শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়।

অনেক মাতা দুগ্ধপ্রবাহের মধ্যে ভগবৎকরুণা অনুভব করেন না। অনেক সন্তান নিজের রক্ত মাংসের মধ্যে জননীর দান দেখিতে পান না। ইহারা ভ্রান্ত। প্রাণের ভিতর যে আচার্য্য ভগবৎ প্রেরণা অনুভব করেন না, তিনি ভ্রান্ত এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন শিক্ষক। আর যে নরনারী স্ব স্ব ধর্ম্ম জীবনের মধ্যে আচার্য্য বা ধর্ম্মশিক্ষকের দান অনুভব করেন না, বা স্বীকার করেন না, তিনিও মোহান্ধ।

শিক্ষা ব্যতীত মানুষ কোন জ্ঞানই লাভ করিতে পারে না। শিক্ষা ব্যতীত নিশ্চয়ই ধর্ম্মলাভও হয় না। শিক্ষক এবং শিক্ষার সুব্যবস্থা ব্যতীত ব্রাহ্মসমাজও উন্নতি করিতে পারিবে না। এবং আচার্য্য ও মণ্ডলীর সুব্যবস্থা না করিলে ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ হইবে না।

তাই আমি অনুরোধ করি ব্রাহ্মসমাজ আচার্য্যের সুশিক্ষা এবং নিয়োগের সুব্যবস্থা করিয়া সমাজের উন্নতির চেষ্টা করুন।

শ্রীহরিশচন্দ্র দত্ত।

নববর্ষের উচ্ছ্বাস।

আজি নাথ, নববর্ষ; চেয়ে দেখ, হর্ষে
তাই ধরণী উৎসবময়ী। যেন স্পর্শে
তব তার, দেহে নব যৌবন সঞ্চার,
অন্তরে পুলকোদয়! রক্তিম উষার
আকাশ সুবর্ণময়! স্বর্ণরশ্মি আজি,
পুষ্পোদ্যানে ফুটাইছে নব পুষ্পরাজি
পাদপের হরিত শাখায়! সমীরণ
তটিনীর স্বচ্ছনীরে মধুর নিক্কণ
জাগাইছে তরঙ্গ মৃদুল। নগরীর
সুন্দর-সুরম্য-হর্ম্ম্য পূজার মন্দির
সুসজ্জিত পত্রপুষ্পদলে! মধ্যস্থলে
উপাসকবৃন্দ আজি বসিয়া সকলে!
[illegible] জাগাইয়া উঠিছে সুর, অতি
[illegible] স্বরে রমণী ভক্তিমতী
[illegible] তোমার স্তবগীতি। [illegible]

আচার্য্য করিছে স্তুতি সুগভীর স্বরে,
সুমিষ্ট ভাষায়!

শুন আজি, হে আমার
হৃদয়ের স্বামি, হৃদয়বীণার তার
কোন্ সুরে বাজে! কি সঙ্গীত উচ্ছ্বসিয়া
উঠে মোর মর্ম্মস্থান হ'তে! পূর্ণ হিয়া
কি সংকল্পে, কি গভীর গোপন কথায়!
নিত্য নিরন্তর থাকে তোমার আশায়,
চিত্ত মোর ব্যাকুল অধীর। তুমি কবে,
আমার সর্ব্বস্ব হয়ে প্রকাশিত হবে
আত্মার সম্মুখে? হায়! দিবাবিভাবরী
কত যে তোমার তরে অশ্রুপাত করি,
কে জানে সে মর্ম্মব্যথা? না পেলে তোমায়,
কিরূপে চলিবে দিন? জুড়াব কোথায়
উত্তপ্ত প্রাণের জ্বালা? দরশন দিয়া,
প্রেমে ও অমৃতে পূর্ণ না করিলে হিয়া,
আত্মার অনন্ত তৃষ্ণা কোন্ ক্ষুদ্র সুখে
কে মিটাবে বল?

হে প্রভু, প্রসন্নমুখে
প্রাণের সকল কথা শুন; প্রতিদিন
অন্তরে জাগিয়া উঠে আকাঙ্ক্ষা নবীন,
করিতে তোমার সেবা; ছাড়িতে সুখের
স্পৃহা, স্বার্থের কামনা;—যেমন বৃক্ষের,
সুন্দর শ্যামল শাখা, জীর্ণপত্র শীর্ণ
ফুল ত্যজে অনায়াসে! হৃদয় বিদীর্ণ
হয়, হায় নাথ, স্মরি প্রিয় সমাজের
কথা! কত দৈন্য তার! কে দেহ মনের,
শক্তি দিয়া ভক্তি দিয়া করিবে তাহার
কর্ম্ম, স্বার্থহীন সেবা? কোথায় তোমার
আত্মত্যাগী সবল কর্ম্মীর দল? কই,
আপনা-বিস্মৃত-নিঃস্বার্থ সেবক? অই
দেখ চেয়ে, কর্ম্মক্ষেত্র পড়ে অঙ্গন,
শূন্য মরুভূমি থাকে পড়িয়া যেমন!
ইচ্ছা হয় তাই প্রভু, দেহ ও আত্মার
যাহা কিছু আছে, দিই সেবায় তোমার।
কে জানে কি অজ্ঞাত রয়েছে অপরাধ!
মহৎ সংকল্প মোর, জীবনের সাধ,
অপূর্ণ থাকিয়া যায় শুধু? তাই মম
আঁখি হ'তে ঝরে অশ্রু শিশিরের সম
সঙ্গোপনে?

ওঁ সত্য, হে অসীম সুন্দর!
জীবনের পূর্ণ ইন্দু! পূর্ণ শশধর,
জ্যোৎস্নার মায়াজালে কুহক বিস্তার
করে এ ধরণী পরে! তেমনি তোমার,
অপরূপ রূপ [illegible] হবে প্রকাশিত,
করিবে [illegible] মম আত্মার [illegible]

হৃদয়ের স্বামি, হৃদয়-উন্মাদকারী—
যেরূপ নিরখি তব লক্ষ নরনারী
সঁপিল গভীর প্রেমে সর্ব্বস্ব তোমায়;
সেইরূপ সে বিচিত্র প্রকাশ আমায়,
দেখায়ে করিবে ধন্য দেখমন,
আনন্দে আপ্লুত হবে সমস্ত জীবন;
সমস্ত প্রাণের প্রেম উচ্ছ্বাসি উঠিয়া
তোমাপানে যাইবে ছুটিয়া। সমর্পিয়া
আমার যা কিছু আছে, সবি তব পায়,
বরণ করিয়া লব হৃদয়ে তোমায়
প্রভুরূপে স্বামীরূপে। দূরে যাবে দুঃখ;
তব প্রেমে জীবনের পাব সব্ব সুখ
সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বকাজে!

বল নাথ কবে,
জীবনের সেই মোর শুভক্ষণ হবে,—
বিপুল কর্ম্মের মাঝে ডাকিবে আমায়,
অস্থি দেব, রক্ত দেব তোমার সেবায়।
ঐ যে উদ্যানে হেরি বিটপীনিচয়,
ধরণীরে ফল দিয়া আপনারে ক্ষয়
করে অনায়াসে! শত কর্ম্মে শতবার,
আমিও করিব ক্ষয় শকতি আমার
সবাকারে বিতরিয়া প্রেম। বল কবে,
এ সংকল্প, মনের এ আশা পূর্ণ হবে?
ভূমানন্দে ডুবে যাবে দেহ-আত্মা-মন,
জনম হইবে ধন্য, সার্থক জীবন।

ব্রাহ্মসমাজ।

দান—শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র বসুর পত্নীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পুত্রকন্যাগণ সাঃ ব্রাহ্মসমাজ প্রচারবিভাগে ৫, দাতব্য বিভাগে ২৲ ও সাধনাশ্রমে ৩৲ দান করিয়াছেন।

শ্রীমান বিনয় ভূষণ ব্রহ্মব্রত বিবাহ উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচার বিভাগে ২৲ সাধারণ বিভাগ ২৲ দাতব্য বিভাগে ২৲ ও শিলং সেবাশ্রমে ২৲ দান করিয়াছেন।

মিসেস্ আর, এ,ন্ রায় দাতব্য বিভাগে ২০৲ দান করিয়াছেন।

প্রচার—শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল নিম্নলিখিতরূপে প্রচার কার্য্য করিয়াছেন:—ময়মনসিংহ—ময়মনসিংহে সপ্তাহকাল অবস্থিত করিয়া ১৯শে মার্চ্চ শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ আচার্য্যের গৃহে সমবেত উপাসনা। ২০শে মার্চ্চ সিটি স্কুলে ছাত্র মণ্ডলীতে বক্তৃতা। বক্তৃতার বিষয়, "সাধনা।" ২১শে মার্চ্চ পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দের গৃহে তাঁহার ৬৯ম বার্ষিক জন্মদিন উপলক্ষে দুই বেলা উপাসনা। ২২শে মার্চ্চ মন্দিরে বক্তৃতা। বিষয়, "বর্ত্তমান যুগ-সমস্যা।" ২৩শে মার্চ্চ রবিবার মন্দিরে দুই বেলা [illegible] উপাসনা। [illegible] ২৪শে মার্চ্চ সন্ধ্যাকালে আ[illegible] [illegible]

নরুন্দি—নরুন্দি একটি রেলওয়ে ষ্টেসন [illegible] অবস্থান করিয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ও [illegible]দি করেন। তিনি [illegible] আমার [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] ১৫শে মার্চ্চ বাবু শশিভূষণ বসু মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত [illegible]পুর নামক স্থানে গমন করিয়া শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র রায়ের বাটীতে প্রায় এক সপ্তাহকাল অবস্থিতি করিয়া স্থানীয় লোকদিগের সহিত উপাসনা করেন এবং উপাসনাকালীন, স্থানীয় লোকদিগের উপযোগী বিবিধ বিষয়ে উপদেশ দান করেন। নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজ এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগে ১, [illegible]নাশ্রমে ১, টাকা দান করিয়াছেন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ৩১এ মার্চ্চ কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র [illegible]র ১৮ বৎসর বয়স্কা জ্যেষ্ঠা কন্যা বাসন্তী ও ১২ বৎসর বয়স্ক একমাত্র পুত্র প্রশান্ত এবং ২রা এপ্রিল তারিখে পত্নী, ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। অবশিষ্ট ৭ বৎসর বয়স্কা কন্যাটিও পীড়িতা। এক্ষেত্রে কোনপ্রকার সান্ত্বনা প্রদান করা মনুষ্যের সাধ্যের অতীত।

বিগত ৭ই এপ্রিল কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত উপেন্দ্র-[illegible]শোর রায়ের কনিষ্ঠা কন্যা ও শ্রীমান প্রভাতচন্দ্র চৌধুরীর পত্নী শান্তিলতা, ২৭ বৎসর বয়সে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের আক্রমণে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন।

বিগত ২রা এপ্রিল তারিখে কুমিল্লার অন্তর্গত সাতবর্গ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র রায় জ্বররোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পরিণত বয়সে সপরিবারে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন।

বিগত ১০ই এপ্রিল কলিকাতা নগরীতে বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন।

বিগত ৪ঠা এপ্রিল ভারতমহিলা সমিতির উদ্যোগে পরলোকগত কৃষ্ণভাবিনী দাসের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত [illegible]কুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীমতী সুবালা আচার্য্য, শ্রীমতী সরলা দত্ত, শ্রীমতী কুমুদিনী বসু, শ্রীমতী বিরাজমোহিনী রায় প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুক্তা হেমন্তা দেবী ও শ্রীযুক্তা লীলাবতি মিত্র লিখিত দুইটী প্রবন্ধ যথাক্রমে শ্রীমতী অমলা দেবী ও শ্রীমতী কুমুদিনী বসু পাঠ করেন।

শ্রীমান সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর পুত্র শৈশবে ডিপ্থেরিয়া রোগে গৌহাটীতে মাতামহ ভবনে পরলোক গমন করিয়াছে। উক্ত গৃহে বালকের পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কমললোচন দাস আচার্যের কার্য্য করেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয়স্বজনদের প্রাণে সান্ত্বনা বিধান করুন।

[illegible]—বিগত ১২ই এপ্রিল কলিকাতা নগরীতে বাবু [illegible]কান্ত বসুর তৃতীয় সন্তানের নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য [illegible] উপাসক মণ্ডলীর উদ্যোগে মন্দির প্রাঙ্গণে একটি সান্ধ্য সম্মিলন হইয়াছিল। মাঝে মাঝে এরূপ সম্মিলনের সংকল্প আছে।

বিবিধ সংবাদ।

সাহিত্য-সম্মিলনে আমন্ত্রণ—অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক লিখিতেছেন:—এবার হাওড়া-সহরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন। আগামী ৬ই বৈশাখ শনিবার হইতে অধিবেশন আরম্ভ হইবে। বঙ্গের সাহিত্যসেবী সাহিত্যানুরাগী সকলকেই আমরা আমন্ত্রণ করিতেছি।

আমারা সকলের ঠিকানা অবগত নহি। সুতরাং আমরা সকলকে ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ করিবার সুযোগ পাইব না। তাই সাধারণভাবে বঙ্গসাহিত্যের সেবক ও সুহৃৎ সকলকেই আমরা আমন্ত্রণ করিতেছি,—আসুন, ভাই ভাই সকলে একপ্রাণ একমন হইয়া মায়ের মন্দিরে অঞ্জলি দানের জন্য উপস্থিত হউন।

সম্মিলনের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ার ব্যবস্থা যথাশক্তি করা হইতেছে। সম্মিলনের অধিবেশন জন্য হাওড়ার ময়দানে প্রকাণ্ড এক মণ্ডপ প্রস্তুতের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে; আর, সে মণ্ডপ বেষ্টন করিয়া, তাহার চতুষ্পার্শ্বে সাহিত্য ইতিহাস বিজ্ঞান কৃষি শিল্প প্রভৃতি বিষয়ক বিবিধসামগ্রীপূর্ণ প্রদর্শনী খুলিবার আয়োজন হইতেছে। মহিলাগণের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত আছে। প্রতিনিধিগণের বাসস্থানের জন্য হাওড়ার ষ্টেশনের উত্তরস্থিত প্রকাণ্ড ত্রিতল অট্টালিকা স্থির করা হইয়াছে।

যে সকল সাহিত্যসেবী এই সম্মিলনে যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সত্বর আমাকে পত্র লিখিয়া বিস্তারিত অবগত হউন।

আবেদন।

সবিনয় নিবেদন মিদং

রাঁচি ব্রহ্মমন্দির ৪০ বৎসরের অধিককাল হইল নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের হাতার মধ্যে রাঁচি বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহ আছে। ব্রহ্মমন্দির ও বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহ এত কাছাকাছি অবস্থিত যে দুইটিকে একই গৃহ বলা যাইতে পারে। বালিকা বিদ্যালয়টি আজকাল একটি নূতন গৃহে উঠিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মমন্দির সংলগ্ন পুরাতন বালিকা বিদ্যালয়গৃহ বিক্রয় করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। পুরাতন বালিকাবিদ্যালয়গৃহ অন্য লোকে ক্রয় করিলে ব্রাহ্মসমাজকে ব্রহ্মমন্দির ত্যাগ করিতে হইবে। এই গৃহ ক্রয় করিতে হইলে ১০০০৲ এক হাজার টাকার প্রয়োজন। এই বিদ্যালয় গৃহ ক্রয়ের পর ব্রাহ্মপ্রচারকদের আবাস স্থান রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। সাধারণের সাহায্য ব্যতীত উক্ত কার্য্য সম্পন্ন হওয়া সুকঠিন। সদাশয় বদান্য ব্যক্তিগণের নিকট সবিনয় অনুরোধ যে তাঁহারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কিছু সাহায্য করেন। দান যতই সামান্য হউক না কেন, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। [illegible]

Registered No C. 65.

অসতোমা সদ্গময়,

তমসোমা জ্যোতির্গময়,

মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৪শ ভাগ। ৩য় সংখ্যা। | ১লা জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩২৬, ১৮৪১ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯০ 15th May, 1919. | অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩, প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে আমার দেবতা, আমি কতদিন আর বাহিরে বাহিরে ঘুরিব? কতদিন আর বাহিরের কাজ লইয়া, সুখস্বার্থ লইয়া থাকিব? কতদিন আর ছুটাছুটি করিয়া বেড়াব? জীবনের উষাকালে তোমার ডাক শুনেই ত এসেছিলাম, আজ এখনও দেখি তোমার মন্দিরে প্রবেশ করা হয় নাই: বাহিরের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান লইয়াই রহিলাম; সারা জীবন গণ্ডগোলই করিলাম; কেবল তর্ক ও কোলাহলের মধ্যেই রহিলাম; তোমার মন্দিরে ত প্রবেশ করা হয় নাই! আজ চেয়ে দেখি, আমি কত দীন, কত কাঙ্গাল! আমার এ কূল ও কূল, দু কূলই গিয়াছে; তাই আজ তোমার চরণে নিবেদন জানাইতেছি—হে আমার প্রাণের দেবতা, হৃদয়ের ঠাকুর, তুমি আমাকে এসে ভাল ক'রে স্পর্শ কর। আমি ত ধনজনের আকাঙ্ক্ষা, সুখের লালসা ছেড়ে দিয়েছি; আমি তোমার মুখ যদি দেখ্‌তে পাই, তবে ত সকল দুঃখই সইতে পারি। আমি যে তোমারই ভৃত্য হ'য়ে থাক্‌তে চাই; আমি যে তোমারই ক্রোড়ে মুখ লুকাইয়া থাক্‌তে চাই। অন্যে আমাকে কি বলে, তাতে আমার কি? অন্যে আমাকে উপেক্ষা করে, তাতে হানি কি? তুমি আমাকে গ্রহণ কর, তুমি আমার প্রাণ ভাল ক'রে স্পর্শ কর; তোমার মন্দিরে আমাকে প্রবেশ করিতে দাও; তুমি আমার সঙ্গে থাক; তুমি আমার প্রাণে কথা বল। আমি যে কতদিন ধ'রে তোমার পানে তাকাইয়া আছি, তোমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি; আমার এই ক্ষুদ্রতা, মলিনতা, দৈন্য দুঃখ লইয়াও তোমারই দিকে চাহিয়া আছি। তুমি এসে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর; তোমাকে না পেলে যে জীবন বৃথা যায়; আমার সব সাধ ফুরাইয়া যায়। হে আমার প্রভু, হে আমার প্রিয়, হে আমার প্রাণের দেবতা, তুমি আমাকে তোমার করিয়া লও; তোমাকে নিয়ে আমি থাকি; তোমাকে দেখি, তোমার নাম করি, তোমার ধ্যান করি, তোমার আদেশ পালন করি। আর বাহিরে রেখো না, ভিতরে নিয়ে যাও।

নিবেদন।

সাধ ক'রে—আমি সাধ ক'রেই ত আপনার সুন্দর ঘরখানি ভেঙ্গে দিয়েছি; আমি ত বৈঠা বেয়ে আস্তে আস্তে নদীতে যাইতেছিলাম; সাধ ক'রেই ত বৈঠাখানি ভেঙ্গে দিয়েছি; আমি সাধ ক'রেই ত পদতলে যে আশ্রয় ছিল, তা সরাইয়া দিয়াছি; আমি সাধ ক'রেই ত যে ডালে বসেছিলাম, সে ডাল কেটে ফেলেছি। লোকে ত আমাকে পাগল বল্‌বেই; লোকে ত আমার গ্লানি কর্‌বেই। কিন্তু আমি যে কেন কি করি, তা অন্যে জানে না, আমিও জানি না; কে যেন আমাকে হুকুম করে, আমি সে হুকুমে চলি। তিনি যখন বলেন, বেশ করেছ, আমার আর দুঃখ থাকে না; তাঁর হাসি মুখ দেখে আমি রসাতলে যেতে পারি; আমার দুঃখ নাই; তিনি যে আমার হৃদয়দেবতা!

তৃপ্তি—আমি ত অনেক পেয়েছি, কত সুখ সম্ভোগ করি, কত প্রেম ভালবাসা পাই, কত লোকে আদর করে, কত উচ্চপদ লাভ করেছি! কই, প্রাণে ত তৃপ্তি পাইলাম না! এ অতৃপ্তি কেন? কেন প্রাণের জ্বালা যায় না? আমি কেন ক্ষুধায় অধীর হই, কেন পিপাসায় ছট্‌ফট্‌ করি? এ রহস্য কে বুঝিবে? ক্ষুধা ত ধূলিমুষ্টিতে মেটে না, পিপাসা ত জলবিনা তৃপ্ত হয়

না। প্রাণের ক্ষুধা, অন্তরের তৃষ্ণা কে মিটাবে? আমি এতদিন অন্নের সন্ধানে, জলের সন্ধানে ছুটাছুটি করিলাম; প্রাণের অন্ন-জল যে প্রাণেই রহিয়াছেন, তাহা দেখিলাম না কেন? তাঁর একটু প্রেম যে সব ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করে! তিনি তবে প্রাণ স্পর্শ করুন; নতুবা যে প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করে, জীবন যে থাকে না, হৃদয় যে শুকাইয়া যায়। একটু তাঁর স্পর্শ, একটু তাঁর আভাস, একটু তাঁর বাণী; তা না হ'লে তৃপ্তি কোথায়? তৃপ্তি তাঁহাতে, শান্তি তাঁহার প্রেমে, তাঁহার স্পর্শে।

অতৃপ্তি—তিনি ত আমাকে কাঙ্গাল বলিয়া দূরে রাখেন নাই, পাপী বলিয়া তাড়াইয়া দেন নাই, অপরাধী বলিয়া আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন নাই; তিনি কত ভাবে প্রাণ স্পর্শ করেছেন, কতবার দয়া করে দেখা দিয়াছেন! আমি কি তাঁকে চেয়েছি? আমি কি তাঁকে আদর করেছি? আমি কি তাঁকে বরণ করে নিয়েছি? তবুও তিনি কাঙ্গালের ঘরে এসেছেন, দীনের কুটীর এসে আলো করেছেন, মলিন প্রাণ এসে স্পর্শ করেছেন; তবুও ত তৃপ্তি পাই না। এ যে অনন্ত অতৃপ্তি; যত পাই, ততই আরও চাই; আমি ত বলেছিলাম, একটু তোমাকে পেলেই কৃতার্থ হব, আর চাইব না, তাঁহার একটু প্রকাশেই কৃতার্থ হব; কিন্তু এখন যে আরও চাই; আরও তাঁর প্রকাশ চাই; আরও—আরও! আরও! এ আকাঙ্ক্ষার যে বিরাম নাই, এ বাসনার যে শেষ নাই; অনন্ত আকাঙ্ক্ষা, অনন্ত অতৃপ্তি, অনন্ত পুরুষ পূর্ণ কর্‌বেন না কি?

একটু কাছে বসি—আমি আর ছুটাছুটি ক'রে পারি না; আমি আর কাজ কাজ ক'রে ঘুরিতে পারি না; শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তোমরা বল কর্ত্তব্য, নানা রকম কর্ত্তব্য,—ভাই বোনের প্রতি কর্ত্তব্য, পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য, দেশের প্রতি কর্ত্তব্য, মানবের প্রতি কর্ত্তব্য, ধর্ম্মসমাজের প্রতি কর্ত্তব্য—এই কর্ত্তব্য কর্ত্তব্য ক'রে আমাকে তোমরা পাগল ক'রে তুলেছ; আমি আর বিশ্রাম পাই না। আজ কর্ত্তব্য একটু পড়ে থাক্‌, কাল তাহা করিব; আজ একটু আমার প্রিয়তমের কাছে বসি; একটুক্ষণ তাঁর মুখের দিকে তাকাই, একটু তাঁর ক্রোড়ে মুখ রেখে শান্তি পাই; একটু তাঁর মুখের বাণী শুনি। কর্ত্তব্য ত রোজই করি, কাজের ত আর বিরাম নাই; কিন্তু প্রাণ যে তৃপ্তি মানে না, শুষ্কতা যে দূর হয় না; আমার প্রিয়তমের কাছে একটু না বসিলে আমার যে চলে না; আমার প্রাণে যে বল পাই না, উৎসাহ আসে না, প্রেম জাগে না। তাই একটু বসি; তোমরা দূরে চলে যাও; আমাকে বাধা দিও না; আমি নির্জ্জনে, একান্তে আমার প্রিয়তমের নিকট একটু বসি।

সম্পাদকীয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও নূতন বাণী—বর্ত্তমানযুগে মানবের প্রাণে এক নূতন বাণী আসিয়াছে। নানা ভাবে, নানা দিকে এই মহাবাণী প্রকাশ পাইতেছে; রাজনীতি, সমাজনীতি, পারিবারিক সম্বন্ধ, এমন কি ধর্ম্মনীতিতেও এই বাণী আপনার প্রভাব বিস্তার করিতেছে। সে বাণী এত মধুর যে তাহাতে মন মুগ্ধ হয়; সে বাণী শুনিলে প্রাণে নববল আসে, হৃদয়ে নব আকাঙ্ক্ষা জাগে, দুর্ব্বল চিত্ত অসীম সাহসে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হয়; সে বাণী প্রকৃত ভাবে ধরিতে পারিলে মানুষ সুখ-স্বার্থে বলিদান দিয়া অমৃতের সন্ধানে ছুটিতে থাকে—স্যার গ্যালাহাডের মত হোলি গ্রেইলের (Holy grail) পশ্চাতে অগ্রসর হয়। সে বাণী স্বাধীনতার বাণী। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী দেশে এই বাণী উত্থিত হইয়া রাজশক্তি, সমাজশক্তিকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল; আমেরিকাতে এই বাণী নূতন মন্ত্রে অধিবাসীদিগকে দীক্ষিত করিয়াছিল। তদবধি এই বাণী মানবের জীবনের সকল ক্ষেত্রে অল্পাধিক পরিমাণে ফুটিয়া উঠিতেছে। মানুষ স্বাধীন, মানুষের প্রাণে—প্রত্যেক মানুষের প্রাণে, স্বয়ং ব্রহ্ম বিরাজিত; তিনি প্রত্যেক আত্মার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ; তিনিই প্রাণে থাকিয়া মানবকে নূতন পথে আকর্ষণ করিতেছেন, মানবের মনুষ্যত্ব ফুটাইয়া তুলিতেছেন। এক সময় ছিল, যখন প্রত্যেক মানবের ভিতরেই যে স্বয়ং ব্রহ্ম বিরাজিত, প্রত্যেক মানবকেই যে তিনি অনুপ্রাণিত করিতেছেন, এ কথা লোকে কার্য্যতঃ স্বীকার করিত না; এখনও যে সকলে এ কথা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে এবং বুঝিয়াও তদনুসারে কার্য্য করিতেছে, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু এই যে প্রাণে প্রাণে ব্রহ্ম—তুমি ব্রাহ্মণ হও আর শূদ্র হও, ধনী হও আর গরীব হও, রাজা হও আর প্রজা হও, তোমার প্রাণে ব্রহ্ম স্বয়ং থাকিয়া তোমাকে ফুটাইয়া তুলিতেছেন; তুমি তাঁহারই প্রিয়; তোমা বিনা তাঁহার চলে না—এই সত্য মানুষ এখনও সম্পূর্ণ স্বীকার করে নাই, এ সত্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য এখনও মানুষ বুঝিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু এই সত্য কি? স্বাধীনতার মূল এবং মূলমন্ত্র মানুষ বুঝুক আর নাই বুঝুক স্বাধীনতার বাণী এসে মানুষের প্রাণে পৌঁছিয়াছে; স্বাধীন ভাব, স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন কার্য্য নানাভাবে মানবের ভিতর দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাই এখন কর্ম্মক্ষেত্রে আনুগত্যের পরিবর্ত্তে সাহচর্য্য আসিয়াছে; রাষ্ট্রজগতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতেছে; সমাজে সমাজপতিগণ দশজনের মতের অপেক্ষা করিয়া চলিতে বাধ্য হইতেছেন। তুমিও স্বাধীন, আমিও স্বাধীন; একই লক্ষ্য লইয়া চলিয়াছি; আমরা পরস্পরের সহচর—এই ভাবে বর্ত্তমান যুগে কার্য্য চলিবে। ধর্ম্মতন্ত্রেও এতদিন আনুগত্য ছিল—এখনও অনেক স্থলে আছে; শাস্ত্র অভ্রান্ত, গুরু অভ্রান্ত; তাঁহারা যাহা বলিবেন, ধর্ম্মপথে চলিতে হইলে, বিনাবিচারে তাহা তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। তুমি ক্ষুদ্র হীন মানুষ, তুমি ধর্ম্মের তত্ত্ব কি বুঝিবে? শাস্ত্র যাহা বলেন, সাধুগণ যাহা বলেন, গুরু যাহা বলেন, পুরোহিত যাহা বলেন, গুরুজনগণ যাহা বলেন, তাহা বিনাতর্কে গ্রহণ কর; ইহাতেই তোমার ধর্ম্ম, ইহাতেই তোমার জীবনের সিদ্ধিলাভ। কিন্তু মানুষ তাহা শুনিল না; মানুষ বিচার করিতে লাগিল; ধর্ম্মতত্ত্বের, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। শাস্ত্র, গুরুবাক্য, সাধুবাক্য লঙ্ঘন করা চলে না। কিন্তু স্বাধীনতার বাণী এসেছে; তাই

মানুষ নূতন ভাবে শাস্ত্রবাক্য, সাধুবাক্য, গুরুবাক্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। সেই দিন কি শুভদিন, যে দিন মহর্ষি বক্র-পথে চলিতে না পারিয়া সোজা ভাবে স্বাধীনতার বাণী শুনিলেন, বেদের অভ্রান্ততা অস্বীকার করিলেন, আত্মপ্রত্যয়ের উপর, হৃদয়নিহিত ব্রহ্মের বাণীর উপর, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—তাঁর উপর ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি স্থাপিত করিলেন! সেই যে ব্রাহ্মসমাজ স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ করিলেন, স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত করিলেন, তাহাই আমাদের ধর্ম্মজীবনের, সামাজিক জীবনের ভিত্তি হইল। ব্রাহ্মসমাজ স্বাধীনতার মন্ত্র ঘোষণা করিয়াও সম্পূর্ণরূপে সকল মানবের ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনতা স্বীকার করিলেন না; ধর্ম্মসমাজ পরিচালনে সকলকে আহ্বান করিলেন না। তাঁহারা ভয় পাইলেন; যাহা কোন দিন কেহ দেখেন নাই—তুমি আমি দশজনের মত লইয়া ধর্ম্মসমাজ চলিবে—যাহা কোন দিন জগতে হয় নাই, তাহার সূচনা করিতে ভীত হইলেন। মানবচিত্তকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; মানবহৃদয়নিহিত ব্রহ্মকে স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন না; প্রত্যেক মানবের কার্য্যের পশ্চাতে যে তাঁহার ইঙ্গিত আছে, তাহা দেখিতে পাইলেন না। তাই এখানেও ব্যক্তিগত জীবনের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়াও সমাজ সম্বন্ধে মানবের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইল না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, প্রত্যেক মানবের হৃদয়ে যে ব্রহ্ম বিরাজিত, তাহা দর্শন করিলেন; কত ভ্রম, কত দোষ ত্রুটি দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও যে ব্রহ্ম পরিত্যাগ করেন না, ব্রহ্ম তাহার হৃদয়ে থাকিয়া আদেশ করিতেছেন, ইহা স্বীকার করিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে স্বাধীনতার বাণী স্পষ্ট ভাবে শোনা হইল; সকল মানবকে, সকল ব্রাহ্মকে আহ্বান করা হলো; ধনী এস, নির্ধন এস, পণ্ডিত এস, মূর্খ এস, সকলে এস, এ যে তোমার কাজ, এ যে সকলের কাজ। তোমার প্রাণে ব্রহ্ম আছেন, আমার প্রাণে ব্রহ্ম আছেন, প্রত্যেকের প্রাণে ব্রহ্ম আছেন; সেই ব্রহ্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে, তাঁর শক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে, তাঁর আলোকে আলোকিত হয়ে পথে চল; সমাজ গঠনে, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে, জগতে স্বর্গরাজ্য স্থাপনে, তোমার আমার সকলেরই দায়িত্ব আছে, কর্ত্তব্য আছে। এই উদ্যানে আমরা এক একটি ফুল—ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের ফুল ফুটিয়া উঠিয়া বাগানের শোভাবর্দ্ধন করিব; আমরা প্রত্যেকে এক একটি প্রদীপ, ব্রহ্মেরই আলোকে জ্বলিয়া উঠিব। ব্রহ্মেরই শক্তির অংশ পাইয়া আমরা সমাজের কাজ করিব। আমরা পরস্পরের সাহচর্য্য করিব; আমরা পরস্পর হাত ধরিয়া চলিব। বর্ত্তমান যুগে যে নূতন বাণী আসিয়াছে, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ সেই বাণী মানবের হৃদয়ের দ্বারে দ্বারে ঘোষণা করিয়া সকল নরনারীকে সমাজের কার্য্যে আহ্বান করিতেছেন। কাল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন.; আমরা এই সত্যটি বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়া ভগবানের চরণে প্রাণের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করি।

বিপদ্ ও প্রতীকার—এই যে স্বাধীনতার নূতন বাণী আসিয়াছে, ইহার আনুষঙ্গিক বিপদ্ও আছে। এই স্বাধীনতার উৎস স্বয়ং ব্রহ্ম; প্রতি মানবের হৃদয়ে ব্রহ্ম বিরাজিত থাকিয়া তাহাকে আলোক দেখাইয়া দিতেছেন, তাহার প্রাণে অনুপ্রাণনা জাগাইতেছেন, তাহাকে স্বাধীন উন্মুক্ত পথে চলিতে উৎসাহিত করিতেছেন; সে ব্রহ্মের বাণী শুনিয়াই চলিবে, ব্রহ্মের শক্তিতেই শক্তিশালী হইবে। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণ প্রতি ভূতে ব্রহ্ম বিদ্যমান, এ কথা স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মানুষ এই স্বাধীনতার উৎস যিনি, সকল আকাঙ্ক্ষার প্রস্রবণ যিনি, তাঁহাকে দেখিল না; সকলের মধ্যেই যে তিনি বিরাজিত, সকলেরই যে স্বাধীন হইবার অধিকার আছে, এ কথা বুঝিল না। তাই জগতে স্বাধীনতার নামে যথেচ্ছাচারের সৃষ্টি হইয়াছে, তাই সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা, ঔদ্ধত্য দেখা দিয়াছে; তাই রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে নানারূপ অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছে; তাই বল্‌সেভিজম্, অ্যানা-র্কিজমের সৃষ্টি হইয়াছে। ধর্ম্মসমাজেও মানুষ স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারী হইতেছে। শ্রদ্ধা ধর্ম্মের প্রাণ, ভক্তিই মানুষকে ঈশ্বরের পথে লইয়া যায়, মানুষ এই পরম সত্য ভুলিয়া যাইতেছে; স্বাধীনতার নামে ঔদ্ধত্য, স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচার, স্বাধীনতার নামে গুরুজনে শ্রদ্ধাহীনতা দেখা দিতেছে; মানুষ আপনাকে বড় করিয়া তুলিতেছে। দুইজন লোক একস্থানে থাকিলে তাহারা দুই দল হয়; আনুগত্যের স্থানে বর্ত্তমান যুগে সাহচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে; কিন্তু সে সাহচর্য্য পাওয়া যাইতেছে কোথায়? প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন; কেহ কাহারও কথা শুনিবে না, অভিজ্ঞতার বাণী গ্রাহ্য করিবে না, মতদ্বৈধ স্থলেও যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে হয়, তাহা স্বীকার করিবে না। স্বাধীনতার এই বিকৃতি দেখিয়া সাধুজন ভীত হইতেছেন, সুধীগণ আতঙ্কিত হইতেছেন। ব্রাহ্মসমাজ এই সঙ্কটকালে কি প্রতীকারের ব্যবস্থা করিবেন? ব্রাহ্মসমাজ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন; কিন্তু সে স্বাধীনতা হৃদয়নিহিত ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। তোমার শক্তি, আমার শক্তি, প্রত্যেকের শক্তিই ব্রহ্মের শক্তি হইতে অনুস্যূত; তাহা যদি মনে থাকে, তবে আর বিপদ্ হয় না। আমার প্রাণে ব্রহ্ম থাকিয়া যেমন আমাকে অনুপ্রাণিত করিতেছেন, তোমার প্রাণেও ব্রহ্ম থাকিয়া তোমার বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রদান করিতেছেন। ব্রহ্মের আলোক দেখিয়া চলিতে হইবে, তাঁহার আদেশ শুনিতে হইবে, তাঁহার নির্দ্দেশ মত কার্য্য করিতে হইবে; তাহাতে তুমি আমার সহায়, আমি তোমার সহায়; আমরা সহকর্ম্মী। অবশ্য তাঁর আলোক সব সময় দেখি না, তাঁর বাণী সব সময় শুনি না; আমাদের ভুল আছে, ভ্রান্তি আছে; সুতরাং পরস্পরের মত ও কার্য্যকে উদার ভাবে দেখিতে হইবে। আর যাঁহারা ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হইয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার বাণী স্পষ্ট শুনিয়াছেন, তাঁহাদের পরামর্শ, উপদেশ শ্রদ্ধার সহিত শুনিতে হইবে। ব্রহ্ম যে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, যে তাঁহার আলোকেই তোমার আমার আলোক, তাঁহার শক্তিতেই যে তোমার আমার শক্তি, তাঁহার জ্ঞান প্রেম হইতেই যে তোমার আমার জ্ঞান প্রেম উৎসারিত হইতেছে, এই সত্য যদি অনুভব করিতে পারি, তবে আর দ্বন্দ্ব থাকিবে না, ঔদ্ধত্য আসিবে না, উচ্ছৃঙ্খলতা চ'লে যাবে; তখন গুরুজনে শ্রদ্ধা, সাধুজনে ভক্তি আসিবে; ভাইএর প্রতি আস্থা আসিবে; সকলে একযোগে প্রভুরই কর্ম্ম করিয়া যাইব। একটা কথা আমাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, স্বাধীনতাই বল, অধিকারই বল, ইহা আমাদের জীবনের লক্ষ্য

নয়। জীবনের লক্ষ্য ব্রহ্মলাভ, ব্রহ্মানুভূতি, তাঁহার সহিত নিত্যযোগ অনুভব এবং তাঁহার আদেশ পালন। আমাদের জ্ঞান প্রেম, আমাদের শক্তি সামর্থ্য, আমাদের স্বাধীনতা, অধিকার, সকলই সেই মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের সহায়মাত্র। স্বাধীনতা ও অধিকার সংযত করিতে হইবে। আমার বাড়ীতে তোমার আসিবার অধিকার নাই; গরীবের এসে আমার গৃহে ভিক্ষার জন্য ক্রন্দন করিবার অধিকার নাই; সুতরাং তুমি যদি আমার বাড়ী এস, ভিক্ষুক যদি এসে আমার বাড়ীতে অন্নের জন্য ক্রন্দন করে, তবে আইনতঃ তাড়াইয়া দিবার অধিকার আমার আছে; কিন্তু সে অধিকার প্রয়োগ করা দয়ার কার্য্য হবে না, ভদ্রতারও কার্য্য হবে না, তাহা অধর্ম্মই হবে। তাই বলি, স্বাধীনতা আমাদের আছে—কিন্তু সে স্বাধীনতা ব্রহ্মপ্রেম ও মানবপ্রেম-দ্বারা সংযত করিতে হইবে। তাহা হইলেই একদিকে যেমন হৃদয়নিহিত ব্রহ্মবাণী অবহেলা করিবার অপরাধ হইবে না, অপর দিকে অপরের হৃদয়নিহিত ব্রহ্মকেও সম্মান ও শ্রদ্ধা করা হবে। যদি জীবনে শ্রদ্ধা না আসিল, যদি ভগবানে ভক্তি না আসিল, যদি সাধুজনের প্রতি ভক্তি না আসিল, যদি বাক্য সংযত না হইল, যদি সকলের প্রতি মিষ্ট ব্যবহার করিতে না পারিলাম, যদি মতদ্বৈধ স্থলেও শ্রদ্ধা রক্ষা করিতে না পারিলাম, যদি দুঃখী-জনে দয়া করিতে অগ্রসর না হইলাম, তবে স্বাধীনতা লইয়া কি করিব? তবে এ জীবনই যে বৃথা গেল। হৃদয়ে হৃদয়ে যে ব্রহ্ম বিরাজিত, তাহা আমরা অনুভব করি এবং তাঁহারই বাণী শুনিয়া চলি! আপনার প্রভুত্ব চাই না, তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে অগ্রসর হই। তাহা হইলেই বিপদ্ কাটিয়া যাইবে, প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের পথে অগ্রসর হইতে পারিব।

ব্রাহ্মজীবন—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিনে আজ নূতন করে একটি কথা সকলের মনে রাখা আবশ্যক—আমাদের ব্রাহ্মজীবন লাভ করিতে হইবে। অনেকে অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মসমাজে এসেছেন; অনেকে পিতামাতা আত্মীয় স্বজনকে চক্ষের জলে ভাসাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন; অনেকে এখনও জীবনের আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কত ক্লেশ, কত দরিদ্রতা সহ্য করিতেছেন। মনে রাখিতে হইবে, এতদূর আসিলাম কেন, এত ক্লেশ স্বীকার করিলাম কেন, আত্মীয় স্বজনকে এত কষ্ট দিলাম কেন? আমরা ধর্ম্মজীবন লাভ করিব, আমরা ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইব, আমাদের জীবনের প্রভাবে অপর দশজনের প্রাণ জাগ্রত হবে, আমাদের জীবনে, পরিবারে, দেশে ব্রহ্মের পূজা প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছি, প্রকৃত ব্রাহ্মজীবন আমরা লাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না? আমরা অনেক কাজ করিতেছি, সমাজ সংস্কার করিতেছি, জাতিভেদ তুলিয়া দিয়াছি, বাল্যবিবাহ রহিত করিয়াছি, নরনারীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতেছি, দুর্ভিক্ষে অন্নক্লিষ্ট লোকের কতক পরিমাণে সাহায্য করিতেছি। এ সকল কার্য্য ভাল; সাধুকার্য্য না থাকিলে সাধুজীবনের চরিতার্থতা হয় না; ভগবানের প্রিয়-কার্য্য সাধন করা ত উপাসনারই অঙ্গ। কিন্তু One thing needful—যাহা এমন একটি জিনিষ যাহা সকল জিনিষ অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়—তাহা কি আমরা পাইয়াছি? তাঁহার জন্য কি আমরা ব্যস্ত হইয়াছি? Seek ye first the Kingdom of God and His righteousness—সর্ব্বাগ্রে স্বর্গরাজ্য ও ধর্ম্ম অন্বেষণ কর—এই বাক্য অনুসরণ করিয়া আমরা কি ঈশ্বরে ভক্তি লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি? আমরা যদি আর দশজনের মত খাই দাই, বেড়াই, আমোদ আহ্লাদ করি, আর মধ্যে মধ্যে সৎকার্য্যের সূচনা করি, তবে কি আমাদের ব্রাহ্মজীবন-লাভ হইল? কত কাজ কর, কত সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হও, দুঃখীর দুঃখ বিমোচন কর, নিরক্ষরকে শিক্ষা দান কর, একদিকে তাহা ভাল; কিন্তু যদি তাহার পশ্চাতে ঈশ্বরে প্রীতি না থাকে তবে বলিব তোমার ধর্ম্মজীবন—ব্রাহ্মজীবন লব্ধ হয় নাই। আমাদিগকে ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে; তাঁহার আরাধনা ও ধ্যান করিতে হইবে; জীবন ব্রহ্মময় হইবে; সকল সময়ে সকল পদার্থে, সকল কর্ম্মে তাঁহার বিদ্যমানতা অনুভব করিতে হইবে; তাঁহাকে প্রাণে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইতে হইবে; তাঁহার নামগানে, তাঁহার আরাধনাতে, তাঁহার প্রসঙ্গে আনন্দ অনুভব করিতে হইবে। তাঁহাকেই জীবনস্বামী বলিয়া বরণ করিয়া লইতে হইবে। সব কাজ করিব—আবশ্যক হইলে কাজের ভার হ্রাস করিব; কিন্তু যাহাই করি, তাঁহারই প্রেমপ্রেরণায় করিব। তাঁহাকে যদি জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারি, তাঁহাকে নয়নে রাখিয়া চলিতে না পারি, তবে জীবন বৃথা, এত কষ্ট দিয়ে ও কষ্ট সহ্য ক'রে ব্রাহ্মসমাজে আসা বৃথা। কেবল কর্ম্ম, কেবল ছুটাছুটি, কেবল সংস্কৃত মতে অনুষ্ঠান, কেবল উদার মত, কেবল জ্ঞানের অনুশীলন, তোমাকে ধর্ম্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবে না। ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ স্থাপন চাই, তাঁর উপাসনা চাই, তাঁর স্বরূপ ধ্যান করা চাই; "তুমি প্রকাশিত হও," ব'লে প্রার্থনা করা চাই। ব্রাহ্মজীবনের মূলমন্ত্র ব্রহ্মে প্রীতি। আজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিনে সকলকে বলি, ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হও, ব্রাহ্ম-জীবন লাভ কর।

অনন্তের পথে।*

মন রে আমার, তুই শুধু বেয়ে যা দাঁড়
(তুই মাথা নুয়ে বেয়ে যা দাঁড়।)
হালে যখন আছেন হরি, তোর যেমন ফাগুন তেমনি আষাঢ়।
যখন যুঝবে তরী স্রোতের সনে, তুই টানিস আরও পরাণ পণে,
যখন পালে লাগবে হাওয়া, সময় পাবিরে জিরুবার।
মাঝির সেই গানের তানে (মন রে আমার, মন রে আমার)
চল সাথীর সনে সমান টানে, চাস্‌নে রে তুই আকাশ পানে,
হোক না ফর্সা হোক না আঁধার!
কাজ কি জেনে কোথায় যাবি, কখন্ ঘাটে নাও ভিড়াবি,
কখন গাঙ্গে লাগবে ভাঁটা, কখন ছুটে আসবে জোয়ার;
মনে রাখিস নিরবধি (ভোলা মন রে আমার, মন রে আমার)
যাহারি নাও তাঁরই নদী, যে ফেলবে তোরে বানের মুখে
সেই ত তরীর কর্ণধার।

* বর্ষশেষ উপলক্ষে প্রাতঃকালীন উপাসনায় শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম।

মায়ের কোলে বসিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া শিশু যেমন মনে করিতে পারে যে, অনেক পথ বেড়াইয়া আসিলাম, তেমনি আমরাও পৃথিবীমাতার ক্রোড়ে বসিয়া, তাহার সঙ্গে তাহার কক্ষ আর একবার অতিক্রম করিয়া আসিয়া, মনে করিতে পারি যে, আমরাও পৃথিবীর সুদীর্ঘ কক্ষ আর একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলাম, অনেক পথ চলিলাম। কিন্তু উপরোক্ত সংগীতটিতে আমাদের জীবনের আর এক প্রকারের গতির কথা বলা হইয়াছে। তাহা কোন একটি পথে একই স্থান অতিক্রম করিয়া বা কোন একটি দেশকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসা নহে। অথবা কোন একস্থান হইতে যাত্রা করিয়া পুনরায় সেই স্থানেই ফিরিয়া আসা নহে। পৃথিবী স্মরণাতীত কাল হইতে একই পথে পরিভ্রমণ করিতেছে। একস্থান হইতে যাত্রা করিয়া এক বৎসরে নির্দ্দিষ্ট একটি পথে ভ্রমণ করিয়া সেই স্থানেই পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছে। তাহার গতির অবশ্যই বিরাম নাই; কিন্তু তাহার গমনাগমনের স্থান ও পথ একই। এই সহরের ট্রামগাড়ীগুলি যেমন, সহরের কোন এক স্থান হইতে যাত্রা করিয়া, কতক স্থান বেড়াইয়া, পুনরায় সেই স্থানেই আগমন করে,—চলে সে দ্রুতগতিতে, কিন্তু একই স্থানকে সে বারম্বার প্রদক্ষিণ করিয়া আসে—আমাদের জীবনের গতি সে প্রকারের নহে। আমাদিগকে সরলভাবে একই দিকে ছুটিয়া যাইতে হয়। অনন্তকে লক্ষ্য করিয়া, অনন্ত কল্যাণলাভের জন্য নিরন্তর সম্মুখেই অগ্রসর হইতে হয়। একটি স্থান প্রদক্ষিণ করিবার জন্য নহে, কিন্তু নিত্য নূতন রাজ্যে গমনপূর্ব্বক নিত্য নূতন দৃশ্য ও অবস্থার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাদিগকে কেবলই ছুটিতে হয়; আমাদের জন্য মঙ্গলবিধাতার তাহাই মঙ্গল বিধি। উক্ত সংগীতে আমাদিগের সেই পথের কথারই উল্লেখ আছে।

মঙ্গলময় পরমেশ্বর আমাদিগকে অনন্তকালের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন, অনন্তকাল ব্যাপিয়া আমাদিগকে সেই অনন্তস্বরূপের দিকেই অগ্রসর হইতে হইবে। যাহাকে অনন্তকাল থাকিতে হইবে, তাহার পক্ষে অনন্ত উন্নতিশীল হইয়া থাকাই আবশ্যক ও তাহাতেই তাহার একান্ত কল্যাণ।

পৃথিবীকে থাকিতে হইলেই চলিতে হয়, না চলিয়া সে থাকিতেই পারে না। কিন্তু তাহার যেমন নিত্য এক পথেই চলিতে হয় বলিয়া পথে নূতন কিছুর সহিত সাক্ষাৎ হয়না, একই পথে একই দৃশ্য দেখিয়া দেখিয়া ক্লান্ত হইতে হয়, আমাদের ত সেরূপ হইলে চলে না। এখানকার ট্রামগাড়ীগুলি খুবই ছুটাছুটি করিয়া থাকে, কিন্তু একই পথে, একই দৃশ্য দেখিয়া একই পথিপার্শ্বস্থ বস্তুনিচয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সে যেমন চলিয়া চলিয়া কেবলই হায়রাণ হয়, কিন্তু আনন্দতৃপ্তি পাইবার তাহার সম্ভাবনা নাই, আমাদের সেরূপ হইলে চলেনা। আমাদের জীবনের সুদীর্ঘ পথ। তাই আমাদের কল্যাণবিধাতা সেই পথকে সরল করিয়া দিয়াছেন। সে পথে চলিয়া চলিয়া আমাদিগকে পথে নিত্য নূতনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়। নিত্য নূতন আলোক, নিত্য নূতন সত্য, এপথে চলিতে চলিতে আমাদিগকে পাইতে হয়, জানিতে হয়। তাহাতেই আমাদের জীবনে নিত্য নূতন আনন্দও সমাগত হইয়া থাকে। যেপথে চলা আমাদের জন্য একান্তই আবশ্যক, একান্তই অনতিক্রমণীয় ব্যবস্থা, সেই পথ যদি আমাদের পক্ষে আরামদায়ক না হয়, যদি সে পথে চলিতে গিয়া আমাদিগকে কেবলই একই দৃশ্য দেখিতে হয়, একই প্রকারের অবস্থার মধ্য দিয়া যাইতে হয়, তবে তাহা যে একটা অতি ক্লেশকর ব্যাপারই হইয়া পড়ে। পথে চলিতে হইবে অথচ তাহাতে নিত্য নূতন নূতন আনন্দ ও আরাম আনিবেনা, কেবলই এক প্রকারের দৃশ্য দেখিয়া চক্ষু অবসন্ন হইয়া যাইবে, এমনত মঙ্গলবিধাতার বিধি হইতে পারে না। তিনি আমাদের গতিকে অনন্ত করিয়াছেন, পথকে অনন্ত করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের চির আনন্দপিপাসু প্রাণের সেই পিপাসা দূর করিবার জন্য পথকে সরল করিয়া এবং পথকে নিত্য আনন্দময় দৃশ্য ও আরামপ্রদ ঘটনায় পূর্ণ করিয়া, আমাদিগকে চিরদিন আনন্দিত হইয়া চলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমাদিগকে যখন নিয়তই চলিতে হইবে তখন সেই পথ নিত্য নূতন, নিত্য আরাম ও আনন্দপূর্ণ এবং নিত্য নূতন নূতন শিক্ষা ও সত্যের সাক্ষাতে আনন্দপূর্ণই হওয়া আবশ্যক। বিধাতা আমাদের জন্য সেই ব্যবস্থাই করিয়াছেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মই আমাদিগকে এই শুভ আনন্দজনক বার্ত্তা শুনাইয়াছেন। আত্মা যে নিত্য—অনশ্বর ও অমর, সে তত্ত্বে সকল ধর্ম্মাবলম্বীকেই বিশ্বাস করিতে হয়। আত্মার অমরত্ব স্বীকৃত না হইলে, ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তাই বেশী থাকেনা। ধর্ম্ম যে আত্মার চির সহায় চিরপোষক চিরসম্বল হইয়া আছে ও থাকিবে, তাহাতেই তাহার মহিমা অতুলনীয়। তাহার মর্য্যাদা অসীম গৌরবান্বিত। আত্মা চিরদিন থাকবে কিন্তু তাহার কোন কল্যাণময় পরিবর্ত্তন থাকবে না; সে নিত্য নবীন সত্যের সাক্ষাৎ পাইবেনা, নিত্য তাহার জন্য নূতন আলোক ও আরামপ্রদ কিছুই আসিবেনা, ইহাত ভাবিতেই পারা যায় না। তাহাতে সে যে অসহ এক ঘেয়ে অবস্থার মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া পরিশ্রান্ত ও পরিক্লান্তই হইতে থাকিবে। সে কি অবস্থা!! থাকিবে অথচ কিছু নূতন জানিবে না, নিত্য নূতন নূতন আনন্দের সাক্ষাৎ পাবেনা এমনতর স্থায়ী অবস্থাকে যে কোন মতেই প্রার্থনীয় মনে হয় না। মঙ্গলবিধাতার মঙ্গলবিধি যে সেরূপ হইতেই পারেনা। অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায় মুক্ত আত্মার একটি চিরস্থবিরাবস্থার কথা কল্পনা করিয়াছেন। আত্মা আপনার সুকৃতি দ্বারা বিশেষ এক অবস্থায় যাইবে, সিদ্ধিলাভ করিবে। পরিবর্ত্তন উন্নতি বা অবস্থান্তর তাহার আর ঘটিবে না। ইহাকে চিরস্থিতি বলা যাইতে পারে, কিন্তু জীবন্তভাবে স্থিতি বলা যাইতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে এরূপ স্থবিরত্ব লাভের কথা বলে নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে চিরউন্নতির সংবাদই প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং আমাদের পক্ষে সিদ্ধি বলিয়া কোন একটি বিশেষ অবস্থা নাই। আমরা কোন স্থানে গিয়াই মনে করিতে পারিব না যে, আর যাইবার পথ নাই। কোন অবস্থাতেই উপনীত হইয়া বলিতে পারিব না যে, আর জানিবার বা পাইবার কিছু নাই। জানা ও পাওয়া বন্ধ হইয়া গেলে যে জীবন থাকিল, তাহারইবা কি প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে? উপরে যে সংগীত উদ্ধৃত হইয়াছে—সে সংগীতও আমাদিগকে সেই কথাই বলিতেছে—আমাদের কোথায় যাইতে

হইবে তাহা জানিবারই বা কি প্রয়োজন আছে? মাঝির গানের তানের সঙ্গে সমানটানেই আমাদের চলিতে হইবে—আমাদের নায়ক ও চালকের ইঙ্গিতেই—প্রেরণাতেই আমাদিগকে চলিতে হইবে, বিশ্রাম করিবার কথা আমাদের ভাবিবার নহে। সে অধিকার আমাদের নাই। কারণ বিশ্রাম করা আর মরিয়া যাওয়া একই কথা। তবে একথা অবশ্যই সত্য যে, যেমন নৌকার পালে বাতাস লাগিলে নৌকার চালকদিগকে আর দাঁড় টানিতে হয় না—অনুকূল বায়ুস্রোত তাহাদিগকে লক্ষ্যের দিকে লইয়া যায়, আমাদিগের জীবনেও সেই অবস্থাই আসিবে, যখন পথ চলিতে আর তেমন সংগ্রাম থাকিবে না। মঙ্গলময়ের অনুকূল কৃপাপবন আমাদিগকে লক্ষ্যের দিকেই লইয়া যাইবে। অনন্ত পথের অনন্ত পাথেয় হইয়াই সেই কৃপাপবন আমাদিগের সঙ্গে আছে ও থাকিবে। তাহা আমাদিগকে যেমন বিশ্রামের সুযোগ দিবে না, তেমনি নিয়ত সহায় সঙ্গী হইয়াই আমাদিগকে আনন্দদানের সঙ্গে সঙ্গে অনন্তের দিকে লইয়া যাইবে।

আমরা কি এই নবীন সংবাদে শঙ্কাযুক্ত হইয়া কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিব যে, চিরদিনই কি আমাদিগকে চলিতেই হইবে? চিরদিন চলিয়া চলিয়া কি আমরা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িব না? না, এরূপ জিজ্ঞাসার অবসর আমাদের নাই। কাহারও নাই। আত্মা যেমন চিরকালের তেমনি সে চিরউন্নতিশীল। সুতরাং চিরউন্নতির পথে চলিতে অনিচ্ছুক হইলে চলিবে কেন? ভয় পাইলে বা চলিবে কেন? বাস্তবিক ভয়ের কোন কারণ নাই; কারণ, যিনি বিধাতা, তিনিই পথপ্রদর্শক ও পাথেয়। তিনি এ পথের নিত্য পরিচালক। আমাদের সংগীতে উক্ত হইয়াছে, "আমার সকল গতির মাঝে পরম গতি হে"। তিনি যে আমাদিগকে শুধু অনন্ত পথের পথিক করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাত নয়। তিনি নিত্য সঙ্গী হইয়া চালক ও পোষক হইয়াই আছেন। তাহাতেই বলা হইয়াছে—"অন্তবিহীন লীলা তোমার নূতন নূতন হে।" প্রভু পরমেশ্বর যে আমাদের জীবনের বিধাতা—নিত্য বিধাতা তাহাতে এরূপ হইলেই শোভন ও সম্ভবপর হয় যে, তিনি জীবনপথে নিত্য সঙ্গী ও সহায় হইয়া, নিত্য নবীন বিধি প্রচার করিয়া, যদি আমাদের পরিপোষক চালক হয়েন। সুতরাং এই নবীন সংবাদে আমাদের ভীত হইবার কথা কিছুই নাই; বরং উল্লসিত হইবার, প্রফুল্ল হইবার কথাই আছে। এজন্য পূর্ব্বে কি ছিল বা বর্ত্তমানে আমাদের কি আছে, তাহা আলোচনাতেই সন্তুষ্ট হইলে আমাদের চলিবে না। পূর্ব্বে যাহা অর্জ্জিত হইয়াছিল, যাহা আমাদের জন্য পরম সম্পদ্, তাহার স্মরণে লাভ আছে, এবং বর্ত্তমানে আমাদের যাহা আছে তাহার স্মরণেও আমাদের লাভ আছে, কিন্তু তাহাকেই একান্ত করিয়া দেখিলে বা তাহার স্মৃতিতেই সন্তুষ্ট হইতে চাহিলে, আমাদের চলিবে না। এ পথে নিত্য নূতন সম্বল সঞ্চয় করিতে ও উপার্জ্জন করিতে হইবে। পথের চালক দিতে কৃপণ নহেন; তাঁহার ভাণ্ডারের সম্পদও অফুরন্ত—তাহার আর শেষ নাই। সুতরাং পাথেয় পাইব কি না, সে আশঙ্কা করিতে হইবে না। নিরন্তর চলিতে যে শ্রান্তি আসে, তাহা কতকটা এই শরীরের ধর্ম্মবশতঃ আসিয়া থাকে। আত্মার ধর্ম্ম সেরূপ নহে। সে যত অগ্রসর হইবে, যত পথের নিত্য নবীন ব্যাপারের সঙ্গে পরিচিত হইবে, ততই তাহার গমনোৎসাহ বর্দ্ধিতই হইতে থাকিবে। জ্ঞানপিপাসার নিয়ত পরিবৃদ্ধিতেই আত্মার এই প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। জ্ঞানীর জ্ঞানপিপাসার ত কখনও নিবৃত্তি নাই। জ্ঞানী কোথাও গিয়া বলেন না, আর জানিয়া আবশ্যক নাই। প্রেমেরও সেই ধর্ম্ম। প্রেমিক প্রেম দিয়া ও পাইয়া ত কখন বলেন না, আর নয়, যথেষ্ট পাইয়াছি বা দিয়াছি। পুণ্যের আশাও অনন্ত আশা। সুতরাং কোন একস্থানে গিয়া বসিয়া পড়া বা গতি বন্ধ করা কখনই আত্মার প্রকৃতি নহে।

বৎসরের শেষে ভাই বোন্‌কে তাই জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে, চলিতে চলিতে কি শ্রান্ত হইয়া পথিপার্শ্বে বসিয়া বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা হইতেছে? বিশ্রাম আমাদের জন্য নয়। আমাদের বিধাতার সে ইচ্ছাই নহে। তাই কবি বলিয়াছেন—"যদি আলসভরে আমি বসি পথের পরে, যদি ধূলায় শয়ন পাতি সযতনে, যেন সকল পথই বাকি আছে সে কথা রয় মনে।" আমাদিগের চলিতে অনিচ্ছুক হওয়া আর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা একই কথা। আমরা সেরূপ গতিহীন অবস্থাকে যেন কখনও প্রার্থনীয় মনে না করি। বরং কোন কোন প্রাণী যেমন শীতে অভিভূত হইয়া মৃত প্রায় হইয়া কিছুকাল থাকিয়া আবার বসন্তাগমে জীবন্ত হইয়া উৎসাহের সহিত জীবনচেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়—নবউদ্যমে আপনার গন্তব্যপথে কর্ত্তব্য করে, তেমনি আমরা যদিও সংসারের শীতল বাতাসে অবসন্ন হইয়া পড়ি—যাহা শরীরের আশ্রয়ে থাকাতেই ঘটিয়া থাকে,—তাহাকে আর প্রার্থনীয় বলিয়া আদর করিব না। আবার জীবনপথেই অগ্রসর হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিব। প্রাণীবিশেষ যেমন তাহাদের গায়ের আবরণ পরিত্যাগ করিয়া নবভাবে নবপরিচ্ছদে আবৃত হইয়া জীবনের পথে নবোদ্যমেই অগ্রসর হয়, আমরাও পথে চলিতে চলিতে আমাদের অঙ্গে যে পথের ধূলিকাদারূপ মলিন আবরণ আসিয়াছে, তাহা ফেলিয়া দিয়া আবার নবীন উৎসাহে নবীন উদ্যমে অগ্রসর হইতে থাকিব। শরীরের ধর্ম্ম যেন আমাদিগকে অবসন্ন না করে। কল্যাণবিধাতা তাঁহার জলন্ত উৎসাহময় বাণী শুনাইয়া আমাদিগকে উৎসাহী ও জীবন্ত করিয়াই তুলুন। তাঁহার কৃপাতেই আমাদের চিরগতি সম্ভবপর হইবে।

পরিবারে ধর্ম্মসাধন ও সন্তানগণের ধর্ম্মশিক্ষা।

(১২)

সম্বন্ধ সাধন—প্রীতিসাধন।

"It is a law of human nature, visible enough to all who observe, that those who are debarred from the higher gratifications fall back upon the lower; those who have no sympathetic pleasures, seek selfish ones; and hence, conversely, the *maintenance of happier relations between parents and children* is calculated to diminish the number of those offences of which selfishness is the origin." Herbert Spencer.

"I turn to a home,—a home of beauty, of

affection, of love; to a home where all noble feelings are cherished, and all jarring interests and strife excluded." Theodore Parker.

"হেথায় তিনি কোল পেতেছেন
আমাদের এই ঘরে।"
"তোমার লীলা হবে এ প্রাণ ভরে,
এ সংসারে রেখেছ তাই ধরে।"
"এই ঘরে সব খুলে যাবে দ্বার,
ঘুচে যাবে সকল অহংকার।"

রবীন্দ্রনাথ।

ধর্ম্মসাধনে প্রেম।

ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মসাধনের ন্যায় সুকোমল ও পবিত্র বিষয় জগতে আর নাই। যে বস্তু যত কোমল ও পবিত্র, সে বস্তু তত সহজে আহত ও বিকৃত হয়। হৃদয়ে সরল সতেজ প্রেম না থাকলে, ধর্ম্মসাধন হয় না। প্রকৃতি ও জীবের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকলে মানুষের প্রেম সজীব থাকে না। এই জন্যই প্রেমস্বরূপ ভগবান, আমাদের হৃদয়ে প্রেমের বীজ রোপন ক'রে আমাদিগকে স্নেহ ভালবাসার ঘেরা গৃহে, আত্মীয়-বন্ধু অনাথ-আতুরে পূর্ণ সমাজে, এবং চিরযৌবনা এই সুন্দর প্রকৃতির মধ্যে রেখেছেন। এ সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান, জীবনের প্রকৃত কেন্দ্র আমাদের গৃহ-পরিবার। মাতা পিতা ভাই বোনের সঙ্গে সম্বন্ধ, আলোক-উত্তাপ-জল-বায়ুর সঙ্গে সম্বন্ধের মত সহজ। আলোক উত্তাপ প্রভৃতির সঙ্গে সংস্পর্শের ভিতর দিয়ে শরীর বিকশিত হয়, মাবাবা প্রভৃতি গৃহের পরমাত্মীয়গণের সংস্পর্শে আমাদের প্রেম বিকশিত হয়। সেই প্রেম ক্রমশঃ সমাজ, দেশ ও জগতে বিস্তৃত হয়। যে পরিবারে পরস্পরের প্রতি স্নেহ ভালবাসা, শ্রদ্ধাভক্তি, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ও সেবানুরাগ প্রভৃতি জীবন্ত, সেই পরিবার উপাসনার শ্রেষ্ঠ স্থান। উক্ত সদ্ভাবগুলি উপাসনার শ্রেষ্ঠ নৈবেদ্য। এই উপাদানের অভাব আর কিছুতেই পূর্ণ করতে পারে না।

প্রেমের অভাব।

কেবল মাত্র এক গৃহে এক অন্নে বাস করলেই, উক্ত সদ্ভাবগুলি জীবন্ত থাকে না। কত পরিবার বর্ত্তমান, যেখানে একত্রে নিত্য আবশ্যকীয় কয়েকটি কাজ ছাড়া পরস্পরের মধ্যে আর কোন যোগসূত্র নাই; স্বার্থ যে গৃহের ভিত্তি, সেখানকার প্রেম স্বার্থদুষ্ট ও মলিন। মলিন দর্পণে যেমন প্রতিবিম্ব দেখা যায় না, তেমনি এরূপ গৃহে আধ্যাত্মিক উপাসনা সম্ভব হয় না; লৌকিক ও বাহ্যিক উপাসনা মাত্র হ'তে পারে। অর্থ সম্পদ, পদমর্য্যাদা, শিক্ষাজ্ঞান, গানবাজনা, ললিতকলা, সাজসজ্জা যতই প্রচুর ও বিপুল হোক না কেন, পরস্পরের মধ্যে সুমিষ্ট সুকোমল পবিত্র ও সহানুভূতিময় প্রেম না থাকলে সবই বৃথা। কে কার কথা শোনে? জীবন্ত প্রেম না থাকলে ধনসম্পদ বৃথা, আধ্যাত্মিক সম্পদলাভ অসম্ভব।

প্রেমসাধন—সম্বন্ধ।

"প্রেম প্রেমকে পোষণ করে। নর-প্রেম ভগবৎপ্রেমকে গাঢ় ও বর্দ্ধিত করে।" এই প্রেম সাধনের জন্য,—যাতে পরিবার-মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে স্নেহ ভালবাসা ও শ্রদ্ধাভক্তির সম্বন্ধ জীবন্ত, মিষ্ট ও গভীর হয়, তার আয়োজন আবশ্যক। মনে হ'তে পারে, মা বাবা ছেলে মেয়ে, ভাই বোন, মাসী পিসী—এঁদের মধ্যে আবার সম্বন্ধের সাধন কি,—সম্বন্ধ তো আছেই? লৌকিক সম্বন্ধ আছে—যাতে সংসারের মোটা কাজগুলো চ'লে যায়; কিন্তু, আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ আমাদের মধ্যে নাই বল্লেই হয়। অন্তরের সুখ দুঃখ, আশা-নিরাশা, সংগ্রাম ও শান্তি প্রভৃতি অন্তররাজ্যের জটিল অভিজ্ঞতার সূত্রে যে পরিচয়, আদান প্রদান ও সহায়তা, তাকেই বলে প্রকৃত সম্বন্ধ। ছেলেটির শরীর অসুস্থ হ'লে মা বাবার মন কত ব্যস্ত হয়—এ প্রেমের কাজ। কিন্তু হৃদয় মনের অবস্থা জানবার এবং সুস্থ রাখবার জন্য তার চেয়েও বেশী দৃষ্টি না থাকলে, বুঝতে হবে সে প্রেম অতি স্থূল। মূলে দৃষ্টি না থাকলে সবই লঘু ব্যাপার হ'য়ে পড়ে; আবার মূলটাকে ভাল ক'রে ধরবার ও বুঝবার জন্যও স্থূলের সদ্ব্যবহার আবশ্যক। এ জন্য, আত্মার আত্মীয়তা, আত্মার পুষ্টিসাধন, ও ধর্ম্মবোধের বিকাশকে লক্ষ্য রেখে, সেই লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়ার জন্য পরিবারের অন্তর্গত সকলকে সকলের সকল বিষয়ের সঙ্গে সহৃদয় যোগ রক্ষা করতে হবে—সাধনরূপে করতে হবে। এজন্য বিবিধ উপায় উদ্ভাবন করতে হবে।

পরিচয়ই চক্ষু।

এই আত্মীয়তা—সম্বন্ধ—পরিচয়ই প্রকৃত চক্ষু। এ বিষয়ের সাধন—নিয়মিত মেলামেশা, মন খুলে কথা বলা, পরস্পরের অবস্থার সংবাদ নেওয়া, সায় দেওয়া; পরস্পরের সঙ্গে জীবনের প্রসঙ্গ করা। কার কি ভাল লাগে এবং কি ভাল লাগে না, কবে কোন্ বিষয়ে কার কি বিশেষ শিক্ষা হয়েছে,—ভালমন্দ, কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য,—শরীর মন, পড়াশুনা খেলাধূলো, আমোদ আহ্লাদ, কাজকর্ম্ম কার কেমন চলছে,—পরিচিত অপর পরিবারে সুখদুঃখের ঘটনা কি ঘটেছে, সমাজে, দেশে এবং জগতে কোন্ কোন্ প্রধান ঘটনায় জনসমাজের হিতাহিত হবে—প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে, পরস্পরের সঙ্গে মন খুলে কথা বলা—আত্মীয়তা বৃদ্ধির একটি প্রধান উপায়।

ব্যবস্থা—মন খুলে কথা বলা।

বয়স্ক নরনারীগণ পরস্পরের বিষয় জানবেন ও বলবেন; ছেলে মেয়েরা মাতা পিতা ও বিশেষ আত্মীয় গুরুজনদের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সব কথা বল্বে; বিশেষতঃ মাতা পিতা উভয়ে (অথবা কেবল মাতা), প্রতিদিন অন্ততঃ একবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে, সস্নেহে ছেলে মেয়েদের সমস্ত দিনের সমস্ত সংবাদ জিজ্ঞাসা ক'রে জান্বেন, এবং তাদের সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ ক'রে কথা বল্বেন, এমন ব্যবস্থা গৃহে থাকা উচিত। ছেলেরা যেদিন মা বাবার কাছে নিঃসংকোচে নিজেদের কথা বল্তে পারে না, সেইদিনই তাদের অতি অশুভ দিন। রাত্রিতে আহারের সময়, অথবা, সন্ধ্যাকালীন প্রার্থনার সময়, একবার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মাতা পিতা অথবা মাতা কিম্বা পিতৃ মাতৃস্থানীয় কেহ স্থিরভাবে বস্বেন—এবং সকলের সর্ব্ববিধ সংবাদ জানবেন। মাতা পিতার সঙ্গে সন্তানদের মন খুলে কথা বলার অভ্যাস ছেলেমেয়েদের পক্ষে বড়ই কল্যাণকর।

বয়স্কদের মধ্যে আত্মীয়তা।

পতি পত্নী, বড় ভাই বোন, প্রভৃতির মধ্যেও এইরূপ প্রকৃত পরিচয় না হ'লে, গৃহধর্ম্ম পালন করা সম্ভবপর হয় না। একগৃহে থাকি, খাই দাই সবই করি,—কিন্তু কার কোথায় ব্যথা, কোথায় কার দুর্ব্বলতা, কোথায় কার আনন্দ, তা যদি না জানি, না বুঝি, এবং সে বিষয়ে যদি সহায় ও সঙ্গী কিছু পরিমাণে না হ'তে পারি,—তা হ'লে শরীরগুলিকে একত্র বসালেও সমবেত উপাসনা হয় না, উপাসনায় মিলন হয় না; শোকে দুঃখে সংগ্রামে ঘোর একাকীত্ব দূর হয় না; পারিবারিক জীবন সার্থক হয় না। এই সম্বন্ধের অভাববশতঃ সাংসারিক জীবনে তৃপ্তি থাকে না, ধর্ম্ম-সাধনে প্রাণ থাকে না।

অপর পরিবারের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ।

কেবল মাত্র, পরিবারের অন্তঃর্গত কয়েক জনের মধ্যে মেলা-মেশা এবং কথাবার্ত্তা, সেবা ও সহায়তাই যথেষ্ট নয়। পরিবার সমাজের অঙ্গ। সমাজের আশ্রয় ব্যতীত পরিবার বাঁচে না। অপর দশটি পরিবারের সঙ্গে সংস্রব ব্যতীত কোন পরিবার পূর্ণতা লাভ করে না। এ জন্যে প্রত্যেক পরিবারকে সমাজের অন্তর্গত কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতর রূপে যুক্ত হতে হবে; তাঁদের সঙ্গে শ্রদ্ধা ও প্রীতির যোগ বৃদ্ধি করবার জন্য পরস্পরকে নিয়মিতরূপে গৃহে আহ্বান করতে হবে; বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, এবং ছেলেমেয়েদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করতে হবে; পরস্পর অভ্যর্থনা অভিবাদন করতে হবে, এবং সন্তানগণকে করাতে হবে; এবং ছোটবড় সকলের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা চল্‌তে হবে এবং যথাসম্ভব সেবা ও সহায়তা করার সুযোগ অন্বেষণ করতে হবে। সকল পরিবারের সঙ্গেই সকল পরিবারের বিশেষ বন্ধুতা হওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু, চার-পাঁচটি, কি দশবারোটি পরিবারের মধ্যে বেশ একটু ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়তা হইতে পারে। এরূপ আত্মীয়তা সমাজের স্তম্ভস্বরূপ এবং সন্তানগণের সুনীতি ও সদাচার শিক্ষার বিশেষ উপায়। অবশ্য পরিবাগুলির বন্ধু পবিত্র না হলে ঘনিষ্ঠতাও মঙ্গলকর হয় না।

সকল পরিবারের প্রতি প্রেম।

কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হবে, কিন্তু সমাজের সকল পরিবারগুলির প্রতি সপ্রেম দৃষ্টি রাখতে হবে। সকলেরই সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী ও বিপদে সহায় হতে হবে।

সমাজ।

এজন্য সমস্ত সমাজের কোথায় কি হচ্ছে—সকল সংবাদ জানবার চেষ্টা করতে হবে, সকল পরিবারের সঙ্গে শুভকামনার যোগ রক্ষা করতে হবে।

সাধুভক্ত জ্ঞানীদের প্রতি শ্রদ্ধা।

আরও বিশেষ কথা—সাধুভক্ত জ্ঞানীদের সঙ্গে শ্রদ্ধা ও ভক্তির যোগ। যাঁরা আত্মার কল্যাণ চান, ধর্ম্মসাধন করতে চান, ও সন্তানগণের জীবনে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চান, তাঁদের পক্ষে এই যোগের ব্যবস্থা গৃহে করা অতীব আবশ্যক। সাধুভক্ত কর্ম্মী ও জ্ঞানীগণের চিত্র গৃহে রেখে, পরলোকগত সাধুগণের জন্ম-মৃত্যু দিনে গৃহে তাঁদের বিষয়ে প্রসঙ্গ ক'রে, তাঁদের গ্রন্থ পাঠ ক'রে, সন্তানদের কাছে তাঁদের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনার উল্লেখ ক'রে,—এ-সাধন করা যায়।

ভক্তিভাজনগণ।

দ্বিতীয়তঃ—যে সকল শ্রদ্ধেয় ও ভক্তিভাজন লোক সমাজে বর্ত্তমান, তাঁদেরও নিয়মিতরূপে—সপ্তাহে অথবা মাসে একদিন—নির্দ্দিষ্ট সময়ে গৃহে আহ্বান ক'রে আন্‌তে হবে; এবং তাঁদের প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধাভক্তি প্রকাশ ক'রে অভ্যর্থনা করতে হবে।

গৃহে সাধু জ্ঞানী সমাগম।

পরিবারের সকলের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে; তাঁদের সঙ্গে পারিবারিক ও সামাজিক কল্যাণকর বিবিধ প্রসঙ্গ করতে হবে, সন্তানগণের জীবনের সঙ্গে সংসৃষ্ট বিষয়েরও আলোচনা করতে হবে; এবং সময় বিশেষে অর্চ্চনা বন্দনা করতে হবে। ভাল লোকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে এবং গৃহে তাঁদের গমনাগমনে পরিবারস্থ সকলেরই কল্যাণ হয়। এজন্য শান্তভাবে শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাবে কিছু সময় দেওয়া আবশ্যক। বাহিরে অসার ও লঘু আলোচনাদিতে আমরা অনেক সময় কাটাই—তার সঙ্গে জীবনের প্রত্যক্ষ কোন সম্বন্ধ নাই। গৃহেও অনেক সময় শ্রদ্ধাহীন সমালোচকের ন্যায় প্রসঙ্গাদি করি; তাতে অকল্যাণই হয়। সেই সব সময় যদি সাধুভক্ত জ্ঞানী সমাগমের জন্য ব্যয় করি, তাহলে সকলেরই বিশেষ কল্যাণ হয়।

সমাজ ও পরিবার।

সমাজের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণকেও এজন্য সময় ও শক্তি দিতে হবে। ব্রাহ্মপরিবারগুলি এবং ব্রাহ্ম সন্তানগণের প্রতি সমাজের আচার্য্য ও প্রচারকগণের বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। সে কর্ত্তব্য সাধনে বিশেষ মনোযোগ দিবার সময় এসেছে। পরিবারগুলির কর্ত্তা গিন্নীদেরও কর্ত্তব্য, আচার্য্য ও প্রচারকগণকে বন্ধুরূপে গৃহে গৃহে বরণ।

সমাজের সঙ্গে যোগ।

এ ছাড়া সমস্ত সমাজের সঙ্গে যথাসম্ভব যোগ রক্ষা করা আবশ্যক। সেজন্য সামাজিক উপাসনা, বক্তৃতা, সান্ধ্য সম্মিলন সৎপ্রসঙ্গ প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে। এ গুলির লক্ষ্য কি, এবং প্রত্যেকের দায়িত্ব কি—সে জ্ঞান স্পষ্ট না থাকায় এ সকল ব্যাপার সার্থক হয় না। সেদিকে সকলের মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রতি পরিবারে যদি এই জ্ঞান জাগ্রত হয়, তাহ'লে এই সকল সম্মিলিত ব্যাপারও সফল হবে; এবং সন্তানগণের শিক্ষার সহায় হবে।

পরস্পরের সহায়তা।

পরস্পরের সহায়তা ব্যতীত কোন বিষয়েই কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভবপর নয়। ধর্ম্ম সাধন ও চরিত্র গঠনেও তাই। পরস্পরের সহায়তা যে কি, এবং তা কেমন ক'রে করতে হয়, সে বিষয়েও শিক্ষার প্রথম ও প্রধান ক্ষেত্র গৃহ পরিবার। পরিবারের সকলের ভাল মন্দ সুখ দুঃখ সকলের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সকলে যদি বিভিন্ন অবস্থাতে পরস্পরের সঙ্গে সরল হৃদয়ে ও সপ্রেমে মেশে ও সহায় হয়, তাহলে গৃহ স্বর্গে পরিণত হয়। এজন্য নানা উপায় অবলম্বন করতে হয়। একসঙ্গে জ্ঞানানুশীলন

করতে হবে, নৈতিক আদর্শের আলোচনা করে নিজেদের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে এবং সংকল্প করতে হবে, আত্মদোষ স্বীকার এবং অপরের গুণ গ্রহণ করতে হবে; শাস্ত্রপাঠ করতে হবে, মহৎ জীবনের প্রসঙ্গ করতে হবে, উপাসনা প্রার্থনা ও নির্দ্দিষ্ট সাধন প্রসঙ্গ করতে হবে;-- ছোটদের উপযোগী করে ছোটদের সঙ্গে এবং বড়দের উপযোগী করে বড়দের সঙ্গে বসতে হবে ও কথা বলতে হবে। এ সকল ব্যাপার যেন ক্লান্তিজনক ও দুর্ব্বোধ্য না হয়, দীর্ঘকাল-ব্যাপী না হয়। এইরূপে পরস্পরের জীবনের বিচিত্র সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে জীবনের সকল দিক ফুটে উঠে, অন্তরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উদয় হয়। এই ব্যবস্থার জন্য পিতামাতা গুরুজন ও আচার্য্যগণ দায়ী। এজন্য পিতামাতার সময়, হৃদয়, অর্থ, স্থান সবই আবশ্যক। এই আত্মীয়তা—আন্তরিক জীবনের অনুভূতি আধ্যাত্মিক জীবনের হৃৎপিণ্ড।

প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ।

কেবল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ হইলেই সম্বন্ধ সাধন পূর্ণ হয় না। বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সঙ্গে, বৃক্ষ লতা ফুল ফলের সঙ্গে, পশু পক্ষীদের সঙ্গে,—নদ নদী, বন উপবন, শস্যক্ষেত্র ও প্রান্তর, পাহাড় ও সাগর, উষা ও সন্ধ্যা পূর্ণিমা ও অমাবস্যা, সূর্য্যের উদয় ও অস্ত, গ্রহ নক্ষত্র, পুষ্পের সৌরভ, পাখীর সুস্বর, শস্যাদির বিচিত্র আস্বাদন—প্রভৃতির সঙ্গে হৃদয়ের মনের পবিত্র আনন্দময় যোগ সাধন মানুষের উচ্চ অধিকার। এই অধিকার, এই যোগ সাধনের মূল ও গৃহে। দুটি ফুলগাছের যত্ন,—মাটি দেওয়া জল দেওয়া। পশু পক্ষীদের দুমুঠো খাবার দেওয়া, ইত্যাদি কাজের সূত্রে এই প্রেম বিকশিত হয়। এইসূত্রে জনক জননী অতি সহজে বিশ্ব ব্যাপারে বিশ্বপতির বিচিত্র লীলা সন্তানগণকে বোঝাতে পারেন, "সীমার মাঝে" অসীমের আনন্দময় প্রকাশ অনুভব করতে পথ খুলে দিতে পারেন।

অন্যান্য লোক।

এই সঙ্গে দাস দাসী, গয়লা, মেথর, ধোবা, দোকানদার, দীন দুঃখী প্রভৃতি সকলেরই সুখ দুঃখের সঙ্গে সহানুভূতি, সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার শিক্ষার কেন্দ্র ও গৃহ।

অতিথী।

অতিথী অভ্যাগতদের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রদর্শন এবং তাঁদের সেবা ও চিত্ত বিনোদন অন্তরের সাধুভাব জাগ্রত করবার একটি প্রধান উপায়।

সেবা-দান।

সেবা—পরোপকার—দান প্রেম সাধনের একটি প্রধান অঙ্গ এবং পরিবারে নিয়মিতরূপে সাধনের বিষয়। (১) মা বাপ ভাইবোনের সাহায্য করা,—বাবার জুতোজোড়া যথাস্থানে রাখা, লাঠিটা এনে দেওয়া; মার একটা জিনিষ হাতের কাছে এগিয়ে দিলে; খাওয়ার স্নানের আয়োজনের সময় কেহ জল দিলে, কেহ নুন দিলে, কেহ আসন ঠিক করলে; কারো অসুখ করলে, পা টিপে দেওয়া, কপালে হাত বুলিয়ে দেওয়া, মাথায় বাতাস করা, বই পড়ে শুনান, গান শুনান, এ সবই সেবা এবং শিক্ষার বিষয়। গৃহে সর্ব্বদা যথাসাধ্য পরস্পরের সেবা ও সহায়তার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে রাখা কর্ত্তব্য।

পবিত্র প্রেম মহৌষধি।

সুস্থ পবিত্র সরল সতেজ প্রেম সর্ব্ববিধ সামাজিক ব্যাধির মহৌষধ, এবং প্রেমস্বরূপের অর্চ্চনার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। এই প্রেম এত অমূল্য বলেই, তার বিকাশের জন্য এত আয়োজন। অতি সূক্ষ্মভাব, শান্ত চিন্তা, গভীর পর্য্যালোচনা, ও সপ্রেম সেবা ব্যতীত ভগবানের এত আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যায়। সন্তানগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাই বিদ্যাশিক্ষার জন্য, কিন্তু এই মহা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহা শিক্ষার ভার প্রধানতঃ জনক জননীর উপর, তারপর সমাজের আচার্য্য প্রচারক শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানগুলির উপর। গৃহই জীবনের মূল, এই মহা শিক্ষার মূল; বাহিরেরও সমাজের ব্যাপার সকল ডাল পালা; মূলে জল সেচন না করলে সবই নষ্ট হয়।

প্রেমের সম্বন্ধের সঙ্গে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধার সঙ্গে কৃতজ্ঞতা, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বিনয়, বিনয়ের সঙ্গে স্থিরতা ও সংযম বর্ত্তমান থাকে। অনুরাগ, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা, বিনয়, স্থিরতা ও সংযম থাকলে, নীতি ও ধর্ম্ম দুই থাকে। প্রেমের সংস্পর্শেই প্রেম বিকশিত হয়। এক পরিবারের অন্তর্গত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রেমের সংস্পর্শ লাভের পথ প্রশস্ত থাকা আবশ্যক। প্রথমে জড়তার পাথর ভাঙ্গতে কিছু বেগ পেতে হবে। তারপর এ ব্যাপার বড়ই তৃপ্তি-জনক। এই প্রেমের সম্বন্ধ সজীব না রাখতে পারলে, আর সবই বৃথা হয়; বিধিব্যবস্থা, জ্ঞান, শৃঙ্খলা সব বাহিরের ব্যাপার হয়ে থাকে।

সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত।

পরলোকগত নেহালচাঁদ ধন।

(শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত)

আমাদের পরম স্নেহের ভ্রাতা নেহালচাঁদ ধন তাঁহার স্ত্রী পুত্র কন্যা এবং আত্মীয়স্বজনকে চিরজীবনের মত শোকসাগরে ভাসাইয়া এ সংসার হইতে ইং ১৭ই নভেম্বর ১৯১৮ সাল রবিবার সন্ধ্যা প্রায় ৭ ঘটিকার সময় এ সংসার হইতে অপসৃত হইয়াছেন।

স্বর্গীয় ভ্রাতা নেহালচাঁদ ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর চিফস্ কলেজ" রাজা, মহারাজ, সর্দ্দার ও রাণা "সাহেবের ছেলেদের বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হয়েন। ইহার বহুদিন পূর্ব্বে ১৮ বৎসর বয়সে তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগাযোগ হয়। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মপিপাসা তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত মিলনের একমাত্র কারণ। ঐ সময় পাঞ্জাবের পণ্ডিত শিবনারায়ণ অগ্নীহোত্রী মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম সতেজে পাঞ্জাবী যুবকগণ মধ্যে প্রচার করিতে-ছিলেন। পরলোকগত ভ্রাতা নেহালচাঁদ তাঁদের স্বর্গবাসী পিতা লালা চোনমল ফৈজপুর জেলায় নিজ পুত্রকে সামান্য গ্রাম্য শিক্ষাই দিতেছিলেন এবং তাঁহার জমীজমা ও চাষকার্য্যের ভারার্পণ করিয়া সংসারী করিবার উপযুক্ত করিতেছিলেন, কিন্তু নেহাল চাঁদের তাহাতে জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত হইবে কেন? তিনি সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পল্লীগ্রাম হইতে লাহোরে উচ্চশিক্ষা লাভের প্রত্যাশায় গমন করেন। এখানে তিনি অতি কষ্টে বিদ্যাশিক্ষারম্ভ করেন, তাঁহার পিতৃদেব চোলমলজীর এমন সংস্থান ছিল না যে পুত্রের শিক্ষার ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করেন; কিন্তু নিজ অধ্যবসায় ও চেষ্টার গুণে এণ্ট্রেন্স পাস্ করিয়া লাহোর (F C)

এফ, সি, কলেজে বি, এ, পর্য্যন্ত বিদ্যোপার্জ্জন করেন। প্রাতে ও বৈকালে ছেলেদের পড়াইতেন, এবং তদ্দ্বারা যে অর্থলাভ হইত তাহাতে নিজের ব্যয়, ইস্কুল ও কলেজের ব্যয়ভার চালাইতেন! তথাপি পাঠ্যাবস্থায় তাঁহার এমন দিন কতবার হইয়াছিল যে তিনি সরকারী রাস্তার উপর দাবায় কতদিন শুইয়া রাত্রিযাপন করিয়াছেন অধিকন্তু রাস্তার সরকারী আলোকের সাহায্যে আপন ইস্কুল ও কলেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়াছেন! এমন ঘটনা এক দিন নয়, দুই দিন নয় সম্বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে তৎপর আরও কত সম্বৎসর ধরিয়া এই ভাবে জীবনের কঠিন অধ্যবসায় ও যৎপরোনাস্তি কষ্ট স্বীকার করিয়া বিদ্যোপার্জ্জন করেন তৎপর যখন "scholarship" পাইবার সুসময় আসিল তখন তাহা হইতে আপন সমস্ত খরচ চালাইয়া উহার অবশিষ্টাংশ পিতা-মাতাকে পাঠাইতেন। তাঁহার মাতৃভক্তি অচলা ছিল।

নেহাল চাঁদের কলেজের প্রিন্সিপাল (Dr. Ewing) ডাক্তার ইউয়িং তাঁহাকে পুত্রবৎ ভাল বাসিতেন এবং তদীয় ১ম পুত্র প্রেমচাঁদকে নিজের সঙ্গে লইয়া সযত্নে Collegeএ পাঠ করাইতেছেন, তাঁহার হঠাৎ এ দৈব বজ্রাঘাতরূপী অকালমৃত্যুতে বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়া প্রেমচাঁদ ধনকে কত প্রকারে সান্ত্বনা দান করিয়াছেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এই সুবৃহৎ লক্ষ্ণৌ নগরীতে নেহালচাঁদ ধন আমাদের সর্ব্বকনিষ্ঠা ভগ্নীর সহিত বিবাহিত হইয়াছিলেন, এবং এই শুভানুষ্ঠান আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ পরলোকগত পণ্ডিত লছমন প্রসাদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। অনন্তর ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে নেহাল চাঁদ ধনজী চিফ্ কলেজ হইতে বদলি হইয়া শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন স্থানে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া কাজ করিতে আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন। বলা বাহুল্য তাঁহার এ স্থানান্তর হইবার সঙ্গে সঙ্গে পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধি হইত। কার্য্যদক্ষতা, বিনয় ও নম্রতা তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ গুণ থাকাতে তিনি যেখানে দুইদিনও থাকিতেন সেখানকার সকলকে বশীভূত করিয়া লইতেন, এমন কি স্থানান্তরিত হইবার সময় সকলে তাঁহার জন্য অশ্রুবর্ষণ করিত! Chief Collegeএর প্রিন্সিপাল Mr. J. C. Godly মহোদয় তাঁহার কার্য্যে এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে অন্যান্য কর্ম্মচারীর তুলনায় বিলক্ষণ স্নেহ করিতেন; এবং এইজন্যই প্রিন্সিপাল মহোদয় Director of Public Instruction পদে অধিরূঢ় হইলে নেহালচাঁদ ধনজীর জন্য ৩০০৲ মাসিক বেতন হারে Inspector of schools মনোনীত করেন, এমন পদোন্নতি সাধারণতঃ সকলের ভাগ্যে সংঘটন হয় না, কিন্তু হইলে হয় কি, এই সময়ে কোথা হইতে অকাল করাল কাল আসিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিয়া লইয়া গেল।

নেহালচাঁদ ধনের ভিতরে এমনি একটা অলৌকিক বস্তু নিহিত ছিল, এবং ভগবান তাঁহার অন্তঃকরণ এমনি এক স্বর্গীয় দেবভাব দ্বারা সংঘটিত করিয়াছিলেন, যাহা দ্বারা রাজা, মহারাজা, ধনি কি নির্ধন; তাঁহার উচ্চ এবং নিম্ন পদস্থ কর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে সানন্দে ভক্তি শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিত, অবাধে মস্তকাবনত করিতে কুণ্ঠিত হইত না। তাহার দেহান্ত হইলে আমি তাঁহার মৃত্যুর স্থানে যাইয়া উপস্থিত হই, তথায় রাণা জগজিৎচাঁদ কুটারের Ruling chief মহানুভবের সহিত সাক্ষাৎ হইল, ইনি কহিলেন "শিক্ষক আমাদের অনেকেই হইয়াছিলেন, আমরা শিক্ষাও অনেকের নিকট পাইয়াছি, কিন্তু এমন সৎগুরু আমাদের কাহারও ভাগ্যে আজ পর্য্যন্ত হয় নাই, হইবে না; এমন সন্তান বৎসলভাবে ছোট বড় নির্ব্বিশেষে কেহ কখনও শিক্ষা প্রদান করেন নাই! আমরা Ruling chief কখনও কাহারও শব দেহের অনুসরণ করি নাই, কিন্তু ইঁহাকে পিতৃবৎ ভক্তি করিতাম, তাই ইঁহার প্রেত দেহের সৎকার সাধন জন্য অবাধে অনুধাবন করিয়া তাঁহার শেষ কার্য্য সম্পাদন পুরঃসর সার্থক হইয়াছি। যখন রাণা সাহেব তাঁহার মৃত দেহ সৎকারের জন্য শাল রুমালের দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া শ্মশান ভূমিতে ভক্তি সহকারে লইয়া যাইতেছিলেন তখন মেজর গিবসন তথাকার সিভিল্ সার্জ্জন সকাতরে আসিয়া কাঁধ দেন! রাণা বাহাদুরের পারিষদেরা, পৌরাণিক ব্রাহ্মণগণ ঐ শব দেহ নির্ব্বিরোধ ও নির্ব্বিবাদে লইয়া গিয়া শ্মশানভূমিতে অগ্নিক্রিয়া সুসম্পন্ন করিল।

একবার সিমলা শৈলে কোন দোকানে নেহাল চাঁদ ও তাহার ছাত্র রাণা সাহেব দণ্ডায়মান ছিলেন, ঐ সময়ে মহারাজ বাহাদুর পাতিয়ালা তথা হইতে এক রেকসা উপরে আরোহন করিয়া গমন করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াই রেকসা হইতে সসম্ভ্রমে অবতীর্ণ হইলেন, এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া তদীয় গুরুদেব লালা নেহাল চাঁদকে প্রণিপাত করিলেন, পরে তাঁহার শিক্ষাগুরু নেহাল চাঁদজীকে রেক্সায় বসাইয়া গুরু মহাশয়কে তাঁহার বাটীতে পৌঁছাইয়া দিলেন। আর একটী ঘটনা, সিমলা শৈলে কোন সময়ে তথাকার Ruling chiefs এই অপরাপর রাজগণ সমবেত ছিলেন, উপলক্ষ রাজ দরবার এই সময়ে রাজ-ভক্ত নেহাল চাঁদজী তথায় কোন কার্য্যোপলক্ষে যাইয়া উপস্থিত হয়েন, তখন বঘেলের রাজা তদন্তে উঠিয়া গিয়া তাঁহার রাজগুরুকে আনিয়া আপন সঙ্গে লইয়া গিয়া তাঁহাকে রাজাসনে বসাইলেন; ইহাতে ঐ দরবারের সম্পাদক মহাশয় সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ সামান্য পোষাকধারী লোকটী কে?" তদুত্তরে রাজা বাহাদুর বঘেল কহিলেন "ইনি সেই মহাভাগ যিনি থাপড়া মারিয়া আমাকে মানুষ করিয়াছেন"! তাঁহার নৈতিক শক্তি অসামান্য ছিল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে যখন আর্দ্রির রাজার অভিভাবক ছিলেন তখন একদিন রাজমাতা তাঁহার পুত্রকে এক বারাঙ্গণা গ্রহণ জন্য রাজগুরু নেহাল চাঁদকে অনুমতি প্রদান করিতে অনুরোধ করিয়া পাঠান। প্রদেশের রাজবংশীয়েদের মধ্যে ঐরূপ একটা প্রথার ন্যায় চলন হইয়া আসিয়াছে, তথাপি নেহাল চাঁদজীর ন্যায় একজন উপযুক্ত শিক্ষক এই কার্য্যে অনুমোদন প্রদান করেন আশায় তাঁহার নিকট ঐ রূপ নিবেদন করিয়া পাঠান, তাহাতে রাজগুরু নেহাল চাঁদজী সগর্ব্বে উত্তর করেন "আমি সৎগুরুর যে কাজ তাহারই অনুমোদন করিতে পারি, এ প্রকার জঘন্য কুৎসিত প্রথা যাহাতে মানুষ নরকে পতিত হয় আমি তাহার প্রশ্রয় দিতে পারি না, সৎশিক্ষা, সৎপরামর্শ, সৎদৃষ্টান্ত ইত্যাদি আমার শিক্ষাবিভাগের যে সমস্ত কাজ তাহাই আমি প্রদান করিতে পারি। যাহাতে আমার কোন ছাত্রের চরিত্র জঘন্য হয় আমি কিছুতেই তাহার অনুসরণ

করিতে পারি না, আমার বর্ত্তমানে যদি কোন ছাত্র কুপথগামী হয় তবে আমি তদ্দণ্ডে এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব, আমার ছাত্র অবাধ্য হইলে আমি তাঁহাকে মনে করি, সে আপনাকে আপনি নষ্ট করিল" ইত্যাকার ভর্ৎসনা বাক্যে নেহাল চাঁদ ধনজী আর্দ্রির রাজমাতাকে বিশেষ নীতিগর্ভ বাক্যে তিরস্কৃতকরিয়া আপন উচ্চ চরিত্র এবং নীতির পরিচয় দিলেন। এমন দেব চরিত্র আত্মীয়কে আমরা হারাইলাম। আজ তাঁহার পাঁচটী পুত্র ও দুইটী কন্যা পিতৃহীন হইল, পরম গুণবতী স্ত্রী পতিহীনা হইয়াছেন। তাঁহার তনুত্যাগের সময় যাইয়া উপস্থিত হইতে পারি নাই, কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়া পড়িয়াছিল, তজ্জন্য আমার চিরজন্মের মতন ক্ষোভ থাকিয়া গেল। ভ্রাতার শেষবাক্যেও অভয় বাণী প্রকাশিত ছিল; তিনি সিভিল সার্জ্জন মহাশয় Major Gibbsonকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন "আমাকে দেখিবার আবশ্যক নাই, আমার স্ত্রীপুত্র পরিবারগণকে রোগমুক্ত করুন।" এরূপ কথাবার্ত্তার পর চারিদিন তাঁহার শ্বাসকষ্ট দেখা দিল, Major Gibbson, সিভিল সার্জ্জন মহাশয়কে স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে "এমন স্বাস্থ্য আমি কখনও জীবনে দেখি নাই!" শারীরিক ও মানসিক শক্তি যথেষ্ট ছিল, কিন্তু বিধাতার বিধানের নিকট মানুষের কোন হাত নাই, ইহলোক হইতে পরলোকে যাইবার নির্দ্ধারিত সময় তোমাকে আমাকে সকলকে এখান হইতে যাত্রা করিতে হইবে! এদিনে কোন চিকিৎসকের চিকিৎসাই খাটে না, ভ্রাতার মৃত্যুর সময় তাঁহার ৫টী পুত্র ও একটী কন্যা ও স্ত্রী উপস্থিত ছিল, তাঁহার ৫৩ বৎসর বয়স হইয়াছিল। হে মঙ্গলময় বিধাতা তোমার মঙ্গলময় বিধানে আমাদের কাহারও হস্ত নাই!

ওঁ! শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

ব্রাহ্মসমাজ।

পুরস্কার—স্বর্গীয় মণিলাল সিংহের স্মরণার্থে "রাজা রামমোহন রায়" সম্বন্ধে একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গালা প্রবন্ধ লেখককে একটী স্বর্ণপদক প্রদত্ত হইবে। সমস্ত কলেজের ছাত্ররাই ইহা লিখিতে পারিবেন। এই প্রবন্ধ রামমোহন লাইব্রেরীর সম্পাদকের নিকট ২৬৭ নং অপার সার্কুলার রোডে ৩১শে জুলাইএর মধ্যে প্রেরণ করিতে হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব—একচত্বারিংশৎ সাম্বৎসরিক উপলক্ষে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন :—

১৪ই মে সায়ংকালে ৭ ঘটিকার সময় বক্তৃতা, বক্তা—শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত। বিষয়—আধ্যাত্মিক ও আনুষ্ঠানিক ধর্ম্ম।

১৫ই মে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা—বক্তৃতা—সভাপতি—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র। বক্তা—শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, শ্রীযুক্ত সুকুমার রায় প্রভৃতি। বিষয়—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ কার্য্য।

১৬ই মে (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন) প্রত্যূষে—উষাকীর্ত্তন, প্রাতে ৭ ঘটিকায় উপাসনা, আচার্য্য—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস। সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকায় সংকীর্ত্তন, ৭॥ ঘটিকায় উপাসনা আচার্য্য—শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়।

১৭ইমে—অপরাহ্নে বালকবালিকা সম্মিলন; শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ এবং শ্রীমতী সুবালা আচার্য্য বালকবালিকাদিগকে উপদেশ দিবেন।

দীক্ষা—গত ২৭শে এপ্রিল প্রাতে আমেদাবাদ ব্রাহ্মসাধনাশ্রমের উপাসনান্তে শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ চুণিলাল ভট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার আচার্য্যের কার্য্য করেন।

পারলৌকিক—গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে গত ২২শে এপ্রিল ডিব্রুগড়ে শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র গুহের পত্নী শ্রীমতী সন্তোষিণী গুহ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

গত ২৭শে এপ্রিল স্বর্গীয় ডাঃ জ্ঞানেন্দ্র নাথ দত্তের পত্নী ও ডাঃ ধর্ম্মদাস বসুর কন্যা শ্রীমতী চারুশীলা দত্ত ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন।

গত ২৪শে এপ্রিল গিরিধিতে শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ঘোষ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বিগত ৮ই মে ময়মনসিংহ সহরে প্রাচীন ব্রাহ্ম "বড় সাধ মনে" প্রভৃতি গান রচয়িতা বাবু অমরচন্দ্র দত্ত পরলোক গমন করিয়াছেন। অমর বাবু ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে ও সাধারণের কার্য্যে জীবন মন নিয়োজিত করিয়াছিলেন; তাঁহার ওজস্বিনী ভাষা, অক্লান্ত কর্ম্মোৎসাহ লোককে অনুপ্রাণিত করিত; ময়মনসিংহ সহরের সমস্ত সাধারণ কার্য্যে তিনি একজন অগ্রণী ছিলেন। কয়েক বৎসর তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন; সম্প্রতি একটু সুস্থতা লাভ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে আবার আস্তে আস্তে প্রবেশ করিতেছিলেন; ভগবানের তখন ডাক আসিল; তিনি চলিয়া গেলেন; তিনি একদিন হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়েন; তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়; তাঁহার মৃত্যুতে ব্রাহ্মসমাজ একজন অকপট কর্ম্মী হারাইলেন।

কয়েকদিন হইল, নলহাটীতে প্রাচীন ব্রাহ্ম বাবু হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় পরলোক গমন করিয়াছেন। হারাধন বাবু ব্রাহ্মসমাজের জন্য অনেক নিগ্রহ ও ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন; তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করাতে পত্নী পুত্র তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল; তিনি সন্তানগণকে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন; একমাত্র কন্যা ব্যতীত কেহই ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বীকার করে নাই। কিন্তু তাঁহার এই ঘোর পারিবারিক সংগ্রামের মধ্যে তিনি নিষ্ঠার সহিত, সহাস্যমুখে ব্রাহ্মধর্ম্মের পতাকা ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বালকের ন্যায় সরল ভাব, সহাস্য মুখ, সকলের প্রাণেই আনন্দ সঞ্চার করিত। যেখানে উৎসব সেখানেই তিনি উপস্থিত থাকিতেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি নলহাটীতে বাস করিতেন। সেখানে মৃত্যুসময়ে তাঁহার কন্যা শ্রীমতী নগেন্দ্রবালার সম্মুখে নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

মঙ্গলময় বিধাতা পরলোকগত আত্মাগণের শান্তিবিধান করুন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারগণের হৃদয়ে শান্তনাবারি বর্ষণ করুণ।

গত ২১শে এপ্রিল শ্রীমতী শান্তিলতা চৌধুরীর পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে; শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র চৌধুরী ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন বিভাগে ১৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ২১শে বৈশাখ ডিব্রুগড নগরে শ্রীযুক্ত ভগবানচন্দ্র গুহের পত্নী সন্তোষিণীর পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল আচার্য্যের কার্য্য সম্পাদন করেন। ভগবানবাবু পত্নীর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত পাঠ ও প্রার্থনা করেন। পুত্রগণ দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা করেন। এতদুপলক্ষে নিম্নলিখিত দান করা হইয়াছে:—

১। সন্তোষিণী ফণ্ড—১০০৲ টাকা এককালিন, এই টাকার সুদ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

২। সন্তোষিণী পুরস্কার—৫৲ টাকা বার্ষিক, ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের যে ছাত্রী সেবাপরায়ণা বলিয়া বিবেচিত হইবেন তিনি এই পুরস্কার পাইবেন।

৩। ডিব্রুগড় ব্রাহ্মসমাজ—৩৲ ডিব্রুগড় দরিদ্রসমিতি ৫৲ খাসিয়া মিসন—২৲ টাকা, খাসিয়া অনাথ আশ্রম, শিলং—৩৲, পাবনা ব্রাহ্মসমাজ—২৲, মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ—১৲, কলিকাতা সাধনাশ্রম—৫৲ সাঃ ব্রাহ্মসমাজ দাতব্যবিভাগ—৩৲, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ (প্রচার ফণ্ড)—৫৲।

বিগত ৪ঠা মে বাণীবনে পরলোকগত ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়; কলিকাতা হইতে অনেক বন্ধু সেখানে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন রায় জীবনচরিত পাঠ ও প্রার্থনা করেন; এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান করা হইয়াছে।—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ দাতব্য বিভাগ ২০৲, দুর্ভিক্ষ ফাণ্ড ১০৲, সাধনাশ্রম ১০৲, নববিধান সমাজ দাতব্য বিভাগ ২০৲, অনাথাশ্রম ১০৲, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ব্রাহ্মসমাজ ১০৲, ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুর্ভিক্ষ ফাণ্ড ২৫৲, কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজ ১০৲, বাণীবন ব্রাহ্মসমাজ ২৫৲, গিরিডি ব্রাহ্মসমাজ ১০৲, শিলং সেবাশ্রম ২৫৲, পুরী কুষ্ঠাশ্রম ১০৲ ঢাকা বিধবাশ্রম ১০৲, ঢাকা অনাথাশ্রম ১০৲, কলিকাতা রিফিউজ ১০৲, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ২০৲, বেঙ্গল সোসিয়েল সার্ব্বিস লিগ ১৫৲, ইন্দুপ্রকাশ ইনষ্টিটিউসন বাণীবন ১০৲ মোট ২৬০৲ টাকা।

বাণীবন বালিকা বিদ্যালয়—গবর্ণমেণ্ট বাণীবন বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ৯০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

দান—স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসুর পত্নী স্বর্ণপ্রভা বসুর বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁহার পুত্রগণ সমাজের স্বর্ণপ্রভা বসু ফাণ্ডে ১০০ টাকা দান করিয়াছেন।

প্রচার—শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল আসামের ডিব্রুগড় সহরে একমাস কাল অবস্থিতি করিবেন এরূপ সংকল্প লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি প্রতিদিন রায়সাহেব শরচ্চন্দ্র দাসের গৃহে পারিবারিক উপাসনা সমাপনের পর আসামী ও বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের গৃহে গৃহে গমন করিয়া দেখা সাক্ষাৎ করেন। সন্ধ্যার সময় নিম্নলিখিত গৃহে মিলিত মণ্ডলীতে উপাসনা করিয়াছেন এবং উপদেশ দিয়াছেন;—বাবু ভগবানচন্দ্র গুহ, লক্ষ্মীনাথ দাস এবং রায় সদয়াচরণ দাস বাহাদুর। একটি শোকার্ত্ত পরিবারে প্রতিদিন উপাসনা সম্পাদনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রুগ্ন ব্রাহ্মপরিবার পরিদর্শন করিতেছেন। দুই শনিবার সমাজমন্দিরে দুইটি বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতার বিষয় (১) "প্রেমের জয়" (২) "দুঃখ বিজয়।" প্রতি রবিবার মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনা সম্পাদন করিতেছেন।

গিরিধি ব্রাহ্মসমাজ—বিগত ৩০শে চৈত্র বর্ষশেষ এবং ১লা বৈশাখ নববর্ষারম্ভ উপলক্ষে গিরিধি ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে।

উৎসব—শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী রঙ্গপুর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করিয়া নিম্নলিখিত প্রণালীতে উৎসবের কার্য্য করিয়াছেন।—১৮ই এপ্রিল, সন্ধ্যায় উৎসবের উদ্বোধন। ১৯শে এপ্রিল, প্রাতে উপাসনা; সন্ধ্যায় বক্তৃতা—বিষয় "আত্মার ঐশ্বর্য্য।" ২০শে এপ্রিল, প্রাতে উপাসনা; অপরাহ্নে পাঠ ও ব্যাখ্যা, সন্ধ্যায় উপাসনা। ২১শে এপ্রিল, প্রাতে উপাসনা ও শান্তিবাচন; সন্ধ্যায় বক্তৃতা—বিষয় "বর্ত্তমান যুগের কয়েকটি লক্ষণ"; ঈশ্বরের আহ্বান; ঈশ্বর অনুভূতির উপায়; ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি ও বিশেষত্ব; ধর্ম্মজীবনের সুর ও ঈশ্বরের অনুপাত হওয়াই ধর্ম্মজীবনের উন্নতি ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবার উপায়—এই বিষয়ে উপদেশ।

ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ—বিগত বর্ষের অবসানে এবং নূতন বর্ষের আগমনে ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক বিশেষ উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। ২৯শে চৈত্র সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত অর্পণাচরণ ভট্টাচার্য্য, এম্ এ "মানব-জীবন ও তাহার উচ্চ আদর্শ" বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ৩০শে চৈত্র প্রাতে শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত সমাজে উপাসনা করেন এবং "ঈশ্বরে অবস্থিতি" বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত হরানন্দ গুপ্ত উপাসনা করেন এবং "ঈশ্বরেই আশা" বিষয়ে উপদেশ দেন। ১লা বৈশাখ প্রাতঃকালে অমরবাবু উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "ধর্ম্মসাধন" বিষয়ে উপদেশ দেন এবং সন্ধ্যায় হরানন্দবাবু উপাসনান্তে "মাহং ব্রহ্মনিরাকুর্য্যাম, মা মা ব্রহ্মনিরাকরোৎ" এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। পরদিন সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, 'নূতন ও পুরাতনের সমস্যা" বিষয়ে ব্রহ্মমন্দিরে বক্তৃতা করেন।

নামকরণ—ডিব্রুগড় নগরে বাবু ভগবানচন্দ্র গুহের শিশু কন্যার নামকরণ অনুষ্ঠান গত ৩০শে চৈত্র সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল আচার্য্যের কার্য্য করেন। বালিকার নাম সুজাতা রাখা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ভগবানবাবু কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগে ৩৲ পাবনা ব্রাহ্মসমাজে ২৲ ডিব্রুগড় ব্রাহ্মসমাজে ১৲ এবং ডিব্রুগড় সমাজের অন্তর্গত দরিদ্র সমিতিতে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন। পরমেশ্বর শিশুকে আশীর্ব্বাদ করুণ।

বিবাহ—বিগত ১২ই মে কলিকাতা নগরীতে রায় শশিভূষণ মজুমদারের দ্বিতীয়া কন্যা স্বপনার ও শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র দাসের পুত্র শ্রীমান সুধীরঞ্জনের শুভ বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতীকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

২১১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Registered No C. 65.

অসতোমা সদগময়।
তমসোমা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৪শ ভাগ।	১৬ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ১৩২৬, ১৮৪১ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯০	অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲
৪র্থ সংখ্যা।	30th May, 1919.	প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে আমার হৃদয়দেবতা, আমি ত তোমার দ্বারেই পড়ে থাকিতে চাই, আমার মন ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কেন? আমি ত তোমাকে লইয়াই সুখী হতে চাই, আমার মন অন্য জিনিষের জন্য লালায়িত হয় কেন? আমি ত তোমার নামের আনন্দেই ডুবিতে চাই, আমার মন অন্য রসে রসিক হতে চায় কেন? এতদিন বসে রইলাম, আমার মন তোমাতে ডুবিল না, তোমার রসে মজিল না, তোমার আনন্দে বিভোর হইল না। তবুও বলি, তোমা ছাড়া আমার আর কেহ নাই; আমি তোমার চরণেই মাথা রেখে পড়ে থাকব; আমি তোমারই নাম ল'য়ে পড়ে থাকব, আমি তোমারই জন্য প্রতীক্ষা করব; দুঃখকে ভয় করব না; নিরাশা মনে আসতে দিব না; তুমি ত আমাকে পরিত্যাগ করতে পারবে না; তুমি যে আমাকে ভালবাস, তুমি যে আমার জন্য ব্যস্ত; আজ না হোক কাল, কাল না হোক দশদিন পরে, দশদিন পরে না হোক, দশ বৎসর পরে, তুমি আমাকে তুলে লবেই; তুমি আমার প্রাণে এসে বসবেই; তোমার আনন্দে আমাকে ডুবাবেই। আমি সেই আশা লয়েই বসে থাকব; আমি নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেও তোমার নাম নিয়ে বসে থাকব; আমি ঘোর ঘনঘটার মধ্যেও তোমার প্রতীক্ষা করে বসে থাকব। হে আমার প্রিয়, হে আমার দেবতা, হে আমার স্বামী, আমি যে তোমারই; আমি আর দ্বারে দ্বারে ঘুরব না; চোখের জল ফেলতে হয়, তোমার চরণেই ফেলব; জীবন তোমার চরণেই অর্পণ করব; তুমি যখন আসবে, তখন আনন্দে হৃদয় ভরপূর হবে; তখন লোকের নিকট বলব, আমি কৃতার্থ হয়েছি, তাঁর প্রেমের স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়েছি।

নিবেদন।

এ আনন্দ কেন?—এতদিন কেঁদে কেঁদে বক্ষ ভাসিয়েছি, চোখ অন্ধ হয়ে গেছে; কত দুঃখ, কত বেদনা; তা ত লোকে বোঝে না; আমার প্রি[illegible] যিনি, তাঁকে হারিয়ে আমার জীবন যে শূন্য হয়ে গিয়েছিল; আজ দেখি আমার প্রাণে আনন্দ ধরে না; আজ দেখি নূতন দৃষ্টি পেয়েছি। আমার প্রিয়তমের সংবাদ পেয়েছি; আজ দেখ্‌ছি, চারিদিকে তাঁর নিদর্শন; আজ দেখ্‌ছি তাঁর হাতের লেখা; ঐ যে তাঁর রূপের ছবি জগৎ আলো কর্‌ছে; ঐ যে তাঁর গন্ধ পবন বহন কর্‌ছে। আমার আর দুঃখ নাই; আমাকে তিনি যে কৃতার্থ করেছেন; তোমরা কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছ না? তোমরা তাঁর সঙ্গীত শোন না? তোমরা তাঁর লেখা দেখ না? আমাকে ত আর দীন রাখেন নাই। আজ আমি অমৃতের সন্ধান পেয়েছি; তাই এ আনন্দ।

সকলই নিয়ে যাবে?—তুমি আমার ধন মান সকলই নিয়ে যাবে? আমি ত দিতে চাই না; আমার প্রাণের অন্তরালে যা লুকিয়ে রেখেছি, তা ত দিতে ইচ্ছা হয় না। তুমি তাও কেড়ে নিবে? আমার হৃদয় শূন্য করে দিবে? আমার প্রিয়জন যারা তাদেরও নিয়ে যাবে? আমার প্রীতি যেখানে, তাহাও দূর করবে? তবে আমি কি নিয়ে থাকব? ওগো দেবতা, সব নিয়ে যেয়ো না; তবে যে আমি বাঁচ্‌ব না। বুঝেছি, নাথ, তুমি বুঝি আসবে; তুমি বুঝি শূন্যহৃদয় পূর্ণ করে বসবে; তুমি বুঝি, সকল অভাব পূর্ণ করবে; তুমি বুঝি জীবনের স্বামী হ'য়ে থাকবে? তবে তাই হোক; আমি ত কিছু বুঝি না;

তাই কাঁদি, চোখের জল ফেলি; তুমি তবে আমাকে কাঁদায়েও সব নিয়ে যাও; তোমা ধনে যদি ধনী হতে পারি, তবে আর অন্য কি চাই?

এত ভাবনা কেন?—তোমরা এত ভাব্‌ছ কেন? কি খাবে, কি পর্‌বে বলে এত চিন্তা কর কেন? প্রিয়জন চলে যায়, সেজন্য এত ক্রন্দন কর কেন? কত ভাই ভগিনী, আপনার জন বিপথে যায় তাতে এত নিরাশ হও কেন? সংসারে এত অত্যাচার, এত উৎপীড়ন দেখে, তোমাদের প্রাণে অবিশ্বাস আসে কেন? জান না, তিনি আছেন; তিনি সকল জানিতেছেন; তিনি মঙ্গলের দিকে নিয়ে চলেছেন; তাঁর সাড়া কি পাও নাই? দুঃখ শোক, ক্লেশ, উৎপীড়নের মধ্যে তাঁর মাভৈঃ বাণী কি শোন নাই? তিনি যে সঙ্গেই আছেন, তিনি যে বরাভয় দান করিতেছেন; তাঁর প্রেমে কেন সন্দেহ কর? তাঁর মঙ্গল ইচ্ছাতে কি নির্ভর কর্‌তে পার না? ঐ দেখ, তিনি সব দেখ্‌ছেন, যাহা শুভকর মঙ্গলকর, তাই ফুটাইয়া তুল্‌ছেন।

কে বুঝ্‌বে?—আমার দুঃখের কথা কত জনের নিকট বলিলাম, কত বন্ধুকে জানাইলাম; সকলেই হেসে উড়িয়ে দেয়, কেহ আমার ব্যথা বোঝে না, প্রাণের যাতনা দেখ্‌তে পায় না; আমার কথায়ও বোধ হয় বিশ্বাস করে না; আমার ভাষা বুঝাতে অক্ষম; তিনি ত দেখেন, তিনি ত প্রাণের নীরব ক্রন্দন শোনেন; তিনি যে প্রাণের অস্ফুট বেদনাও বোঝেন; তবে আর আমার ভয় কি, ভাবনা কি? আমি তাঁর উপরই তবে নির্ভর করি; তিনি যা হয় করিবেন; আমি তাঁকেই দুঃখ বলি; তিনি তার ব্যবস্থা কর্‌বেন।

সম্পাদকীয়।

ধর্ম্মের প্রাণ—ধর্ম্ম কেবল নিত্য ও নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানে নহে, শাস্ত্র, দর্শন বিজ্ঞান আলোচনাতে নহে; ধর্ম্ম কেবল লোকশ্রেয়ঃ সাধনে নহে; কিম্বা কেবল নৈতিক জীবনলাভে নহে। ধর্ম্ম সাধনার্থীর পক্ষে নিত্য নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান; নিষ্ঠার সহিত সাধন করা প্রয়োজন, শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ, দর্শন বিজ্ঞান আলোচনা, সাধুসঙ্গ লাভ প্রয়োজন, নানা ভাবে মানবের হিতসাধনে ব্রতী হওয়া আবশ্যক; সর্ব্বোপরি নৈতিক চরিত্র গঠন, একান্ত দরকার। কিন্তু এ সকল ধর্ম্মের কাঠাম, এ সকল হইলেই ধর্ম্ম হইল না; ধর্ম্মের প্রাণ চাই; সে প্রাণ ঈশ্বরে ভক্তি; তাঁতে একান্ত অনুরাগ, তাঁর নামে আনন্দ; ধর্ম্মের লক্ষ্য ব্রহ্মলাভ, তাঁর সঙ্গে যোগ, তাঁর বাণী শ্রবণ। একজন সাধু বলিয়াছেন,—"শনৈঃ শনৈঃ তাঁহাকে লাভ করিতে হয়, একদিনে হয় না। প্রথমে নামে রুচি, তাহার পর নামে অনুরাগ, তাহার পর নামে আনন্দ। নামে আনন্দ হইলেই প্রেমের সঞ্চার হয়। প্রভুর কৃপাতেই তাঁহাকে লাভ করা যায়।" যে পর্য্যন্ত ঈশ্বরের নামে রুচি না হয়, তাহাতে অনুরাগ না জন্মে, তাঁহার নাম লইতে আনন্দ না হয়, সে পর্য্যন্ত ধর্ম্মের বহিরাবরণ লইয়াই আছি, ধর্ম্মের প্রাণে পৌঁছাতে পারা যায় নাই। ভক্তিভাজন গোস্বামী মহাশয় একদিনের কথা বলিয়াছিলেন,—"ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া শয়ন করিব মনে করিয়া, উপবেশন করিলাম, কিন্তু উপাসনা এত মিষ্ট বোধ হইল যে, আর শুইতে ইচ্ছা হইল না, সমস্ত রজনী কাটিয়া গেল।" "সে বস্তু ছাড়িয়া কি নিদ্রা ভাল লাগে? সেই সুন্দর বস্তু কি এক পলক চক্ষের আড় করা যায়?" ইহাই হইল প্রকৃত ধর্ম্মের লক্ষণ। আমরা প্রিয়জনকে কত ভালবাসি; সে যখন কাছে আসে, তার সঙ্গে কত গল্প করি; তাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হয় না; কত রাত্রি তার সঙ্গে কথাবার্ত্তায় কাটিয়া যায়; চক্ষে নিদ্রা আসে না; ঘুমুতে ভাল লাগে না। প্রভু পরমেশ্বরে যখন অনুরাগ জন্মে, তাঁহাকে যখন প্রিয় বলে বরণ করা যায়, তখন তাঁহার নামে রুচি হবে, তাঁহার উপাসনাতে অনুরাগ জন্মিবে, তাঁহার গুণকীর্ত্তনে, তাঁহার ধ্যানে আনন্দ আসিবে; তাঁকে ছেড়ে উঠিতে ইচ্ছা হবে না। অন্য কাজ করিবে, সে সময়ও তাঁর ভাব প্রাণে আসিবে, তাঁতে মন সমর্পিত থাকিবে। ছুটে ছুটে সুবিধা পেলেই একান্তে তাঁর ধ্যানে মগ্ন হইতে ইচ্ছা হইবে। এই যে নামে রুচি, অনুরাগ ও আনন্দ ইহাই ত ধর্ম্মের প্রাণ; এই অন্তরের ধর্ম্ম লাভ করিতে হইবে। তাহার কৃপা ব্যতীত এ ধর্ম্ম লাভ করা যায় না; কিন্তু আমাদেরও ত কর্ত্তব্য আছে; আমরা নিষ্ঠার সহিত অনুষ্ঠানাদি সবই করিব, সৎগ্রন্থ পাঠ করিব, লোকশ্রেয়ঃ সাধন করিব, চরিত্র উন্নত করিব, কিন্তু সর্ব্বোপরি তাঁহার চিন্তা, তাঁহার ধ্যানে নিযুক্ত থাকিব; তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিব; তাঁহার চরণে অশ্রুপাত করিব। বলিব,—প্রভু, তুমি বিনে যে আমার সকলই বৃথা হয়ে গেল! আমি যে তোমারই জন্য বসে আছি—সকল দুঃখ ক্লেশ সহিয়া তোমারই জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি; তুমি প্রাণে প্রকাশিত হও; তোমাতে আমার অনুরাগ জন্মাক, তোমার নামে আমার আনন্দ আসুক।" তাঁহার কাছে প্রার্থনা, তাঁহার ধ্যান, তাঁহার চিন্তা, তাঁহার নাম কীর্ত্তন করা প্রয়োজন; যে পর্য্যন্ত নামে অনুরাগ না আসে, তাঁহার ধ্যানে আনন্দ না জন্মে, সে পর্য্যন্ত ধর্ম্ম আরম্ভই হলো না। এই যে ধর্ম্মের প্রাণ, এই যে অন্তরের ধর্ম্ম, ইহাই লাভ করিতে হইবে; নতুবা জীবন যে কৃতার্থ হইল না।

দুর্ভিক্ষ—এ বৎসর দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে; এ দেশের উপর এ বৎসর কি যে বিপদের পর বিপদ্ যাইতেছে, তাহা ভাবিলে চোখে জল রাখা যায় না। প্লেগ, কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া ত আছেই, এ বৎসর এক ইনফ্লুয়েঞ্জাতেই ভারতে ৬০ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে; এখনও ত সে রোগের প্রকোপ সম্যক্ দূর হয় নাই। ইহার উপর আবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে। যুদ্ধের জন্য বস্ত্র এবং অন্যান্য জিনিষ ক্রমেই দুর্মূল্য হইয়া উঠিতেছিল; বস্ত্রাভাবে লোকের কি কষ্ট যাইতেছে, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু গত বৎসর ধান চাউলের মূল্য বেশী ছিল না। কাজেই লোকের বস্ত্রাভাবে কষ্ট হইলেও অন্নের সংস্থান করা কঠিন ছিল না। সকলেই মনে করিয়াছিল,

যুদ্ধের অবসান হইলে সকল জিনিষেরই মূল্য হ্রাস হইবে। কিন্তু এখন দেখি তাহার বিপরীত। বস্ত্রের মূল্য ত বিশেষ হ্রাস হয়ই নাই, অধিকন্তু চাউল, ডাল, তৈল, কেরোসিন্ তৈল, আলু পটল সব জিনিষের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। চাউলের ও ডাইলের এবং তেলের এত অধিক মূল্য কেহ কখনও দেখে নাই। তাই চারিদিকে অন্নাভাবে হাহাকারধ্বনি উঠিতেছে। মধ্যবিত্ত লোক যাঁরা তাঁহাদেরও ভয়ানক কষ্ট আরম্ভ হইয়াছে—গরীব প্রজাদের ত অন্ন জুটিতেছেই না। কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, বাঁকুড়া অঞ্চলে খুব অন্নকষ্ট আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমে এই কষ্ট আরও বর্দ্ধিত হইবে; তখন যে কি উপায় হইবে, তাহা বলা যায় না। গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন; ব্রাহ্মসমাজ ও রামকৃষ্ণ মিশন, সোসিয়েল সার্ব্বিস্ লিগ্ প্রভৃতি নানা সমিতি দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকদিগের সাহায্যের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজ আপাততঃ বাঁকুড়াতে দুর্ভিক্ষের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এজন্য লোক ও অর্থ প্রয়োজন। ব্রাহ্মসমাজ চিরদিনই জনসেবাকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন; কত স্থানে কত দুর্ভিক্ষে জলপ্লাবনে ব্রাহ্মসমাজ হইতে সাহায্য করা হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও বাঁকুড়া ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে ব্রাহ্মসমাজ হইতে অন্নক্লিষ্ট লোকদিগের সাহায্য করা হইয়াছিল। ব্রাহ্মসমাজ ত লোকের দুঃখ দেখিয়া নীরব থাকিতে পারেন না। তাই বলি, এই পবিত্র কার্য্য সাধনের জন্য লোক প্রয়োজন, অর্থের প্রয়োজন। দুঃস্থ ভাই ভগিনীদের মৃত্যুগ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য কি লোক আসিবে না? তাঁহাদের নীরব ক্রন্দন কি ব্রাহ্মদের কর্ণে পৌছিবে না? তাঁহাদের জীবন রক্ষার্থ কি ব্রাহ্মগণের হস্ত উন্মুক্ত হইবে না? ব্রাহ্ম হউন, অব্রাহ্ম হউন, এই মহৎ কার্য্যে সকলেই অগ্রসর হউন; দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে যাইবার জন্য লোকের প্রয়োজন; যার একটু সময় আছে, দুঃখীর চোখের জল মুছাইবার ইচ্ছা আছে, দৃষ্টিশক্তি আছে, তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হউন; যাঁর অর্থ আছে, তিনি অর্থ প্রদান করুন; যাঁর অর্থ নাই, তিনি অর্থসংগ্রহের ভার গ্রহণ করুন। অন্নাভাবে লোক কষ্ট পাইবে, ভাই ভগিনী সব মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, এ দৃশ্য কি দেখিতে পারা যায়! তাই সকলকে এই পবিত্র কার্য্যে সাহায্যের জন্য আহ্বান করিতেছি।

সাম্যবাদ—আজকাল সর্ব্বত্রই নানা ভাবে নানা আকারে সাম্যবাদ মস্তক উত্তোলন করিতেছে; কি রাজনীতি ক্ষেত্রে, কি সমাজনীতি ক্ষেত্রে, কি ধর্ম্মসমাজে, কোন দিনই কোথাও সাম্যবাদ সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত হয় নাই। এ দেশে অতি প্রাচীন কালেই ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন, ভূতে ভূতে ব্রহ্ম বিরাজমান; অথচ এ দেশেই রাষ্ট্রনীতিতে, সমাজনীতিতে যেরূপ বৈষম্য প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে, তাহাতে অবাক্ হইতে হয়; এই বর্ত্তমান যুগেও জাতিতে জাতিতে কিরূপ ভেদ রহিয়াছে, ব্রাহ্মণে ও ব্রাহ্মণেতর জাতিতে কিরূপ পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা ত সকলেই অবগত আছেন; কত জাতি এ দেশে অস্পৃশ্য হইয়া রহিয়াছে, মান্দ্রাজের পারিয়াগণ কত ভাবে হীন ও ঘৃণিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক হৃদয়বান্ ব্যক্তিরই প্রাণে বেদনা উপস্থিত হয়। অন্যান্য দেশেও শ্রমজীবীদিগকে—নিম্নশ্রেণীকে কিরূপ ভাবে কত অধিকারে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইতেছে; রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে ও এখনও গণতন্ত্র সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই যে অসাম্য, এই যে মানুষে মানুষে প্রভেদ, ইহা হইতেই বর্ত্তমান সময়ে কত দ্বন্দ্ব, কলহের সৃষ্টি হইতেছে। প্রাচীনকালে হিন্দু ও ম্লেচ্ছ, গ্রীক্ ও বার্ব্বেরিয়ান্, জু ও জেণ্টাইল, খৃষ্টান্ ও পেগান্, যবন ও কাফেরে কত প্রভেদ ছিল; ধর্ম্মসম্মত ভাবেই যেন ম্লেচ্ছ, জেণ্টাইল, বার্ব্বেরিয়ান্, পেগান্ ও কাফেরকে ঘৃণা করা হইত; সেই সকল অপভাষা এখন অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইতেছে বটে, কিন্তু সাম্যভাব এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। রাজার সঙ্গে প্রজার, ধনীর সঙ্গে নির্ধনের, উচ্চ জাতির সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর, ক্যাপিটেলিষ্টের সঙ্গে শ্রমজীবীর চিরদিন বিবাদ চলিতেছে; এই যে রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য, তাহা প্রজাবর্গ সহ্য করিতে না পারাতেই ফরাসী বিপ্লব ঘটিয়াছিল; দাসদিগকে শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার জন্যই আমেরিকার অন্তর্যুদ্ধ ঘটিয়াছিল; তদবধি কতক পরিমাণে সাম্যমন্ত্র ঘোষিত হইলেও, কেবল ভারতবর্ষ কেন, ইউরোপ আমেরিকা হইতেও অসাম্য দূরীভূত হয় নাই। সেই জন্যই সর্ব্বত্র বিদ্রোহ ধর্ম্মঘট, কলহের সংবাদ শুনিতে পাই। শ্রমজীবীরা দিনরাত পরিশ্রম করিয়া আয়ের অতি অল্পমাত্রই প্রাপ্ত হয়, যাঁহাদের মূলধন তাঁহারাই লাভের অধিক অংশ গ্রহণ করেন; এ দেশে এখনও নিম্নশ্রেণীগণ কত রূপ নিগ্রহ সহ্য করিতেছে; তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা নাই, উন্নতির বন্দোবস্ত নাই, তাহারা অস্পৃশ্য, সমাজের অতি হীন স্তরে তাহাদিগকে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্রনীতিতেও এখনও গণতন্ত্র সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, প্রজাবর্গের অধিকার সর্ব্বত্র স্বীকৃত হয় নাই; এই জন্যই নানা আকারে স্থানে স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত হইতেছে। এই যে বলসেভিষ্টদের বিদ্রোহ, এই যে এ দেশে অব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণদের প্রতি বিদ্বেষ, এই যে নিম্নশ্রেণীর উচ্চ শ্রেণীর প্রতি বিরাগ, ইহার মূলে এক প্রবল স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, সাম্যের আহ্বান। তাহারা অজ্ঞ, সুতরাং তাহারা তাহাদের আকাঙ্ক্ষা সুসংযত ভাবে পরিচালিত করিতে পারে না; কিন্তু ব্রহ্ম সকলের মধ্যে বিদ্যমান, তাই সকলেরই স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা আছে, সকলের প্রাণেই একটা সাম্যের আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে; কেহ আর অপরের অধীনতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে, কেহ আর অত্যাচার উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করিতে চাহিতেছে না; কেহ আর উচ্চশ্রেণীকে, রাজাকে, ব্রাহ্মণকে, ধনীদিগকে ঈশ্বরের অবতার বা অনুগৃহীত বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিতেছে না। এই সংসারে তুমি আমি সকলেই সমান, তুমি আমি সকলেই সমান অধিকার পাইবার উপযোগী; তুমি আমাকে হীনস্তরে রাখিয়া দিবে কেন? তুমি আমার কথা উপেক্ষা করিয়া তোমারই সুবিধামত আইন করিয়া লইবে কেন? তুমি আমি উভয়েই শিল্প বাণিজ্যের সাহায্য করিতেছি, তুমি লাভের অধিক অংশ পাইবে, আর আমি সামান্য অংশে তৃপ্ত থাকিব কেন? তুমি আমাকে অস্পৃশ্য বলিয়া তোমার দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতে দিবে না কেন, তোমার কূপের জল লইতে দিবে না কেন, তোমার বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে দিবে

না কেন? তুমি রাজা, আমি প্রজা, তুমি আমার মত লইয়া শাসন করিবে না কেন? এই যে ধ্বনি উঠিয়াছে, ইহার প্রতিরোধ করিতে যাইয়াই ঘোর কলহ, বিদ্রোহ বিপ্লব উপস্থিত হইতেছে। যাহারা সাম্যের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহারাও অনেক সময় ন্যায় ও ধর্ম্মের সীমা লঙ্ঘন করিতেছে। ব্রহ্ম যে তাহাদের মধ্যে বিরাজিত তাহা দেখিতে পাইতেছেনা; তাই তাহারা সময় সময় আপনাকেই বড় করিয়া তুলিতেছে। ব্রহ্মকে প্রাণে দেখিতে হইবে; তাহা হইলেই সাম্যমন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই সময়ে যাঁহারা জ্ঞানী, যাঁহারা ধীর, তাঁহাদের কর্ত্তব্য এই যে, যাহারা অধিকার লাভের জন্য গোলযোগ উপস্থিত করিতেছে তাহাদিগকে সুপরিচালিত করা, তাহাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করা, তাহাদের উন্নতির দ্বার অনর্গল করা, তাহাদিগকে সংযত হইতে শিক্ষা দেওয়া, তাহাদিগকে সহানুভূতির চক্ষে দেখা, তাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়মিত করা, তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা, তাহাদের ধর্ম্মবুদ্ধি জাগ্রত করা, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন্ উন্নতির সহায়তা করা। তাহা হইলেই জগতে শান্তি আসিবে, সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, জগতে স্বর্গরাজ্য স্থাপনের পথ পরিষ্কার হইবে।

জীবনের জটিলতা ও সাধনা।

সম্মুখে ভীষণ নদী, প্রবল তরঙ্গ; কত যাত্রী নৌকারোহণে পার হইতে যাইয়া জীবন হারাইতেছে; একজন পথিক চলিতে চলিতে নদীর তীরে উপস্থিত, তাহাকে ও পার যাইতে হইবে; কিন্তু নদীর প্রবল তরঙ্গ দেখিয়া, অনেক তরণী জলমগ্ন হইতেছে দেখিয়া তাহার কিছুতেই নদী পার হইতে সাহস হইতেছে না; সে কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না; সে ভাবিতেছে, ঐ যে জলস্রোত ক্রমাগত বহিয়া যাইতেছে, ঐ স্রোত যখন ফুরাইবে, জলপ্রবাহের যখন শেষ হইবে, তখন অবাধে নির্ভয়ে হাঁটিয়া খাত পার হইব; জলস্রোত কি কখনও ফুরাইবে? নদী প্রবাহের কি কখন শেষ হইবে? ওহে ভ্রান্ত পথিক, তুমি ত তবে কখনই পার হইতে পারিবে না, ঐ কূলে থাকিয়াই তোমাকে জীবন কাটাইতে হইবে; যদি পার হইতে চাও, তবে সাহসে বুক বাঁধিয়া ঐ নদীস্রোতেই ভাসিতে হইবে; পথে উত্তাল তরঙ্গে মৃত্যু আসিতে পারে, পোত মগ্ন হইতে পারে, তবুও অন্য গতি নাই; ঐ তরঙ্গের মধ্যেই সাহসে বুক বাঁধিয়া তোমাকে অপর পারের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে; নতুবা আর তোমার অন্য গতি নাই, পার হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এইরূপ পথিকের গল্প শুনিয়া আমরা পরিহাস করি, আমরা বিদ্রূপ করি, আমরা ইহা একান্তই গল্প বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেই; অথচ আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই এইরূপ বিষয় সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হয়। জীবনের উষাকালে যখন ভগবানের কৃপায় মন একটু জাগ্রত হইল, গতানুগতিকের পথ পরিত্যাগ করিয়া একটু ঈশ্বরের পথে চলিবার ইচ্ছা হইল, সুষুপ্ত প্রাণ একটু ঈশ্বরের নামে জাগিয়া উঠিল, ধর্ম্মপথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা হইল; সম্মুখে কত বাধা উপস্থিত; কত নদী, কত পর্ব্বত, কত বন জঙ্গল অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। উপাসনা করিতে যাই, চারিদিকে বাধা পাই, সত্য যাহা বুঝিয়াছি তদনুসারে কার্য্য করিতে যাই, পিতামাতা বাধা দেন, আত্মীয় স্বজন বাধা দেন, বন্ধুবান্ধব বাধা দেন, সমাজপতি প্রতিরোধ করেন; তখন পড়া শুনার সময়, পরীক্ষা পাশ করিতে হইবে, দিনরাত্রি খাটিতে হয়, অকৃতকার্য্য হইলে জীবন যে বৃথা যাইবে। ধর্ম্মসাধনে, সত্য অনুসরণে, স্বাধীন ভাবে চলিতে কত বাধা, কত বিঘ্ন; নদীর কূলে দাঁড়াইয়া ভাবিলাম, এই স্রোত যখন চলিয়া চলিয়া শেষ হইবে, তখন পার হইব; পড়া শুনা শেষ হউক, স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জনে সক্ষম হই, বয়স বাড়ুক, সমাজে আমারও একটা স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার অধিকার জন্মাক, তখন ধর্ম্মসাধন করিব, বাধা বিঘ্ন থাকিবে না, কাহারও ভয় থাকিবে না, পড়া শুনার পরীক্ষা পাশের চিন্তা থাকিবে না, পিতামাতা আত্মীয় স্বজন তখন বাধা দিতে সাহস করিবেন না। পড়া সাঙ্গ হলো, পরীক্ষায় পাশ হওয়া গেল, স্বাধীন ভাবে চলিবার সুবিধা হলো, পিতামাতা, আত্মীয় স্বজনও দেখিলেন, এখন ছেলে বড় হইয়াছে, স্বাধীন ভাবে চলুক, তাঁরা এসে সন্ধি করিলেন; সমাজও ত কোনও কার্য্যে বাধা জন্মায় না; কিন্তু তবুও যে পার হইতে পারিতেছি না, তবুও যে সাধন পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না; আজ অর্থচিন্তা, কাল আত্মীয়ের ব্যারাম, আজ খাটিতে খাটিতে ক্লান্ত হইয়াছি, কাল এখানে পার্টি আছে, ওখানে সভাসমিতি আছে; আজ অসুখ, কাল শোকের তাড়না; এ যে সম্মুখে প্রবল তরঙ্গ, বিস্তৃত নদী; আবার মনে হইল, স্রোত চলিয়া যাউক তবে পার হইব।

জীবনপথে চলিতে চলিতে কত বাধা বিঘ্ন, কত কাজের পর কাজ, কত শোকের পর শোক, কত সংগ্রাম, কত বেদনা, কত ব্যর্থমনোরথ, কত আকাঙ্ক্ষা; কতরূপ চিত্তবিক্ষোভ; চারিদিক্ হইতে যেন নানা প্রকার কর্ম্ম আসিয়া টানিতেছে, একটু স্থির হইয়া বসিতে পারি না; আজ একটা কাজ শেষ হইল, কাল আর একটা কাজ আসিল; আজ একজন আরোগ্য হইল, কাল আর একজন রোগশয্যায় শায়িত হইলেন; আজ একজনের শোকাশ্রু মুছিয়া উঠিলাম, কাল আর একজনের ডাক আসিল; এইরূপ কর্ম্মের পর কর্ম্ম, শোকের পর শোক, সংগ্রামের পর সংগ্রাম একটু স্থির ভাবে বসিবার অবকাশ নাই, একটু চিত্ত স্থির করিতে পারি না, সাধনা করিব কখন্। তখন আবার ভাবি, এই স্রোতের কি অবসান হইবে না? নদীকূলে দণ্ডায়মান হইয়া ভাবি, ঐ যে কুলকুলু ধ্বনিতে নদীপ্রবাহ চলিতেছে, ঐ ধ্বনির কি শেষ নাই, ঐ প্রবাহের কি অবসান হবে না? হায় রে! তবে কেমন করিয়া পার হই? এই ভাবিতে ভাবিতেই অনেকের জীবনের সন্ধ্যা আসিল, পার হওয়া আর হইল না, সাধনে মন আর বসিল না। ভাবিতে ভাবিতে, সংকল্প করিতে করিতে, অনুতাপের অশ্রু ফেলিতে ফেলিতেই অনেকের জীবন কাটিয়া গেল। কেহ বা, আর পার হইতে না পারিয়া, দূর্ ছাই বলিয়া এ পথই পরিত্যাগ করিলেন; ফিরিয়া গতানুগতিকের পথে চলিলেন; কেহ বা সমস্ত প্রলোভন হইতে মুক্ত হইবার জন্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া, স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়

স্বজনের স্নেহ মমতা ভালবাসা বিসর্জ্জন করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন। সেখানেও কি নিষ্কৃতি আছে? সকলের কথা বলিতেছি না, অনেকেই সেখানে যাইয়াও আবার মাকড়সার জাল পাতিলেন, ক্ষুদ্রতাকে বরণ করিয়া লইলেন, ক্ষুদ্র সংসারের ক্ষুদ্র স্বার্থ চিন্তাতে মজিলেন।

জীবনটি বড়ই জটিল; মনে করিও না সকল সংগ্রাম থামিয়া যাইবে, সকল বাধা বিঘ্ন সরিয়া যাইবে, সকল সুখ দুঃখ, পাপ প্রলোভন চলিয়া যাইবে, চারিদিকে অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইবে, আর তুমি বেশ হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইবে; মনে করিও না, নদীর প্রবল প্রবাহ সরিয়া যাইবে, তার পর তুমি নির্ভয়ে অবাধে পার হইয়া যাইবে; না, তা নয়; ভগবানের সে বিধান নয়; এই তুমি, আর ঐ তোমার সাধনার লক্ষ্য, তুমি সহজে এখান হইতে ওখানে গেলে, তাত নয়। সাধনার লক্ষ্য, ধর্ম্ম-জীবন লাভ একটা স্বতন্ত্র বস্তু নয়; এই যে সুখদুঃখময় জীবন, এই যে আশা নিরাশাময় জীবন, এই যে হর্ষবিষাদময় জীবন, এই যে পাপ পুণ্যময় জীবন, এই যে রোগশোক-তাপ বেদনাময় জীবন, এই যে সংশয় সমস্যাময় জীবন, ইহাকেই ত ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, ইহাকেই ত ঈশ্বরাভিমুখী করিতে হইবে, ইহাকেই ত পুণ্যের সৌরভে আমোদিত করিতে হইবে। ঐ যে বীজটি যাহা হইতে সুন্দর পত্রপুষ্প ফল-সমন্বিত বৃক্ষটি উঠিবে, উহাকে প্রথমতঃ মাটির নীচে পুতিতে হয়; মাটির সহিত সংগ্রাম করিয়া, মাটি ভেদ করিয়া তাহাকে বাহির হইতে হয়; এখানে তাপ, জল বায়ুর সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হয়, তাহাদিগের সাহায্য লইতে হয়, তবে ত বৃক্ষজীবনের পরিণতি, তবে ত বীজ ফলফুলপত্র-শাখাপ্রশাখা-সমন্বিত বৃক্ষে পরিণত হয়। মানবজীবনও সেই-রূপই; ইহাকে সুখ দুঃখ হইতে, হর্ষ বেদনা হইতে, ঘাত প্রতিঘাত হইতে, সংশয় সমস্যা হইতে, বিভিন্ন পথগামী কর্ত্তব্যের ডাক হইতে পৃথক্ করা যায় না; জীবনে অবস্থার পর অবস্থা আসে, তাহার মধ্য দিয়াই জীবনকে গঠন করিতে হইবে, জীবনের মধ্যে নিহিত মহত্বের বীজকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, জ্ঞান প্রেম পুণ্যকে অভিব্যক্ত করিয়া অনন্তের অভিমুখীন্ করিতে হইবে, ইহার মধ্য দিয়াই জীবনকে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হইবে। ধর্ম্মকে abstract ভাবে দেখিলে চলিবে না; ধর্ম্ম concrete; জীবন নানা অবস্থার ভিতর দিয়া সেই concrete spiritualism —জীবন্ত ধর্ম্ম লাভ করিবে, ইহাই বর্ত্তমান যুগে ধর্ম্মের আদর্শ।

প্রবল তরঙ্গস্রোতে অনেক নৌকা ডুবিয়া যায়; তাহা দেখিয়া কে সাহস করিয়া নদীতে নৌকা ভাসাইতে পারে? কিন্তু এক রকম নৌকা আছে, তাহা জলে ডোবে না; তরঙ্গের আঘাতে তাহা সময় সময় উলট পালট হয় বটে, কিন্তু সে নৌকা জলমগ্ন হয় না। অনেকে সেই নৌকাতে প্রবল বাত্যার সময়ও নদী পার হয়; সেই নৌকার উপর যখন তরঙ্গের আঘাত বার বার পড়িতে থাকে, যখন নৌকা উলট পালট হইতে থাকে তখন নৌকাখানিকে শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকিতে হয়; নৌকা-খানিকে জড়াইয়া ধরিতে হয়; আর সকল ছাড়িয়া ঐ নৌকা-খানিকে শক্ত করিয়া বক্ষ দিয়া, হাত দিয়া, পা দিয়া জড়াইয়া ধরিতে হয়; তবেই জীবন বাঁচিয়া যায়; তরঙ্গাঘাতে মানুষকে স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে না। জীবনপথে চলিতে চলিতে, সাধনপথে অগ্রসর হইতে হইলেও বিপুল তরঙ্গের মধ্যে ঐরূপ একখানা তরণীকে শক্ত করিয়া ধরিতে হয়; সব চলিয়া যাউক কিন্তু তাহাকে ছাড়িব না, এই প্রতিজ্ঞা লইয়া ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ঋষিরা বলিয়াছেন,—

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ঃ বিত্তাৎ
প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ তদন্তরতমং যদয়মাত্মা।

এই যে অন্তরতর, অন্তরতম পরমাত্মা, ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, অন্য সকল হইতে প্রিয়।

এই যে পরমাত্মা যিনি সকল প্রিয় হইতে প্রিয় তাঁহাকে ধরিয়া থাকিতে হইবে, তাঁহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিতে হইবে, আর সকল থাক্ আর যাক্, তাঁকে লইয়া আছি, এই ভাবে অগ্রসর হইতে হইবে। মানুষ নানা ফুলের মালা গাঁথিয়া থাকে; জাতী যুঁই শেফালিকা কত ফুল সংগ্রহ করে; কিন্তু তাহার ভিতরে একগাছি সূত্র থাকে; ঐ সূত্র ছিঁড়িয়া ফেল ফুলগুলি ছড়াইয়া পড়িবে; জীবনে নানা ঘটনা আসে, নানা সুখ দুঃখ আসে, অনেক সময় অনেক সংশয় আসে, সমস্যা আসে, দশদিকে দশটা কর্ত্তব্য আহ্বান করে, কিন্তু তাহার মধ্যে এই সকল ল'য়ে—মালা গাঁথিতে হইলে একগাছি সূত্র চাই; ঐ প্রিয়তমের প্রতি যে প্রেম, ঐ প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি যে গভীর ভালবাসা, তাহাই সূত্রস্বরূপ হইয়া সকলকে একগাছি মালাতে পরিণত করিবে।

ভগবানের বিধানই এই যে, জীবন সহজ সরল ভাবে চলিবে না; জীবন জটিলতাময়, জীবন ঘটনাবহুল; সংগ্রাম করিয়া মানুষকে জীবনের বৃত্তিগুলি ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, সংগ্রাম করিয়া মানুষকে দেবত্বের পথে, স্বর্গরাজ্যের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

ধর্ম্মজীবন যখন আরম্ভ করিয়াছিলাম, তখন বেশ ভাল লাগিত, সহজেই অনেক পাপের হাত হইতে উদ্ধার পাইলাম, সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন উপাসনা কত ভাল লাগিত; লোকেও কত প্রশংসা করিত; তখন ভাবিতাম, এইরূপ হাসিয়া খেলিয়া নাচিয়া গাহিয়া, সহজ ও সরল ভাবেই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইব—কিন্তু তা ত হইল না; এখন দেখি জীবনে কত সংগ্রাম, কত কণ্টকাকীর্ণ পথ বাহিয়া চলিতে হয়, দেহ রক্তাক্ত করিতে হয়; কত ব্যথা, কত বেদনা; এক এক সময় মনে হয়, আর নয়, এ পথ যদি এতই জটিল হয়, তবে ফিরিয়া যাই। বঙ্কিম বাবুর একটি সঙ্গীত আছে; তাহা পার্থিব অর্থেই লিখিত হইয়াছিল; কিন্তু ধর্ম্মজীবনের এই অবস্থাটি সেই সঙ্গীতদ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায়—

সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে,
কে আছে কাণ্ডারী হেন কে যাইবে সঙ্গে?
ভাস্‌ল তরী সকাল বেলা, ভাবিলাম এ জলখেলা,
মধুর বহিবে বায়ু ভেসে যাব রঙ্গে।
গগনে গরজে ঘন, বহে ঘন সমীরণ,
কূল ত্যজি এলাম কেন মরিতে আতঙ্কে।
মনে করি কূলে ফিরি, বাহি তরী ধীরি ধীরি,
কূলেতে কণ্টকতরু বেষ্টিত ভুজঙ্গে।
যাঁহারে কাণ্ডারী করি, সাজাইয়া দিনু তরী,
সে কভু দিল না পদ তরণীর অঙ্গে।

জীবনের উষাকালে জীবনতরণী অনুকূল বায়ুতে ধর্ম্মপ্রবাহে ছাড়িয়া দিলাম; ভাবিলাম, এই ভাবে আনন্দে বিনা বাধা বিঘ্নেই চলিয়া যাইব; কিন্তু এখন দেখি জীবন জটিল, আকাশে মেঘ, ঝড় ঝঞ্ঝাবাত, কত বিপদ্ কত পরীক্ষা; এক একবার মনে হয়, আর দশজনে কেমন সুখে আছে, আমি যাই, ফিরিয়া সংসারে যাই; কিন্তু আদর্শ বড় হইয়াছে, দৃষ্টি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা ত আর ভাল লাগে না। যাঁহাকে কাণ্ডারী করিয়া জীবন তরণী ছাড়িয়া দিলাম, কই, তিনি ত এলেন না।

এই ভাব অনেকের মনে আসে; কিন্তু জীবনের এই যে জটিলতা, এই যে ঘটনাবহুলতা, এই যে সুখ দুঃখ, এই যে ঘাতপ্রতিঘাত প্রবল তরঙ্গ, ইহা দেখিয়া ভয় পাইলে হইবে না। ধর্ম্ম ত abstract কিছু নয়; জীবন ছাড়িয়া ত ধর্ম্ম নয়; এই সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ জড়িত যে জীবন, এই জীবনকেই গড়াইয়া ফুটাইয়া তুলিতে হইবে; ঈশ্বর ভক্তির সূত্রদ্বারা এই ঘটনা-বলীকে মালা রূপে গাঁথিতে হইবে; সমগ্র জীবন অর্ঘ্যরূপে তাঁর চরণে সমর্পণ করিতে হইবে।

জীবনে সুখ আছে, দুঃখ আছে, শোক আছে, আনন্দ আছে, সংগ্রাম আছে, পরীক্ষা আছে, তা ত অস্বীকার করিলে চলিবে না। তোমাকে অন্নসংস্থানের জন্য রাত্রিদিন পরিশ্রম করিতে হইতেছে, মাথার ঘাম পায় ফেলিতে হইতেছে; গৃহে পরিবারে কত নূতন নূতন সমস্যা উঠিতেছে; তুমি যে ভাবে পরিবার গঠন করিতে চাও, সে ভাবে স্ত্রী পুত্র কন্যা গড়িয়া উঠিতেছে না; তুমি যাহার উপর যে ভার দাও, তাহা সে গ্রহণ করে না, সংসারে কত লোকের সঙ্গে তোমার মিশিতে হয়, কারবার করিতে হয়, আলাপ পরিচয় করিতে হয়; স্বার্থ সম্বন্ধ—নিঃস্বার্থ সম্বন্ধ হয়; কত সময়ে লোকের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইতে হয়; লোকে তোমার অবস্থা বোঝে না, কত রকমে এসে বিরক্ত করে, ক্রোধের কারণ জন্মাইয়া দেয়, সময়ে অসময়ে আসিয়া বিরক্ত করে; কত রোগ শোকে প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়ে, আপনার জন পর হইয়া যায়; একজনের পর আর একজন রোগশয্যায় শায়িত হয়; একজনের মৃত্যুজনিত অশ্রুজল মুছিতে না মুছিতে আর একজনের ডাক আসে, প্রিয়জন—যাহাকে প্রাণের মত ভালবাস, সেও পর হইয়া যায়, বিগড়িয়া যায়, প্রাণে কত ব্যথা দেয়; কেবল যে দুঃখ ক্লেশ বিপদই আসে তা ত নয়; কত সময় কত প্রশ্ন আসে, সমস্যা আসে, দশদিকে দশটা কর্ত্তব্য আকর্ষণ করে, কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারি না; সম্পদ্ বিপদ্ সকলই ত মনকে বিক্ষিপ্ত করে; কোন্ পথে চলিব স্থির করিতে পারি না; কত সংগ্রাম, কত পরীক্ষা, কত প্রলোভন; ইহার মধ্যেই তোমাকে আমাকে সকলকে ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে। ভগবান্ এই সকলের ভিতর দিয়াই তোমাকে ফুটাইয়া তুলিবেন।

তোমার একটিমাত্র মন্ত্র আছে, একটিমাত্র স্পর্শমণি আছে তাহা দিয়া গতি নির্ণয় করিবে। যিনি বিত্ত হইতে প্রিয়, পুত্র হইতে প্রিয়, সকল পদার্থ হইতে প্রিয়, তুমি তাঁহাতে আত্মসমর্পণ কর; তাঁহার কাছে পরামর্শ জিজ্ঞাসা কর, তাঁহার দিকে তাকাইয়া চল; চলিতে ফিরিতে তাঁহার নাম কর; সজনে নির্জ্জনে যখনই সময় পাও, তাঁহাতে আত্মসমাধান কর; চলিতে চলিতে তাঁহার নিকট প্রার্থনা কর। তোমার অনেক কাজ আছে; একটুও সময় পাও না, একটু বসিবার সময় নাই; আচ্ছা, গভীর রাত্রিতে একটু সময় পাও ত; খুব ভোরে একটু সময় পাও ত? তখন ব্যাকুল প্রাণে তাঁহার চরণে বস; হাঁটিতে চলিতে কত কি ভাব, কত কল্পনা জল্পনা কর; তখন তাঁহার নাম জপ কর, গুন্ গুন্ স্বরে তাঁহার নাম গান কর। প্রাণের দুঃখ বেদনা, সংগ্রামের কথা তাঁহাকে জানাও, আর পারি না বলে, তাঁহাতে জীবন অর্পণ কর, দেখিবে, তোমার প্রাণ সরস হইবে, সকল কাঁটা ফুল হয়ে ফুটে উঠবে, সকল বেদনা, সকল পরীক্ষার মধ্যে তাঁহার স্পর্শ পাইবে, তাঁহার বাণী শুনিয়া কৃতার্থ হইবে। তখন দেখিবে, তিনি দুঃখের বেশে তোমার নিকট এসেছেন, মৃত্যুর ছায়ার ভিতরে তোমাকে আসিয়া স্পর্শ করিয়াছেন; সংগ্রামের ভিতরে মাভৈঃ বাণী শুনাইতেছেন; জীবনের অন্ধকার পথে "ভয় পাইও না, আমি সঙ্গে আছি!" বলিয়া অভয় দিতেছেন, প্রাণে আশা জাগাইতেছেন। জীবনের গভীর সমস্যার সময়, যখন কোন্ পথে চলিবে স্থির করিতে পারিতেছ না, দশ রকম কর্ত্তব্য দশ দিক্ হইতে টানিতেছে, তখন তিনিই পথ দেখাইয়া দিবেন, অন্ধকারের মধ্যে আলো ধরিয়া চলিবেন, প্রবল তরঙ্গের মধ্যে ভেলা হইয়া তোমাকে রক্ষা করিবেন। এ জীবন তাঁহারই লীলাক্ষেত্র; জীবনের ঘটনাবলী, সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদ, আশা নিরাশা, সংগ্রাম পরীক্ষা, বিভিন্ন কর্ত্তব্য, সংশয় সমস্যা তাঁহারই আশীর্ব্বাদ; তিনি এই সকলের ভিতর দিয়াই তোমাকে তাঁহার পথে লইয়া যাইতেছেন।

তুমি ত জীবনকে ফুটাইয়া তুলিতে চাও? তুমি ধৈর্য্যশালী হইতে চাও? যদি লোকে আসিয়া সময়ে অসময়ে বিরক্ত না করে, তবে তুমি ধৈর্য্য শিক্ষা কিরূপে করিবে? তুমি ত অক্রোধ হইতে চাও? লোকে আসিয়া যদি তোমার ক্রোধের কারণ না জন্মায় তবে তুমি অক্রোধ হবে কি করে? তুমি ত ক্ষমাশীল হইতে চাও? লোকে যদি তোমার অনিষ্ট না করে তবে ক্ষমা শিক্ষা করিবে কিরূপে, তোমার মনে ক্ষমাগুণ ফুটিয়া উঠিবে কিরূপে? তুমি প্রেম চাও? লোকের প্রতি ভালবাসা বিস্তার করিতে চাও? তুমি যাকে ভালবাস সেও যদি তোমাকে ভালবাসে, তবে ত প্রকৃত প্রেম শিক্ষা হবে না; যেখানে ভালবাসার পরিবর্ত্তে উপেক্ষা, ইষ্টের পরিবর্ত্তে অনিষ্ট প্রাপ্ত হইবে, সেখানে যদি ভালবাসিতে পার, তবেই ত প্রকৃত প্রেম লাভ হইল; যে তোমাকে আঘাত করিতে আসে তাকে যদি আলিঙ্গন করিতে পার, যে তোমাকে বেদনা দেয়, তার যদি মঙ্গল চিন্তা, মঙ্গল চেষ্টা করিতে পার, যে তোমার নিন্দা করে, তার প্রতি যদি শ্রদ্ধা রাখিতে পার, শতমুখে তাহার প্রশংসা কর, তবেই ত তোমার প্রেমশিক্ষা হইবে। যদি শোকের মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছাতে বিশ্বাস রাখিতে পার, যদি পরীক্ষার মধ্যে, বিপদের মধ্যে তাঁহাতে নির্ভর করিতে পার, তবেই ত তোমার ধর্ম্মজীবন গঠিত হইল।

সেই জন্য বলি, এই জীবনপথে চলিতে চলিতে যে সকল সংগ্রাম পরীক্ষা আসে, দুঃখ ক্লেশ আসে, বাধা বিঘ্ন আসে, অপমান নির্য্যাতন আসে, বেদনা নির্ম্মম ব্যবহার আসে, সংশয় সমস্যা আসে,

কর্ত্তব্যের ডাক আসে, তাহার মধ্য দিয়াই ভগবান্ আমাদিগকে গড়াইয়া তোলেন; জীবন—সমগ্র জীবন লইয়া ধর্ম্ম, জীবনকে কাটিয়া ছাটিয়া পৃথক্ ভাবে দেখিতে পারা যায় না। কেবল কি তাহাই? ভগবান্ কখন হৃদয় স্পর্শ করেন? সুখের সময়, সম্পদের সময়, মিলনের সময়, আনন্দের সময় তাঁহাকে ত ভুলিয়া যাই; যখন দুঃখ বিপদ্ আসে, যখন প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়ে; যখন পরীক্ষা প্রলোভন আসে, যখন শোকাশ্রুতে বক্ষ প্লাবিত হয়, যখন বেদনায় অস্থির হই, আর গতি নাই, আর কূল কিনারা দেখি না, যখন নানা প্রকার কর্ত্তব্যের ডাক আসে, যখন নানা প্রকার সমস্যা আসে, তখনই দেখি তাঁহার দিকে তাকাই আর তিনি এসে প্রাণ স্পর্শ করিতেছেন, সান্ত্বনা দিতেছেন, চক্ষের জল মুছাইতেছেন; অন্ধকারে তিনিই আলোক হইয়া আছেন, নিরাশার সময় তিনিই আশা দিতেছেন, বেদনায় তিনিই হাত বুলাইতেছেন; পাপের সংগ্রামে তিনিই হাত ধরিয়া তুলিতেছেন, জীবনসমস্যার পথ দেখাইয়া দিতেছেন; সেই জন্যই বলি, জীবনের জটিলতাকে দূর করিতে চাহিও না; এই জটিল জীবন, এই সুখ দুঃখময় জীবন, এই পরীক্ষা প্রলোভনময় জীবন, এই সংশয় সমস্যাময় জীবন, হর্ষ বিষাদময় জীবন, এই আশা নিরাশাময় জীবন, এই জীবনই ধর্ম্মসাধনের ক্ষেত্র, ধর্ম্মসাধনের সহায়; এই জটিলতার মধ্য দিয়াই অমৃতধামের যাত্রী সকল অগ্রসর হইবে। তবে সেই পুত্র হইতে প্রিয় যিনি, বিত্ত হইতে প্রিয় যিনি, সকল বস্তু হইতে প্রিয় যিনি, তাঁহাকে জীবনের সূত্র করিয়া, তাঁহাকে জীবনের কেন্দ্র করিয়া, তাঁহাতে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া, তাঁহার গান গাহিতে গাহিতে, তাঁহার নাম করিতে করিতে, তাঁহাতে জীবন মন দান করিতে করিতে, তাঁহার চরণে অশ্রুপাত করিতে করিতে, তাঁহাকে প্রাণের বেদনা প্রাণের সংগ্রাম বলিতে বলিতে, অগ্রসর হও; দেখিবে, জীবনের দেবতা তিনি, দেখিবে, জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তিনি; দেখিবে, তিনিই তোমার জীবনের স্বামী হয়ে আছেন; দেখিবে প্রতি ঘটনাতে তিনিই হাত ধরিয়া তোমাকে লইয়া যাইতেছেন; দেখিবে, তিনিই সুখে দুঃখে আপনার হইয়া আছেন; দেখিবে প্রতি দৃশ্যে তিনি, প্রতি বাণীতে তিনি, প্রতি গন্ধে তিনি, প্রতি আস্বাদে তিনি। অন্তরে চাহিয়া দেখ, হৃদয়নাথ রূপে তিনি আছেন; বাহিরে চাহিয়া দেখ, জড়ের জড়ত্ব চলিয়া গিয়াছে; প্রতি বৃক্ষ লতা, প্রতি পর্ব্বত নদী, প্রতি পত্র পুষ্প, তাঁহারই প্রকাশ; জড় নাই, চেতন নাই, কেবল তিনি; মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে তিনি, মানুষের হাসিতে তিনি, ক্রন্দনে তিনি, হাস্য পরিহাসে তিনি, ফুলে ফলে গানে গন্ধে, আলাপে ব্যবহারে সর্ব্বত্র তিনি; জীবন তাঁতে পূর্ণ, বাহির তাঁহার প্রকাশে পূর্ণ।

সেই জন্যই বলি, এই জীবনের সুখ দুঃখ, প্রলোভন পরীক্ষা, হর্ষ বিষাদের অতীত স্থানে ধর্ম্ম নহে; জলস্রোত চলিয়া গেলে পার হইতে হইবে না; তাঁহার নামের তরণীতে প্রবল স্রোতের মধ্য দিয়া চলিয়া যাও; এই তরণী ডোবে না; এই তরণী শক্ত করিয়া ধর, বুক দিয়া ধর, উলট পালটেও তুমি ডুবিবে না। দুঃখ বিপদ্, শোক তাপ, বেদনা সকলের মধ্য দিয়া, সকলের সাহায্যে তুমি অমৃত জীবন লাভ করিবে; "রিপু-পরিচারিকাদল, আনন্দে মিলি সকল, প্রতিদিন করিবে তোমার পূজার আয়োজন।" তাঁহাকে ধরিয়া থাক, সকল অবস্থাতে সজনে নির্জ্জনে, তাঁহার নাম কর, দৃষ্টি পরিবর্ত্তিত হইবে, হৃদয় প্রশস্ত হইবে, জীবনের ক্ষুদ্র বড় সকল ঘটনা, সকল অবস্থা জীবন বিকাশের, ধর্ম্মসাধনের সহায় হইবে। তিনি যে এই সকলের ভিতর দিয়াই তোমাকে আমাকে সকলকে ফুটাইয়া তোলেন; তিনি যে দুঃখের বেশেই অনেক সময় প্রাণের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হন; তিনি যে ব্যর্থ-মনোরথের গভীর বেদনার মধ্যেই প্রাণমন স্পর্শ করেন।

জীবনকে তুচ্ছ করিও না; অতীত জীবনের সুখ দুঃখ তোমার ভবিষ্যৎ জীবন গঠন করিবে; জীবনের একটি ঘটনাও তুচ্ছ নয়, একটি সমস্যা, একটি সংশয়ও বৃথা আসে না, একবিন্দু অশ্রুজলও বিফলে যায় না; একটা দীর্ঘশ্বাসেরও মূল্য আছে; তাঁহার প্রেমে সিক্ত চক্ষুতে জীবনের ঘটনাবলী দর্শন কর; তাঁহাতে মন রাখিয়া প্রাণ সমাধান করিয়া জীবনের ঘটনা পাঠ কর; বাহিরের প্রকৃতির দিকে তাকাও, দেখিবে, তিনি অন্তর বাহির পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন; দেখিবে, তাঁহার সৌন্দর্য্যে জগৎ উদ্ভাসিত, দেখিবে, তিনি সকল দেশ পূর্ণ করিয়া সৌন্দর্য্য ছড়াইতেছেন, দেখিবে, তিনিই তোমার দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া দিতেছেন, দেখিবে, তিনিই তোমার জীবনের প্রভু হইয়া রহিয়াছেন, দেখিবে, তিনিই তোমার প্রতি পাদবিক্ষেপে সঙ্গে রহিয়াছেন, দেখিবে, তিনিই সাক্ষাৎ ভাবে তোমার হাত ধরিয়া সকল ঘটনার মধ্য দিয়া সকল ঘটনাকে পূত পবিত্র করিয়া লইয়া চলিয়াছেন। তবে জীবনের ঘটনা দেখিয়া, পরীক্ষা দেখিয়া, সংগ্রাম দেখিয়া, দুঃখ শোক বেদনা দেখিয়া ভয় পাইও না। এই জটিলতাময় জীবনের মধ্যেই ধর্ম্ম-সাধন করিতে হইবে; তাঁহাতে আত্মমন সমর্পণ কর, জীবন গড়িয়া উঠিবে, অমৃত পুরুষকে লাভ করিবে।

পরলোকগতা নির্ম্মলা দেবী।

(ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেন কর্ত্তৃক শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত)

গত ২২এ ফাল্গুন, ঢাকা হিন্দুবিধবা আশ্রমের অন্যতম স্থাপয়িত্রী ও ভূতপূর্ব্ব তত্ত্বাবধায়িকা আমার পরমারাধ্যা দিদি নির্ম্মলা দাস ৪২ বৎসর বয়সে অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি জনসাধারণের নিকটে তেমন সুপরিচিতা না হইলেও যাঁহারা তাঁহাকে জানিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাঁহারা জানিতেন এমন শক্তিশালিনী, ধর্ম্মশীলা কর্ম্মিষ্ঠা তেজস্বিনী নারী দুর্লভ। ধর্ম্ম ও কর্ম্ম এই মহীয়সী নারীজীবনে আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছিল। ৪২ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুপরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া সাধারণ বাঙ্গালা লেখাপড়ামাত্র শিখিয়া বালবিধবা হইয়া একমাত্র নিজের অসাধারণ শক্তিতে তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তিনি তাঁহার প্রতি সৎকর্ম্মে ও শুভচেষ্টায় তাঁহার সমাজ হইতে বাধা পাইয়াছেন; নিন্দা কুৎসারও অভাব হয় নাই। সমাজ যদি তাঁহাকে দলিয়া পিশিয়া চাপিয়া না রাখিত, তিনি যদি উপযুক্ত শিক্ষা ও সহানুভূতি লাভ করিতেন, তাহা হইলে এই পুষ্পসৌরভে সমগ্র দেশ আমোদিত ও উপকৃত হইতে পারিত।

নির্ম্মলা দাসগুপ্ত ময়মনসিংহ অষ্টগ্রাম নিবাসী ৺হরিশ্চন্দ্র

সেন সব্-জজ মহাশয়ের কন্যা। ১১ বৎসর বয়সে ব্রাহ্মণবাড়িয়া চেলিখোলা নিবাসী ৺ভগবান্‌চন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৫ বৎসর বয়সে স্বামীকে হারাইয়া তিনি পিতৃগৃহে আসেন। শৈশবেই তিনি স্বল্পভাষিণী, স্থির ও নিতান্ত সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন; শৈশবের চঞ্চলতা, দুষ্টামি ও আব্দার তাঁহাতে ছিল না। এইজন্য অনেকে তাঁহাকে সোজা বা বোকা বলিয়া ভাবিতেন; কিন্তু এই মেয়ের ভিতর যে কি তেজ ও দৃঢ়তা ছিল তাহা তাঁহার বৈধব্যের পরই প্রকাশিত হয়। পিতা স্নেহময়ী বালিকার বৈধব্য বেশ ও মূর্ত্তি এবং কৃচ্ছ্রতা সাধন দেখিয়া কন্যাকে কোন কোন বিষয়ে নিবৃত্ত করিবার জন্য কত অনুরোধ করিয়াছেন, কত চোখের জল ফেলিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম পালন হইতে এক তিলও বিচলিত করিতে পারেন নাই। বিশেষ বিশেষ দিনে তিনি দ্বার রুদ্ধ করিয়া পরলোকগত স্বামীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেই দ্বার কেহ খুলিতে পারিত না। ১৫।১৬ বৎসরের বালিকার সেই একাগ্র দৃঢ় সাধনা দেখিয়া পিতামাতাও জল গ্রহণ না করিয়া কত দিবস কাটাইয়াছেন, কিন্তু বালিকা স্বীয় সঙ্কল্পে অচলা! স্বামীর চিতা বক্ষে জ্বালাইয়া রাখিয়া এইরূপ শোকতাপের মধ্যে তিনি হঠাৎ যেন শান্তির পথ, মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাইলেন। মঙ্গলময় অদৃশ্য পুরুষ তাঁহার আত্মার শান্তির জন্য কর্ম্মের পথ দেখাইয়া দিলেন। সেই হইতে বাহিরে আর শোকের কোন প্রকাশ রহিল না। নিজের শিক্ষার উন্নতি, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, পিতৃগৃহে সর্ব্ববিধ কাজ কর্ম্ম, দীন আত্মীয় স্বজন প্রতিবেশীর সেবা ও সাহায্য, এই সময়ে তাঁহার দৈনিক কার্য্য হইল। তাঁহার পিতৃদেব যখন একে একে চারিটি পুত্র সন্তান হারাইয়া শোকাতুরা পত্নী ও সাত বৎসরবয়স্ক একমাত্র পুত্র রাখিয়া পরলোক যাত্রা করিলেন, তখন ২৪ বৎসর বয়সের এই নারী পিতৃসংসারের কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিলেন। এমন সুচারুরূপে তিনি পিতৃসম্পত্তির শাসন সংরক্ষণ করিতে লাগিলেন যে, তাহা বিষয়াভিজ্ঞ পুরুষেরও সাধ্যাতীত। তিনি বাহিরের কাহারও নিকট পরামর্শ বা সাহায্য গ্রহণ করিলেন না। তাঁহার হাতে পিতৃপরিবারের সম্মান ও সুনাম অক্ষুন্ন রহিল।

এই সময়ে তিনি কতজনের কত ভাবে উপকার করিয়াছেন তাহা বলিবার নহে। কোন দরিদ্র বিধবার খাইবার সংস্থান নাই, তাঁহাকে মাসিক সাহায্য করিয়াছেন। যাহার সমস্ত অভাব নিজে দূর করিতে পারেন নাই আত্মীয় স্বজনের নিকট যাইয়া বা চিঠি লিখিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। বর্ষাকালে কোন স্ত্রীলোককে ভগ্নগৃহে সন্তানগণ সহ ভিজিয়া কষ্ট পাইতে দেখিলে, অমনি তাহাকে টিনের ঘর করিয়া দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাহার স্বামী মাতাল, টাকা হাতে পড়িলে ব্যয় করিয়া ফেলিবে; সেই জন্য নিজে লোক নিযুক্ত করিয়া সমস্ত চোখের সম্মুখে সম্পন্ন করাইয়াছেন। কোন ভদ্র সন্তান খরচের অভাবে পড়িতে না পারিয়া গ্রামে থাকিয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তিনি তাহাকে সহরে কোন অবস্থাপন্ন আত্মীয়ের নিকট থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক বিষয়ে তাঁহার আশ্চর্য্য দৃষ্টি ছিল। তিনি প্রত্যেক বিষয়ের ব্যবস্থা এমন সুন্দর ভাবে ও সহজে করিতেন যে, দেখিলে অবাক হইতে হইত। ভাইয়ের শিক্ষার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। পড়া ও লেখার নিয়মের তিলমাত্র ব্যতিক্রম হইবার উপায় ছিল না। পড়া শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন মতেই তাহার বিবাহ দিতে সম্মত হন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা হইয়া গেলে পর তাঁহার বিবাহ দেন। তাঁহাকে তাঁহার সঙ্কল্প হইতে কখনো বিচ্যুত হইতে দেখি নাই।

সম্ভবতঃ যখন ১৯০৭ সালে দুর্ভিক্ষ ভীষণ মূর্ত্তিতে বঙ্গদেশ আক্রমণ করে। নির্ম্মলা দেবী তখন স্থির থাকিতে পারিলেন না, ভিক্ষার ঝুলি লইয়া মাতার চরণে প্রণাম করিয়া ভিক্ষায় বাহির হইলেন। মাতা তাঁহাকে ২০টি টাকা দিলেন, তৎপরে তিনি গ্রামের গৃহে গৃহে যাইয়া অর্থ ও বস্ত্র সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁহার আত্মীয়দিগকে চিঠি লিখিয়া অর্থ সংগ্রহের জন্য উদ্বোধিত করিলেন। এই ভাবে তিনি যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিয়া বরিশালে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের নিকট ও অন্যান্য স্থানে প্রেরণ করেন।

এই সময়ে "ভারত-মহিলা"র সম্পাদিকা শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা সরযুবালা দত্ত ও তাঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। তাঁহারা নিঃসহায় হিন্দুবিধবাদের শিক্ষা আত্মোন্নতি ও জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য একটি আশ্রমের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া তাহা স্থাপনের সঙ্কল্প হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলেন। কিন্তু এই সকল মেয়েদের সর্ব্ববিধ দায়িত্ব ও ভার নিয়া থাকিতে পারে, এমন একটি প্রাণ তাঁহারা খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। নির্ম্মলা দেবী মনঃ প্রাণ ঢালিয়া এই কাজে লাগিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বিধবাশ্রমের সর্ব্ববিধ ভার ও দায়িত্ব নির্ম্মলা দেবীর উপর পড়িল। দুইটিমাত্র মেয়ে লইয়া তিনি সামান্য ভাড়ায় একটি ক্ষুদ্র জীর্ণ গৃহে আশ্রমের কাজ আরম্ভ করেন। দেশ হইতে একটি পরিচারিকা আনিয়াছিলেন। সেইটি মাত্র সহায়। দ্বারবান্ বা ভৃত্য কেহ ছিল না। একাধারে তিনি শিক্ষয়িত্রী, মেট্রন্, তত্ত্বাবধায়িকা ও দ্বারবান্। এই গুরু দায়িত্ব নিয়া তাঁহাকে কত রজনী অনিদ্রায় ঈশ্বরের নাম জপিতে জপিতে কাটাইতে হইয়াছে। কি করিয়া তিনি এরূপ অসীম সাহস করিয়া থাকেন, জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন,—উপরে ভগবান্, আর নীচে নিকটস্থ ভদ্রলোকগণের উপর নির্ভর রাখিয়াছি। কত দিবসে কত রাত্রিতে পাড়ার দুষ্ট লোকেরা ইট্‌পাট্‌কেল ছুঁড়িয়াছে; দরজায় ঘা দিয়াছে; কিম্বা শুনাইয়া শুনাইয়া কদর্য্য সঙ্গীত বা আলাপ করিয়াছে। তিনি অমিত তেজে বাহির হইয়া যখন গর্জ্জন করিয়া উঠিয়াছেন তখন কে কোথায় ভয়ে সরিয়া পড়িয়াছে। এইরূপে তাহারা এই ধর্ম্মবলে বলবতী নারীর পরিচয় পাইলে আস্তে আস্তে সকল অত্যাচার থামিয়া গিয়াছে।

তিনি সহরের পরিচিত, অর্দ্ধ পরিচিতদের বাড়ী বাড়ী যাইয়া অর্থসংগ্রহ করিয়াছেন। সকল আত্মীয়ের নিকট তাঁহাদের শক্তি অনুযায়ী এককালীন চাঁদা ও মাসিক চাঁদা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। তবুও কোন কোন দিন এমন হইয়াছে যে, বাজারে পাঠাইবার পয়সা পর্য্যন্ত নাই; কিন্তু ঈশ্বর আশ্চর্য্য উপায়ে তাঁহার কাজ চুলাইয়া লইয়াছেন। আশ্রমের প্রথম কয়েক

বৎসরের রিপোর্ট খুলিলে, চাঁদাদাতৃগণের মধ্যে তাঁহার আত্মীয়গণের নামই প্রায় দেখা যাইবে। নিজের যে অর্থ ও তৈজসপত্র ছিল তাহা প্রায় সবই ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মল্লিক মহাশয়ের উদ্ধার আশ্রমে ও অন্যান্য সদনুষ্ঠানের দান করিয়া ফেলিয়াছিলেন। নিজের আর অর্থসাহায্য করিবার তেমন সামর্থ ছিল না। কাজেই কোন স্থায়ী ও নির্দ্দিষ্ট আয় না থাকায় আশ্রমের অস্তিত্ব কত সময় লোপ পাইবার মত হইয়াছে।

তিনি বহুকাল যাবৎ অজীর্ণ রোগে ভুগিতেছিলেন। কতবার তিনি গুরুতর রূপে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়ায় আত্মীয়েরা তাঁহাকে আশ্রম হইতে লইয়া যাইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে আশ্রম আর টিকে না দেখিয়া তিনি অন্যত্র যাইতে অসম্মত হইয়াছেন। বাধ্য হইয়া তাঁহার মাতৃদেবীকে নিজের সংসার ফেলিয়া কন্যার জন্য আশ্রমে থাকিতে হইয়াছে। লক্ষপতির কন্যা, অবস্থাপন্ন পদস্থ ব্যক্তির পত্নী—আশ্রমে ভিন্ন রন্ধনশালার অভাবে বৃক্ষের নীচে পর্য্যন্ত রন্ধন করিয়া আহার করিয়াছেন। নিজের খরচ ত দিয়াছেনই, আশ্রমের মেয়েদের অভাব চোখের সম্মুখে দেখিয়া দূর না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। রুগ্নশয্যায়ও আশ্রমকে দুর্ব্বল সন্তানের মত ধরিয়া রহিয়াছেন। তাহাকে সকল ঝঞ্ঝাবাত নিরাশার মধ্যে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। অবশেষে তিনি তাঁহার এই প্রাণের বস্তুর প্রতি লর্ড ও লেডী কারমাইকেল মহোদয়ার দৃষ্টি ও সহানুভূতি পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহারা সরকারী সাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

আশ্রমের কার্য্যপ্রণালী প্রণয়ণ করা, তদনুসারে কাজ করান, মেয়েদিগকে শাসনে রাখা, ইত্যাদি সকল বিষয়ে তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। তাই মেয়েরা একদিকে যেমন তাঁহাকে ভয় করিত অপরদিকে তাঁহাকে মাতৃবৎ ভালবাসিত।

সম্ভবতঃ ১৯১৩ সালে স্বর্গীয় এ, রসুল সাহেবের সভাপতিত্বে চট্টগ্রাম নগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হয়। তখন হাইলাকান্দীতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। তিনি এই বিরাট জনসঙ্ঘের সম্মুখে, বঙ্গের সমবেত সুধীমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত সন্তানদের জন্য কাতর আবেদন করিলেন ও সভাগৃহের চতুর্দ্দিক হইতে এরূপ ভাবে বস্ত্র, অর্থ ও অলঙ্কার আসিতে লাগিল যে কন্‌ফারেন্সের কাজ আধঘণ্টার উপর বন্ধ রাখিতে হয়। ঐ কন্‌ফারেন্সে স্ত্রীশিক্ষা ও তাহাদের উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাব সম্বন্ধেও ইনি বক্তৃতা করেন।

চট্টগ্রাম হইতে তিনি কুমিল্লায় যান, সেখানে পিতার নামে তিনি সকলেরই সুপরিচিত। ভদ্রলোকদের গৃহে গৃহে যাইয়া দুভিক্ষের জন্য তিনি যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিলেন। তিনি এই ভাবে হাইলাকান্দীর দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের সাহায্যার্থ বহু অর্থ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। একটি আত্মীয়, নির্ম্মলাদেবীর ভ্রাতৃপরিবারের প্রতি শত্রুতা করিবার উদ্দেশ্যে ও নিজ নীচ প্রবৃত্তির প্ররোচনায় নির্ম্মলাদেবীর বিরুদ্ধে একটি বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রে বিষ উদ্গীরণ করিলেন। নির্ম্মলাদেবীর অপরাধ—তাঁহার পিতা তাঁহার জন্য যথেষ্ট অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন; তবে কেন তিনি স্থানে স্থানে অর্থ সংগ্রহের জন্য ঘুরিয়া বেড়ান? সুখের বিষয় অপর একটি সাপ্তাহিক পত্র নিজ হইতেই ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। দোষী সম্পাদক নিজ ত্রুটি বুঝিতে পারিয়া পরবর্ত্তী সংখ্যায় তাঁহার অনুপস্থিতিতে ও অজ্ঞাতে একজন সাধ্বী পুণ্যশীলা মহিলা সম্বন্ধে তাঁহার কাগজে যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তজ্জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেন এবং তাঁহার আন্তরিক অনুশোচনার নিদর্শনস্বরূপ নির্ম্মলাদেবীর বিধবাশ্রমে মাসিক সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, এইরূপ বিষদংশনও নির্ম্মলা দেবী অক্ষুব্ধ চিত্তে সহ্য করিয়াছেন। যা মরমে মরিয়া গিয়াছেন, তাই মানহানির মামলা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কিন্তু নির্ম্মলাদেবী শুধু বলিয়াছেন, লোকের ভালমন্দ বলাতে কি যায় আসে, নিজের কাছে খাঁটি থাকিতে পারিলেই হইল। "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" এই ভাবটি তাঁহার জীবনে যেমন পরিস্ফুট দেখিয়াছি তেমন আর কোথায়ও দেখি নাই। না জানি ভিতরে কত গভীর ধর্ম্মবিশ্বাস থাকিলে লোকে সর্ব্বাবস্থাতে এরূপ অবিচলিত থাকিতে পারে! রোগে শোকে, বিপদে আত্মীয়েরা যখন আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি বাহিরের লোকের ন্যায় নির্ব্বিকার ভাবে সে সব নিবারণের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন, সকলকে সান্ত্বনা দিয়াছেন। অনাবশ্যক ভাবুকতা হা হুতাশ, বিলাপ পরিতাপ তাঁহার মধ্যে মোটেই ছিলনা।

চট্টগ্রাম, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থান হইতে ফিরিবার পর সংবাদ পত্র যোগে তাঁহার সৎকাজের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে, চতুর্দ্দিক হইতে ভক্তিশ্রদ্ধাজ্ঞাপক চিঠী ও অর্থ সাহায্য আসিতে আরম্ভ করে। সে সব চিঠীপত্র সংবাদপত্রের মন্তব্য কিছুই তিনি রাখেন নাই। অসুস্থতার সময়ে তাঁহার কর্ম্মময় পুণ্যজীবনের নিদর্শন যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহাও নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে তাঁহার নামের আকাঙ্ক্ষা ছিলনা। ইহাকেই বোধ করি নিষ্কাম কর্ম্ম বলে।

> "কর্ত্তব্য বুঝিব যাহা, নির্ভয়ে করিব তাহা,
> যায় যাক্ থাকে থাক্, ধন প্রাণ মান
> সত্যকে ধরিয়া রব পর্ব্বত সমান।"

তাঁহার জীবনে এই ভাবটি কিরূপ সত্য ছিল উহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। আমাদের দেশে হিন্দুসমাজে বিবাহ সম্বন্ধে একটি দেশাচার—সংস্কার বিবাহ—(চলিত ভাষায় দ্বিতীয় বিবাহ) প্রচলিত আছে। লোকে মনে করে এই ক্রিয়া ব্যতীত বিবাহ অসম্পূর্ণ ও অশুদ্ধ। নির্ম্মলা দেবী এই দুর্নীতিপূর্ণ দেশাচারের লোপ সাধন উদ্দেশ্যে বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু প্রথমেই ভ্রাতৃপরিবার হইতে এই ক্রিয়া উঠাইয়া দিবার কোন সুযোগই তিনি খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। কারণ তাহার পরিবারে একমাত্র ভাইএর বিবাহও শীঘ্র হইবার সম্ভাবনা ছিলনা। এমন সময়ে পরিবারে এক দাসীকন্যার বিবাহে তাঁহার সেই সুযোগ উপস্থিত হইল।

এই অনুষ্ঠানের সময় উপস্থিত হইলে তিনি তাহা হইতে দিলেন না। এই কার্য্যের ফলে দেশে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল।

মাত্র ভীত হইলেন। তিনি নির্ভীক ও স্থির রহিলেন। অবশেষে সমাজপতিদের মধ্যে ব্যক্তিগত বিরোধ হইতে দুই দল হইয়া, এক দল নির্ম্মলা দেবীর পক্ষাবলম্বন করিলেন। কাজেই একঘরে আর হইতে হইলনা। তার পর ভ্রাতৃবিবাহের সময় এবিষয়ে আর কোন আলোচনাই হয় নাই। বিক্রমপুরের একটি কুলীন বৈদ্যের মেয়ে বিবাহের একমাস পরে বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হয়। তাহার বিধবা মা ও ভাইরা মেয়েটির এই অবস্থা সহ্য করিতে না পারিয়া ঢাকায় আসিয়া তাহাকে নির্ম্মলাদেবীর হাতে সমর্পণ করেন। নির্ম্মলা দেবী বহু আয়াসে তাহাকে একটি সুপরিচিত সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্ম পরিবারে বিবাহ দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ধর্ম্ম, জ্ঞান ইত্যাদি সর্ব্বক্ষেত্রে আত্মোন্নতির জন্য তাঁহার যেরূপ একাগ্র চেষ্টা ছিল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইংরাজী ভাষায় অজ্ঞতার দরুন তাঁহার মনে অত্যন্ত ক্ষোভ ছিল। ইংরাজী ভাল ভাল গ্রন্থের নাম শুনিয়া তাহা পড়িতে পারিতেন না বলিয়া আমরা তাঁহাকে চোক্ষের জল পর্য্যন্তও ফেলিতে দেখিয়াছি। আত্মোন্নতিশীলা নির্ম্মলা দেবী ৩৫ বৎসর বয়সে ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া ইংরেজী পড়িতে আরম্ভ করেন; অজীর্ণ রোগের ফলে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা হেতু তিনি বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই; তাঁহাকে এই চেষ্টা ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার এরূপ প্রয়াস জাগ্রত ও সজীব প্রাণের পরিচয় দিতেছে।

তিনি জীবনে বোধ হয় একখানাও নাটক উপন্যাস পাঠ করেন নাই। তিনি শুধু ইতিহাস, মহাত্মাদের জীবনচরিত, ধর্ম্মগ্রন্থ, বিশেষভাবে সাধকদের উপাসনা গ্রন্থ পড়িতেই ভাল বাসিতেন।

তিনি প্রকৃত ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। ঈশ্বরোপাসনা তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। ইহা শুধু নিয়মরক্ষা ছিলনা; নিজের সকল দুর্ব্বলতা দূর করিয়া, সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া তাঁহাকে প্রেমময়ের দিকে টানিয়া লইবার জন্য তাহা ছিল প্রাণের কথা, নিজকে প্রেমময়ের যোগ্য করিবার জন্য তাহা ছিল আন্তরিক সাধনা। ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবের সঙ্গে তাঁহার এমনি একটী প্রাণের যোগ স্থাপন হইয়া গিয়াছিল যে মাঘোৎসব আসিলেই তিনি কলিকাতা যাইবার জন্য অস্থির হইতেন। এবার ১১ই মাঘ মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া থাকিয়াও তিনি তাঁহার প্রাণের দেবতার চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন। প্রতিবেশী একটী বালককে তাহার ঈশ্বরানুরাগের জন্য তিনি বড় স্নেহ করিতেন। ছেলেটী বেশ গান করিতে পারে। ১১ই মাঘ অতি প্রত্যুষে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া গান করিবার জন্য তিনি তাহাকে বলিয়াছেন। শেষ রাত্রে আসিয়া বালক গান করিতে আরম্ভ করিল; আর তিনি—যিনি রুগ্নশয্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত করিতে অক্ষম—আবেগ-কম্পিত-স্বরে প্রাণ খুলিয়া নিজকে ভগবৎচরণে একেবারে নিঃশেষ করিয়া দিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

তাঁহার সংসর্গে বসিলে সাধুতার বাতাসে হৃদয় পবিত্র হইয়াছে, চিত্ত সংযত হইয়াছে, বাচালতা রুদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার সঙ্গে আধ ঘণ্টা সময় বসিয়া লোকে কিছু সময়ের জন্য হইলেও উন্নত হইয়া আসিয়াছে। প্রত্যেক কাজেরই তিনি প্রথম হইতে একটী পরিপূর্ণ প্ল্যান ঠিক করিয়া লইতেন এবং ঠিক প্ল্যান অনুযায়ী কাজটী সম্পন্ন করিতেন। তাই তাঁহার ছোট বড় সকল কাজ এরূপ সুশৃঙ্খল, পরিপাটি ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জীবনে তিনি গুরু-স্থানীয় ছিলেন। যুগপৎ ধর্ম্ম ও কর্ম্মকে জীবনে এমনভাবে লাভ করিতে বড় একটা দেখা যায়না।

তাঁহার মহাপ্রস্থান তাঁহার মহৎজীবনের উপযুক্তই হইয়াছে। প্রায় ২ মাস যাবৎই তিনি মরণাপন্ন কাতর। মৃত্যুর দিনও তাঁহার অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন বাহির হইতে বোঝা যায় নাই। কিন্তু, তিনি যেন তাঁহার শেষ সময়ের খবর পাইয়াছিলেন। তাই পূর্ব্ব দিন রাত্রেই তাঁহার লিখিত শেষ অভিলাষপত্রে স্বাক্ষর করিলেন এবং বৃহস্পতিবার দিন প্রাতে তাঁহার প্রিয় ইজি-চেয়ারটীতে শোয়াইয়া দিবার কথা বলিলেন! তাঁহার অভিপ্রায় মত তাঁহাকে সেই ইজিচেয়ারে শোয়াইয়া দেওয়া হইল। তিনি তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার গ্রামের পাড়ার দরিদ্র মেয়েদের দিবার জন্য যে বাসনের কথা লিখিয়াছিলেন তাহা দেখিতে চাহিলেন। তখনই বাজার হইতে নূতন বাসন কিনিয়া আনিয়া তাঁহাকে দেখান হইল। সেই সময়ে গ্রামের একজন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তখন কথা বলিবার শক্তি তাঁহার প্রায় লোপ পাইয়া আসিতেছিল। তখনই বাসনগুলি তাঁহার সহিত লইয়া যাইয়া মেয়েদের দিবার জন্য ভদ্রলোকটীকে অস্ফুট স্বরে অনুরোধ করিলেন। তৎপর ভগ্নীপতিকে আসিবার জন্য তার করিতে বলিলেন। অন্যান্য দিন তাঁহার নিকট আসিবার জন্য তার করা হইবে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে বারণ করিতেন। ভগিনীকেও সঙ্গে আসিবার কথা লিখা হইবে কি না জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "সে দুর্ব্বল চিত্ত, সে আসিলে নিজেও ব্যস্ত হইবে, মাকেও ব্যস্ত করিবে, তাহার আসিবার প্রয়োজন নাই।" ইহার পর বাজার হইতে একটা ডিজ লণ্ঠন আনাইবার কথা বলিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরের ব্যবস্থাগুলি পর্য্যন্ত তিনি এই ভাবে নিজে করিয়া গিয়াছেন। এবং তৎপর ধর্ম্মসঙ্গীত করিবার জন্য সঙ্কেত করেন। সঙ্গীত ও উপাসনার মধ্যে দিন ও রাত্রির সন্ধিস্থলে, পবিত্র মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রাণবায়ু দেহ-ত্যাগ করিল, তিনি ঠিক যেন শান্তিময় সমাধিতে মগ্ন হইলেন।

প্রেরিত পত্র।

[পত্র প্রেরকদিগের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,—

আশাকরি আমার এই ক্ষুদ্র পত্রখানা আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন। সর্ব্বসাধারণ ধর্ম্মপ্রাণ ও মহানুভব ব্যক্তিবর্গকে এক প্রাণে সম্মিলিত ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে আমার কাতর প্রার্থনা জানাইতেছি; আশাকরি সকলেই সহায়কারী পরামর্শ দানে নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করিয়া সমাজের এই অভাবটী পূর্ণ করিতে প্রয়াসী হইবেন।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কোনও আর্থিক সাহায্য না লইয়া, একটী স্বাধীন উদ্ধারাশ্রম ও অনাথাশ্রম খুলিবার প্রস্তাব উপস্থিত করিতেছি। এই আশ্রমে (১) ব্রাহ্ম পরিবার ভুক্ত ছেলে মেয়েরা বর্ত্তমান সময়ের

শিক্ষোপযোগী ও ব্রাহ্ম চরিত্র গঠনোপযোগী বিদ্যার শিক্ষা পাইবে প্রতি ছাত্র বা ছাত্রীর অভিভাবকগণ হইতে মাসিক অতি সামান্য (৫ পাঁচ টাকার অনধিক) বোর্ডিং খরচা নেওয়ার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া ছাড়া ছাপাখানার কার্য্য, মিস্ত্রির কার্য্য, সেলাই, গেঞ্জি ও মোজা তৈয়ার করা ইত্যাদি কার্য্য শিক্ষা দিবার বন্দোবস্তও থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে যদি সম্ভব হয়, টাইপ লিখা ও সাঙ্কেতিক লিখা এবং অন্য কোনও চাকুরী ব্যবসায় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্তও থাকিবে। (২) জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে অনাথ ছেলে মেয়ে ও অন্যান্য প্রকার প্রাপ্ত নিরাশ্রয় কিম্বা ভবিষ্যতে দুশ্চরিত্র হইবার সম্ভবপর এমত ছেলে মেয়েদিগকে সংগ্রহ করিয়া আশ্রমে স্থান দান পূর্ব্বক শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। (৩) কুবাসনা পরিত্যক্ত মুক্তিপথানুসন্ধায়ী অনুতপ্তা পতিতা রমণীদিগকে আশ্রয় দিয়া তাহাদিগকে পবিত্র জীবন যাপনোপযোগী ধর্ম্ম, বিদ্যা ও শিল্পকার্য্য শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। (৪) বিধবা কিম্বা অন্য প্রকারের আশ্রয়হীনা নারীদিগকে সম্ভবমত আশ্রয় দিয়া ধর্ম্ম, বিদ্যাশিক্ষা ও ভবিষ্যৎ জীবনে স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন নিমিত্ত তাহাদিগকে শিক্ষকতা কর্ম্ম শিক্ষাদিবার বন্দোবস্ত কিম্বা অপর কোনও উপায় করিতে হইবে। (৫) সমাজ হইতে কোনওরূপ সাহায্য না পাইয়া স্বাধীন ভাবে একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক প্রচার করিবার জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে ইচ্ছুক, এইরূপ একদল লোককে ধর্ম্মশিক্ষাধীন রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

এই সমস্ত কার্য্য আরম্ভ করিয়া চালাইতে ব্যয় সঙ্কুলানার্থ প্রথমতঃ একটী স্থায়ী ফণ্ড সর্ব্বসাধারণের সৌজন্যে ও সম্মিলিত চেষ্টায় সংগৃহীত করিয়া তদ্দ্বারা একটী ছাপাখানা ও ছোটখাট একটী কারখানা খোলার আবশ্যক হইবে। বাহিরের লোক এবং স্কুলের ছাত্র, ছাত্রী, কিম্বা স্কুল হইতে শিক্ষা সমাপনকারী লোক দ্বারা ছাপাখানার এবং কারখানার কাজ কর্ম্ম সম্পাদিত হইবে, কিন্তু সেলাই কার্য্য সাধারণ ও মেয়েদের দ্বারাই চালিত হইবে।

কোনও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নামে এই আশ্রম অভিহিত হইবে। প্রস্তাবটি সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতি লাভ করিলে সে নাম যথা সময়ে বিজ্ঞাপিত করিব। ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত যে বর্ত্তমানকালে ব্রাহ্মছেলে মেয়েদের জন্য ব্রাহ্মজীবন গঠনোপযোগী কঠোর নিয়মের অধীন একটী স্বতন্ত্র স্কুলের দরকার হইয়া পড়িয়াছে এবং অন্য যে সমস্ত সংসৃষ্ট আশ্রম থাকিবে তাহাদিগেরও দরকার হইয়া পড়িয়াছে। হয় ত এই সম্বন্ধে কেহ নানা অন্তরায় উত্থাপন করিয়া প্রস্তাবটী উপেক্ষার বা অবহেলার চক্ষেও দেখিতে পারেন, সেই আশঙ্কায় আমি পূর্ব্ব হইতেই তিনটী সাধারণ প্রশ্নের উত্তর নিম্নে লিখিতেছি।

(১) আমাদের (বাঙ্গালীদের) মধ্যে ছেলে মেয়ে স্ত্রীলোকদিগের একত্রে বাস করিবার প্রথা নাই বলিয়া এই জাতীয় প্রস্তাব কার্য্যতঃ চলিতে পারে না; ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে এক একটী আশ্রম স্বতন্ত্র ভাবে, দায়ীত্বপূর্ণ স্বতন্ত্র উপযুক্ত লোকের তত্ত্বাবধানে, অর্থাৎ ছেলে মেয়েদের ভার পুরুষ ও যুবতী স্ত্রীলোকদিগের ভার উপযুক্ত স্ত্রীলোকের তত্ত্বাবধানে, থাকিবে। কেবল উপাসনালয় একটী হইবে। যদি সম্ভবপর হয় পৃথক পৃথক ভাবে শিক্ষার বন্দোবস্তও হইবে।

২। এত কার্য্য একত্র হস্তে নিবার জন্য প্রচুর অর্থ কোথা হইতে আসিবে? উত্তরে এই বলিতে পারি যে প্রার্থনা পূর্ব্বক ঈশ্বরের এই কার্য্যে ব্রাহ্মসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী কতিপয় স্বনামধন্য ঈশ্বর সেবক, হস্তক্ষেপ করিলে চতুর্দ্দিক হইতে এত অর্থ আসিবে যে ক্রমে ক্রমে অল্প দিনের মধ্যেই প্রস্তাবিত সমস্ত বিভাগ খোলা যাইবে। নিঃস্বার্থ ভাবে পরের জন্য ভিক্ষায় বাহির হইতে হইবে, ইহাতে কোনও লজ্জা নাই, বিদ্বেষ নাই; এবং দলে দলে ব্রাহ্মযুবক যুবতী প্রত্যেকের কর্ত্তব্য কার্য্য,—নিজস্ব কার্য্য, বিবেচনা করিয়া যিনি যে প্রকারে সাহায্য করিতে পারেন সেই প্রকারে কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া সাহায্য দানে নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবেন। যাহার অর্থ আছে তিনি অর্থ দিবেন, যাহার বিদ্যা জ্ঞান আছে উৎসাহ আছে তিনি কার্য্যকারী শ্রেণীভুক্ত হইবেন, যাহার সম্মান আছে তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকট তাঁহার সহানুভূতি জানাইবেন, যাহার অন্য কোনও উপায়ে সাহায্য করিবার ইচ্ছা আছে তিনি সেই উপায় ঈশ্বরের এই কার্য্যে প্রয়োগ করিবেন। তখনই যথেষ্ট অর্থ আসিবে; কেবল আমাদের সম্মিলিত প্রাণে উদ্‌যোগ ও ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা চাই। এই কার্য্যের জন্য নিশ্চয়ই একটী কমিটী গঠিত করিতে হইবে। উপযুক্ত লোকের স্বাক্ষরিত আবেদন পত্র কাগজে ছাপাইয়া অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইবে, একদল লোককে ব্রাহ্ম সাধারণ ও অপরাপর সাহায্যকারীদের বাড়ী বাড়ী যাইয়া সাহায্য আদায় করিবার ভার নিতে হইবে, প্রতি জিলায় জিলায় ও অপরাপর স্থানে কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটীর সভ্য রূপে বিশেষ দান সংগ্রহ করিবার ভার দিতে হইবে, স্থানীয় সমাজের সেক্রেটারী মহাশয়গণকে স্থানে স্থানে মণ্ডলীর নিকট আবেদন করিতে হইবে ইত্যাদি। আমার এই বিনীত নিবেদন কেবল প্রস্তাব মাত্র—সর্ব্বসাধারণের বিবেচনার জন্য আপনার পত্রিকায় পাঠাইলাম। যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক অপরাপর বাঙ্গালা কাগজ ও এই আবেদনটি নকল করিয়া পত্রিকাস্থ করেন তবে বাধিত হইব।

শ্রীজগৎচন্দ্র দাস।

ব্রাহ্মসমাজ।

দান—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রচার ফণ্ডে ২ টাকা, সাধনাশ্রমে ২ টাকা ও দাতব্য ফণ্ডে ১ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

বক্তৃতা— লচন্দ্র ঘোষ বি,এ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষের সাহায্য কার্য্যে প্রেরিত হইয়াছেন। তিনি স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজে "ধর্ম্মের প্রভাব" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। অনেক লোক উপস্থিত হইয়াছিল।

শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজ—৩১শে বৈশাখ পূর্ণিমা-তিথিতে মহাত্মা শ্রীবুদ্ধের জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রাতে শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজ গৃহে উপাসনা, মধ্যাহ্নে জীবন পাঠ, সন্ধ্যায় উপাসনা হয়।

২রা জ্যৈষ্ঠ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজে সমস্ত দিন উৎসব হয়।

বিবাহ—বিগত ২৬এ মে পরলোকগত হেমেন্দ্রমোহন বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ ক্ষিতেন্দ্রমোহনের সঙ্গে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের কন্যা শ্রীমতী লীলার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে; শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২৭এ মে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণের কন্যা শ্রীমতী সুধাময়ীর সহিত শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন।

এই উভয় বিবাহই ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্টারী করা হইয়াছে। ভগবান্ নব দম্পতিদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব—বিগত ১২ই মে হইতে ১৪ই মে পর্য্যন্ত কলিকাতাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের এক চত্বারিংশ জন্মোৎসব সম্পন্ন হয়; ১৪ই তারিখ সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধুদত্ত "ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ভাব ও অনুষ্ঠান" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ১৫ই তারিখ সন্ধ্যার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ ভাব সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়; শ্রীযুক্ত সুকুমার রায়, বি, এস সি ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ বক্তৃতা করেন; শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র বি,এ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১৬ই মে (২রা জ্যৈষ্ঠ) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার দিন,; ঐ দিন ভোরে উষা কীর্ত্তন হয়; প্রাতে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস ও সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় এম্,এ, উপাসনা করেন। তৎপর দিন অপরাহ্নে বালকবালিকা সম্মিলন হয়; শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ এম্,এ, শ্রীমতী সুবালা আচার্য্য ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত উহাদিগকে উপদেশ দেন।

পারলৌকিক—বিগত ২৪এ মে রাত্রিতে প্রাচীন ব্রাহ্ম বাবু আনন্দমোহন দত্ত বসন্ত রোগে কলিকাতাতে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল বরিশাল থাকিয়া শিক্ষকতা কার্য্য করিয়াছেন; অনেক কৃতবিদ্য লোক তাঁহার ছাত্র আছে। মৃত্যু সময়ে তাঁহার বয়স ৭৯ হইয়াছিল; এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি কর্ম্মঠ ছিলেন; অনেক সময়ই সমাজের উপাসনা বক্তৃতাদিতে মন্দিরে যাইতেন। তিনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম ছিলেন; কাহারও প্রতি তাঁহার অপ্রেমের ভাব ছিল না; কাহারও নিন্দা তাঁহার মুখে শুনা যাইত না! তিনি নানাভাবে লোকের অজ্ঞাতে অপরের সাহায্য করিতেন; পশুপক্ষীদের প্রতিও তাঁহার করুণা ছিল। ভগবান্ তাঁহার আত্মাকে শান্তি ও পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দান করুন

বিগত ৭ই মে সীতামারীতে শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল ঘোষের পুত্র মৃণালরঞ্জন ঘোষের মৃত্যু হয়। ভগবান পরলোকগত আত্মাকে শান্তি ও তাহার পিতা ও আত্মীয় স্বজনকে সান্ত্বনা দান করুন।

প্রচার—শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষালের ডিব্রুগড়ের প্রচার বিবরণ—তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে রায়সাহেব শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাসের গৃহে পারিবারিক উপাসনা সমাপনের পর স্থানীয় বন্ধুগণের গৃহে গৃহে গমন করিয়া দেখা সাক্ষাৎ এবং যাহারো কাহারো সঙ্গে ধর্ম্ম-প্রসঙ্গাদি করিয়াছেন। এবং নিম্নলিখিত গৃহে ব্রাহ্ম-সমাজের ব্যক্তিদিগকে লইয়া মিলিত উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন; শ্রীযুক্ত মহেশ্বর বরুয়া, রায়সাহেব শরচ্চন্দ্র দাস। নিম্নলিখিত গৃহে পারিবারিক উপাসনা সম্পাদন করিয়াছেন;—শ্রীযুক্ত মণিলাল মল্লিক, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়। নিম্নলিখিত বক্তৃতা করিয়াছেন; জর্জ্জ হাইস্কুল-হলে—"সেবাধর্ম্ম।" ব্রহ্মমন্দিরে—'বর্ত্তমান সমাজ-সমস্যা।" এবং "বিশ্বজনীন ধর্ম্মের প্রভাব।" একদিন মন্দিরে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা এবং মণ্ডলী গঠনের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রতি রবিবার ব্রহ্মমন্দিরের সামাজিক উপাসনা সম্পাদন করেন।

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু কাঁথি মহকুমার মধ্যে নিম্নলিখিত স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন—বনমালি চট্টা; ভবানীচক্, চণ্ডিভেটী, বালক্মা; তিনি এই সকল স্থলে উপাসনা ও সমাজের কল্যাণসাধন বিষয়ে আলোচনা ব্যতীত ২রা মে, অঘোরনাথ দিন্দা স্কুলের ছাত্রদিগের জন্য "আদর্শ মানুষ" বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন, এবং ১৫ই মে উক্ত বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন।

উৎসব—বিগত ২৩এ মে হইতে ২৬এ মে পর্য্যন্ত বানীবন ব্রাহ্মসমাজের উৎসব সম্পন্ন হয়। তৎপূর্ব্বে কয়েকদিন উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইবার জন্য পাঠ ব্যাখ্যা চলিতেছিল। উৎসবের কয়েকদিন উষা কীর্ত্তন হইয়াছে, কোনদিন ছেলেরা, কোন দিন মেয়েরা, উষা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ২৩এ শুক্রবার সন্ধ্যায় সময় উৎসবের উদ্বোধন সূচক উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২৪এ প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত উপাসনা করেন; সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্ত ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস কীর্ত্তন করেন। ২৫এ মে রবিবার উৎসবের বিশেষ দিন। প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত উপাসনা করেন; অপরাহ্নে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়; শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যার সময় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস উপাসনা করেন। ২৬ প্রাতে ব্রাহ্মিকাদের বিশেষ উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে বালকবালিকা সম্মিলন হয়। উৎসবে কলিকাতা, বাগনান প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মগণ আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন।

২১১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Registered No C. 65.

অসতোমা সদ্গময়,
তমসোমা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রী:, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৪শ ভাগ। ১লা আষাঢ়, সোমবার, ১৩২৬, ১৮৪১ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯০ অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲

৫ম সংখ্যা। 16th June, 1919. প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

প্রার্থনা

হে প্রভু, আমি কি ব'লে আর তোমার নিকট প্রার্থনা করিব? আমার সকল ভাষা শেষ হয়েছে; কত চক্ষের ধারা বহিয়াছে; কত অন্তরের বেদনা জানাইয়াছি; তবুও প্রভু, তুমি কি কৃপা করিবে না? তবুও কি প্রভু, তোমার আশ্বাসবাণী শুনিব না? তবুও কি প্রভু, তোমার দ্বারে পড়িয়া থাকিবার অনুমতি পাইব না? আমি ত তোমার ভক্ত সন্তানদের সঙ্গে স্থান চাই না; আমি ত প্রভু তোমার মলিন দুর্ব্বল সন্তান; আমার ভক্তি নাই, জ্ঞান নাই; সেবার ভাব আমার নাই; তাহা তুমি ত জান, আমিও জানি। তবুও ত জানিয়াছি, তুমি ছাড়া আমার গতি নাই; তাই ত তোমার চরণে কাঁদিতেছি; তাই ত কত নিবেদন তোমাকে জানাইতেছি; তাই ত বেদনায় অস্থির হয়ে কত অশ্রুপাত করিতেছি, কত দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছি। তুমি ত জান আমার আর কেহ নাই; এই অসীম সংসারে আমি একা! আমিত দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছি, কোথাও ত আশ্রয় পাই না; কেহ ত দু'টা আশার কথা বলে না; কাহার নিকটই ত প্রাণের ব্যথা জানাইয়া শান্তি পাই না; তাই ত অগতির গতি তুমি, নিরাশ্রয়ের আশ্রয় তুমি, তোমারই দ্বারে এসেছি। আমি আর কথা বলিতে পারি না; আর কাঁদিতেও পারি না; আমি কেবল নীরবে তোমার দ্বারে পড়িয়া থাকিব; তোমার কৃপার জন্য ভিখারী হইয়া প্রতীক্ষা করিব; আমার সকল গর্ব্ব চূর্ণ হয়েছে, সকল অহঙ্কার ভেঙ্গে গিয়াছে; আমি দেখেছি, বুঝেছি, আমি অতি অসার; আমাতে কিছুই নাই; আমি এখন কেবল তোমার কৃপারই ভিখারী। তোমার কৃপাই আমার সম্বল; তোমার দ্বার ব্যতীত আর আমার দাঁড়াবার স্থান নাই। হে প্রভু, আমাকে পরিত্যাগ করিও না; আমাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দিও না; আমাকে তোমার চরণে স্থান দাও; তোমার মন্দিরের এক প্রান্তে আমাকে বসিতে দাও; আমি তোমার দিকে দূর হইতে তাকাইয়া থাকিব; তোমার বাণী দূর হইতে শুনিয়া কৃতার্থ হইব; তোমার ভক্ত সন্তানগণের সেবা করিয়া ধন্য হইব। আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা তুমি জান। আমাকে তুমি ফিরাইয়া দিও না। তুমি আমায় গ্রহণ কর। হে আমার দেবতা, হে আমার একমাত্র আশ্রয়; আমি অনন্যগতি হইয়া তোমারই শরণাপন্ন হইতেছি; কৃপা কর।

নিবেদন

আমার কামনা—তোমরা যাকে সুখ বল, তা কামনা করে ত আমি এ পথে আসি নাই; সুখ আরাম, সকলি জলাঞ্জলি দিয়েই ত এসেছি; এ পথে চলিতে যখন পায়ে কাঁটা ফুটে শরীর ক্ষত বিক্ষত হয়, আমি দেখি, প্রভু আমাকে কত স্নেহে আলিঙ্গন করিতেছেন। তিনি ত আমাকে সুখ দিবেন, সম্পদ্ দিবেন বলে ডাকেন নাই; তাঁর যে একটু ডাক শুনা, তাঁর যে একটু সৌন্দর্য্য অনুভব করা, ইহাতেই যে আমি কৃতার্থ হই; তাঁর জন্যে যে দুঃখ পাই, তাতেই যে আমার সকল কামনা পূর্ণ হয়। তিনি যে আমাকে একদিন তাঁর চরণে স্থান দিবেন, এই আশাতেই যে আমি নৃত্য করি। তোমরা তাঁকে দেখ নাই, তোমরা তাঁকে চেন না; তাই তোমরা আমাকে পাগল বল। দূর হইতেও যে তাঁর একটু আভাস পাই, তাঁর একটু বাণী শুনি, তাতেও ত স্থির থাকিতে পারি না; আমি ছুটে যাই—পর্ব্বত নদী বন জঙ্গল পার হয়ে ছুটে যাই; ও রূপের যে তুলনা নাই,

ও স্বর কত মধুর! আমি ঐ রূপ দেখ্‌বার জন্য, ঐ সৌন্দর্য্যে ডুব্‌বার জন্য, ঐ সঙ্গীত শুন্‌বার জন্য ছুটে চলিব; ইহাই আমার কামনা; তোমরা আমাকে বাধা দিও না; আমি ছুটে চলিলাম।

আমার যাত্রা—আমি আজ যাত্রা করেছি; আমাকে পশ্চাতের দিকে ডাকিও না; পেছনে আর আমি ফিরিতে পারি না; আমার সম্মুখে চলিতে হবে; কোথায় যাব? কোন পথে যাব? তাই তোমরা জান্‌তে চাও? আমি ত তা জানি না; আমি এক অজানা রাজ্যে চলেছি, অজানা পথে চলেছি; আমি কি এক ডাক শুনেছি; ঘুমের ঘোরে কি এক সঙ্গীত শুনেছি; আমাকে পাগল করেছে; না জেনে না শুনে যাওয়া অন্যায়? তোমরা ত দশ দিন বসে পথ নির্ণয় কর, গম্যস্থান নির্ণয় কর, পরে যাত্রা কর; আমি আগেই যাত্রা করিলাম; আমার কর্ণধার কে তাকে ত চিনি নাই; কিন্তু তবুও অজানার সন্ধানে অজানা রাজ্যে, অজানা পথে আমি যাত্রা করিলাম। তোমরা আমার কথা বুঝ্‌তে পার না; তোমরা আমার ভাষা বোঝ না; তোমরা আমার প্রাণের টান ত দেখ্‌তে পাও না। আমার চক্ষের উপর কি যেন ভাসিতেছে; আমার কাণে কি যেন সুর বাজিতেছে; আমি স্থির থাকৃতে পারি না; তাই ছুটেছি—আমি ছুটেছি; যাত্রা সুরু হলো; বাঁধন দড়াদড়ি টুটে গেল; কোন বাধা আর মানব না; আমি এই চলিলাম।

আমার দেখা—তোমরা বল, প্রকৃতি নীরব ও নির্জ্জীব; আমি ত তোমাদের কথায় সায় দিতে পারি না; আমার কি দৃষ্টিভ্রম হলো, আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি? আমি ত চারিদিকে তাকাই, কি যেন দেখ্‌তে পাই; চারিদিকেই ত সজীবতা; ঐ বৃক্ষের পত্রে, ঐ ফুল ফলে, ঐ গিরি নদীতে—আমি কি দেখ্‌ছি? তোমরা কিছু দেখ না; তোমরা ফুলের সৌন্দর্য্য দেখ, তোমরা পর্ব্বতের গাম্ভীর্য্য দেখ—আমি দেখি কে যেন উঁকি দিয়ে রয়েছেন; কার সৌন্দর্য্য যেন আমাকে অধীর কর্‌ছে। তাই ত আমি ছুটে যাই—তাই ত বৃক্ষলতাকে আমি আলিঙ্গন কর্‌তে যাই—তাই ত নদীপ্রবাহে অঙ্গ ডুবাইতে চাই। তোমরা কি দেখ্‌ছ না, এ যে কি মধুর প্রকাশ! তোমরা শোন না? কি মধুর স্বর লহরী ছুটিতেছে; গগনে গগনে কি সঙ্গীত; আমি কি এ নূতন দেশে এসেছি! কি দেখি, চারিদিকে যে কি নব সৌন্দর্য্যের প্রকাশ। আমার প্রাণমোহন হৃদিরঞ্জন দেবতা যে চারিদিকে প্রকাশ হইতেছেন। জড় ত আর নাই; এ যে তাঁকেই দেখ্‌তে পাচ্ছি; আমি যে আর চল্‌তে পারি না; তিনি যে ফুটে উঠ্‌ছেন; আমি যে শু'তে পারি না, তিনিই যে চারিদিক ঘেরে রয়েছেন। আমি যে আর স্থির থাকৃতে পারি না। আমাকে যে অবশ করে তুলছে। তবে তাঁর রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।

তাঁর অবতরণ—তোমরা বল, তিনি রাজাধিরাজ, আমি দেখি তিনি হৃদয়সখা! আমি ত তোমাদের কথা শু'নে ভয়ে ভয়ে দূরে ছিলাম; কে আমাকে এসে বুকে চেপে ধর্‌ল! আমি ত আমার মলিনতা লয়ে গৃহকোণে লুকিয়েছিলাম; কে এসে আমাকে টেনে বাহির কর্‌ল, বাহুপাশে আলিঙ্গন কর্‌ল? আমি ত আমার ভাঙ্গা একতারাটি লয়ে আপন মনে বেসুরে গান গাইতেছিলাম, কে এসে আমার প্রাণের এক-তারাটিতে ঝঙ্কার দিল; কে নূতন সুর বাজাইল; কে আমার চোখে হাত বুলাইয়া দিল—আর চারিদিক্ সুন্দর দেখ্‌তে পেলাম। তিনি রাজাধিরাজ হলেও যে, দীন দুঃখীর সহায়, পাপীর বন্ধু, অনাথের নাথ। তাই তিনি এসে আমাকে ধরেছেন; তাই তিনি এসে আমার প্রাণমন পূর্ণ করেছেন; তাই তিনি এসে আমাকে মৃত্তিকা হতে তুলে নিয়েছেন; তাই তিনি এসে আমার চোখের জল মুছাইতেছেন; তাই তিনি এসে আমাকে সখা বলে আলিঙ্গন করেছেন, তাই তিনি এসে আমাকে নূতন গান শুনাইতেছেন; তাই তিনি এসে আমাকে নবসৌন্দর্য্যে মোহিত করিতেছেন। তিনি আমার কে? আমার যে তিনি হৃদয় নাথ!

সম্পাদকীয়।

প্রচার—Woe unto me, if I preach not the gospel—আমাকে ধিক্, আমি হতভাগ্য, যদি আমি ভগবানের বাণী প্রচার না করি—মহাত্মা সেন্টপল্ এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন; তাঁহার এই বাণী সেই সুদূর সময় হইতে এখনও আসিয়া আমাদের কর্ণে বাজিতেছে; ভগবানের বাণী, তাঁহার সত্য জনসমক্ষে প্রচার করিতে, মানবের নিকট নবজীবনের বার্ত্তা ঘোষণা করিতে, দুঃখ তাপ পাপদগ্ধ নরনারীকে ভগবানের শান্তিময় নামের মহিমা জানাইতে সকলেই বাধ্য। সংসারে ত সকলেই কোনও না কোনও প্রকারে সত্য প্রচার করিতে ব্যস্ত; এত যে তর্ক, এত যে আলোচনা, এত যে বক্তৃতা, এত যে কথাবার্ত্তা, তাহা ত মানুষকে সত্য বুঝাইবার জন্যই; কেবল ধর্ম্মবিষয়ে নহে, নীতিবিষয়ে নহে, সর্ব্ব বিষয়েই মানুষ আপনার মত প্রচার করিয়া থাকে, অপরকে আপনার মতে দীক্ষিত করিতে চাহে; যাহা মানুষ সত্য বুঝিয়াছে, খাঁটি বুঝিয়াছে, কল্যাণপ্রদ বলিয়া জানিয়াছে, তাহাই সে অপরকে দিতে চায়; অপরকে জানাইতে না পারিলে তাহার প্রাণে তৃপ্তি আসে না, শান্তি আসে না; এই সত্য দিবার জন্য, সত্যটিকে পরিস্ফুট করিয়া জানাইবার জন্য মানুষ রাশি রাশি গ্রন্থ লিখিয়াছে, লোকের সঙ্গে আলোচনা তর্ক বিতর্ক করিতেছে। সত্য প্রচারই মানবের ধর্ম্ম; পরস্পরের সাহায্যেই মানুষ এদেশে বাস করে, পরস্পরের সাহায্যেই মানুষ সভ্যলাভ করে, জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করে। সুতরাং এক অর্থে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সকলেই প্রচারের কার্য্য করিতেছেন; যাহা সত্য, যাহা খাঁটি, যাহা কল্যাণপ্রদ, তাহা মানুষ প্রচার না করিয়াই থাকিতে পারে না। কিন্তু যাহাকে আমরা ধর্ম্মপ্রচার বলি, তাহা করিবার জন্যও প্রত্যেক মানুষ দায়ী; ভগবান্ তোমার নিকট যে আলোক প্রকাশ করিয়াছেন, তোমার নিকট যে সত্য উদ্ভাসিত করিয়াছেন, তাহা তুমি লুকাইয়া রাখিতে পার না; তুমি ধন সম্পদ্ প্রাপ্ত হইয়াছ, আর তোমার ভাই বোন সকল অর্থাভাবে অনাহারে

ক্লেশ পাইবে, তাহা তুমি কেমন করিয়া সহ্য করিবে? তাহাদের কষ্টে কি তোমার প্রাণ কাঁদিবে না? তাহাদের দুঃখ দেখিয়া কি তোমার হৃদয় গলিবে না? সংসারে মানুষ কত দুঃখ ক্লেশ পাইতেছে, কত পাপ পঙ্কে যাইয়া মগ্ন হইতেছে; কত রোগে শোকে অস্থির হইতেছে; কত অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিতেছে, কে তাহাকে আশার বাণী শুনাইবে? কে তাহাকে মৃত্যুর ভিতর অমৃতের সন্ধান বলিয়া দিবে? কে তাহাকে পাপপঙ্ক হইতে হাত ধরিয়া তুলিবে? কে তাহার শোকের সময় প্রকৃত সান্ত্বনা প্রদান করিবে? তুমি কি সেই অমৃতরাজ্যের খবর পাইয়াছ? তুমি কি যাহাতে দুঃখে শান্তি, শোকে সান্ত্বনা, পাপে বল লাভ করা যায় তাহার সন্ধান জানিয়াছ? তুমি কি ভগবানের অপার প্রেমের স্পর্শ অনুভব করিয়া প্রাণে শান্তি পাইয়াছ? তুমি কি তাঁর প্রেম প্রাণে অনুভব করিয়াছ? তোমার প্রাণে কি তাঁহার জ্যোতি প্রকাশিত হইয়াছে? যদি তুমি তাঁহার প্রেমের স্পর্শ পেয়ে থাক, যদি তুমি তাঁর নামরসে ডুবিতে পারিয়া থাক, যদি তুমি এই মৃত্যুময় জীবনের মধ্যে একটু অমৃতের সন্ধান পাইয়া থাক, তবে কি ভাইবোনদিগকে সে সন্ধান বলিয়া দিবে না? তবে কি পাপতাপদগ্ধ নরনারীকে ডাকিয়া বলিবে না, তোমরা এস, আমি তোমাদিগকে শান্তির সন্ধান বলিয়া দিব? যীশুখৃষ্ট বলিয়াছিলেন,—পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত নরনারী, আমার নিকট এস, আমি তোমাদিগকে শান্তির সন্ধান বলিয়া দিব। তিনি ভগবানের করুণায় শান্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন; তিনি জানিতেন, তাঁহাকে পাইলে শোক তাপ ও পাপের অতীত হওয়া যায়, তিনি অমৃতের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাই তিনি সেই সন্ধান সকলকে বলিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া সকলকে আহ্বান করিয়াছিলেন। আর্য্য ঋষিগণ বলিয়াছিলেন,—হে অমৃতের পুত্র সকল, তোমরা শ্রবণ কর, আমি অন্ধকারের পরপারে জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পরমেশ্বরকে জানিয়াছি; তাঁহাকে জানিয়াই মানুষ মৃত্যুকে লঙ্ঘন করিয়া অমৃত পুরুষকে লাভ করিতে পারে; ইহা ব্যতীত আর কোনও পথ নাই। তাঁহারা অমৃত পুরুষকে পাইয়াই মানুষকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, আমরা তাঁহাকে পাইয়াছি, তোমরা এস, তোমরাও তাঁহাকে পাইবে; তাঁহাকে পাইলে প্রাণে পরাশান্তি লাভ করিবে। জগতের মহাজনগণ তাঁহার প্রেমের আস্বাদ পাইয়াই মানুষকে সেই রস আস্বাদ করিবার জন্য ডাকিয়াছিলেন। তাঁহারাই প্রকৃত প্রচারক ছিলেন। এইরূপ প্রচারকের প্রয়োজন আছে। যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহার সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহারা পাপতাপদগ্ধ নরনারীকে সেই অমৃতের সন্ধান বলিয়া দিন; মানুষ তৃপ্ত হইবে, কৃতার্থ হইবে

সেবার অধিকার—লোকে কথায় বলে, একটা মাদুরে পাঁচ জন ফকির বসিতে পারে, কিন্তু এক বিস্তৃত রাজ্যে দুইজন রাজার স্থান হয় না। এই প্রচলিত প্রবাদবাক্যের মধ্যে গভীর অর্থ লুকায়িত আছে। সংসারের লোক সাধারণতঃ আপনার স্বার্থ, আপনার প্রভুত্ব, আপনার অধিকার লইয়া ব্যস্ত; রাজা চান, আপনার অধিকার অপ্রতিহত রূপে প্রচলিত থাকিবে; প্রজা চায়, আপনার অধিকার ক্রমে বর্দ্ধিত করিবে। এইজন্য জগতে রাজাতে রাজাতে, রাজাতে প্রজাতে ও প্রজাতে প্রজাতে কঠোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়; কেহই আপনার অধিকার ত ছাড়িতে চাহেই না, বরং অপরের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিবার জন্য, অপরকে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য অনেকে ব্যস্ত। মানুষ যে আপনার ন্যায্য অধিকার লাভ করিবার জন্য ন্যায়তঃ চেষ্টা করে, তাহাতে দোষ নাই; মানুষ কেন আপনার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে? মানুষ কেন স্বাধীন ভাবে আপনার মনুষ্যত্ব ফুটাইয়া তুলিতে পারিবে না? সংসারে প্রবল দুর্ব্বলকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে; এক জাতি অপর জাতিকে জ্ঞান হইতে, অধিকার হইতে, স্বাধীন প্রচেষ্টা হইতে বঞ্চিত রাখিবার চেষ্টা করিতেছে; ভগবান্ মানুষকে যে শক্তি দিয়াছেন, সে শক্তি যাহাতে ফুটিয়া উঠিতে না পারে তার জন্য অপরেরা নানা ভাবে চেষ্টা করিতেছে। এই যে অন্যায় রূপে মানুষের অধিকার লোপের প্রয়াস, এই যে অন্যায় রূপে মানুষকে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন ভাব স্বাধীন কার্য্য হইতে বঞ্চিত করিবার প্রয়াস, ইহার বিরুদ্ধে মানুষ ত সংগ্রাম করিবেই; মানুষ যে ব্রহ্মের সন্তান, তাহার ভিতরে ব্রহ্ম বিরাজিত; সেই ব্রহ্ম যাহাতে প্রকাশিত হইতে পারেন, ব্রহ্মশক্তি যাহাতে স্ফূর্ত্তি পায়, তাহার চেষ্টা ত করিতেই হইবে; দুর্ব্বল যাহাতে সবল হইতে পারে, উৎপীড়িত যে, সে যাহাতে উন্নত হইতে পারে, যে নিম্নস্তরে পড়িয়া আছে, সমাজ যাহাকে হীন করিয়া রাখিয়াছে, সে যাহাতে উন্নীত হইতে পারে, তাহার সহায়তা করা ত প্রত্যেক মানবেরই কর্ত্তব্য। এই যে মনুষ্যত্ব ফুটাইবার অধিকার, তাহা প্রত্যেক মানবেরই আছে; কোনও রাজশক্তি, কি সমাজশক্তি, কোনও গুরু কিম্বা পুরোহিত, কোন ব্যক্তিই যদি তোমার মনুষ্যত্ব বিকাশে বাধা দেয়, তোমার মনুষ্যত্ব বিকাশের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিতে চায়, তুমি তাহা নিশ্চয়ই সহ্য করিবে না; তোমার অধিকার লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত হইবে, সংগ্রামে লিপ্ত হইবে। কিন্তু মানুষ ত আপনার মনুষ্যত্ব বিকাশের অধিকার পাইয়াই তৃপ্ত থাকিতে চায় না; সে চায় ক্রমে প্রভুত্ব লাভ করিতে, সে চায় আপনার ধন মান পদ বৃদ্ধি করিতে; সে চায় অপরের অধিকার খর্ব্ব করিতে। এখানেই ধর্ম্ম বলেন,—Thus far shalt thou go and no further—এই অবধি তুমি যাবে আর অধিক নয়। তোমার মনুষ্যত্ব বিকাশের পন্থা রোধ করিলে তুমি তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে পার; সে সংগ্রাম ধর্ম্মসংগ্রাম, মনুষ্যত্বের সংগ্রাম। কিন্তু তোমার পদ মান ধন লাভের জন্য তুমি অপরের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পার না। এখানে অধিকার খর্ব্ব করিয়াও তোমাকে সেবাব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। সেই জন্যই শ্রীচৈতন্য বলিয়াছেন, যে আপনি মান চায় না, অথচ অপরকে মান দান করে সে-ই হরিনাম করিবার উপযুক্ত। তোমার বাড়ীতে গরীবের আসিবার অধিকার নাই; অধিকারের দিক দিয়া তুমি তাহাকে তাড়াইয়া দিতে পার; আইন তোমার সহায় হইবে। সে কেন তোমার অনিচ্ছায় তোমার বাড়ীতে প্রবেশ করিবে? কিন্তু তোমার ধর্ম্মবুদ্ধি তোমাকে বলিবে, উহাকে তাড়াইয়া দিও না; উহার সেবা করাই তোমার কর্ত্তব্য। তোমার উপার্জ্জিত অর্থদ্বারা তুমিই সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবে, অন্য কাহাকেও দিবে না, ইহা তোমার

আইনতঃ অধিকার আছে; কিন্তু ধর্ম্ম বলেন, ওরূপ অধিকার কুবুদ্ধিপ্রসূত; তুমি তোমার অর্থদ্বারা মানবের দুঃখ বিমোচন করিবে। সংসারে দেখা যায়, মানুষ আপনার এইরূপ অধিকার লইয়া কলহে প্রবৃত্ত হয়; আমাকে লোকে সম্মান করিল না, আমার মূল্য তারা বুঝিল না, আমাকে উচ্চপদ প্রদান করিল না, আমাকে এসে দশজনে সাহায্য করিল না, আমাকে কেহ শ্রদ্ধা করিল না, আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিল না, আমার সমাজে যে স্থান তাঁহা প্রদান করিল না; আমার জ্ঞান, আমার শক্তি, আমার বিদ্যা বুদ্ধির সমুচিত আদর মানুষ করিল না; আমাকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিল। এই সব প্রশ্ন ধর্ম্মসমাজের লোকের মনে আসিবে না; তুমি চাও ধর্ম্ম, তুমি চাও ঈশ্বরকে, তুমি ধন মান পদ লইয়া কি করিবে? তুমি চাহিবে সেবা করিতে। তুমি অপরের সেবার অধিকার পাইলেই কৃতার্থ হইবে; তুমি সকলের পশ্চাতে থাকিয়াই কাজ করিয়া যাইবে; অপরেরা তোমাকে চরণে দলিয়া যাউক; তুমি বলিবে, আহা! আঘাত লাগে নাই ত? অপরেরা ধন জন পদ মান লাভ করিবে; তুমি বলিবে আমার যাহা আছে তাহাতেই তৃপ্ত; আমি কি তোমার সাহায্য করিতে পারি? এই যে আপনাকে বিলোপ করিয়া সেবা-ব্রত গ্রহণ করা, ইহাই ধর্ম্মপথাবলম্বীর কার্য্য; সেবার অধিকারই ধর্ম্মসমাজের লোকের অধিকার। এখানে আপনাকে সম্মুখে রাখিবে না; দশজনে যে কাজ না করে, দশজনে যাহা না দেখে, দশজনে যাহার প্রশংসা না করে, এমন কার্য্যে তুমি যাইবে; তুমি নীরবে আপনার সুখ স্বার্থ ভুলিয়া, আপনার অধিকার ত্যাগ করিয়া অপরের সেবা করিয়া যাইবে; নিজে অপমানিত হইয়া অপরের সম্মান বর্দ্ধিত করিবে; নিজে নির্ম্মম ব্যবহার পাইয়া অপরকে প্রেম দান করিবে, যে তোমাকে ন্যায্য সম্মান হইতে বঞ্চিত রাখিবে, তাহাকেও প্রেমে আলিঙ্গন করিবে; যে তোমাকে বেদনা দিবে, তাহারও কল্যাণ কামনা, মঙ্গল সাধন করিবে; তুমি ঈশ্বরের দাস হইয়াছ, ধর্ম্মপথে চলিতে চাহিতেছ; সেবার অধিকার, তোমার মহান্ অধিকার, আত্মবিলোপই তোমার মহান্ অধিকার, অপরকে বড় করার চেষ্টাই তোমার মহান্ অধিকার। ধর্ম্মসমাজের লোকদিগকেও নানা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়, নানা সংঘর্ষের মধ্যে আসিতে হয়; তাঁহারা যেন সর্ব্বদা মনে রাখেন, আমাদের পদ মান, ধন যশ লাভের অধিকার নাই—আমাদের অধিকার সেবা করিবার; আমাদের অধিকার অপরকে বড় করিবার, আমাদের অধিকার আপনাকে মুছিয়া ফেলিবার।

স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা।

Come unto me, all ye that labour and are heavy-laden and I will give you rest.

হে পরিশ্রান্ত, ভারাক্রান্ত নরনারী, আমার নিকট এস, আমি তোমাদিগকে শান্তি দিব।

সংসারে শান্তির অন্বেষণে মানুষ ছুটাছুটি করিতেছে; এখানে কত দুঃখ দারিদ্র্য, কত রোগ শোক, কত পাপ তাপ, মানুষের প্রাণে শান্তি কোথায়? কোথায় যেয়ে সে প্রাণের জ্বালা জুড়াইবে, কে আশার বাণী শুনাইবে, কে দগ্ধ হৃদয় শীতল করিবে। মানুষের বিপদের উপর বিপদ্ আসে, সংগ্রামের উপর সংগ্রাম আসে; এক এক পরিবারে রোগের পর রোগ, মৃত্যুর পর মৃত্যু আসিয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। এই যে প্রায় এক বৎসরাবধি সংক্রামক জ্বরে কলিকাতা সহর—কেবল কলিকাতা সহর কেন মফঃস্বলের অনেক স্থানেও ছাইয়া পড়িয়াছিল; এমনও দেখা গিয়াছে গৃহের প্রায় সকলই জ্বরে পড়িয়া আছে—একটু জল দিবার লোক নাই। আবার অনেক পরিবারে একজনের জ্বর হইল—টাইফয়ড়ে পরিণত হইল—বা নিমোনিয়া দেখা দিল—একমাস দেড়মাস পর সে হয় ত আরোগ্য হইল—অথবা তাহার মৃত্যুহইল; ইতিমধ্যে আবার আর একজন জরাক্রান্ত হইল, তার মাসাধিকব্যাপী অসুখ চলিল, সে উঠিতে না উঠিতে আর একজন পড়িল। একজনের মৃত্যুজনিত ক্রন্দনধ্বনি থামিতে না থামিতে আর একজনের ডাক আসিল, মানুষ কেমন করিয়া সহ্য করে? দিনরাত্র পরিশ্রম করিয়া, অনাহারে অনিদ্রায় থাকিয়াও যে, সম্যক্ শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করা যাইতেছে না। কত অর্থব্যয়, কত সেবার প্রয়োজন। ইহাতে একটা দেখিয়াছি, অনেকের সেবার শক্তি, কষ্ট সহিবার শক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে—দুই মাস—তিন মাস দিনরাত্রি খাটিতেছে—প্রফুল্লচিত্তে খাটিতেছে, ক্লান্তি নাই, শ্রান্তি নাই! কিন্তু মানুষ কত সহিতে পারে? ইহার পর যখন চক্ষের সম্মুখে স্নেহের আধার পুত্রটি চলিয়া যায়, কেমন করে স্নেহময়ী জননীকে সান্ত্বনা দেওয়া যায়? আবার চক্ষের জল মুছিতে না মুছিতে যখন আর একটিও অসুস্থ হয়ে পড়ে, তখন কি বলিয়া শোকাকুলা জননীকে আশ্বাস দেওয়া যায়? সংসারে ত এইরূপই ঘটিতেছে! এই সকল রোগ শোক, দুঃখ দারিদ্র্য, পাপ তাপের সহিত সংগ্রাম করিতে যাইয়া মানুষ আর পারে না, নিরাশ হইয়া পড়ে। ইহা দেখিয়াই যীশুর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাকে লোকে Man of sorrows বলিত; কেন না, লোকের দুঃখ ক্লেশ পাপ তাপ দেখিয়া, তাহাদের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া তিনি সর্ব্বদাই বিষণ্ণ থাকিতেন। তিনি দেখিতেন যে, মানুষ যে পথে গেলে শান্তি পায়, সকল জ্বালার হাত হইতে পরিত্রাণ পায়, সে পথে যাইতেছে না; তাই তিনি ডাকিয়া বলিলেন,—হে পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত মানুষ, তোমরা কোথায় ছুটিয়া যাইতেছ? আমার নিকট এস, আমি তোমাদিগকে শান্তির সন্ধান বলিয়া দিব; আমি তোমাদিগকে এমন কিছু দেখাইব, এমন কিছু শুনাইব, যাহাতে তোমাদের সকল দুঃখ শোক তাপের অবসান হইবে, প্রাণে পরাশান্তি লাভ হইবে।

কেবল কি যীশু এই কথা বলিয়া মানবমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়াছিলেন? ঐ বুদ্ধ কি মানুষকে আহ্বান করেন নাই? তিনিও ত মানবের দুঃখে ব্যথিত হইলেন; জরা মরণ ও ব্যাধিতে মানুষ কত কষ্ট পাইতেছে; তিনি ভাবিলেন, এমন কি কিছু নাই, যাহা পাইলে মানুষ জরা, মরণ ও ব্যাধিজনিত ক্লেশ হইতে মুক্তি পাইতে পারে? তিনি সকল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া, রাজত্ব পায়ে ঠেলিয়া, প্রাণের প্রতিমা ভার্য্যা, নবজাত সুকুমার কুমারকে ত্যাগ করিয়া, রাজপুত্র হইয়া ভিখারীর বেশে ছুটিলেন-

—কত তপস্যা, কত সাধনা, কত ক্লেশের পর, লোকের সম্মুখে এসে বলিলেন,—Eureka Eureka আমি পাইয়াছি! আমি পাইয়াছি! সেই ঔষধ পাইয়াছি, সেই মন্ত্র লাভ করিয়াছি,—যাহাতে মানুষের জরা মরণ ও ব্যাধিজনিত দুঃখ ক্লেশ দূর হইবে; মানুষ প্রাণে স্থায়ী শান্তি লাভ করিবে। জগতের মহাজনগণ সকলেই মানবকে ডাকিয়া বলিয়াছেন,—তোমরা কোথায় শান্তির অন্বেষণে ছুটাছুটি করিতেছ,? এস, আমাদের নিকট এস, আমরা এমন কিছুর সন্ধান বলিয়া দিব, যাহা পাইলে আর শোক তাপ পাপ থাকিবে না, দুঃখ বেদনা দূর হইবে, প্রাণে পরাশান্তি লাভ করিবে।

সংসারে মানুষ ত কত দুঃখ বেদনা লইয়া আছে; মানুষ ত পাপ ও তাপের পীড়নে জর্জ্জরিত; রোগ শোক, দারিদ্র্যে কত লোক পীড়িত হইতেছে; কত লোক কত মর্ম্মন্তুদ বেদনায় অস্থির হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতেছে; সংসারে কত সংগ্রাম, কত পরীক্ষা; কত লোক হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতেছে, অথচ দিনের অন্ন সংস্থান করিতে পারিতেছে না; কত লোক রোগ-শয্যায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে; কত লোক প্রিয়জনকে হারাইয়া আকুল প্রাণে ক্রন্দন করিতেছে, কত লোক পাপে পড়িয়া কত ক্লেশে দিন কাটাইতেছে, কেবল কি তাহাই? বাহির হইতে আমরা যাহাদিগকে মনে করি যে, বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে, তাহাদেরও অনেকের অন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখ, দেখিবে সেখানে কত বেদনা, কত দুঃখ তুষানলের ন্যায় জ্বলিতেছে। এই দুঃখ তাপ ও পাপের প্রকোপ যে কেবল যীশু ও বুদ্ধের সময় ছিল, আজ তাহা নাই, তাহা ত নয়; চিরদিনই মানুষ এই পাপ তাপ, দুঃখ ও শোক, দারিদ্র্য ও বেদনা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে; কত মর্ম্মবেদনা পাইয়া মানুষ হাহাকার করিতেছে; এই দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্য, শোক তাপ পাপ, জ্বালা যন্ত্রণা যীশু বুদ্ধের সময়ও ছিল, এখনও আছে। মানুষ সংসারে দুঃখ পাপ ও তাপের মাত্রা হ্রাস করিবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছে; কত নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। কত মানুষ মানবের দুঃখ দেখিয়া ব্যথিত হইয়াছে; তাই মানুষ দুর্ভিক্ষ দেখিলে তাহা নিবারণের চেষ্টা করে; শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির ব্যবস্থা করে; নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য করিয়া ধরণীকে শস্যশ্যামলা করে; কত খাল, ক্যানেল্‌ কাটিয়া অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টির প্রকোপ হইতে মানুষের দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য, ক্লেশ উপশম করিবার জন্য কত চেষ্টা হইতেছে; শিক্ষার বিস্তার দ্বারা মানুষের মন উন্নত ও সবল করিতে চেষ্টা হইতেছে; কত নূতন নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইতেছে, নূতন চিকিৎসাপ্রণালী উদ্ভাবিত হইতেছে; মানুষকে অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য কত মনীষী কতরূপ চেষ্টা করিতেছেন; মানুষের সুখের মাত্রা বৃদ্ধি করিবার জন্য কত ব্যবস্থা হইতেছে; রেল ষ্টীমার বৈদ্যুতিক আলো, বৈদ্যুতিক পাখা, বৈদ্যুতিক ট্রাম, কত নূতন নূতন সুখকর আনন্দদায়ক ব্যবস্থা হইতেছে; মানবের সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক উন্নতি হইতেছে; এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে মানবের সুখের ব্যবস্থাও বৃদ্ধি পাইতেছে। আজ পৃথিবীকে কেমন সুন্দর সাজে সজ্জিত দেখিতেছি; সুখভোগের কতরূপ ব্যবস্থা দেখিতেছি; দুঃখ দারিদ্র্য ক্লেশ, অজ্ঞানতা, অকাল-মৃত্যুজনিত শোক, ব্যাধির হস্ত হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার জন্য এবং অপরদিকে মানুষের বৃত্তিগুলি ফুটাইবার জন্য, মানুষকে নূতন সৌন্দর্য্য, নূতন সুখ, নূতন আরামের আস্বাদ দেওয়ার জন্য কতরূপ নূতন নূতন উদ্ভাবন, নূতন নূতন ব্যবস্থা হইতেছে। কত শিল্পাশ্রম, কত হাঁসপাতাল, কত আতুরাশ্রম, কত অনাথাশ্রম, কত স্কুল কলেজ, কত কত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; মানবের দুঃখ ক্লেশ, দারিদ্র্য দেখিয়া মানুষের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে; তাই তাঁহারা যাহাতে দুঃখের মাত্রা, পাপ ও তাপের মাত্রা লাঘব করিতে পারেন, তার চেষ্টা করিতেছেন। এই সকল চেষ্টা দ্বারা মানুষের উপকার হইতেছে; সংসার উন্নত হইতেছে; ধরা বাসের যোগ্য হইতেছে; মানুষে মানুষে সম্পর্ক বৃদ্ধি পাইতেছে; দেশে দেশে সহানুভূতি বাড়িতেছে; মানুষের দুঃখের মাত্রা লাঘব হইতেছে। এই সকল চেষ্টার দ্বারাই মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশ হইবার সুযোগ হইতেছে; মানব হৃদয়ে যে দেবতা বিরাজিত আছেন, তিনিই অলক্ষ্যে থাকিয়া মানুষকে অনুপ্রাণনা দিতেছেন; তাই মানুষ মানুষের জন্য অশ্রুপাত করিতেছে; তাই মানুষ আপনার অন্নমুষ্টি অপরকে দিয়া সুখী হইতেছে; তাই মানুষ দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া অনাহারে অনিদ্রায় থাকিয়া মানুষের রোগযন্ত্রণা দূর করিতে চেষ্টা করিতেছে; তাই মানুষ মানুষকে পাপপঙ্কে ডুবিতে দেখিলে বেদনা পায়, আহা! বলিয়া উর্দ্ধদিকে তাকায় ও দুইটি আশার কথা বলিয়া তাহাকে পাপ হইতে হাতধরিয়া তুলিয়া উপরে আনিতে চেষ্টা করে; তাই মানুষ যেখানে দুঃখ, যেখানে দারিদ্র্য, যেখানে শোক, যেখানে রোগ, যেখানে পাপ, যেখানে বেদনা, যেখানে অশ্রুজল, সেখানেই যাইয়া উপস্থিত হয়; কেবল সাময়িক রূপে দুঃখতাপ নিবারণ চেষ্টা করিয়াই মানুষ নিবৃত্ত হয় না; দুঃখ দারিদ্র্য, তাপ তাপের মূল যাহাতে উন্মূলিত হয়, দুঃখ বিমোচনের স্থায়ী ব্যবস্থা যাহাতে হয়, তাহার চেষ্টা করিতেছে। এই চেষ্টাতেই মানবের মহত্ত্ব, মানবের দেবত্ব। মানুষ পশু হইতে শ্রেষ্ঠ কিসে? মানুষের হৃদয় আছে, সহানুভূতি আছে, সমবেদনা আছে, প্রেম প্রীতি ভালবাসা আছে; পরকে আপন করিবার শক্তি আছে; পরের জন্য আত্মত্যাগ করিতে পারে; অপরের দুঃখ বিমোচনের জন্য দিনরাত্রি খাটিতে পারে।

কিন্তু এই যে দুঃখ পাপ তাপ বিমোচনের চেষ্টা হইতেছে, ইহাতে কি সংসার দুঃখ তাপ পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছে? দুঃখ তাপ অনেক পরিমাণে যে হ্রাস পায় নাই, এ কথা বলিতে পারি না। হয় ত একদিন আসিবে, যখন মানুষ অন্নাভাবে ক্লেশ পাইবে না, শিক্ষার অভাবে কষ্ট পাইবে না; হয় ত রোগ-যন্ত্রণা নিবারণের আরও সুব্যবস্থা হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও কি প্রাণের বেদনা মানুষের দূর হইবে? অন্নাভাবই কি মানুষের একমাত্র ক্লেশের কারণ? রোগই কি মানুষের একমাত্র দুঃখের হেতু? শিক্ষার অভাবই কি মানুষের সকল বেদনার মূলসূত্র? কত ধনী, শিক্ষিত লোক, বাহিরে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে; কিন্তু তাদের অন্তরে প্রবেশ কর, দেখিবে, কেবল অশ্রুজল, দীর্ঘশ্বাস, মর্ম্মন্তুদ বেদনা। কি যে যন্ত্রণা তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না; অথচ প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

কত উচ্চ প্রাসাদ, সুরম্য উপবন, তাহার পশ্চাতে চাহিয়া দেখ, শ্মশানের অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। কে শোকের বেদনা হইতে মানুষকে উদ্ধার করিবে? মৃত্যু আসিয়া যখন প্রিয়তম পুত্রকে জননীর বক্ষ হইতে লইয়া যায়, কে তখন তাহার প্রাণে সান্ত্বনা দেয়? পাপের সংগ্রামে মানুষ যখন পীড়িত হয়, কে তখন আশার বাণী শুনায়? মানবের কত রকম দুঃখ আছে, বেদনা আছে, হৃদয় ফাটিয়া যায়, হৃদপিণ্ড ছিন্ন করিতে ইচ্ছা হয়, এই সংসার দুঃখের আগার বলিয়া মনে হয়; সুখ নাই, শান্তি নাই, স্থির হইয়া থাকিবার সাধ্য নাই; চারিদিকে যেন আগুন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে; প্রাণ ছটফট করিতেছে। ধন জন, পদ মান সবই আছে; কিন্তু প্রাণের ক্রন্দন থামে না; তোমার কলের জল, বৈদ্যুতিক পাখা সে আগুন নিভাইতে পারে না। বিজ্ঞান দর্শনের উন্নতি হইয়াছে, সাহিত্য ইতিহাসের উন্নতি হইয়াছে, সভ্যতার উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু মানুষের প্রাণের ক্রন্দন ত থামে নাই, হৃদয় বেদনা ত দূর হয় নাই; চক্ষের জল ত মোছে নাই; হাহাকার, আর্ত্তনাদ ত দূর হয় নাই?

কিসে এই দুঃখ, পাপ তাপ, এই বেদনা, যন্ত্রণা দূর হয়? বুদ্ধ বলিয়াছেন, বাসনার বিলয় কর, ধর্ম্মের শরণাপন্ন হও, জরা মরণ ব্যাধিজনিত দুঃখ হইতে মুক্ত হইবে। যীশু বলিয়াছেন, "হে পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত নরনারী আমার নিকট এস, আমি তোমাদিগকে শান্তি দিব।" যীশুর ত ধন জন ছিলনা; তিনি ত ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া বলেন নাই, যে এস ক্ষুধিত পিপাসিত যারা, এই ধন লও, তোমাদের দুঃখ ঘুচিবে। তিনি ত গরীব সূত্রধরের ছেলে। তিনি ত নিজেই বলিয়াছেন,—পাখীদের কুলায় আছে, পশুদের গর্ত্ত আছে, কিন্তু মানব সন্তানের মাথা রাখিবার স্থান নাই। তবে কি দেখাইয়া তিনি সাহস করিয়া বলিলেন,—এস, আমার নিকট এস, আমি তোমাদিগকে শান্তি দিব? রাজা মহারাজারা যাহা বলিতে সাহস করেন না, যীশু যাঁর মাথা রাখিবার স্থানটুকু নাই, তিনি কেমন করিয়া এই ঘোষণা করিলেন, এস পরিশ্রান্ত, ভারাক্রান্ত নরনারী, আমি তোমাদিগকে শান্তি দিব? বুদ্ধ রাজার পুত্র ছিলেন; অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি তিনি; ধনে, পদে মানে যদি জরা মরণ ব্যাধি দূর হইত তিনি তাহা অনায়াসেই করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি কি করিলেন,—অতুল সম্পত্তি পদ মান, রাজত্ব পায়ে ঠেলিয়া ফকির হইলেন; তিনি কি দেখিলেন, কি পাইলেন, ভিখারীর বেশে দ্বারে দ্বারে আসিয়া মানুষকে বলিলেন, এস, জরা মরণ ব্যাধিজনিত দুঃখ ক্লেশ হইতে যদি মুক্ত হইতে চাও, এস আমি তাহার মন্ত্র বলিয়া দিব। লোক দলে দলে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। জগতের মহাজনগণ ভিক্ষাপাত্র হাতেই মানুষের দ্বারে দ্বারে গিয়াছেন, তাহাদিগকে ডাকিয়াছেন, ধন, জন ঐশ্বর্য্য, পদ মান ত্যাগ করিয়া আসিতে ডাকিয়াছেন,, আর মানুষ, স্থির থাকিতে পারে নাই, তাঁদের ডাক শুনে এসেছে, সব ত্যাগ করে এসেছে, দারিদ্র্য দুঃখ বরণ করিয়া লইতে এসেছে; কারণ তারা বুঝিয়াছে ইহাই শান্তির পথ।

যীশু কি বলিয়াছেন?—Seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all those things shall be added unto you—সর্ব্বাগ্রে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ কর, আর সব আপনিই আসিবে। বুদ্ধ বলিয়াছেন,—বাসনার বিলয় কর, ধর্ম্মের শরণাপন্ন হও, জরা-মরণ-ব্যাধিজনিত দুঃখ হইতে মুক্ত হইবে। উপনিষৎকার ঋষি বলিয়াছেন,—

স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা,
তরতি শোকং, তরতি পাপ্মানং,
গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তঃ অমৃতো ভবতি।

সেই আনন্দময়কে জানিয়া সে আনন্দিত হয়; সকল শোক, সকল পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়; হৃদয়ের গ্রন্থি সকল ছিন্ন হয়, আর সে অমৃতত্ব লাভ করে।

জগতের মহাজনগণ মানুষের দৃষ্টি ফিরাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন; মানুষ সুখ শান্তির জন্য ধন, জন, পদ মানের পশ্চাতে ছুটিয়াছে; মানুষ সুখ শান্তির কত উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে, দুঃখ ক্লেশ দারিদ্র্য নিবারণের জন্য কত ব্যবস্থা করিয়াছে; কিন্তু তাঁহারা বলিয়াছেন,—আগে সেই স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ কর, আগে সেই প্রেম-স্বরূপ যিনি, মঙ্গলস্বরূপ যিনি, তাঁহার প্রেম অনুভব কর, দেখিবে সুখ আসিবে, শান্তি আসিবে, সকল দুঃখের অবসান হবে, সকল সংগ্রাম থামিয়া যাবে। তাঁরা এ কথা বলেন নাই যে, সংসারে রোগ থাকিবে না, জরা থাকিবে না, মৃত্যু থাকিবে না, মানুষ মানুষের বিরুদ্ধাচরণ করিবে না; কলহ থাকিবে না; মানুষ উপকারের পরিবর্ত্তে অকৃতজ্ঞতা উপহার পাইবে না; মানুষ প্রেমের বিনিময়ে বিদ্বেষ পাইবে না। বুদ্ধ নিজেই রোগ মৃত্যুর হাত হইতে মুক্ত হন নাই; যীশু নিজেই কাঁটার মুকুট পরিয়াছেন, ক্রশ কাষ্ঠে হত হইয়াছেন; জগতের মহাজনগণ সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে অপমান নির্য্যাতনের মালা পরিয়াছেন; দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইয়াছেন; কিন্তু তবুও তাঁদের প্রাণে শান্তি ছিল; দুঃখ ক্লেশ, রোগ শোক, পাপ তাপ—তাঁহাদিগকে বেদনা দিতে পারে নাই—স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা—সেই আনন্দময়কে প্রাপ্ত হইয়া তিনি আনন্দে দিন কাটান। সকল শোক তাপ পাপ হইতে মুক্ত হয়েন।

হরিসুখে সুখী চিরদিন—
যে জন হরির অধীন,
রোগে শোকে অনাহারে হয় না তাঁর মুখ মলিন।
নাইকো অন্ন গৃহবাস, ছিন্ন কন্থা অঙ্গবাস
পথের কাঙ্গাল হরিদাস হরির অধীন;
তবু সে হাস্যমুখে নাচে গায় মনের সুখে
হরিপদ করি বুকে প্রেমেতে হ'য়ে বিলীন।

এই যে ভক্তের চিত্রটি অঙ্কিত করা হইল, এই চিত্রেতেই লোক আকৃষ্ট হয়, মুগ্ধ হয়; সকল ছাড়িয়া ঐ আদর্শের সন্ধানে ছোটে। যাঁহারা এইরূপ লোককে আহ্বান করিয়াছেন, মানুষ তাঁহাদের জীবন দেখিয়াছে; তাঁহারা কেবল গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধার করিয়া ঈশ্বরভক্তিতে যে পরাশান্তি পাওয়া যায়, এ কথা বলেন নাই; আমরা ত কত বচন উদ্ধৃত করি; তাঁহারা অনেকে শাস্ত্র জানিতেন না, দর্শন জানিতেন না; যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা হয় ত এক এক শাস্ত্রই জানিতেন। আমরা এখন কত শাস্ত্র জানি, কত দর্শন

বিজ্ঞান জানি; ঈশ্বরে ভক্তি হইলে যে প্রাণে শান্তি পাওয়া যায়, তাহার কথা কত শাস্ত্র, সাধুবাক্য, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস হইতে বচন তুলিয়া বুঝাইতে পারি; কত যুক্তি তর্কের অবতারণা করিতে পারি; জগতের মহাজনগণের জীবন মানবের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারি; কিন্তু তাহাতে ত মানুষ ছুটিয়া আসে না? যীশুর পশ্চাতে, বুদ্ধের পশ্চাতে, চৈতন্যের পশ্চাতে ধন জন, বিষয় সম্পদ্ পরিত্যাগ করিয়া মানুষ ছুটিয়া আসিত কেন? যীশু ঐ ক্রুশ কাষ্ঠে বিদ্ধ হইয়াও বলিয়াছিলেন,—Father, forgive them, for they know not what they do—পিতা, ইহাদিগকে ক্ষমা কর—কারণ ইহারা কি করিতেছে, তাহা জানে না। এই যে বাক্যটি—ইহা ত সামান্য নয়। ঐ ক্রুশ কাষ্ঠে বিদ্ধ হইলে কি যে ভীষণ যন্ত্রণা, তার মধ্যেও যে ব্যক্তি উৎপীড়নকারীদিগের জন্য ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতে পারেন, তাঁহার হৃদয়ে প্রেম কত! মানব প্রেমই বা কত আর ঈশ্বর প্রেমই বা কত! তিনি ঈশ্বরের প্রেমে মগ্ন ছিলেন; তিনি দেখিয়াছিলেন, প্রভু তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া আছেন; সকল দুঃখ বেদনা, অপমান, নির্য্যাতনের মধ্যে তিনি তাঁহারই ক্রোড়ে রহিয়াছেন; সুতরাং দুঃখকে ক্লেশকে দুঃখ ক্লেশ মনে হয় নাই। তাঁর প্রেম যে তাঁকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। তাই তাঁহার অন্তরে আনন্দ ও শান্তি; বুদ্ধকেও লোক দেখেছিল, তাঁর চিত্তে উদ্বেগ নাই, প্রশান্ত; দুঃখ শোক তাঁকে ব্যথিত করিতে পারে না

মহাজনগণ সকল ধনে বঞ্চিত; কিন্তু একটি ধন তাঁহাদের আছে, সে ধনের তুলনা নাই; তাহা ঈশ্বরপ্রেম; তাঁরা ঈশ্বর প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছেন; সেই প্রেমের আস্বাদ পেয়ে, তাঁর প্রেমের আবেষ্টনে থাকিয়া, তিনিই জীবনে লীলা করিতেছেন দেখিয়া আনন্দে বিভোর থাকিতেন; অন্য দুঃখ শোক, তাপ তাঁহাদিগকে ক্লেশ দিতে পারিত না; তাই তাঁহারা ডাকিয়া বলিতেন,—হে মানুষ, তুমি কি করিতেছ? সুখ চাও, শান্তি চাও; পাপ হইতে তাপ হইতে মুক্ত হইতে চাও? এস এস, আমাদের কাছে এস; এ ধন মান পদ তোমাদিগকে সে শান্তি দিতে পারিবে না; আমরা সে শান্তির সন্ধান পেয়েছি; এস, আমরা তোমাদিগকে সে সন্ধান বলিয়া দিব, তোমরাও শান্তি পাইবে। মানুষ তাঁহাদের প্রসন্ন বদন, প্রশান্ত চিত্ত, নিরুদ্বেগ জীবন, প্রেমে পরিপূর্ণ মুখ দেখিয়া আশা পাইয়াছে, আনন্দময় জীবনের আভাস পাইয়াছে, তাই ছুটিয়া আসিয়াছে।

একজন ভক্ত সম্বন্ধে এই গল্প আছে,—তাঁহাকে সকলেই ভক্তি করিত। একটি স্ত্রীলোক স্বামী হারাইয়া পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়া তাঁহার নিকট গেল; বলিল,—প্রভু, তুমি সাধু, ভগবান্ তোমার কথা শোনেন্, তুমি আমার স্বামীকে আনিয়া দাও; সাধু স্ত্রীলোকের ভাবগতিক দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন; তাঁকে বলিলেন, আচ্ছা, এক মাস পরে তুমি তোমার স্বামীকে পাইবে, এখন আমি যা বলি তাই কর। তখন সাধু একখানি কুটির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে ঐ নারীকে থাকিতে দিলেন; এবং তাঁহাকে সাধনের মন্ত্র দিলেন। সেখানে আর কেহ যাইবে না; দিনরাত্রি ঐ স্ত্রীলোক ঐ মন্ত্র জপ করিবে। এক মাস পরে, গ্রামের সকল লোক এসে উপস্থিত; দেখিবে, সাধুর কৃপায় ঐ অনাথা স্ত্রীলোক স্বামী লাভ করিয়াছে। যখন দ্বার উন্মুক্ত হইল, দেখা গেল, স্ত্রীলোকের চক্ষে জলধারা বহিতেছে—চক্ষু নিমীলিত, কিন্তু বদন প্রসন্ন; তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইল, তুমি স্বামী পাইয়াছ? স্ত্রীলোক বলিল, হাঁ পাইয়াছি। এ কোন্ স্বামীর কথা বলা হইল? যিনি জগৎস্বামী তাঁহাকে পাইয়া তাঁহার মধ্যেই স্বামীকেও দেখিয়াছে; প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে, হৃদয়ে শান্তি আসিয়াছে।

সেই যে স্বামী যিনি, সেই যে জগতে একমাত্র পুরুষ যিনি, তাঁহাকে পাইতে হয়, তাঁহার প্রেম দেখিতে হয়, তাঁহার প্রেমে ডুবিতে হয়; তবেই সকল দুঃখের শান্তি হয়। সে প্রেম কোথায়? সে প্রেমের পরিচয় আমরা বাহিরে খুঁজিয়া থাকি। আমরা অনলে অনিলে তাঁর প্রেম খুঁজি, আমরা পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোকে, বিহঙ্গমের সঙ্গীতে, নদীর কুলু কুলু ধ্বনিতে, বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর শব্দে তাঁহার প্রেম দেখিতে চাই; সেখানে যে তাঁর প্রেম আছে তাহাতে সন্দেহ নাই; তাঁহার প্রেমেই জগৎ এত সুন্দর, প্রকৃতি এত মধুর; তাঁহার প্রেমেই জগৎ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সেখানে তাঁর প্রেমের প্রকৃষ্ট পরিচয় নয়। আমরা সাধুগণের—ভক্তগণের জীবনের ঘটনাবলিতে তাঁর প্রেম দেখি—খৃষ্টের জীবনে, চৈতন্যের জীবনে, দেবেন্দ্রনাথের জীবনে তাঁহার প্রেমের নিদর্শন দেখি; ইহা ঠিক্; সাধুর জীবনে তাঁহার প্রেমের পরিচয় পাইয়া আমাদের অনুপ্রাণনা জন্মে, প্রাণে আশা আসে। কিন্তু সেখানে যে প্রেম দেখা যায়, তাহাতেও প্রাণে তৃপ্তি আসে না, প্রাণের সংশয় ঘোচে না। প্রেম দেখিতে হয় নিজের জীবনে; তুমি আমি ক্ষুদ্র; কিন্তু তোমার আমার জীবনেও তিনি লীলা করিতেছেন; তাঁহার প্রেম অসীম; তিনি ধূলিমুষ্টিকে স্বর্ণরেণুতে পরিণত করেন। নিজের জীবনেও প্রেম দেখিতে যাইয়া অনেক সময়ে আমরা ভুল করি; যেখানে অপ্রত্যাশিত ভাবে বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইয়াছি, কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছি, সেখানেই তাঁহার প্রেমের প্রকৃষ্ট পরিচয় বলিয়া মনে করি; বাস্তবিক আমাদের প্রেমাস্পদ যাঁহারা, তাঁহাদের প্রেমের পরিচয় কি তাঁহারা আমাদিগকে কখন কি উপহার দিয়াছেন, কখন কিরূপ আহার করাইয়াছেন, কখন কিরূপ পোষাক পরিচ্ছদ দিয়াছেন তাহা দ্বারা হয়? তা ত নয়। তাঁহারা এসব দিতেও পারেন, নাও দিতে পারেন; সুরস জিনিষ খাওয়াতেও পারেন, না খাওয়াতেও পারেন; তাহা দ্বারা প্রিয়জনের প্রেমের পরিচয় হয় না; তাঁর প্রেমের পরিচয়, একটু চাহনিতে পাই, একটু হাসিতে পাই, একটু মিষ্টবাক্যেও পাই, একটু কটু বাক্যেও পাই। প্রভু যে প্রেম করেন, তাহা কেবল সুখসম্পদ্ দ্বারা বোঝা যায় না; তাহা কেবল কৃতকার্য্যতা দ্বারা পরিমাপ হয় না; তাহা কেবল বিপদে উদ্ধার দ্বারা বুঝিতে পারা যায় না; দুঃখের সময়, রোগের সময়, অকৃতকার্য্যতার সময়ও তাঁহার প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। সে প্রেম যে কি, তাহার কথা কি বলিব; কোনও ভক্তিভাজন ভক্ত নিজের অনুভূত ভাব, এই সঙ্গীতটিতে বর্ণনা করিয়াছেন;—

ইনি যখন দয়া করেন, কি যে তখন হয়ে যাই,
কারে কব সে সব কথা? শুন্‌লে পাগল বল্‌বে ভাই।

চাঁদ এসে কোলে পড়ে,
প্রাণে মধু-নিঝর ঝরে,
হীরা মাণিক থরে থরে
হৃদয় মাঝে দেখ্‌তে পাই।
যারে দেখি সেই মিষ্টি
সবাই করে সুধাবৃষ্টি,
ঘুচে যায় ইষ্টি রিষ্টি,
শত্তুর মিত্তির ভেদ নাই।
কি যেন কি পিয়ে পিয়ে,
ভাবে হয় বিভোল হিয়ে,
ধুলো মুঠো হাতে নিয়ে
শত শত চুমো খাই।

এই প্রেম যাঁরা অনুভব করিয়াছেন, তাঁদের জীবন দেখিয়াই, তাঁদের গতিবিধি, ভাবগতিক, চলাফিরা, কথাবার্ত্তা দেখিয়াই মানুষ বুঝ্‌তে পারে, তাঁরা এমন কিছু পেয়েছেন যাতে দুঃখ শোক, জ্বালা যন্ত্রণা পাপ প্রলোভনের উপরে উঠিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারিয়াছেন,—সেই আনন্দময় যে ঘিরিয়া আছেন, তিনি যে দুঃখ বেদনা দেখিতেছেন, তিনি যে প্রেমস্পর্শে সকল জ্বালা জুড়াইতেছেন, তিনি যে কত আদর করিতেছেন, তিনি যে হাত ধরিয়া অমৃতের দিকে লইয়া চলিয়াছেন, তিনি ধূলিকণাকে সোণা করেন, তিনি যে মৃত্যুকে অমৃতের সোপান করেন; তিনি যে কখনও ছাড়েন না; এই ভাব যিনি অনুভব করিয়াছেন, তিনি ত দুঃখে শোকে অধীর হন নাই; তিনিই ডেকে বলিতে পারেন,—পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত নরনারী, তোমরা এস, আমি তোমাদিগকে শান্তির সন্ধান বলিয়া দিব, আর লোকে তাঁহার জীবন্ত আহ্বান শুনিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ ছুটিয়া আসে। সেই আনন্দময়কে জানিলেই দুঃখ দূর হয়, বেদনা দূর হয়। ব্রাহ্মসমাজকে সেই সন্ধান বলিয়া দিতে হবে; কেবল শাস্ত্রবাক্য দ্বারা নয়, কেবল সাধুবচন দ্বারা নয়, কেবল দর্শন বিজ্ঞানের যুক্তিদ্বারা নয়, জীবনে দেখাইতে হইবে যে, তাঁহাকে পাইয়া, সেই আনন্দময়কে লাভ করিয়া সকল দুঃখ শোক বেদনা ভুলিতে পারা যায়, জীবন মধুময় হয়, আনন্দময় হয়, শত্রুকেও মিত্র মনে হয়, পরকে আপন মনে হয়, সকলকে আপনার বলিয়া প্রেমে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হয়।

তবে আজ সাধুদের কথা শুনি, ভক্তদের আশার বচন শুনি; দুঃখী তাপী, পাপী আমরা সেই প্রভুর চরণে জীবন অর্পণ করি, তাঁহার প্রেম জীবনে প্রত্যক্ষ করি, অনুভব করি; আমাদের জীবন ক্ষুদ্র, কিন্তু এই ক্ষুদ্র জীবনের ঘটনাগুলিও যদি প্রার্থনাসহকারে দেখি, তবে এখানেও তাঁহার প্রেম দেখিতে পাওয়া যাইবে; তিনিই প্রেমবাহুতে আমাদিগকে ঘেরিয়া আছেন, তিনি আমাদিগের সুখ দুঃখ, শোক তাপ, উত্থান পতন সব দেখিতেছেন; তিনিই হাত ধরিয়া লইয়া চলিয়াছেন; তিনি যখন কাছে, তিনি যখন এত অযাচিত ভাবে স্নেহ করেন, তখন আর দুঃখ কি,—ভয় কি? তখন আর শোক কি, তাপ কি? পাপকেই বা ভয় করি কেন? তিনি কত ভালবাসেন, কত সান্ত্বনা দেন, কত বল দেন; দুঃখ দিয়াও তিনিই মঙ্গলের পথে নিয়ে চলেন; তিনিই পিতা, স্বামী, বন্ধু হয়ে আছেন; তিনিই সখা ও সুহৃৎ, তিনিই জীবনস্বামী; তখন সাধুরা যে বলেছেন, এস ভারাক্রান্ত পরিশ্রান্ত নরনারী, আমার নিকট এস, তোমাদিগকে শান্তি দিব, তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া তখন আমরাও বলিতে পারিব, লোকের নিকট আশার কথা বলিতে পারিব, যে ব্যথিত, যে পীড়িত, যে দুর্ব্বল, যে ডুবিতেছে, যে নিরাশায় পড়িয়া আছে, তাহাকে বলিতে পারিব—ভয় নাই! ভয় নাই! তিনি সঙ্গে আছেন; তাঁর প্রেম দেখ, তাঁর দিকে তাকাও, তাঁর প্রেমে নির্ভর কর, দুঃখ যাইবে, শোক যাইবে, ব্যথা দূর হইবে, পাপ যাইবে, প্রাণে নির্ম্মল শান্তি পাইবে। তাঁর প্রেম অসীম—সে প্রেমের কথা বলিব, নিজে সেই প্রেমের লীলা দেখিয়া কৃতার্থ হইব।

স্বর্গীয় অমরচন্দ্র দত্ত।

(শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পুত্র শ্রীমান্ পরিমল দত্ত কর্ত্তৃক পঠিত)

পূজনীয় পিতৃদেব বাঙ্গলা ১২৬১ (ইং ১৮৫৪) সনে ৫ই আশ্বিন ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন শ্রীবাড়ী গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। বিগত ২৫শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় ৬৪ বৎসর ৮ মাস বয়সে তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ময়মনসিংহ জেলাস্থ আটিয়া পরগণার অন্তর্গত বানাইল গ্রাম তাঁহার পৈতৃক বাসভূমি। কিন্তু ইনি মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন ও মাতুলের মাতুল সেরপুরবাসী স্বর্গীয় গুরুচরণ নাগ মহাশয়ের গৃহে প্রতিপালিত হন। ইঁহার পিতার নাম স্বর্গীয় ব্রজনাথ দত্ত। পিতৃদেব একবারমাত্র পিতৃগৃহ দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। শৈশবেই তিনি পিতৃহীন হইয়া কখনও শ্রীবাড়ীতে মাতুলগৃহে, কখনও বা সেরপুরে বাস করিতেন। শ্রীবাড়ীর ও সেরপুরের পাঠশালায় তাঁহার বাল্যশিক্ষা হয়।

যখন সেরপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় নাবালক ছিলেন, তখন পিতৃদেবের মাতুল তৎকালপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় হলধর মজুমদার মহাশয় তাঁহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার যত্নে উক্ত চৌধুরী মহাশয় অসাধারণ উন্নতি লাভ করেন। অতঃপর মজুমদার মহাশয় তাঁহার ষ্টেটের প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন।

কিছুকাল পর সেরপুরে স্কুল স্থাপিত হইলে পিতৃদেব সেই স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বিশ্বাস তৎকালে এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ, কর্ত্তব্যপরায়ণ শিক্ষকের দৃষ্টান্তে পিতৃদেবের জীবনে অতি সুফল ফলিয়াছিল।

সেরপুরে স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরীর বাড়ীতে ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইত; এবং তাহাতে আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা হইত। তদ্ব্যতীত তাঁহার গৃহে ভারতবর্ষীয় সভার অধিবেশনে সমাজ ও রাজনীতির আলোচনায় এবং বিদ্যোন্নতিসাধিনী সভার অধিবেশনে পিতৃদেব যাইতেন। কিন্তু এই অল্প বয়সে সভার কার্য্যের অতি অল্পই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। কিছুদিন পর তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স ১২।১৩ বৎসরের অধিক নহে। এই বয়সে

এই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন কি না এ বিষয়ে তাঁহার মাতুল মহাশয়ের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়, এজন্য তাঁহার মাতুল তাঁহাকে মাইনর পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। তদনুসারে তিনি মাইনর পরীক্ষার পাঠ্যই পড়িতে আরম্ভ করিলেন। প্রায় তিন বৎসর পাঠ করিয়া উক্ত পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলেন, এবং মাসিক ৫৲ টাকা বৃত্তি পাইয়া ময়মনসিংহ জিলা স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। ময়মনসিংহে পাঠ্যাবস্থায় প্রসিদ্ধ উকিল স্বর্গীয় গঙ্গাদাস গুহ মহাশয়ের বাসায় থাকিতেন। তাঁহার বাসায় বহু ছাত্র থাকিত। এই সকল ছাত্রের অনেকেই শাখা ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন। জিলা স্কুলে "মনোরঞ্জিকা" নামে এক সভা ছিল। জিলা স্কুল, নর্ম্মাল স্কুল এবং বাঙ্গলা স্কুলের বয়স্ক অনেক ছাত্র ইহার সভ্য ছিলেন; একটি প্রার্থনা করিয়া এই সভার কার্য্য আরম্ভ হইত। মনোরঞ্জিকার সভ্যদের মধ্যে কেহ কেহ শাখা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন; পিতৃদেব তাঁহাদের সঙ্গে মিলিয়া ব্রাহ্মসমাজে যাইতে আরম্ভ করেন। তখন ব্রাহ্মসমাজ অতিশয় সজীব ছিল। প্রতি শনিবার এক এক সভ্যের বাসায় উৎসাহের সহিত উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তন হইত। তিনি এই সঙ্কীর্ত্তনে উপস্থিত হইতেন। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িবার সময় আষাঢ় মাসে পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্ম-সমাজের প্রচারক শ্রদ্ধেয় বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয় ময়মনসিংহে আগমন করেন। তখন বাবু গিরিশচন্দ্র সেন জেলা স্কুলের পণ্ডিত ছিলেন। ইহার বাসায় প্রত্যহ উপাসনা ও আলোচনা হইত। পিতৃদেব তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইলেন। পিতৃদেব সেই বৎসর ২৩শে আষাঢ় শাখা সমাজের উৎসবে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। এইসঙ্গে আরও অনেকে দীক্ষিত হন। তন্মধ্যে তাঁহার প্রিয় সুহৃদ শ্রদ্ধাস্পদ কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় একজন। তিনি কৃষ্ণ বাবুর সঙ্গে একই বাসায় থাকিতেন। বাবু শরচ্চন্দ্র রায়, বাবু শ্রীনাথ চন্দ, বাবু মধুসূদন সেন প্রভৃতি সমবিশ্বাসিগণ তাঁহার সহায় ছিলেন। তৎকালে বাবু গোপীকৃষ্ণ সেন, বাবু কালীকুমার বসু এবং বাবু আনন্দনাথ ঘোষ যুবক ব্রাহ্মদিগের অভিভাবক স্বরূপ ছিলেন। ইঁহাদিগের সহৃদয়তায় নবাগত ব্রাহ্মগণ যথেষ্ট উপকৃত হইতেন। আষাঢ়ের উৎসবের পর সাধু অঘোরনাথ ময়মনসিংহে উপস্থিত হন। শুনিয়াছি তাঁহার ঐকান্তিক উপাসনা, সরল প্রার্থনা এবং অধ্যাত্ম বিষয়ের আলোচনায় ময়মনসিংহের ব্রাহ্মগণের মধ্যে এক নবজীবনের সঞ্চার হয়। ইনি যে সকল উপদেশ দিতেন যুবক ব্রাহ্মগণ তাহা লিখিয়া লইতেন এবং সেইগুলি পালন করিবার জন্য যত্ন করিতেন।

শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণবাবু এবং পিতৃদেব ৺গঙ্গাদাস বাবুর বাসায় থাকিতেন; দীক্ষার পরে হিন্দুসমাজের আন্দোলনের প্রবলতার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের পংক্তি বর্জ্জন আরম্ভ হইল। তাঁহারা ভিন্ন স্থানে আহার করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তিনি তাঁহার আত্মীয় ৺আনন্দনাথ ঘোষ মহাশয়ের গৃহে আশ্রয় লইলেন।

১৮৭২ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পিতৃদেব কলিকাতায় গেলেন। মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত মালুচী নিবাসী ৺কৃষ্ণদয়াল রায় মহাশয় তখন কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। পিতৃদেব তাঁহার বাসায় থাকিয়া ডফ্ কলেজে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কলিকাতায় তখন ছাত্রদের জন্য যে সকল সভা সমিতি ছিল, পিতৃদেব সেই সকলের সঙ্গে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিতেন। তখন সুপ্রসিদ্ধ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিবিধ জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, পিতৃদেব অতিশয় শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সহিত সেই সকল কার্য্যে যথাসম্ভব যোগ দিয়া আপনার জীবন ভবিষ্যৎ কর্ম্মক্ষেত্রের উপযুক্ত করিয়া গঠন করিয়াছিলেন।

পিতৃদেব "ডফ্ কলেজে" এফ্, এ ক্লাস্ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার স্বাস্থ্য অতিশয় ভগ্ন হইয়া পড়াতে পাঠ পরিত্যাগ করিলেন।

অতঃপর কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে ময়মনসিংহে নবপ্রতিষ্ঠিত ভারতমিহিরের সহকারী সম্পাদকের কার্য্য গ্রহণের জন্য বাবু কালীনারায়ণ সান্যাল তাঁহাকে পত্র লিখিলেন। সংবাদ-পত্রের প্রতি তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই অনুরাগ ছিল। এইটিই উত্তম সুযোগ মনে করিয়া তিনি ঐ কার্য্য গ্রহণ করিলেন এবং ইং ১৮৭৮ সনের ফাল্গুন মাসে ময়মনসিংহ নগরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কর্ম্মজীবনের ইহাই আরম্ভ। "ভারতমিহির" সংবাদ-পত্র ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত হইয়া বঙ্গদেশে কিরূপ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল তাহা অনেকেই অবগত আছেন। বাবু অনাথবন্ধু গুহ উহার সম্পাদকরূপে সর্ব্বত্র খ্যাতি লাভ করিয়া-ছিলেন।

পিতৃদেবও তাঁহার সহকারীরূপে তখন সামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই। তিনি কিছুদিন উক্ত পত্রের সম্পাদকও ছিলেন। পিতৃদেব ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত "সঞ্জীবনী" পত্রিকার অন্যতম পরিচালক ছিলেন। ইং ১৮৭৮ হইতে ১৯০৪ সন পর্য্যন্ত তিনি "চারুবার্ত্তার" সম্পাদক এবং অতঃপর "চারুমিহিরে"র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সহকারী সম্পাদক এবং সম্পাদকের কার্য্য করেন। ময়মনসিংহের কৃষিশিল্প ইত্যাদির উন্নতির জন্য ইং ১৮৭৭ সনে এই সহরে সারস্বত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৮ সনে পিতৃদেব ইহার কোষাধ্যক্ষ হন ও তৎপর কিছুদিন ইহার সম্পাদকের কার্য্য করেন। প্রায় ত্রিশবৎসর কাল তিনি এই সমিতির প্রাণরূপে থাকিয়া ইহার পরিচালন করেন।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ময়মনসিংহে এরূপ কোন সৎকার্য্য ছিল না যাহাতে তিনি প্রবর্ত্তক কিংবা উৎসাহদাতা রূপে সংযুক্ত ছিলেন না। তিনি ছাত্রসমাজের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। স্থানীয় জেলা স্কুলে সকল ছাত্রের পাঠের সুবিধা হয় না দেখিয়া তিনি ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে "ময়মনসিংহ ইনষ্টিটিউশন্" নামে স্কুল স্থাপন করেন। এই স্কুলই এখন ময়মনসিংহ সিটি কলেজিয়েট্ স্কুল নামে সর্ব্বত্র পরিচিত। শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠাতারূপে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই স্কুলের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। আনন্দমোহন কলেজ যখন ময়মনসিংহ সিটি কলেজ নামে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন পিতৃদেবই উহার প্রধান প্রবর্ত্তক ছিলেন। তাঁহার যত্ন ও উৎসাহেই এই স্থানে কলেজ স্থাপিত হইতে পারিয়াছিল। গোপনে বিপন্নের সাহায্য এবং সৎকার্য্যে দান করা তাঁহার অভ্যাস ছিল।

নিজে অবস্থাপন্ন না হইয়াও অনেক দরিদ্র ছাত্রকে সাহায্য

এবং ময়মনসিংহ ইন্‌ষ্টিটিউশন্ প্রতিষ্ঠাকালে তজ্জন্য অর্থদান করিয়াছিলেন। পিতৃদেব "লহরী", "অরূপা","হরিবল্লভের স্নেহ", "নীরাজা", "আকার ইঙ্গিত" প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যিক সমাজে সুপরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রণীত কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানের স্কুলে অনেক দিন অধীত হইয়াছে। "হাজি মহম্মদ মহসীন" তাঁহার লিখিত জীবনচরিত। অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহার লিখিত মহাত্মা আনন্দমোহন বসুর জীবনচরিত যন্ত্রস্থ হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ এখনও মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই।

যখন পিতৃদেব ময়মনসিংহ ইন্‌ষ্টিটিউশন্ স্থাপন করিয়া ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ ভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন ব্রাহ্মছাত্রদের ইচ্ছানুসারে তিনি প্রতি শনিবার সন্ধ্যাকালে ব্রহ্মমন্দিরে সংগীত ও বক্তৃতা করিতে প্রবৃত্ত হন। শুনিয়াছি, "তাঁহার কৃত নব নব ভাবপূর্ণ সংগীত ও কবিত্বপূর্ণ উপদেশ ছাত্রগণের বিলক্ষণ আকর্ষণের বস্তু ছিল।" তাঁহার কৃত আরও বহু সংগীত সঙ্কীর্ত্তন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। মাঘোৎসব সময়ে তিনি অনেক বার নগরসংকীর্ত্তন রচনা করিয়া দিয়াছেন। গত মাঘের উৎসবে তাঁহার রচিত সংকীর্ত্তন শেষবার এই নগরে গীত হইয়াছে।

পিতৃদেব অনেক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মদোকানে শরৎবাবুর সঙ্গে বাস করিতেন। তাঁহার মাতৃদেবী তদীয় আত্মীয় কবিবর দীনেশচরণ বসু মহাশয়ের বাসায় থাকিতেন। ভক্তিভাজন শ্রীনাথ চন্দ মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "মাতার একান্ত ইচ্ছা, তাঁহার একমাত্র পুত্র বিবাহ করিয়া সংসার-ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হয়েন। কিন্তু পুত্র সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। যাহা হউক, পরিণামে মাতার ইচ্ছাই জয়লাভ করিল। পুত্র বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন।" বিবাহের পূর্ব্বে আমাদের বর্ত্তমান বাটী যে জমিতে নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা ক্রয় করিলেন। পিতৃদেবই এই ব্রাহ্মপল্লীর প্রথম অধিবাসী। তাঁহার মাতৃদেবী একজন নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা ছিলেন; তাঁহার যেমন ধর্ম্মনিষ্ঠা তেমনি প্রখর বুদ্ধি, উদার হৃদয় ও গভীর সন্তানস্নেহ ছিল। যশোহর জেলার বাঘ আঁচড়া গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় অমৃতলাল মল্লিক মহাশয় আমার ভক্তিভাজন মাতামহ ছিলেন। মাতামহী ঠাকুরাণী বৃদ্ধ বয়সে এই একমাত্র কন্যার বৈধব্য দেখিয়া এবং গুণবান্ জামাতা হারাইয়া শোকসাগরে ভাসিতেছেন।

পিতৃদেবের কর্ম্মবহুল পবিত্র জীবনের কাহিনী সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করিবার শক্তি আমার নাই, এবং এই ক্ষুদ্র লিপিতেও আমি সে চেষ্টা করিও নাই। অদ্য তাঁহার পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার পূত জীবনের কেবল স্থূল কতিপয় ঘটনামাত্র উল্লেখ করিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করাই আমার উদ্দেশ্য এবং তাহাই করিতেছি।

এই পুণ্যাত্মা কর্ম্মবীরের সাধুজীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যখন আমাদিগের নিজ জীবনের দিকে তাকাই, তখন আমরা যে তাঁহার কত অযোগ্য সন্তান তাহা বুঝিয়া লজ্জায় অবনতমস্তক হই। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন পিতৃদেবের পবিত্র পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিবার চেষ্টা যেন আমাদের হয়।

পিতৃদেব আমাদের এই ক্ষুদ্র পরিবারটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কি যে কঠোর সংগ্রাম করিয়া গেলেন, তাহা অনেকেই জানেন। কিন্তু নানা কারণে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই; এজন্য তিনি কতই আক্ষেপ করিয়াছেন। বিধাতার চরণে সকাতরে প্রার্থনা করি তিনি তাঁহার প্রাণে শান্তি বিধান করুন।

ভ

ব্রাহ্মসমাজ।

বি,এ পরীক্ষা—শ্রীমতী আশাবতী সরকার বেথুন কলেজ হইতে বি,এ পরীক্ষায় ইংরেজীতে দ্বিতীয় বিভাগে অনার্স পাশ করিয়াছেন।

সিটি কলেজ হইতে বি,এ পরীক্ষায় ১৬ জন ছাত্র অনার্স পাশ হইয়াছে; ১ জন গণিতে প্রথম বিভাগে ১১ জন ইংরেজীতে ও ৪ জন দর্শনে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

বিবাহ—বিগত ৩০এ মে গিরিডিতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী লতিকার সহিত শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদারের পুত্র শ্রীমান্ সুধাংশুকুমারের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। বিবাহ ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে রেজেষ্টারী হইয়াছে। ভগবান্ নবদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা—ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় হইতে ১২ জন ছাত্রী পরীক্ষায় উপস্থিত হইয়াছিল; সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে; ৯ জন প্রথম বিভাগে ও ৩ জন দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করিয়াছে।

কলিকাতা সিটি কলেজিয়েট্ স্কুল হইতে ৩৮ জনের মধ্যে ২৩ জন প্রথম বিভাগেও ১০ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ময়মন সিংহ সিটি কলেজিয়েট্ স্কুল হইতে ৩৪ জন ছাত্র প্রথম বিভাগে ১৯ জন দ্বিতীয় বিভাগে ও ২ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ব্রাহ্ম বয়েজ স্কুল হইতে ২৪ জনের মধ্যে ৭ জন প্রথম বিভাগে ও ৮ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

ঢাকা ইষ্টবেঙ্গল ইন্‌ষ্টিটিউসন হইতে ৫ জন প্রথম বিভাগে ১৩ জন দ্বিতীয় বিভাগেও ১ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

পারলৌকিক—বিগত ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ময়মনসিংহে পরলোকগত অমরচন্দ্র দত্তের শ্রাদ্ধক্রিয়া তাঁহার পুত্র শ্রীমান পরিমল দত্ত কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী ঢাকা হইতে তথায় গমন করেন। শুক্রবার অতি প্রত্যূষে সমাধিক্ষেত্রে অমরবাবুর জীবনবন্ধু ও সহকর্ম্মী শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ চন্দ প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা করেন। তৎপরে শ্রাদ্ধস্থানে একটী সঙ্গীতের পর শ্রীযুক্ত হরানন্দ গুপ্ত পরলোকতত্ত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রীয় শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। গুরুদাসবাবু উদ্বোধন ও আরাধনা করেন এবং শ্রীমান

পরিমল তাঁহার পিতার জীবন ও কার্য্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করেন। তদনন্তর শ্রীনাথবাবু অমরবাবুর ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা ও নানা আকারে ইহার পরিচর্য্যার বিষয় অনুপ্রাণিত ভাষায় বিবৃত করিয়া প্রার্থনা করেন। গুরুদাসবাবু পরলোকতত্ত্ব উপদেশ প্রদান ও প্রার্থনা করিয়া প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানের উপসংহার করেন। পুনরায় অপরাহ্ণে বিশেষভাবে অমরবাবুর পত্নীর সান্ত্বনার্থ ব্রাহ্ম-মহিলাদিগকে লইয়া একটি বিশেষ উপাসনা হয়, তাহাতেও গুরুদাসবাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং আত্মার অমরজীবন সম্বন্ধে কিছু বলেন। যে গৃহে অমরবাবু দেহত্যাগ করেন, সন্ধ্যায় সেখানে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত প্রমত্ত ভাবে সংকীর্ত্তন হয়। তৎপর গুরুদাসবাবু উপাসনা করেন। পারলৌকিক অনুষ্ঠানে সহরের বহুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরলোকগত আত্মার প্রীত্যর্থে তাঁহার পুত্র বিবিধ জনহিতকর কার্য্যে ১৬ দান করেন। পরবর্ত্তী রবিবারে তাঁহার গৃহে সমবেত বহুসংখ্যক দরিদ্রকে চাউল ও পয়সা বিতরণ করা হয়। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান করা হয় :—

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—প্রচারফণ্ড ১, দাতব্যফণ্ড ১, দুর্ভিক্ষ ফণ্ড ১, সাধনাশ্রম ১। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ—প্রচার ফণ্ড ১। ঢাকা:—ইষ্ট বেঙ্গল ব্রাহ্মসমাজ—প্রচারফণ্ড ১, অনাথ ব্রাহ্মপরিবার ফণ্ড ১, অনাথাশ্রম ১, বিধবাশ্রম ১, বঙ্গীয় হিতসাধকমণ্ডলী ১, বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রম ১, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ১, লিট্‌ল্ সিস্‌টার অব্ দি পুয়োর ১, রাধানগর—রামমোহন স্মৃতিমন্দির ১, ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ ২, মোট ১৬।

বিগত ১১ই জ্যৈষ্ঠ দার্জ্জিলিং ব্রাহ্মসমাজে পরলোগত অমর-চন্দ্র দত্তের পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রীমতী সুশীলা বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন ও শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু সংক্ষেপে অমরবাবুর জীবন ও কার্য্য সম্বন্ধে কিছু বলেন।

বিগত ২০শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার প্রাতে বরিশালের প্রাচীন ব্রাহ্ম স্বর্গীয় আনন্দমোহন দত্তের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান তাঁহার বরিশালস্থ ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। ঢাকা এবং কলিকাতা এবং কিশোরগঞ্জ হইতে বহু আত্মীয়স্বজন সম্মিলিত হইয়াছিলেন। এই অনুষ্ঠানে আনন্দ বাবুর বহু বন্ধুবান্ধব, ভূতপূর্ব্ব ছাত্র, এবং সহরের অনেক পদস্থ ব্যক্তি এবং ব্রাহ্মসমাজের নরনারী যোগদান করিয়াছিলেন। ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন হয়, তৎপরে উপাসনা, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস বি, এ, গীতা, উপনিষৎ হইতে আত্মার অমরত্ববিষয়ক তত্ত্বপাঠ ব্যাখ্যা করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু মনোমোহন দত্ত প্রথমে প্রার্থনা করিলে কনিষ্ঠ পুত্র বাবু সুরেন্দ্র-মোহন দত্ত পিতার সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করেন। জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত হরকিশোর বিশ্বাস পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেন। দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী সুবালা হালদার সংক্ষেপে পিতার জীবনপ্রসঙ্গ পাঠ করিয়া প্রার্থনা করেন। বাবু রাজকুমার ঘোষ আনন্দবাবুর জীবনের প্রেম, ছাত্রবাৎসল্য ও ও ত্যাগের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া প্রার্থনা করেন। সর্ব্বশেষে আচার্য্য পরলোকগত আত্মার সরলতা উদারতা, প্রেম, পবিত্রতা বিষয়ক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া প্রার্থনা করেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময়ে প্রায় ৪০০ শত ভিখারী সমবেত হইলে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী তাহাদিগকে পরলোকগত আত্মার গুণাবলী উল্লেখ করিয়া উপদেশ দেন ও প্রার্থনা করেন। তৎপরে তাহাদিগকে পয়সা এবং তণ্ডুল বিতরিত হয়।

২১শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার প্রাতে ব্রাহ্ম শ্মশান ভূমিতে আনন্দ বাবুর পবিত্র দেহ ভস্ম সমাহিত করা হয়। মনোমোহন বাবু প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত দান প্রতিশ্রুত হইয়াছে :—

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে একটী স্থায়ী ফণ্ড ৫৫০ টাকা দৌহিত্র সুধীন্দ্রকুমার হালদার ১০০, দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সুবালা হালদার ১০০, কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অবলা বিশ্বাস ২৫, প্রথমা কন্যা পরলোকগতা সরলা বিশ্বাসের পুত্রদ্বয় অজয়কুমার ও সুধীরকুমার ২৫, জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু মনোমোহন দত্ত এবং কনিষ্ঠ পুত্র বাবু সুরেন্দ্রমোহন দত্ত ৩০০, মোট——৫৫০।

এই স্থায়ী দণ্ডের টাকা গবর্ণমেণ্টের কোন ব্যাঙ্কে রাখা হইবে এবং ইহার সুদদ্বারা বরিশালস্থ দুস্থ ব্রাহ্ম পরিবার অথবা ধর্ম্ম প্রচারকদিগের সন্তানগণের শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইবে। দাতাগণের ইচ্ছানুসারে অন্য কোন উদ্দেশ্যেও ব্যয় হইতে পারিবে।

এতদ্ব্যতীত পুত্রগণ নিম্নলিখিত ভাবে দান করিলেন :—

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতা—সাধারণ ফণ্ড ১০, মিশন ফণ্ড ১০, ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিল্ডিং ফণ্ড ১০, কুমিল্লা ব্রাহ্ম-সমাজ ৫, ঢাকা বিধবাশ্রম—২০, ঢাকা অনাথ ব্রাহ্মভাণ্ডার ৫ কলিকাতা দুস্থ ব্রাহ্মপরিবার ৫, বরিশাল রামকৃষ্ণ মিশন ৫, Littele Brothers of the Poor ৫, বরিশাল নাইট স্কুল ৫, শিলং অনাথাশ্রম ৫, ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজ ৫, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে ১০, কালীকচ্ছ মধ্যবাঙ্গালা বালিকা-স্কুল পুরস্কার দুই বৎসরের জন্য ৫, সরাইল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে মেট্রিক পরীক্ষায় যে ছাত্র ইংরেজীতে প্রথম হইবে—(২ বৎসরের জন্য) পুরস্কার ৫, বরিশাল জিলা স্কুলে যে ছাত্র প্রতিযোগিতায় ইংরেজীর ২য় বেলার পরীক্ষায় প্রথম হইবে ২ বৎসরের জন্য পুরস্কার ৫, পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ ৫, ঢাকা নববিধান ব্রাহ্মসমাজ ৫, বরিশাল মূকবধির বিদ্যালয় ৫, মোট ১৬০ টাকা।

পরলোকগত প্রাচীন ব্রাহ্ম আনন্দমোহন দত্তের শ্রাদ্ধের দিনে তাঁহার আত্মার কল্যাণের জন্য এবং মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁহার পত্নী, পুত্রকন্যা প্রভৃতির সহিত সমবেদনা প্রকাশ জন্য ধুবড়ীস্থ গবর্ণমেণ্ট উকিল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু বি, এল,এর বাসাবাড়ীতে ৫ই জুন প্রাতে ৬ ঘটিকার সময় বরিশালে মিলিত উপাসনায় যোগ রাখিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মমণ্ডলী সঙ্কীর্ত্তন ও মিলিত উপাসনাদি করিয়াছিলেন। তাহাতে শ্রীযুক্ত মতিলাল সরকার আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন ও শ্রীমতী বামাসুন্দরী সরকার প্রার্থনা করেন।

বিগত ১লা জ্যৈষ্ঠ শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ শীলের পিতা বাবু নন্দলাল শীল পরলোকগমন করেন। বিগত ১৩ই জুন তাঁহার

কলিকাতায় ভবনে আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পুত্র পিতার জীবনী বিবৃত করেন ও প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে অনাথ বাবু ব্রাহ্মসমাজের নানা বিভাগে ৫০্ টাকা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে স্থায়ী ফাণ্ডে ১০০্ টাকা ও দুঃস্থ ব্রাহ্মদের বস্ত্রের জন্য ৫০্ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হন।

বিগত ১৪ই জুন কলিকাতা সহরে শ্রীযুক্ত অপর্ণাচরণ ভট্টাচার্য্যের মাতার আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়; শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন ও ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে পাঠ করেন। অপর্ণবাবু মাতার জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা করেন এতদুপলক্ষে নিম্নলিখিত দান প্রতিশ্রুত হইয়াছে;—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ১৫্, ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ ৫্, বানীবন ব্রাহ্মসমাজ ৫্, মোট ২৫্ টাকা।

গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে কয়েক দিন হইল গিরিডিতে বাবু মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা পরলোক গমন করিয়াছেন। অনেক দিন হইতেই তিনি পীড়িত ছিলেন। তিনি এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্যে জীবন মন নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার উপাসনা, উপদেশ ও বক্তৃতা ও সর্ব্বোপরি, তাহার গভীর ধর্ম্মভাব, উদার চরিত্রে সকলেই মুগ্ধ হইত। তিনি তখন নিজে দরিদ্র ছিলেন; কিন্তু তাহার গৃহ সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। এই উদার ভাব চিরদিনই তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল। বঙ্গবিভাগের সময় রাজনীতিক আন্দোলনে বিশেষ ভাবে যোগ দেওয়াতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করেন। স্বদেশের কল্যাণ সাধনে তিনি চিরদিনই ব্রতী ছিলেন। ভগবান্ তাঁর পরলোকগত আত্মাকে শান্তি ও তাঁহার সন্তানগণ ও আত্মীয়দিগকে সান্ত্বনা দান করুন।

উৎসব—নিম্নলিখিত প্রণালীতে টাঙ্গাইল ব্রাহ্মসমাজের অষ্টবিংশ বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে:—

২১শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, সন্ধ্যা উদ্বোধনসূচক উপাসনা আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র।

২২শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার, প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীতারাপ্রসাদ রায়; সন্ধ্যায় স্থানীয় টাউনহলে "বুদ্ধের নির্ব্বাণ" বিষয়ে বক্তৃতা হয়, বক্তা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র।

২৩শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার, প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বসু. সন্ধ্যায় টাউনহলে "সামাজিক অবস্থা ও আমাদের কর্ত্তব্য" বিষয়ে বক্তৃতা হয়, বক্তা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র।

২৪শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার, প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, অপরাহ্নে বালকবালিকা সম্মিলন, সন্ধ্যায় টাউন হলে "শান্তি কোথায়?" বিষয়ে বক্তৃতা বক্তা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র। বালকবালিকা সম্মিলনে শ্রীযুক্তা লীলাবতী উপস্থিত বালকবালিকাদিগের জন্য প্রার্থনা করেন, তৎপর বালকবালিকাগণ নানা রকম কবিতা আবৃত্তি ও সঙ্গীত করে তৎপর শ্রীযুক্তা লীলাবতী মিত্র, শ্রীযুক্তা জ্ঞানদা সুন্দরী বসু, শ্রীমতী বাসন্তী মিত্র ও শ্রীমতী বিনয়বালা দাস উপস্থিত বালকবালিকাগণকে নানারকম উপদেশপূর্ণ ও আমোদজনক গল্প বলেন। টাউনহলে যে তিন দিন বক্তৃতা হইয়াছে প্রতিদিনই সহরের অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত হইয়া অতি শান্তভাবে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। কারণ প্রত্যেক বক্তৃতাই বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

২৫শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার—প্রাতে উপাসনা, আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র; অপরাহ্নে প্রথমে কীর্ত্তন তৎপরে আলোচনা ও শাস্ত্রপাঠ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র পাঠ ও আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় উপাসনা হইয়া উৎসব শেষ হয়। শ্রীযুক্তা লীলাবতী মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার উপাসনা সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। অনেক ভদ্র মহিলা এবং গণ্যমান্য ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

প্রচার—শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষালের প্রচারকার্য্যের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। তেজপুর—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাঁর গৃহে পারিবারিক উপাসনায় মধ্যে মধ্যে আচার্য্যের কার্য্য সম্পাদন করেন। ব্রাহ্মমন্দিরে দুইটি বক্তৃতা করেন; বক্তৃতার বিষয়—"মানব দেবতা", এবং "বর্ত্তমান ভারতে ধর্ম্মের প্রভাব।" টাউন হলে আনন্দরাম বরুয়ার স্মৃতি সভায় সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত বরকাকতির গৃহে সমবেত উপাসনা সম্পাদন করেন। বন্ধুগণের সহিত ধর্ম্মালোচনা এবং প্রতি রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পাদন করেন।

শ্রদ্ধেয় কাশীবাবু এবং তেজপুর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত বরকাকতি, তেজপুরের অন্তঃর্গত কাছারী গাও চা বাগানে ব্রাহ্ম ডাক্তার শ্রীযুক্ত ঘণেশ্যাম দাসের গৃহে উপস্থিত হইয়া দুই বেলা সমবেত উপাসনা সম্পাদন করেন। তথা হইতে বামগাও চা বাগানে বাবু নিশিকান্ত দাসের গৃহে উপস্থিত হইয়া তিন বেলা সমবেত ও পারিবারিক উপাসনা করেন। দুই স্থানেই কাশীবাবু আচার্য্যের কার্য্য ও সঙ্গীত করেন এবং উপদেশ দেন।

২১১ নং কর্ণওয়ালি ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Registered No C. 56.

অসতোমা সদ্গময়,
তমসোমা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।

ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—
১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৪শ ভাগ। ১লা শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩২৬, ১৮৪১ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯০ অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲
৭ম সংখ্যা। 17th July, 1919. প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে প্রভু, তোমারই প্রতীক্ষায় দিন রাত বসিয়া আছি। আমাকে যে চারিদিক হইতে আকর্ষণ করিতেছে! কত দিক হইতে কত প্রলোভন আসিতেছে! এক একবার ত তোমার পথ ছাড়িয়া প্রলোভনে যেয়ে পড়ি। হে অন্তর্যামী দেবতা, তুমি সে সকলই জান। তুমিত দেখিতেছ, আমার প্রাণে কত সংগ্রাম চলিতেছে; কতবার আমি আপনাকে হারাইয়া ফেলি; কত দুঃখ ক্লেশ, পাপ তাপ, নিরাশা অন্ধকার আমাকে ঘিরিয়া ফেলে। আমি কতবার উঠি, কতবার পড়ি! তবুও নাথ, তোমার দিকেই আমি তাকাইয়া আছি। যদিও আমার দৃষ্টি মধ্যে মধ্যে ক্ষীণ হয়, সংসারের চাক্‌চিক্যে ঝলসিয়া যায়, প্রলোভনের ধূলিরাশিতে অন্ধ হয়; তবুও নাথ, পর মুহূর্ত্তেই বুঝি, তুমি ছাড়া আমার আর গতি নাই। পর মুহূর্ত্তেই তোমারই প্রতীক্ষায় চেয়ে থাকি। আমি দুর্ব্বল অক্ষম, তা তুমিও জান, আমিও জানি; তবুও আমার আশা আছে, তুমি আমার জীবনের প্রভু, তুমি শরণাগতদীন-বৎসল, তুমি কখনও আমাকে পরিত্যাগ করিবে না, তুমি কখনও আমাকে বিনষ্ট হইতে দিবেনা। তুমি আমার এই আঁধার হৃদয় আলো করিবে, তুমি এই শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিবে। তুমি আমাকে স্বহস্তে ধরিয়া তোমার স্নেহক্রোড়ে স্থান দিবে। তুমি যে আমার জীবন নাথ; তাই শত অপরাধ লইয়া, শত অবাধ্যতার স্মৃতি লইয়াও তোমারই প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। শত লোকের শত নিন্দা শত গঞ্জনা সহিয়া, শত ঘাতপ্রতিঘাতে আহত হইয়াও তোমার দ্বারে পড়িয়া আছি; হৃদয়ের শত বেদনা বহিয়াও তোমারই চরণে প্রাণের কথা নিবেদন করিব বলিয়া বসিয়া আছি। হে আমার প্রভু, হে আমার একমাত্র দেবতা, হে আমার আশ্রয় ও গতি, তুমি আমাকে কবে গ্রহণ করিবে, জানি না; কবে তোমার সঙ্গসুখ লাভ করিয়া কৃতার্থ হ'ব, জানিনা; তবুও তোমার দয়ায় নির্ভর করিয়া তোমারই প্রতীক্ষায় রহিলাম। তোমার করুণা লাভ ক'রে কৃতার্থ হ'ব।

নিবেদন।

স্থির হও—এত অস্থিরতা কি ভাল? কেন অস্থির হও; কেন আপনাকে ভুলিয়া যাও; কেন অবিশ্বাসী হও? তোমার প্রেমের পুতুলি তিনি কাড়িয়া লইয়াছেন? তোমার জীবন তাই ভারবহ হইয়াছে? জাননা, একবার ভাবিয়া দেখনা কি, সে প্রেমের পুতুলি কাহার দান? তুমি যাহার ভার প্রাপ্ত হইয়া দাতাকে ভুলিয়া ছিলে, তিনি তাঁহার জিনিস কাড়িয়া লইয়া তোমাকে জাগ্রত করিয়া দিলেন, সচেতন করিয়া দিলেন। চাও, এখন অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাও। তিনি তাঁহার মধ্যে তোমার প্রেমের পুতুলিকে দেখাইয়া জীবন ধন্য করিবেন। সর্ব্বদা ইহা মনে রাখিয়া সংসারে চলিও যে, "সঃ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ"—তিনি পুত্র হইতেও প্রিয়, বিত্ত হইতেও প্রিয়।

কেন কাঁদ?—তুমি কেন কাঁদিতেছ? বিপদে পড়িয়াছ, কেহ তোমায় দেখিলনা, কেহ তোমায় সাহায্য করিলনা; কেহ তোমায় দুটী মিষ্টি কথা বলিল না। তাই তোমার মনে এত দুঃখ? সে জন্য এত দুঃখ কেন? ঘোর সংগ্রামে কেহ সাহায্য করিলে, "আহা" বলিয়া একটা সহানুভূতি দেখাইলে প্রাণে সাহস হয়, সত্য বটে। কিন্তু জাননা, যে পেতে চায় সে যে পায়না? তুমি কতবার অন্যের বিপদে সহানুভূতি দেখাইয়াছ? কাহারও অশ্রুজল কি কখন মোচন করিয়াছ? তবে কেন পাইতে চাও? মানুষের দিকে দৃষ্টি কেন? প্রাণের ভিতরে কে বিরাজে জাননা? তিনি

যে অন্তরতর অন্তরতম, তাঁহাকে ডাক, তাঁহার নিকট আপনার বেদনা জানাও, পরম শান্তিলাভ করিবে; আর কাঁদিতে হইবেনা।

বাদ প্রতিবাদ—সংসারে কেবলই তর্ক, কেবলই কোলাহল, কেবলই বাদপ্রতিবাদ! যেখানেই যাই, কোথাও শান্তিতে থাকা যায় না; কেবলই অযথা আন্দোলন, অযথা নিন্দা ও তার প্রতিবাদ, অযথা কথার কাটাকাটি। তুমিও কি বৃথা কোলাহলে ডুবিবে, কথার কাটাকাটি লইয়া থাকিবে, অযথা বাদপ্রতিবাদের মধ্যে ডুবিবে? বাদপ্রতিবাদ ত্যাগ কর, কথার কাটাকাটি দূর হোক্; নীরবে তোমার কাজ করিয়া যাও, নীরবে স্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া যাও; নীরবে প্রভুর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অগ্রসর হও। লোকে তোমার নিন্দা করে, অযথা নিন্দা করে? প্রতিবাদ করিওনা। লোকে তোমার কাজে বাধা দেয়? প্রতিবাদ করিও না। লোকে তোমার কলঙ্ক রটনা করে? উত্তর দিও না। লোকে তোমার কাজের উদ্দেশ্য বোঝে না? আত্ম-সমর্থন করিও না। সব সহিয়া, সব বোঝা বহিয়া, নীরবে প্রভুর দিকে তাকাও; তিনি যা করিতে বলেন, তাহা করিয়া যাও। হাসিমুখে সকল নিন্দা, অপমান, বাদপ্রতিবাদ সহিয়া যাও; সকলকে প্রেমদৃষ্টিতে দেখিয়া প্রভুর দিকে তাকাইয়া নীরবে চলিয়া যাও।

প্রেম—লবণ খাদ্যদ্রব্যের স্বাদ জন্মাইয়া দেয়; তেমনি প্রেম পৃথিবীকে মধুময় করে। ধন জন পদ মান কিছুতেই পৃথিবী বাসযোগ্য হইত না, যদি প্রেম না থাকিত। প্রেম দৃষ্টি কোমল করে, হৃদয় সরস করে, জীবন পবিত্র করে, ব্যবহার মধুময় করে। প্রেম দুর্ব্বলকে সবল করে, নিরাশ প্রাণে আশা আনিয়া দেয়, শোকে সান্ত্বনা দেয়। প্রেম পৃথিবীকে বাসের উপযুক্ত করে, জীবনকে সরস করে। যে প্রেমের মর্ম্ম জানিল না, তার জীবন বৃথা। প্রেমে যে দুঃখ আছে, সে দুঃখেতেই সুখ; প্রেমে যে বেদনা আছে, ঐ বেদনার ভিতরেই আরাম; প্রেমে যে দীর্ঘশ্বাস আছে, ঐ দীর্ঘশ্বাসের মধ্যেই জীবনের বীজ; ঐ প্রেমের জন্য যে ক্লেশ, যে ত্যাগ, তার ভিতরেই আনন্দ। প্রেম বিলাইয়া যাও; প্রেমের দোকানদারী করিও না। প্রেম করিয়া প্রতিদান চাহিও না, সকলকে প্রেম বিলাইয়া যাও। প্রেমের নিকট আপন পর নাই, সুন্দর কুৎসিৎ নাই, ধনী দরিদ্র নাই, পাপী পুণ্যবান নাই, পণ্ডিত মূর্খ নাই। বিনা বিচারে প্রেম বিলাইয়া যাও। যে ভালবাসে তাকেও প্রেম কর, যে ঘৃণা করে তাকেও প্রেম কর। যে ইষ্ট করে তাকেও ভালবাস, যে অনিষ্ট করে, তাকেও প্রেমে আলিঙ্গন কর। কারণ, প্রেমই জীবন; প্রেমে ঈশ্বর প্রাণে অবতীর্ণ হন।

আমার আশা—আমি মলিন, দুর্ব্বল, তবুও আমার আশা আছে। আমার হৃদয় শুষ্ক, নীরস তবুও আমার আশা আছে। আমি আনন্দে নাচিয়া গাহিয়া বেড়াই; আমার প্রভুই আমাকে আশা দিয়াছেন। তিনি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিবেন, তিনি আমার মলিনতা ধৌত করিবেন, তিনি আমার কলঙ্ককালিমা মুছাইয়া দিবেন। তিনি আমার দুঃখ বেদনার ভিতরে, আমার অনুতাপ অশ্রুজলের ভিতরে আলোক-রেখা পাত করিয়াছেন; আমার নিরাশ প্রাণে আশার বাণী শুনাইয়াছেন। সুতরাং তাঁর বাণীতে আমি অভয় পেয়েছি; তাঁর আশ্বাসবচন শু'নে নিশ্চিন্ত হয়েছি। আমার আশা কত বড়! তিনি আমায় আশা দিয়াছেন; আমার নিরাশ প্রাণে আশা দিয়াছেন। তাই আজ আমার আনন্দ; আমার দুঃখের মধ্যেও আনন্দ; দোষ দুর্ব্বলতার মধ্যেও আনন্দ; শোক তাপের মধ্যেও আনন্দ। আমাকে যে তিনি নিজে আশা দিয়াছেন! আমার ভার যে তিনি নিজে গ্রহণ করিয়াছেন! আমার প্রাণ যে তিনি স্পর্শ করিয়াছেন! তাঁহাতেই আমার আশা, বল ও আনন্দ।

সৌন্দর্য্য—তুমি সুন্দর পোষাক পরিয়াছ, গায়ে সুগন্ধ জিনিস মাখিয়াছ, সুন্দর বেশবিন্যাস করিয়াছ; মনে করিতেছ তুমি বড় সুন্দর। বেশভূষা, সুগন্ধ জিনিসে মানুষ সুন্দর হয় না; রং পরিষ্কার হইলেও মানুষ সুন্দর হয় না। যার প্রাণে ব্রহ্ম, মুখে প্রেমের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেই প্রকৃত সৌন্দর্য্য বিদ্যমান! তার রং কাল হইলেও সে সুন্দর, তার বেশভূষা না থাকিলেও সে সুন্দর; তাঁর শরীর কর্দ্দমাক্ত হইলেও সে সুন্দর। তার সৌন্দর্য্যে যে সকলেই মুগ্ধ হয়; রাজা সিংহাসন ছেড়ে তার চরণে এসে প্রণত হয়; দলে দলে জ্ঞানী ধনী লোক তার কাছে মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে থাকে। সৌন্দর্য্য বাহিরে নয়, সৌন্দর্য্য ভিতরে; সৌন্দর্য্য প্রেমে, সৌন্দর্য্য পবিত্রতায়, সৌন্দর্য্য ঈশ্বরনিষ্ঠায়। শরীরের সৌন্দর্য্য ক্রমেই বিনষ্ট হয়; বেশভূষা মলিন হয়; ভিতরের সৌন্দর্য্য ক্রমেই উজ্জ্বল হয়; ক্রমেই মানুষের মন আরও মুগ্ধ করে। তুমি সুন্দর হইতে চাও? বাহিরের দিকে দৃষ্টি দিও না; ভিতরকে সুন্দর কর।

সম্পাদকীয়

শান্তি—বিগত পাঁচ বৎসর ধরিয়া ইউরোপে যে ভীষণ সমরানল প্রজ্জলিত ছিল, এত দিনে তাহা নির্ব্বাপিত হইল। এই মহাহবে কত নগর ধ্বংশ হইল, কত নরনারী কালগ্রাসে পতিত হইল, কত হিংসা, কত বিদ্বেষ সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধরণীতল হইতে ন্যায়, প্রেম ও ধর্ম্মকে নির্ব্বাসন করিল! ঈশ্বরের কৃপায় এত দিন পরে যে জগতে শান্তির আবির্ভাবের আগমনী সঙ্গীত শ্রবন করা যাইতেছে, ইহাও আনন্দের বিষয়। কিন্তু প্রকৃত শান্তির রাজ্য এখনও বহু দূরে। এখনও রণোন্মত্ত নরনারীর রুধিরপিপাসা প্রশমিত হয় নাই—জগতে প্রেমের রাজত্ব স্থাপিত হয় নাই। প্রেমশূন্য পূর্ণ ন্যায়ও জগতে শান্তি স্থাপন করিতে পারে না। পূর্ণ ন্যায়ের রাজ্যও এখন পর্য্যন্ত বহু দূরে। তদুপরি আবার মহামারি ও মহা অন্নকষ্টের প্রকোপ হইতে পৃথিবী এখনও রক্ষা পায় নাই। এই পৃথিবীব্যাপী দুঃখ ও অভাবের মধ্যে ভারতবাসীর দুর্দ্দশার কথা আর কে ভাবিবে? সমরাবসানে অন্য দেশে শান্তির যে একটু ছায়াপাত হইয়াছে

ভারত যেন তাহা হইতেও বঞ্চিত। ভারত এখনও ত্রিতাপেই তপ্ত ও দগ্ধ,—কোনও দিকেই যেন শান্তির ক্ষীণ আভাস মাত্রও দেখা যায় না। আশার যে ক্ষীণ রশ্মি এক সময়ে দেখা গিয়াছিল, তাহাও যেন দিন দিন বিলুপ্ত হইতেছে! চারিদিক নিরাশার ঘোর অন্ধকারে ঘিরিয়াছে, শত ত্যাগ ও আত্মবলি সত্ত্বেও শান্তি-ভোগে যেন ইহার কিছুমাত্র অধিকার জন্মে নাই। ইহা যেন জগতের বহির্ভূত কোনও বর্জ্জিত দেশ। প্রেমের দাবীত দূরের কথা, কারুণ্য-মিশ্রিত পূর্ণ ন্যায়ের দাবীও যেন ইহার নাই। ইহার দুঃখের ভার যেন কিছুতেই পূর্ণ হয় না। ইহার অজ্ঞাতপাপজনিত প্রায়শ্চিত্তের যেন আর শেষ নাই। জগতে শান্তি স্থাপনের আশা দেখিয়া যখন ভারত ঈশ্বর সমীপে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে, ঠিক সেই সময়ই তাহাকে আপনার লাঞ্ছিত সন্তানদের বিবিধ দুঃখ ও অশান্তি দূর করিবার জন্য, অবিচার ও অত্যাচার বিদূরিত করিবার জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করিতে হইতেছে। মঙ্গল বিধাতাই জানেন ভারতের দুঃখানল কবে নির্ব্বাপিত হইবে; এখানে প্রকৃত শান্তির রাজ্য কবে প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাঁহার পূর্ণ প্রেম ও শান্তির রাজ্য জগতে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হউক, ভারতেও প্রতিষ্ঠিত হউক। শান্তির সুশীতল ছায়াতে সকলে আনন্দে বাস করুক ও উন্নতির পথে অগ্রসর হউক। সকল প্রকার অন্যায় অপ্রেম, অবিচার অত্যাচার জগত হইতে চির দিনের জন্য বিদূরিত হউক। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক।

অমঙ্গল হইতে মঙ্গলের উৎপত্তি—এই বিশ্বব্যাপী মহাসমর যেমন পৃথিবীতে অমঙ্গল আনয়ন করিয়াছে, মানবপ্রাণহননের জন্য যেমন নূতন নূতন কৌশল আবিষ্কার করিয়াছে, তেমনি মঙ্গলময় বিধাতা এই অমঙ্গলের মধ্য হইতেও প্রভূত মঙ্গল উৎপন্ন করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ যে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মূলমন্ত্র প্রচার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর, এই ভীষণ যুদ্ধের ফলে সেই মহামন্ত্র পৃথিবী গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে। এই যুদ্ধে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল রাজ্যগুলি জগৎসভায় আপন আপন স্থান গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। এক-নায়কত্বের উন্নত মস্তক আজ ধরাশায়ী; আজ প্রতি মানবের মনুষ্যত্ব স্বীকৃত হইতেছে। কে কবে সপ্নেও ভাবিয়াছিল যে, এই নির্জ্জীব পদদলিত ভারতও জাতিসঙ্ঘে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইবে? কে ভাবিয়াছিল ভারতবাসীর দাবী প্রকাশ্য ভাবে কিয়ৎ পরিমাণেও স্বীকৃত হইবে? ঘোর সমরানলের অগ্নিপরীক্ষা হইতে পৃথিবী নব সাজে সজ্জিত হইয়া, মুক্তির বাণী, সাম্যের বাণী এবং ন্যায়ের বাণী ঘোষণা করিয়াছেন। যুদ্ধাবসানে ন্যায়ের প্রভুত্ব স্থাপিত হইবে, সকল প্রকার অহঙ্কার, অন্যায়, অবিচার ও অত্যাচারের পতন অবশ্যম্ভাবী। এই যুদ্ধের ফলে পৃথিবী বহুবৎসর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবী এখনই উন্নতির চরম শিখরে উঠিবে, ইহা সম্ভবপর না হইলেও এ কথা নিশ্চিতরূপেই বলা যায় যে, বিগত মহাসমরের শিক্ষা পৃথিবী কখনও সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে পারিবে না। জগত যে নূতন পথে অগ্রসর হইতেছে তাহা হইতে কখনও চিরদিনের তরে বিচ্যুত হইবে না। মানুষের শত পাপ-প্রবৃত্তি ও স্বেচ্ছাচারিতা সত্ত্বেও সে বিশ্ববিধাতার ইচ্ছাকে ব্যর্থ করিয়া, তাঁহার জগতে আপনার ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না, উহার ধ্বংসসাধন করিতে পারে না। মঙ্গলবিধাতা চির দিনই জগতের ঘটনাবলী এইরূপে নিয়মিত করিয়াছেন, অমঙ্গল হইতে মঙ্গল ঘটাইয়াছেন। জগতে তাঁহারই পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হউক। মানবের স্বেচ্ছাচারিতা চির দিনের জন্য বিদূরিত হউক। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

ধর্ম্মসাধন ও প্রচার—ব্রাহ্মধর্ম্মসাধন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, ইহাই প্রাচীন ব্রাহ্মগণের জীবনের ব্রত ছিল। প্রচার করা মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাই পূর্ব্ব কালের ব্রাহ্মগণ অবকাশসময়ে সৎপ্রসঙ্গ ও উপাসনাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত থাকিতেন। আপনারা ব্রহ্মনামসুধা পান করিয়া তাহার সুসমাচার সকলকে জানাইবার জন্য, অপরকে তাহার অংশভাগী করিবার জন্য ব্যগ্র হইতেন। যাঁহারা প্রচারকের ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের তো কথাই নাই, এমন কোন বিপদ, বা কষ্ট ছিল না যাহাতে তাঁহাদিগের প্রচারব্রত উদ্‌যাপনে ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিত। প্রাণে ভগবানের আহ্বানধ্বনি শ্রবণ করিয়া যাঁহারা তাঁহার নাম প্রচারে প্রাণমন ঢালিয়া দিয়াছেন, সংসারের কোন সুখসুবিধার দিকে কি তাঁহাদের দৃষ্টি আবদ্ধ থাকিতে পারে? ভগবানের নামে তাঁহারা বাহির হইয়া পড়িতেন—পরিবার পরিজনের ভরণপোষণের ব্যবস্থা কি হইবে, সে দিকেও দৃষ্টিপাত করিতেন না। সাংসারিক কোন বিষয়ের কোন বন্দোবস্ত করিয়া তো তাঁহারা প্রচারব্রত গ্রহণ করেন নাই, প্রাণের টানেই করিয়াছেন। প্রচারও তখন আশানুরূপই হইত; কেননা, প্রচারক তাঁহার জীবনই প্রচার করিতেন। আদর্শ-প্রচারও এক প্রকারের প্রচার বটে; কিন্তু আদর্শের অনুরূপ জীবন না হইলে প্রচার কার্য্যে সুফলপ্রাপ্তি অসম্ভব। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মগণ যেন সাধন ভজনের দিকে তত্তটা মনোযোগ দিতেছেন না। সুসভ্য সমাজগঠন, ও সুপথে থাকিয়া সুখভোগই যেন অনেকের আদর্শ হইয়াছে। এখনও আমাদের মধ্যে সাধকের অভাব নাই সত্য; কিন্তু বহুসংখ্যক নরনারীকে যেন ঘোর সাংসারিকতায় গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। যে সাংসারিকতার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মসমাজ একদিন মহা যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন, যে সাংসারিক সুখ-সুবিধাকে পদদলিত করিয়া ব্রাহ্মগণ সর্ব্বোপরি ধর্ম্মকেই বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, অবশেষে বুঝি তাহারই নিকট অধিকাংশ ব্রাহ্মের জীবন বিক্রীত হইতে চলিল। পূর্ব্বে কোন স্থলে ব্রহ্মনাম কীর্ত্তিত হইতেছে শ্রবণ করিলেই, নিমন্ত্রণ থাকুক আর নাই থাকুক, ব্রাহ্মগণ ছুটিয়া যাইয়া উপস্থিত হইতেন। আজ ব্রহ্মমন্দিরে বহু-সংখ্যক ব্রাহ্ম অনুপস্থিত থাকেন। আজকাল সাধন ভজনের কত আয়োজন ও সুবিধা রহিয়াছে! ব্রাহ্মগণের অনেকেই এই সকল সুযোগ হেলায় হারাইতেছেন। অনেক ব্রাহ্মের বাড়ীতে নিয়মিত ব্রহ্মপূজার বন্দোবস্ত নাই। সন্তানগণ অব্রাহ্ম হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। অবশ্য সকল পরিবারেরই এইরূপ অবস্থা, তাহা বলিতেছি না; তবে, বহু পরিবারের সম্বন্ধে ইহা সত্য। সাধন-হীনতার অবশ্যম্ভাবী ফল ধর্ম্মপ্রচার-বিমুখতা। সাধনবিহীন জীবন নিরাশা, অপ্রেম ও হিংসাদ্বেষাদিই প্রচার করিয়া থাকে।

অপরদিকে প্রচারকগণের সংখ্যাও হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। বিধাতা কিন্তু তাঁহার সত্য ধর্ম্ম প্রচার করিবেনই; তাই সমগ্র দেশ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়াছেন; ভিতরে ভিতরে অনেক নরনারী ব্রাহ্ম হইয়া যাইতেছেন। কিন্তু তাহার জন্য আমাদের শ্লাঘা করিবার কিছুই নাই; যাঁহার নাম তিনিই প্রচার করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণিগণের বর্ত্তমান সময়ে প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহারা যেন ব্রাহ্মপরিবারগুলিকে প্রকৃত ব্রাহ্মপরিবারে পরিণত করিবার উপায় উদ্ভাবন করেন, সকলের মধ্যে সাধননিষ্ঠা ও ব্রহ্মপরায়ণতা জাগাইতে এবং সাংসারিক সুখস্পৃহাকে খর্ব্ব করিতে, ধর্ম্মকেই জীবনে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিতে বদ্ধপরিকর হন। নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই, ভগবান ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া প্রকৃত ধর্ম্মভাব জগতে প্রচার করিবেনই; ইহাতে সন্দিহান হইবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু তাঁহার করুণা ধারণ করিবার জন্য যোগ্যতালাভে যত্নবান হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। আমাদের আপন কর্ত্তব্যসাধনে অবহেলা করিলে চলিবে না। আমরা এই গুরুতর কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত হই। করুণাময় পিতা আমাদের সহায় হউন।

সমাজের সেবা।*

লীলাময় ঈশ্বর প্রকৃতিরাজ্যে যেরূপ লীলা করেন, তেমনি মানবজীবনে ব্যক্তিগত ভাবে এবং সমাজমধ্যেও লীলা করিয়া থাকেন। মেঘ্‌লা দিনের সূর্য্য কেমন এক একবার প্রখর কিরণে প্রকাশ পায়, আবার যেন সে প্রখর রশ্মির আভামাত্র দেখা যায়। যখন প্রখর কিরণ দেখা যায় তখন প্রাণিগণের প্রাণ প্রফুল্লিত হয়, আবার সূর্য্যকিরণ মেঘাবৃত হইলে সকলের প্রসন্নতা যেন চলিয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজের জীবনের ইতিহাসে যেন সেই রূপ লীলাই দেখা যাইতেছে। আমি ইতিহাস আজ আর বলিব না, এখানে সে ইতিহাস বলিয়া কথা বাড়াইব না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসই একটু বলি—

যখন ব্রাহ্মসমাজে মেঘলা দিন দেখা গেল, তখন অনেক প্রাণ থেকে "মেঘ কাটিয়া দাও" এই ব্যাকুল প্রার্থনা উত্থিত হইতে লাগিল। সজনে নির্জ্জনে কত ভক্তপ্রাণের কত ব্যাকুল-প্রাণের প্রার্থনায় মেঘ কাটিয়া গেল; প্রখর সূর্য্যকিরণে যেন দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত হইল। ব্রাহ্মসমাজের সত্যসূর্য্য—প্রেমরবির আবির্ভাবে ব্রহ্মবিশ্বাসী উপাসকগণের যেন উৎসাহ আর ধরে না; যাঁহারা বয়স্ক, যাঁহারা প্রবীণ, যাঁহারা যুবক, তাঁহারা যেন সকলে গলাগলি হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মকালে যাহা দেখিয়াছি একটুকু বলি, কাহারও নাম করিবার প্রয়োজন নাই, যদিও জানি, সে সব সাধুদের নাম করাতে পুণ্য আছে; কিন্তু কাহাকেও ভুলিয়া যদি অপরাধ করি, এই জন্য নাম না করিয়া সকলকেই অন্তরে স্মরণ করিয়া প্রভুর লীলার কথা বলি। বাহিরের লোকদের নিকট নানাজনে নানা কথা বলিয়া ইহাকে ছোট করিতে চাহিলেও পৃথিবীময় ইহার যশগৌরব ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ইহার সাধুকর্ম্মে উৎসাহ, নানারূপ বিদ্যালয় স্থাপন, দেশের লোকের অন্নকষ্ট হইয়াছে—তাহাদের শুধু অন্নক্লেশ নয়, তাহার সঙ্গে বস্ত্রক্লেশ, পীড়ার ক্লেশ—তাহা দূরীকরণ, ইত্যাদি কত প্রকারের সদনুষ্ঠান! প্রচারকসংখ্যা কম, তবু সেই অল্পসংখ্যক প্রচারকদের মধ্যে যিনি একটুকু সময় দিতে পেরেছেন উৎসাহের সহিত সেই কাজে লেগে গিয়াছেন। যাঁহারা এখন বাঙ্গালীদের মধ্যে খুব কৃতী, নানাকার্য্যে যশস্বী, তখন সবে কলেজ থেকে কৃতিত্বের সহিত পাশ করিয়া বাহির হইয়াছেন—সেইরূপ যুবক জলন্ত মানুষ নানা-~~স্থানে~~ ঘুরিয়া জনসেবায় নিযুক্ত! ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ যেন তাঁহাদের সম্মুখে জল্‌জ্বল্‌ করিয়া প্রকাশ রহিয়াছে। এই সবের ত আর প্রতিবাদ চলে না; সুতরাং এইরূপ কাজ দেখিয়া বা এইরূপ কাজের প্রশংসা শুনিয়া কাহারও কাহার মন কেমন হইয়া যাইত। তবুও তাঁহারা বলিতেন, "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সমাজসংস্কারে আদর্শ বটে, ইহাদের সৎকার্য্যের প্রশংসা করিতে হয়; কিন্তু ইহারা আধ্যাত্মিকতা বিমুখ—ইহাদের মধ্যে উপাসনাদির ভাব নাই।" অথচ একজন সাধু ভক্ত পুরুষ একবার আমাকে বলিয়াছিলেন, "চৈতন্যদেবের কীর্ত্তনের ইতিহাস পড়িয়াছিলাম, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে যে কীর্ত্তনে মত্ততা দেখিলাম, ব্রাহ্মসমাজের কেন, অনেক স্থানের অনেক কীর্ত্তনে যোগ দিয়াছি, এমন দৃশ্য আর দেখি নাই।" সূর্য্য-উদয়ের সঙ্গে কীর্ত্তন আরম্ভ, কিন্তু দিবা প্রায় অবসান, তখনও যেন প্রমত্ত ভাবে ভক্তগণ কীর্ত্তন প্রার্থনাতেই বিভোর। আর বলিব না, এ সব কথা বলিয়া গৌরব করিবার সময় এ নয়, বা সে অপরাধ করিতে চাই না।

এই সূর্য্য কি আবার মেঘে ঢাকিতেছে? ইহাই বলিবার জন্য মেঘ্‌লা দিনের সূর্য্যের কথা বলিয়া আরম্ভ করিয়াছি। তবে দিনে মেঘ্‌লা কাটিলেই আবার সূর্য্যকিরণে জগৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। ব্রাহ্মসমাজের জীবনও দিন, ধর্ম্মজগতের জীবনও দিন, কোন ভয় নাই। জানি অনেক প্রচারক আছেন, অনেক উৎসাহী যুবক আছেন, তবু ব্রাহ্মসমাজের জীবনের দিন মেঘ্‌লা হয়েছে। অনেকে নানা রকমে সেই মেঘ্‌লাকে সরাইয়া দিতে চাহিতেছেন, সে কুলর বাতাসে পাহাড়কে নাড়ার মত হ'য়ে যাচ্ছে। এ মেঘ কাটাইয়া প্রেমরবিকে দেখ্‌তে হ'লে সেই ভক্ত বিশ্বাসীর আকুল প্রার্থনা চাই। তুমি ইহাতে যদি বিশ্বাসী হইতে না পার, তুমি এ পথ যদি না ধর, তোমার যত শক্তিই থাকুক, কুলার বাতাসে পাহাড় নাড়ার ন্যায় ব্যর্থ হইবে। ব্রাহ্মসমাজের জীবনে ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। প্রভুত্বপ্রিয়তা যে মানুষের জীবনের কি অনিষ্ট করে, সমাজের জীবনকে মলিন করে, তাহা ব্রহ্মসমাজে বেশ দেখা গিয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কোন এক ব্যক্তির সম্পত্তি নয়—একজনের জীবনমৃত্যুর উপর ইহার জীবনমৃত্যু নির্ভর করে না। কিন্তু ইহার মেঘগুলিকে সরাইতে পারেন একজনে—যাহার প্রাণে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস আছে। যে প্রাণ দিয়ে বলিতে পারে, ইহা আমার প্রভুর, প্রভু ইহাকে রক্ষা করিবেন, তিনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা। একজন এইভাবে ধরিয়াছিলেন, তাই সূর্য্যের উদয় হয়েছিল। যতবার মেঘে ঢেকেছে, দু'পাঁচজন লোকের ব্যাকুল প্রার্থনায় মেঘ কাটিয়া গিয়াছে, এবারও যাইবে।

* সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিগত জন্মোৎসব উপলক্ষে ব্রহ্ম মন্দিরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম।

যাঁহারা সেই পথ ধরিবেন তাঁহাদের জীবনই ধন্য হইবে; নতুবা বিদ্যাবলে, ধনবলে, কথার জোরে এ মেঘ কাটিবে না—কাটিতে পারে না।

আজ কি তাই ভগিনী আশার কথা শুনিলে, না নিরাশার কথা শুনিলে? শুধু কি একটা কাল্পনিক লোকভুলান আশার কথা বলিলাম, না জগতে বিশ্বাসীদের পদানুসরণ করিয়া জীবনের খাঁটি কথাটি বলিলাম? ব্রাহ্মসমাজের জীবনে ঈশ্বর এ লীলা অনেকবার দেখাইয়াছেন, এবারও দেখাইবেন। প্রভু, তোমার লীলাই ধন্য!

ভাই-ভগিনী, তোমাদের সমাজের জন্মদিনের উৎসবে আনন্দ করিতে আসিয়াছ। যদি তোমাদের সকলে আসিত, এই গৃহ পূর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু কৈ তাহাদের উৎসাহ? যদি তোমাদের উৎসাহ থাকিত, যদি তোমাদের ছেলে মেয়েদের উৎসাহ থাকিত, যদি ইহাতে তাহারা আনন্দ পাইত, তাহা হইলে সমাজে ত আসিতই, গৃহে গৃহেও আনন্দ উৎসব লাগিয়া যাইত। কিন্তু তাহা কোথায়? তোমরা ত বন্ধুবান্ধবদের জন্মোৎসবে যাও, তাহাদের ছেলে মেয়েদের জন্মোৎসবে যাও, যার যেমন অবস্থা কিছু উপহার লইয়া যাও; কিছু না দিলে যেন মন কিছুতেই প্রসন্ন হয় না—দু চার পয়সার জিনিস হ'লেও লইয়া যাও। তাই বলি, প্রিয় সমাজের জন্মোৎসবে আসিয়া কিছু উপহার দাও। আহা! ধন্য তাঁহারা যাঁহারা এই জন্মোৎসবে ইহার সেবায় আপনাকে দিয়াছেন—দিতেছেন। যাহার যাহা দিবার শক্তি আছে তাহাই দাও,—জ্ঞান দাও, ধন দাও; যাহা দিবে তাহাতেই ধন্য হইবে। আমি ঈশ্বরেতে পূর্ণ আশা ও বিশ্বাস রাখি, তাই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসবে সকলকে প্রাণের কথা বলিলাম। ঈশ্বর এই সমাজে গৌরবান্বিত হউন। ইহার কল্যাণ ও জয়বিধান করুন—এই প্রার্থনা।

প্রাপ্ত।

উপদেষ্টা ও উপদেশ।

ব্রাহ্মসমাজ একদিকে যেমন জাতিভেদকে অস্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, তেমনি অন্য দিকে উপদেষ্টা বা আচার্য্যগণের মধ্যেও শ্রেণীভেদ রাখিতেছেন না। পরন্তু শ্রেণীর ভেদ না রাখিয়া বিষয়ী এবং বিষয়ত্যাগী সকলকেই উপযুক্ত মনে হইলে, আচার্য্য বা উপদেষ্টার পদে নিযুক্ত করিয়া আসিতেছেন। বাস্তব ব্যাপার এরূপ হইলেও সময় সময় একটা কথা শুনিতে পাওয়া যায় যে, যাঁহারা ত্যাগী, অনন্তকর্ম্মা হইয়া যাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারে এবং ধর্ম্মের শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের কথাতেই বাস্তবিক সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। ত্যাগীদিগের উপদেশ বাক্যই লোকের প্রাণে যথার্থতঃ উদ্দীপনার সঞ্চার করিতে পারে, তাঁহাদের উপদেশই লোকের চিত্তের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে সমর্থ। যে বুদ্ধির উদয় হইলে মানুষ পার্থিব সুখাসক্তি বিসর্জ্জনপূর্ব্বক মহৎ কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিতে পারে—পরার্থে আত্মোৎসর্গ করিতে সুযোগ প্রাপ্ত হয়—ত্যাগী ব্যক্তিগণের উপদেশ দ্বারাই লোকের প্রাণে সেই শুভবুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। বিষয়ী ব্যক্তির বাক্যে সে প্রেরণা ও উদ্দীপনা আনিবার সম্ভাবনা নাই; কারণ, তাঁহারা একস্থানে আপনাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁদের বাক্যের সহিত জীবনের সামঞ্জস্য প্রায়শঃ থাকে না।

পূর্ব্বোক্ত উক্তি যে সত্য, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। একথা ত সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে, যাঁহারা ত্যাগী যাঁহারা অনন্তকর্ম্মা হইয়া ধর্ম্মসাধনে এবং ধর্ম্মশিক্ষা ও প্রচারে ব্যাপৃত আছেন, লোকের প্রাণে তাঁহাদের বাক্যের শক্তিই প্রবলরূপে কার্য্য করিবে—লোকের ঘুমন্ত প্রাণকে জাগাইয়া, উদাসীনের উদাসীনতা দূর করিয়া, মানুষকে কল্যাণলাভের জন্য ব্যগ্র করিয়া তুলিতে, তাকে জীবনের লক্ষ্যসাধনের জন্য আকুল করিয়া দিতে ত্যাগীর জলন্ত বাক্য যে সমধিক সমর্থ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সচরাচর ত্যাগীর দৃষ্টান্ত ও জলন্ত বাক্যই মানুষকে পরিবর্ত্তিত, পরার্থে আত্মদানের জন্য ব্যগ্র করিয়া থাকে। ব্যাপারটি এ প্রকারের হইলেও ইহার যে ব্যতিক্রম স্থল নাই, এমনও নহে। একটু প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিলে জানা যাইবে, এ বিষয়ে অন্যরূপ দৃষ্টান্তও যে না আছে, এমন নহে।

এ বিষয়ের আলোচনার সুবিধার জন্য দৃষ্টান্তের সাহায্য লওয়া যাইতেছে। জগতে যে কয়টি ধর্ম্ম বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে—মানবসমাজের অধিকাংশ যে কয়েকটি ধর্ম্মের আশ্রয়ে বাস করিতেছে, সেই সকল ধর্ম্মের যাঁহারা প্রবর্ত্তক বা বিশেষ প্রবক্তা বলিয়া গণ্য তাঁহাদেরই কথা এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে;—জগতে হিন্দু ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম এবং ইস্‌লাম ধর্ম্মই ত বিশেষ ধর্ম্মরূপে পরিগণিত। বৌদ্ধধর্ম্মের যিনি প্রবর্ত্তক বা যাঁহার নামে এ ধর্ম্ম পরিচিত, সেই মহাপ্রাণ বুদ্ধ শাক্যসিংহের ন্যায় ত্যাগী অবিষয়ী আর কে আছে? তাঁহার দৃষ্টান্ত, তাঁহার উপদেশ যুগ যুগ ধরিয়া কোটি কোটি লোকের ধর্ম্মার লাভের উপায় হইয়া আছে। তাঁহারই প্রেরণা কোটি কোটি নরনারীর ধর্ম্মসাধনের হেতু হইয়া আছে, সে কথার বেশী উল্লেখের প্রয়োজনাভাব।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের যিনি প্রবর্ত্তক, যাঁহার নামে এ ধর্ম্ম পরিচিত ও প্রসিদ্ধ, তিনিও ত্যাগীদিগের অগ্রগণ্য। মহর্ষি ঈশার জীবনের দৃষ্টান্ত, আত্মত্যাগ ও উপদেশবাণী খ্রীষ্টীয় সমাজের সাধনরত ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের চিরদিনের অন্নপানীয় হইয়া আছে। উদ্দীপনা এবং আত্মোৎকর্ষলাভের জন্য অতীব ব্যগ্রতা হইবার পথে তাহা চিরদিনের তরে পাথের হইয়া আছে। সে কথারও বেশী বর্ণনার প্রয়োজন নাই।

উপরে যেমন দুই মহাত্যাগী অবিষয়ীর কথা উল্লেখ করা গেল তেমনি সেই ভাবের ত্যাগী না হইয়াও যে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক এবং মহাশিক্ষক হইয়া চিরপ্রসিদ্ধিলাভ করিয়া আছেন, এমন কাহারও কাহারও নামের উল্লেখও নিম্নে করা যাইতেছে;—

হিন্দুধর্ম্মের নানা শাখা প্রশাখা। ইহার সঙ্গে কোন বিশেষ ব্যক্তির নাম যেমন যুক্ত নহে, তেমনি কাহাকেও ইহার প্রবর্ত্তক বলিয়াও জানা যায় না। বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি একজন নহেন। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি বেদমন্ত্ররচয়িতাগণ যে অবিষয়ী ও তেমন ত্যাগী পুরুষ ছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। উপনিষদের প্রবক্তাদিগের অনেকে ক্ষত্রিয় রাজাও আছেন, তাঁহারা এবং ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতিও যে অবিষয়ী ছিলেন, এমন নহে। তৎপরে ভগবদ্গীতার প্রবক্তা নামে যিনি পরিগণিত তিনি যে সম্পূর্ণ বিষয়ী ও অত্যাগী ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অথচ এই সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণের উপদেশবাণীসমূহই হিন্দু-

ধর্ম্মাশ্রিত ধর্ম্মপ্রাণ সাধনরত ব্যক্তিদিগের সম্বল হইয়া আছে। ত্যাগী বা অবিষয়ী নহেন বলিয়া এই সকল মহৎ ব্যক্তির উপদেশে আস্থা স্থাপন করিতে বা তাঁহাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং পরিবর্ত্তিত হইতে কাহারও পক্ষে বাধা হয় নাই।

ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মহম্মদের জীবনে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত থাকিলেও, তিনি তেমন ত্যাগী বা অবিষয়ী বলিয়া বিখ্যাত নহেন। তিনি পরিবারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এবং রাজ্যেশ্বর হইয়াও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত ত্যাগী মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণের বাক্যে উৎসাহিত ও উদ্দীপিত হইয়া যেমন বহু লোকে আত্মদান করিয়াছে, পরিবর্ত্তিত হইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছে, মহাপুরুষ মহম্মদের প্রেরণায়ও মানুষ তেমনি ধর্ম্মার্থে আত্মবিসর্জ্জন করিতে ইতস্ততঃ করে নাই। তাঁহার বাক্যাবলি মুসলমানগণের পক্ষে সকল সময়েই পথের সম্বল হইয়া আছে। মুসলমানগণ তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদকে যে সম্মান দিয়া থাকেন, অন্যান্য ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিগণ তাহা অপেক্ষা স্বীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণকে অধিক সম্মান দেন কি না তাহাতে সন্দেহ আছে।

প্রাচীন কালের মহাজনগণ হইতে দৃষ্টি প্রত্যাহার করিয়া যদি এই আধুনিক যুগের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি আনয়ন করা যায়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব, বিষয়ী হইয়াও কেহ কেহ লোকের প্রাণকে পরিবর্ত্তিত করিতে, মানবের ধর্ম্মক্ষুধাকে জাগাইয়া, প্রেরণা ও উদ্দীপনাদ্বারা ধর্ম্মসাধনার্থ আকুল করিয়া তুলিতে এবং পরার্থে আত্মদান করিতে সামর্থ্য প্রদান করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের রাজর্ষি এবং মহর্ষির কথাই এ স্থলে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতেছে। ব্রহ্মানন্দের কথা তেমনভাবে এ স্থলে উল্লেখ করিতেছি না, এজন্য যে, তিনি ত্যাগীদিগের মধ্যেই পরিগণিত। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে, শুধু যে ত্যাগী—অবিষয়ী লোকেরাই মানবপ্রাণের সমস্ত সাধুভাবের উদ্দীপনকারী—তাঁহারাই যে মানবকে পরার্থে আত্মত্যাগের প্রবৃত্তিপ্রদানকারী এবং তাঁহারাই যে একমাত্র মানবের নবজীবনলাভের সহায়, চিরদিন তাঁহারাই মানবকে তাহাদের সাধনপথের পাথেয়দানকারী, এমন নহে। বিষয়ী মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণও মানবকে এ সকল বিষয়ে কম সাহায্য করেন নাই। তাঁহারাও মানবের পথ প্রদর্শক, উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিয়া সকল কালেই মানবের অতি কল্যাণলাভে সহায়তা করিয়াছেন এবং করিতেছেন।

তবেই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, উক্ত প্রকারের কথা আমাদের মধ্যে আসে কেন? এ কথার উত্তরে একটি কথা বলিতে পারা যায় যে, মানবসাধারণেরই একটা কেমন দুর্ব্বলতা বা বিচার-বিহীনতা আছে যে কারণে মানুষ সর্ব্বদাই উক্ত প্রকারের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; সেটি এই যে, যখনই মানবের নিকটে কোন একখানি গ্রন্থ বা কোন নূতন উক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনই সে অনুসন্ধান করে যে, গ্রন্থখানি বা উক্তিটি কাহা-কর্তৃক লিখিত বা কাহাকর্তৃক উক্ত। সাধারণতঃ লোকে ব্যক্তির দ্বারাই গ্রন্থ বা উক্তির মূল্য নিরূপণে ব্যগ্র হইয়া থাকে। বাস্তবিক গ্রন্থখানি উত্তম ও গ্রহণযোগ্য কি না, বাস্তবিক উক্তিটি কি প্রকারের তাহার নির্ণয়ে লোকের মন প্রধাবিত হয় না। গ্রহণ-যোগ্য কি পরিত্যাজ্য তাহার বিচার লোকে প্রণয়নকর্ত্তা বা বক্তার দ্বারাই করিয়া থাকে। এজন্যই লোকে আচার্য্য বা উপদেষ্টার উক্তি শ্রবণ করিলেই এই বিচারে প্রবৃত্ত হয় যে, তাহা বিষয়ী কি ত্যাগীর দ্বারা উক্ত বা ব্যাখ্যাত হইতেছে। বাস্তবিক উপদেশটি সারবান্ কি না, গ্রহণযোগ্য কি না, সে বিষয়ে প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিবার প্রবৃত্তিই লোকের হয় না। ইহা কিন্তু মানবসাধারণের একটা দুর্ব্বলতা বা সংস্কারাধীনতা। মানুষ যখন বাস্তবিক সত্যানুসন্ধায়ী ও সত্যপ্রিয় হইবে, যখন তাহার পূর্ব্বসংস্কারা-ধীনতা না থাকিবে, তখনই সে সত্যকে সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে—সত্যকে বা উপদেশকে গ্রহণ করিতে কোন ব্যক্তি বা প্রাচীন গ্রন্থের অনুরোধের অপেক্ষা করিবে না।

ব্রাহ্মগণের কিন্তু উক্ত প্রকারের দুর্ব্বলতা বা সংস্কারাধীনতা থাকা উচিত নহে; কারণ, ব্রাহ্মগণ বিশেষ ভাবেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, বা তাঁহাদের মূলসত্যের মধ্যেই আছে যে, "সত্যং শাস্ত্র-মনশ্বরং"—সত্যই ব্রাহ্মদিগের শাস্ত্র। ব্রাহ্মগণ বিশেষ ভাবেই এই মতাবলম্বী হইয়াছেন—"যান্য নবদ্যানি কর্ম্মাণি। তানি সেবিত-ব্যানি। নো ইতরানি।" যে সকল কর্ম্ম অনিন্দনীয়, সেই সকল কর্ম্মই করিবে, অন্য অর্থাৎ নিন্দনীয় কার্য্য করিবেনা। সুতরাং উপদেশ বা উক্তিটি গ্রহণযোগ্য কি না, তাহা স্বতঃই উত্তম বা মূল্যবান্ কি না, ব্রাহ্মগণ তাহাই দেখিবেন। ব্যক্তির অনুরোধ যদি থাকে ভাল, যদি তাহা না থাকে তাহা হইলেও উক্তির সারবত্তা দেখিয়াই, তাহার উত্তমতা দেখিয়াই, তাহা গ্রহণ করিবেন। এজন্যও ব্রাহ্মগণের পক্ষে উপদেষ্টা ত্যাগী বা বিষয়ী কি না, সে বিচার করা তেমন আবশ্যক নহে।

উপদেশের সারবত্তা ও সমীচীনতা এবং উপাদেয়তা প্রভৃতি ত দেখিতেই হইবে। লোকে কার্য্যতঃ তাহাই করিয়াও থাকে। উপনিষদ্ বা ভগবদ্গীতার সকল উক্তিকেই কি লোকে সমান ভাবে সমাদর করে? বিচারপূর্ব্বকই লোকে কোনটিকে বা অধিক সমাদর করে কোনটিকে বা তেমন সমাদর করে না। মহর্ষি ঈশার শৈল বেদীর উপদেশকে লোকে যে ভাবে গ্রহণ করে, তাহার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করে, তাঁহার সকল উপদেশের প্রতি ত সেরূপ ভাব প্রদর্শন করে না, তাঁহার সকল উপদেশকেই ত সমান ভাবে আদর করে না।

উপদেষ্টা ত্যাগীই হউন কিম্বা বিষয়ীই হউন, তাঁহার কিন্তু আন্তরিকতা, সরলতা, নিষ্ঠার ঐকান্তিকতা প্রভৃতি থাকা একান্ত আবশ্যক। ঐ সকল গুণের তারতম্যেই উপদেষ্টার উপদেশবাক্যসকলের মূল্য ও মর্য্যাদার তারতম্য হইয়া থাকে। উপদেষ্টাতে সে সকল গুণ থাকে কি না তাহা বুঝিতে শ্রোতাগণের পক্ষে কিন্তু কোন কাঠিন্যই নাই। তাহা অতি সহজেই শ্রোতাগণ বুঝিতে সমর্থ হয়। এজন্য আচার্য্য বা উপদেষ্টানিয়োগের সময় তাঁহাতে উক্ত প্রকারের গুণসমুদয় আছে কি না, তাহা দেখাই আবশ্যক। ত্যাগী কিম্বা বিষয়ীর বিচার তত আবশ্যক নহে।

ব্রাহ্মসমাজমধ্যে উপদেষ্টাগণের শ্রেণীবিভাগ থাকাও আবশ্যক নহে। নিয়মপূর্ব্বক বিশেষ শ্রেণী বিশেষের লোককে আচার্য্য বা উপদেষ্টার পদে নিয়োগের ফল কোথাও উত্তম হয় নাই। তাহার অনিষ্টকারিতার বিশেষ ব্যাখ্যারও প্রয়োজন নাই—তাহা প্রাচীন সমাজসমূহে বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে। সেই

প্রাচীন প্রথার পুনরাভিনয়ের আর কি প্রয়োজন আছে? উপদেষ্টা বা আচার্য্যগণের স্বাভাবিক যোগ্যতা হইতেই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব বা অশ্রেষ্ঠত্ব সহজেই সমাজমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আর স্বতন্ত্র ভাবের বিধি ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই।

এ স্থলে এ কথার উল্লেখ করা একরূপ বাহুল্য যে, বাহ্যদৃষ্টিতে যাঁহারা বিষয়ী বলিয়া গণ্য তাঁহারাও বাস্তবিক অবিষয়ী হইতে পারেন, আবার যাহারা ত্যাগী বলিয়া পরিচিত তাঁহারও অত্যাগী হইতে পারেন। ত্যাগী অত্যাগীর ভিন্নতা বাহ্য আচারব্যবহার দ্বারাই নিরূপিত হওয়া উচিত নহে। যিনি আত্মত্যাগে সমর্থ— যিনি অন্তরনিহিত বাসনাকামনা পরিহার করিতে সমর্থ, তাঁহারাই ত্যাগী বলিয়া গণ্য হইবার উপযুক্ত। আমাদিগকে ত্যাগী বা অত্যাগী বিচার কালে এই দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজ যখন সন্ন্যাসকে আপনাদের লক্ষ্যস্থলে রাখেন নাই, কিন্তু গৃহকেই ধর্ম্মসাধনের প্রকৃত ক্ষেত্র রূপে জানিয়া গৃহী হইয়াই ধর্ম্মসাধনে রত থাকিতে সংকল্প করিয়াছেন এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হওয়াই যখন তাঁহাদের লক্ষ্য, তখন ত সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেই হয় যে, গৃহস্থগণই শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক হইতে পারেন। জ্ঞান ভক্তিতে তাঁহারাও শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিতে পারেন—তাহা যদি সম্ভবপর হয় তাহা হইলে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ আচার্য্য বা উপদেষ্টাও হইতে কেন পারিবেন না? অবিষয়ী অনন্যকর্ম্মা হইয়া এবং সাধনরত ব্যক্তি যেমন জ্ঞান, ধর্ম্মে উন্নত হইতে পারেন—গৃহী—বিষয়কর্ম্মে রত ব্যক্তির পক্ষেও সেরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। এজন্য ত্যাগী বা অত্যাগী, বিষয়ী বা অবিষয়ী কি না, ইহাই শ্রেষ্ঠত্ব বা অশ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র পরিমাপক হওয়া বিধেয় নহে।

প্রাপ্ত।

বিশ্বাসে অবিশ্বাস।

(২)

আমার প্রথম প্রবন্ধে শ্রদ্ধেয় প্রচারক কাশীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের যে উপদেশটা সমালোচিত হইয়াছে তাহা ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত শিক্ষার অনুমোদিত নয় এবং উহাতে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব ততটা দেখিতে পাওয়া যায় না, যতটা তথাকথিত একটা নূতন দার্শনিক ধর্ম্মমতের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কেন আমি এই রূপ মনে করি তাহা বুঝাইবার জন্য উক্ত ধর্ম্মমতটার একটুকুন্ আলোচনা করা আবশ্যক বোধ করিতেছি। এ বিষয়ে ঘোষাল মহাশয়ের এবং পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের মতে মূলতঃ কোন পার্থক্য না থাকায়, এবং তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের লেখাতেই উহা অধিকতর বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হওয়ায় আমি তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের লেখা অবলম্বন করিয়াই আলোচনা উপস্থিত করিতেছি।

এই মতটার জন্মদাতা না হইলেও উহার নামকরণকর্ত্তা এবং প্রধান পুরোহিত যে পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়, তাহা তাঁহার প্রণীত 'ব্রাহ্মসমাজের কৈফিয়ত' যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন। উহার জন্মবৃত্তান্তঘটিত বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়, তাঁহার প্রদত্ত একটি বক্তৃতায়,—সে বক্তৃতা বা অভিভাষণ তিনি পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসম্মিলনীর বিগত অধিবেশনের সভাপতিরূপে পাঠ করেন।

উহা হইতে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যৌবনের প্রারম্ভেই ব্রাহ্মধর্ম্মের মৌলিক বিশ্বাসের মৌলিকতায় সন্দিহান হইয়া এবং তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের কাহারো নিকট হইতে সন্দেহের সদুত্তর না পাইয়া তিনি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন এবং সেই অধ্যয়নের ফলে ক্রমে ক্রমে উক্ত মতে আসিয়া উপনীত হন। তিনি আরো বলিয়াছেন, ঐ নবধর্ম্মমতটা একদিকে বৈদান্তিক দর্শনশাস্ত্রের সহিত এবং অন্য দিকে হেগেলিয়ান্ খৃষ্টীয়ানিটীর সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট।

হেগেলিয়ান্ খৃষ্টীয়ানিটী যে জর্ম্মন-দার্শনিকশ্রেষ্ঠ হেগেলের দর্শনশাস্ত্রের উপরেই সংস্থাপিত, ইহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং ইহাকে (এই নবধর্ম্মমতটাকে) একটা মিশ্র দার্শনিক মতবাদ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ইহার উদ্দেশ্য এতদ্দেশীয় বৈদান্তিক দ্বৈতাদ্বৈতবাদের সহিত পাশ্চাত্য একান্ত অধ্যাত্মবাদের (absolute idealismএর) একটা সমন্বয় সাধন করা এবং সেই সমন্বয়ীকৃত দার্শনিক জ্ঞানটাকে বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলে সংস্থাপন করা। অবশ্য আমি এমত বলিতেছি না যে, প্রথম হইতেই পণ্ডিত তত্ত্বভূষণ মহাশয় এই প্রকারের একটা অভিসন্ধি লইয়াই বিদেশীয় এবং দেশীয় দর্শনশাস্ত্রসমূহের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার লেখা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার অধ্যয়নের ফলে যখন তাঁহার জ্ঞানদৃষ্টিটা খুলিয়া গেল, তখন তিনি বুঝিলেন তাঁহার সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইয়াছে এবং ব্রাহ্মসাধারণকে সেই সিদ্ধির ফলস্বরূপ ভেদাভেদবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদে বিশ্বাসের অংশভাগী করিবার জন্য তিনি স্বভাবতঃই ব্যগ্র হইলেন। তিনি নিজে এই বিষয়ে কি বলিতেছেন তাহা শুনুন্;—

"এই ভেদাভেদবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ যখন বুঝিলাম, তখন এতে ধর্ম্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা ও উজ্জ্বলতা সম্বন্ধে আর উপাসনা সাধন বিষয়ে যে সাহায্য হোল তা কথায় বল্‌তে পারি নে। এতদিন উপাসনা পরোক্ষ ছিল, এখন থেকে প্রত্যক্ষ হ'তে লাগ্‌ল।"

আবার, "এই শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমাদের এখনকার ব্রাহ্মধর্ম্ম এখন আমার কাছে যে আকার ধারণ কর্‌লো সেই আকারের ব্রাহ্মধর্ম্ম মূলে প্রাচীন উপনিষদের ধর্ম্মের সঙ্গে এক, আর সেই একত্ব স্মরণ, সাধন ও প্রচার করা আবশ্যক।"

শেষোক্ত কথাটার প্রতিবাদ শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে করিয়াছেন তাহা তত্ত্বকৌমুদীর পাঠকবর্গ অবশ্যই অবগত আছেন। উহার পরে আর কিছু বলা আমার পক্ষে অনাবশ্যক। কিন্তু প্রথমোদ্ধৃত উক্তির অন্তর্ভুক্ত 'ভেদাভেদ-বাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' বিষয়ে আমাকে দুই চারিটি কথা এই জন্যই বলিতে হইতেছে যে, উহার উপরে দাঁড়াইয়াই ঘোষাল মহাশয় বিশ্বাসকে বর্জ্জন ও দার্শনিক জ্ঞানকে বরণ করিয়া লইবার জন্য ব্রাহ্মসাধারণকে আহ্বান করিয়াছেন। এই আহ্বানটার সম্বন্ধে আমার প্রথম প্রশ্ন এই যে, দ্বৈতাদ্বৈতবাদটা কি ব্রাহ্মসমাজের

নিকট এতই অপরিচিত যে, ঐ সমাজের উপকারার্থেই তৎপ্রতি ব্রাহ্মসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইল? তিনিও কি পণ্ডিত তত্ত্বভূষণের ন্যায় বলিতে চান, রামানুজ বেদান্তের দ্বৈতাদ্বৈতবাদের যে ব্যাখ্যা দিয়া গিয়াছেন সে খবর মহর্ষি প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ব নেতারা জানিতেন না বলিয়াই বেদান্তের মতকে শঙ্করের নির্ব্বিশেষবাদের সহিত এক মনে করিয়া তাঁহারা সেটাকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন? এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদই বৈষ্ণব ধর্ম্মের দার্শনিক ব্যাখ্যা নয় কি? এই ধর্ম্মটাকে বুঝিতে চেষ্টা না করিয়াই রাজর্ষি ও মহর্ষির ন্যায় ধর্ম্মতত্ত্বান্বেষী বেদান্তবিৎ ব্রাহ্মনেতারা সেটাকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভবপর কথা কি? আর 'ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়'এর প্রণেতা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক স্বনামখ্যাত পরলোকগত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় 'ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস' প্রণয়ন কার্য্যে মহর্ষির দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন না কি? ইঁহাদের কেহই দ্বৈতাদ্বৈতবাদের খবর রাখিতেন না? অদ্ভুত কল্পনা বটে। আশা করি ঘোষাল মহাশয় ততদূর যাইতে চাহেন নাই। আমরাও ছাত্রজীবনেই যে দ্বৈতাদ্বৈতবাদের নাম শ্রুত ছিলাম, তাহার সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ব নেতারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন, ইহা কোন রূপেই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। ইহাই অধিকতর সম্ভবপর যে, তাঁহারা জানিয়া শুনিয়াই 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ'কেও ব্রাহ্মধর্ম্মের মৌলিক সত্যরূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এইমাত্র 'ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়' গ্রন্থখানি খুঁজিয়া দেখিলাম উহাতে রামানুজ সম্প্রদায়ের অবলম্বিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের বিস্তৃত বিবরণ রহিয়াছে। নিম্নে তাহা হইতে কিছু কিছু তুলিয়া দিতেছি;—

"ইঁহাদের মতানুসারে পদার্থ তিন প্রকার—চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। জীবাত্মাকে চিৎ কহে; ইনি ভোক্তা ও নিত্য চেতন স্বরূপ……ঈশ্বর বিশ্বের কর্ত্তা ও উপাদান, ইনি অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানস্বরূপ; ইনি সর্ব্বজীবের নিয়ন্তা।"

"ইঁহাদের মতানুসারে বিষ্ণুই ঐ সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কারণ পরব্রহ্ম। প্রথমে কেবলমাত্র তিনি ছিলেন, তাঁহা হইতে এ জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। তিনি ইচ্ছা করিলেন 'আমি বহু হই' এবং এই ইচ্ছামাত্র স্থূলরূপে আবির্ভূত হইলেন।"

"ইঁহারা বৈদান্তিকদিগের ন্যায় বিশ্বের সহিত বিশ্বকারণের অভেদ স্বীকার করিয়া কহেন, যেমন একমাত্র মৃত্তিকাই ঘটশরাদি বিভিন্নরূপে অবস্থান করে, একমাত্র পরমেশ্বর সেইরূপ চিদচিৎ বিভিন্নরূপে বিরাজমান হইতেছেন। কিন্তু বৈদান্তিকেরা যেমন জীব ও জড়ের সহিত পরমাত্মাকে বাস্তবিক অভিন্ন বলিয়া অঙ্গীকার করেন, ইঁহারা সেরূপ অভেদবাদ অঙ্গীকার না করিয়া কহেন জীবাত্মা যেমন হস্তপদাদিবিশিষ্ট ভৌতিক দেহের অন্তর্যামী বলিয়া ঐ দেহ জীবের শরীর বলিয়া পরিগণিত হয়, সেইরূপ পরমাত্মা জীব ও জড়ের অন্তর্যামী বলিয়া জড় ও জীবাত্মাকে পরমাত্মার শরীর বলিয়া গণ্য করিতে হয়।"

"তাঁহার অনন্ত ও দ্বিপ্রকার রূপ—পরমাত্মারূপ অর্থাৎ কারণরূপ এবং স্থূলরূপ অর্থাৎ বিশ্বরূপ।"

"পরমাত্মারূপ ও বিশ্বরূপ ব্যতিরেকে ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তগণের হিতার্থে সময় সময় আর পাঁচ প্রকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন; অর্চা, বিভব, ব্যূহ, সূক্ষ্ম, ও অন্তর্যামী। প্রথমতঃ প্রতিমাদির নাম অর্চা। দ্বিতীয়তঃ, মৎস্য, বরাহ, কূর্ম্মাদি অবতারের নাম বিভব। তৃতীয়তঃ, বাসুদেব, বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারিটি ব্যূহ। চতুর্থতঃ, সম্পূর্ণ ষড়্গুণশালী বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্মের নাম সূক্ষ্ম।"

ইহার পরে কেহ আর বলিতে পারেন কি ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বনেতারা রামানুজের ব্যাখ্যাত দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের খবর জানিতেন না? এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদকে যথাযথরূপে ঘোষাল মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে গ্রহণ করিতে পারেন কি? টিপ্পনীর উপর টিপ্পনী করিয়া ইহারই নামে যে 'ভেদাভেদবাদ'কে তাঁহারা দাঁড় করাইতে চান, তাহাও যে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়, ইহা বারান্তরে দেখাইতে চেষ্টা করিব। বর্ত্তমানে কেবলমাত্র এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই 'বিশিষ্ট বাদের' মূলে তো দার্শনিক যুক্তি ও প্রমাণ অপেক্ষা অমূলক কল্পনা ও অন্ধবিশ্বাসের কার্য্যকারিতাই অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের বিশ্বরূপ, বরাহ কূর্ম্মাদিরূপবিশিষ্ট অবতারত্ব এবং ধূলি, বালি, লতাপাতা ও কৃমি কীটাদির আকারে জন্মগ্রহণ সম্বন্ধীয় মতটা কি দার্শনিক যুক্তি ও প্রমাণের উপরে অবস্থিত? যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে ঐ মতটার ব্যাখ্যাটাকে অলীক কল্পনা কিম্বা অন্ধবিশ্বাসের ভ্রান্ত ধারণা ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে?

এখানে বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, বেদান্তের মতে জীবাত্মা বলিতে কেবলমাত্র মানবাত্মাকে বুঝায় না—পোকা, মাকড়, কৃমি, কীট ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকারের জীবের আত্মাই উহার অন্তর্ভুক্ত। দেখিতে পাওয়া যায়, রামানুজও জীবাত্মার ঐ সংজ্ঞাই গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ অদ্বৈতবাদিগণ মানবাত্মার যেরূপ বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তদ্রূপ তিনি কিছুই করেন নাই; বরঞ্চ ইহাই কহিয়াছেন, "জীবাত্মা যেমন হস্তপদাদি ভৌতিক দেহের অন্তর্যামী বলিয়া, ঐ দেহ জীবের শরীর বলিয়া পরিগণিত হয়, সেইরূপ পরমাত্মা জীব ও জড়ের অন্তর্যামী বলিয়া জড় ও জীবাত্মাকে পরমাত্মার শরীর বলিয়া গণ্য করিতে হয়।"

ঘোষাল মহাশয়ই এখন বলুন, এইরূপ জীবাত্মা নিখিল বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইতে পারে কি না। আর আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিখিল বিশ্বে মনের ব্যাপ্তি ও পরমাত্মার সহিত তাহার যোগ একার্থবোধক ভাব হইতে পারে না। একটা প্রকাণ্ড পাহাড়ের সহিত একখণ্ড তৃণও যুক্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে পরিব্যাপ্ত হইতে পরে না। বিশ্বকে জানা অর্থেই যদি ব্যাপ্তি শব্দটা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও বলিতে পারি মানবমনের সমগ্র বিশ্বকে জানা ত দূরের কথা, করতলধৃত একটি আমলক সম্বন্ধেও সমগ্র জ্ঞাতব্য তত্ত্ব আজ পর্য্যন্ত মানুষ জানিতে পারিয়াছে কি? যদি জানিতে পারিত তাহা হইলে নিউটনের ন্যায় একজন জ্ঞানিশ্রেষ্ঠকে এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে হইত না যে, তিনি জ্ঞানসমুদ্রের উপকূলে দাঁড়াইয়া কেবলমাত্র উপলখণ্ডই সংগ্রহ করিতেছেন, সমুদ্রে নামিয়া মুক্তাদি রত্নরাজি তুলিতে পারেন নাই। আর মানবাত্মা অনন্ত উন্নতিশীল, এ কথা আমরা বিশ্বাস করিলে ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য নই কি যে, অনন্তকালই তাহার পক্ষে

কিছু না কিছু জানিবার বাকী থাকিবেই থাকিবে? বিশ্বকে সমগ্র-রূপে জানা কিম্বা বিশ্বমনের ব্যাপ্তিবিষয়ক ঘোষাল মহাশয়ের উক্তিটাও যে পণ্ডিত তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের কণ্ঠেরই প্রতিধ্বনি ইহাও কি আবার বলিতে হইবে? এ বিষয়ে কাহারো সন্দেহ থাকিলে তিনি তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের ফিলজফি ১১০ম এ পৃষ্ঠাটা খুলিয়া দেখিতে পারেন। আমি সেখান হইতেই কেবলমাত্র দুই তিনটি পংক্তি তুলিয়া দিতেছি,—"But each of us thinks that his inmost self is something universal, existing everywhere and at all times etc." কথাটা মুখভরা ও বুকভরা বটে, তদ্রূপ প্রাণের অনুভূতিভরা ও জীবনের অভিজ্ঞতাভরাও কি? অন্ততঃ রামানুজ সম্প্রদায়ের তথাকথিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ হইতে যে এই উক্তিটা প্রতিপাদিত হয় না, ইহা অস্বীকার করিবার জো নাই। এমতাবস্থায় ঐ 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ'টাকে লইয়া ঘোষাল মহাশয় এত উল্লাস প্রকাশ করিয়াছেন কেন, তাহা আমি কোন রূপেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

ইহার পর আবার পরলোকগত স্বামী বিবেকানন্দ রামানুজের মতবিষয়ে যাহা কহিয়াছেন তাহা হইতেও কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি;—"আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি রামানুজকে দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়সমূহের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিস্বরূপ গ্রহণ করিব। * * * * যাহা হউক, রামানুজের মতে নিত্য পদার্থ তিনটি—ঈশ্বর, জীবাত্মা ও জড়প্রপঞ্চ। জীবাত্মা সকল নিত্য আর নিত্যকালই পরমাত্মা হইতে পার্থক্য থাকিবে। তাহাদের স্বতন্ত্রত্বের কখনও লোপ হইবে না। * * * * তাঁহার মতে জীবাত্মা ও ঈশ্বর যেমন সত্য, জড়প্রপঞ্চও তদ্রূপ। ঈশ্বর সকলের অন্তর্যামী বলিয়া রামানুজ স্থানে স্থানে পরমাত্মাকে জীবাত্মার সহিত অভিন্ন—জীবাত্মার সারভূত পদার্থ বলিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রলয়কালে যখন সমগ্র জগৎ সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়, তখন জীবাত্মাও সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়া তদ্রূপ ভাবে অবস্থান করে। পরকল্পের প্রারম্ভে আবার তাহারা বাহির হইয়া তাহাদের পূর্ব্ব-কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে।"

স্বামীজী যদি রামানুজকে বুঝিতে ভুল করিয়া না থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার (রামানুজের) দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা বিশিষ্ট-দ্বৈতবাদের মূল্য কিছুমাত্র থাকে কি? তাঁহাকে দ্বৈতবাদী কেন, ত্রৈতবাদীও ত বলা যাইতে পারে; কেন না, কেবলমাত্র জীবাত্মা নয় জড়প্রকৃতিও তো তাঁহার মতে ঈশ্বরের ন্যায়ই নিত্যবস্তু। নিত্যবস্তুর ক্রমবিকাশের সম্ভাবনা থাকে কি? এবং তদ্রূপ একটি জীবাত্মাদ্বারা নিখিল বিশ্ব ক্রমশঃ সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে পরিব্যাপ্ত হইতে পারে কি? এহেন দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদকে ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করিলে পর ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করা হয় না কি? আবার জীবাত্মার সঙ্কোচাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া ও তাহা হইতে বাহির হইয়া পুনরায় তাহার কর্ম্মফল ভোগ করা ইত্যাদি কল্পনাকে সত্যধর্ম্মানুমোদিত সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারা যায় কি? যদি না পারা যায় তবে তৎসংশ্লিষ্ট জ্ঞানটা মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে তো পারে না—একটির সহিত অন্যটির পতন অবশ্যম্ভাবী নয় কি? এখন বিশ্বাসটাকে উপনিষদের ঋষিরাও কি চক্ষে দেখিতেন, তাহার একটা নমুনা নিয়ে দিতেছি;—

"শ্বেতকেতু মনে মনে আপত্তি করিতেছেন, 'যদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যই না হইলেন, তবে সে ব্রহ্ম দিয়া আমার নিত্য ব্যবহার সিদ্ধ হইতেছে না এবং তাঁহার সঙ্গে ত আমার সাক্ষাৎ, পরিচয়ের সম্ভাবনা রহিল না'।"

"অনন্তর পিতা (ব্রহ্মজ্ঞ পিতা উদ্দালক) বলিলেন, 'শ্রদ্ধৎস্ব বৎস'—'বৎস, বিশ্বাসচক্ষুর নিকট ব্রহ্ম প্রকাশ হন। তাঁহাকে জানিতে হইলে যে ইন্দ্রিয়টির প্রয়োজন হয় তাহা এখন তোমার ফোটে নাই। বিশ্বাসীর নিকট তিনি প্রকট হন। বিশ্বাস-চক্ষুতে তিনি আপনাকে ধরা দেন।" *

ইহার পরেও কেহ বলিতে পারেন কি "একটা জ্ঞানপ্রণালী প্রাচীন ঋষিদের ছিল সন্দেহ নেই" ইত্যাদি ইত্যাদি?

আর এই কালের ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী আমরাও আমাদের প্রত্যেকের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই এই সাক্ষ্য দিতে পারি না কি যে, জীবন্ত সত্যধর্ম্মকে বিশ্বাসী প্রাণের উৎস হইতেই প্রবাহিত হইতে দেখিয়াছি, জ্ঞানের কৃত্রিম প্রস্রবণ হইতে নয়? তাহা হইলে বিশ্বাসকে বর্জ্জন করিয়া জ্ঞানকে বরণ করিয়া লইতে যাইবে কেন?

অতুলচন্দ্র রায়

প্রেরিত পত্র।

[প্রেরিত পত্রের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।—

জনসাধারণের মধ্যে কিরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা যাইতে পারে, তাহার দুইটি উপায়ের কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

(১) প্রথম উপায়, যাঁহারা পড়িতে পারেন, তাঁহাদের জন্য সহজ ও সরল ভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্মের সাহিত্য প্রচার করা। এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্মের সাহিত্য যাহা বাহির হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ জ্ঞানমার্গ অবলম্বী। যাহারা জ্ঞানের পথ দিয়া আসিতে চাহে না, তাহাদের পক্ষে তাহা তত উপযুক্ত নহে। মানুষ জ্ঞান না চাহিলেও, জীবনের প্রশ্নগুলির মীমাংসা করিতে চাহে। জীবনের দ্বারগুলি উদ্ঘাটন করিয়া যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যসকল দেখাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে মানুষ সহজে ইহাতে অনুরক্ত হয়। এ বিষয়ে দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি;—

যখন আমি হিন্দুসমাজে ছিলাম, তখন আমাদিগের একজন নিকট আত্মীয়া ছিলেন। ধর্ম্মসম্বন্ধে যে তাঁহার বিশেষ কোন চিন্তা বা আগ্রহ ছিল, তাহা পূর্ব্বে দেখি নাই। প্রায় ১৯ বৎসর পরে তাঁহার সহিত আমার পুনরায় সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া দেখিলাম যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক উন্নত ও সারবান্ কথা তিনি জানেন ও বিশ্বাস করেন। এই সকল শুনিয়া আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্যবোধ হইয়াছিল। এ সকল যে কেবল শেখা কথা নহে, তাহাও একটি কথায় বুঝিতে পারিলাম। তিনি বলিলেন,—

* বৈশাখের 'ব্রহ্মবাদী'তে প্রকাশিত 'শ্বেতকেতুর নবজীবন' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত কথোপকথনাংশ সংগ্রহ করা হইয়াছে।

তাঁহার স্বামী পূর্ব্বে ধর্ম্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন বলিয়া তাঁহার দুঃখ ছিল, কিন্তু এখন তাঁহার অনেকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিরূপে তিনি ধর্ম্মবিষয়ে উন্নতিলাভ করিলেন পরে তাহা অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলাম যে, তিনি রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ-সম্প্রদায়ের 'বই' সকল পাঠ করিয়াছেন; কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংসকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন না।

সময়ে সময়ে হিন্দুসমাজের কোন কোন মহিলা ধর্ম্মের পিপাসা লইয়া ব্রাহ্মপ্রচারকদিগের নিকট উপস্থিত হন। তাঁহারা যে সকল ধর্ম্মের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন অথবা প্রশ্ন করেন, তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যে হিন্দু মহিলাদিগের মধ্যে দেবদেবীর পূজা ও ব্রতনিয়মাদি রক্তে মাংসে জড়িত, তাঁহারা ধর্ম্মের জন্ত ব্রাহ্মপ্রচারকদিগের নিকট উপস্থিত হন, ইহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বইসকল তাঁহাদের প্রাণে প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসা জাগাইয়া দিয়াছে; কিন্তু তাহাতে তৃপ্তি পান নাই বলিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মপ্রচারকের নিকট আসিয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহই উচ্চশিক্ষিতা নহেন, সামান্ত শিক্ষা পাইয়াছেন মাত্র। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, রামকৃষ্ণ-মিশন সাহিত্য প্রচার দ্বারা যাহা করিতেছেন, আমাদের মধ্যে তাহার অভাব রহিয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশনের পুস্তকে প্রাণে যে ধর্ম্মভাব জাগাইয়া দেয়, তাহা অবতারবাদ ও সাকার উপাসনায় তৃপ্ত হয় না বলিয়া, লোকে আমাদের নিকট আসে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের সরল সাহিত্যের অভাবে সাধারণের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব যে কত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, সে সম্বন্ধে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালার পরীক্ষক, কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন,—ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব ছাত্রগণের মধ্যে যে কত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, তাহা পরীক্ষার্থিগণের বাঙ্গালা রচনা পরীক্ষা করিলেই দেখা যায়; তাহারা রচনাতে পরমহংস রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের কথাই বলিয়া থাকে, রাজা রামমোহন রায়ের কথা কদাচিৎ কেহ উল্লেখ করে। প্রচারকগণ যে কয়েকজন লোকের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা বলিতে পারেন, সাহিত্য তাহা অপেক্ষা বহু লোকের নিকট সংবাদ বহন করে। কিন্তু যে সাহিত্যের মধ্যে কেবল দর্শনের রূঢ়তা অথবা ভাষার ঝঙ্কার, তাহা সাধারণে পড়িতে চাহে না। যাহাতে জীবনের প্রশ্নগুলির মীমাংসা হয় এমন কথা যদি সহজ ভাষায় লেখা যায়, তাহা সকলেই আগ্রহ করিয়া পড়িবে; কেন না, সমাজের যে স্তর এখনও ইউরোপীয় জড়বাদমূলক সভ্যতা স্পর্শ করিতে পারে নাই, সেখান হইতে এখনও ধর্ম্মের প্রতি আগ্রহ তিরোহিত হয় নাই।

(২) যাহারা অশিক্ষিত, তাহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের বহুকালপ্রতিষ্ঠিত একটি প্রাচীন প্রথা এ দেশে বর্ত্তমান আছে। তাহা এই,—সহজ কবিতায় ধর্ম্মের সত্যগুলি নিবদ্ধ করিয়া তাহার পাঠ ও ব্যাখ্যা করা। প্রাচীন উপনিষদগুলিতে দেখা যায় কবিতার মধ্যে সত্যসমূহ নিবদ্ধ করা হইয়াছিল। উপনিষৎকার গদ্যে শিষ্যদিগের নিকট ধর্ম্মের উপদেশ দিতেছেন বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে "তদেষ শ্লোকো ভবতি" বলিয়া প্রাচীন শ্লোক উদ্ধার করিতেছেন। ইহা জ্ঞানীর নিকটে জ্ঞানীর উপদেশ. হইলেও আমাদের মনে রাখিতে হইবে, সে সময়ে লিখিবার প্রথা আবিষ্কার হয় নাই। সে যাহা হউক, বুদ্ধের সময়েও দেখি, বুদ্ধ যখন শিষ্যমণ্ডলীকে উপদেশ দিতেছেন, তখন গদ্যে; কিন্তু অনেক বিষয় শ্লোকে রচনা করিয়া সাধারণে প্রচার করিয়াছেন। অনেকেই বোধ হয় বুদ্ধ প্রতিসেনা ও ভিক্ষুণীদিগের গল্প জানেন। প্রতিসেনা একটি-মাত্র কবিতা জানিতেন, কিন্তু তাঁহাকেই বুদ্ধ ভিক্ষুণীদিগকে উপদেশ দিবার জন্ত পাঠাইয়া দিলেন। প্রতিসেনা সেই কবিতাটি আবৃত্তি করিয়া এমন চমৎকার ব্যাখ্যা করিলেন যে, যে সকল ভিক্ষুণী প্রথমে তাঁহার অজ্ঞতায় তাঁহাকে তুচ্ছ করিয়াছিল, তাহারাও মোহিত হইল। নানক ও কবীর সাধারণের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের জন্ত কবিতার আশ্রয় লইয়াছিলেন।

উড়িষ্যায় একেশ্বরবিশ্বাসী এক সম্প্রদায় আছে। তাহারা সাধারণতঃ উড়িষ্যার গড়জাতে বাস করে। তাহারা জাতিভেদ স্বীকার করে না বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও নাপিতের অন্ন গ্রহণ করে না। এইরূপ কোন কোন বিষয়ে কুসংস্কার তাহাদের মধ্যে আছে। ইহাদের প্রচারকগণ সন্ন্যাসী। এইরূপ একজন প্রচারকের সহিত খড়্গপুরের রেলগাড়ীতে আমার দেখা হয়। অপরের সহিত কথায় কথায় তিনি প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। দেখি যে, সন্ন্যাসী উড়িয়া ভাষায় শ্লোক আবৃত্তি করিয়া ধর্ম্মের কথা বলিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি, এই ধর্ম্মের লোক উড়িষ্যার করদরাজ্যে অনেক আছে এবং রাজাদের অত্যাচারেও তাহারা ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে নাই। এইভাবে প্রচারদ্বারা তাহারা বহু অশিক্ষিত লোকদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মও যে এরূপ ভাবে প্রচার হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না। স্বর্গীয় কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় যাঁহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা শিক্ষিত লোক ছিলেন না। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির সহিত কথা বলিয়া দেখিয়াছি যে, তাঁহারা তাঁহার ভাবসঙ্গীতের অনেক গান mottoর ন্যায় করিয়া রাখিয়াছেন। দর্শন বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ না হইলেও, ভাবসঙ্গীতের ধর্ম্মতত্ত্ব তাঁহাদিগের জীবনের অনেক উপকার করিয়াছে।

বাস্তবিক যাহাদিগকে আমরা অশিক্ষিত বলি, তাহারা অজ্ঞ নহে। বুঝাইবার প্রণালী জানিলে, তাহাদিগকে বুঝান যায়। ইহাদের মধ্যে অনেকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব সকল বুঝিতে পারে। সংকীর্ত্তন ও কথকতার মধ্য দিয়া কতকটা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা যাইতে পারে; কিন্তু সে সম্বন্ধে এখন কোন আলোচনা করিতেছি না। এ দেশে বহুকাল হইতে আগত একটি প্রথা রহিয়াছে, সহজ কবিতার মধ্য দিয়া ধর্ম্মপ্রচার। ইহাদ্বারা লোকে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। ইহার মধ্যে কোন কুসংস্কারের সংস্পর্শ নাই।

অতএব ব্রাহ্মসমাজের সাহিত্যের এক অংশে ব্রাহ্মসমাজের সত্য সকল সহজ কবিতায় নিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। ব্রহ্মসঙ্গীতে এইরূপ কিয়ৎপরিমাণে আছে বটে, কিন্তু অধিক নহে। সঙ্গীতের উদ্দেশ্য এ উদ্দেশ্যের সহিত মিলে না। ইহার জন্ত স্বতন্ত্র সাহিত্য আবশ্যক।

এইরূপ কবিতার প্রকৃতি কিরূপ হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে দুই একটি কথার উল্লেখ করি। ইহার ভাষা অতি সহজ, মধুর এবং যতদূর সম্ভব জটিলতা বর্জ্জিত হইবে। কাশীরাম দাস ও কবি কৃত্তিবাস যে ভাষায় লিখিয়াছেন, সেই ভাষাই এ বিষয়ে সমীচীন মনে হয়। সংস্কৃতবহুল শব্দ ও বৈষ্ণবদিগের ন্যায় গ্রাম্য শব্দ উভয়ই বর্জ্জন করিতে হইবে। এ উভয়ই মানুষ সহজে বুঝে না। উচ্চ অঙ্গের কবিত্ব ও mysticism ইহার মধ্যে একেবারেই থাকিবে না। সত্যকে সহজ করিবার জন্য উপমা আবশ্যক; কিন্তু উপমাগুলি যিশু যেমন সাধারণ জীবন হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ হইলে সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হয়। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, ইহা সাহিত্যের জন্য সাহিত্যচর্চ্চা নহে, কিন্তু সাহিত্যকে যানরূপে অবলম্বন করিয়া লোকের প্রাণে সত্যকে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। এককথায় ইহা পদাবলী (versification), কাব্য (poetry) নহে।

সকলের দৃষ্টি যাহাতে এ বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, তাহাই আমার উদ্দেশ্য। অনেকেই অবসর সময়ে এইরূপ কবিতা লিখিতে পারেন এবং অনেকের হয় ত এবিষয়ে দক্ষতাও আছে। তাহা যদি উপযুক্ত হয় ও সাহিত্যের আকারে প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে প্রচারের সহায় হইতে পারে। যাহা হউক, এরূপ কবিতা কিরূপ হওয়া উচিত, সাধ্যমত তাহার একটি মোটামুটি আদর্শরূপে কয়েক লাইন লিখিয়া এই পত্রের শেষে যোগ করিয়া দিতেছি।

(১)

ভাব কি মন এই বিশ্ব আপনি জন্মিল,
শূন্য হ'তে আবির্ভূত, শূন্যেতে রহিল?
আকাশের চিত্রপটে, গ্রহ তারকায়,
জ্ঞানের প্রমাণ কভু মনে নাহি লয়?
রবি শশী আলো দেয়, অলঙ্ঘ্য গতিতে,
ইহার রহস্য কভু চাহ না বুঝিতে?
বৃক্ষলতা পত্রে পত্রে, বিচিত্র জগতে,
সংখ্যার অতীত জীবে, জীবনের পথে,
সর্ব্বত্র জ্ঞানের চিহ্ন, জগৎ প্লাবিত,
বিশ্বসৃষ্টি রন্ধ্রে রন্ধ্রে জ্ঞানের সঙ্গীত।

(২)

জ্ঞানী বিনা জ্ঞান কভু পারে কি থাকিতে?
চক্ষু বিনা দৃষ্টিশক্তি হয় কি মহীতে?
মন বিনা সুখ দুঃখ—অসম্ভব কথা!
আধার বিহীন গুণ নাহি থাকে কোথা।
আধার হইতে গুণ বিচ্ছিন্ন করিয়া,
কল্পনার বলে ভাবি স্বতন্ত্র করিয়া।
বিশ্বজ্ঞান যে আধারে, সেই জ্ঞানময়,
বিশ্বজন জ্ঞানময়, তাহারেই কয়।

(৩)

বহু নহে, সেই জ্ঞানী একমাত্র হয়,
সকলে ধারণ করি বিদ্যমান রয়।
সকলি তাঁহাতে স্থিত, (তিনি) সকলের প্রাণ,
সকল বস্তুর মাঝে সংযোগের স্থান।
বুঝিতে না পারি নরে দেবতা রচিল,
স্রষ্টাকে ভুলিয়া শুধু ক্ষুদ্রকে মানিল।
ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন রীতি,
সৃষ্টিধ্বংস হয়, হলে দেবতায় স্থিতি।
ভিন্ন ভিন্ন নরপানে দেখ না চাহিয়া,
ঝগড়া বিবাদ করে স্বতন্ত্র হইয়া।
কিন্তু তথা দেখি এক অপূর্ব্ব একত্ব,
যাহার কারণে ধ্বংস বহুদূরগত।
সকলের জ্ঞান এক, এক ভাবে বুঝে,
ফুলে ফুল, বৃক্ষে বৃক্ষ, সকলেই সুঝে।
সকলের প্রাণে যেই ধর্ম্মভাব সার,
তাহাতে ধরিয়া আছে বিচিত্র সংসার।
একের নিকট হ'তে একত্ব পাইয়া,
সমাজ উন্নত হয়, জীবন লভিয়া।
বহুদেব যদি মান, স্বতন্ত্র সকলে,
সৃষ্টির বিরোধে সৃষ্টি যেত রসাতলে।
যদি ভাব ঈশ্বরের সৃষ্টি দেবগণ,
তাঁহারই একত্বে এক, মানব যেমন,
অথবা আদেশে তাঁর সৃষ্টির প্রেরণা,
তবে, বৃথা (এই) দেবজ্ঞান বৃথা এ কল্পনা।
দেবগণস্রষ্টা যিনি, তিনি কি দুর্ব্বল,
বলবৃদ্ধি তরে সৃজে দেবতা সকল?
যাঁর কথা বল পেয়ে সবে হয় বলী,
তাঁর জন্য বল চাই, কেমনেতে বলি?
অথবা অলস তিনি, ভাব কি অন্তরে,
করিলা দেবতা সৃষ্টি, সাহায্যের তরে?
নরপ্রায় হীন কেন ভাবহ ঈশ্বরে?
এক ছাড়া দুই নাই, দেখ চিন্তা ক'রে।
শাস্ত্রেতে দেবের কথা আছে তাহা জানি,
অপরের কথা তাহা সহজে না মানি।
জ্ঞানজ্যোতি দীপ রূপে সকল হৃদয়ে,
দেখায় সত্যের রূপ নিরপেক্ষ হ'য়ে।
নিজজ্ঞানে মিথ্যা বলি যাহা বুদ্ধি হয়,
অপরের বাক্যে তাহা না মান প্রত্যয়।
এক শাস্ত্রে এক বলে, আর শাস্ত্রে মানা,
এক শাস্ত্রে পূজে যাহা, আর শাস্ত্রে থানা।
সতীদাহ, গাভীবধ, শূদ্রের পীড়ন,
প্রাচীন সংস্কার যত শাস্ত্রে হল স্থান।
অকার্য্য, কুকার্য্য যাহা আপন বুদ্ধিতে,
শাস্ত্রের বিহিত হ'লে (ও) পার না করিতে।
সেই জন্য বলি ভাই, পর কথা ছাড়,
আপনি বুঝিয়া দেখ, একমাত্র সার।
এক ছাড়া, দুই নাই, অসীম শকতি,
অনন্ত জ্ঞানের জ্ঞানী, এই বিশ্বপতি।

বিনীত

চয়নিকা।

"হওয়া" এবং "করা"—আইন বলে—কর, শাস্ত্রের উপদেশ—হও। করা অপেক্ষায় হওয়া অনেক উপরে; কেননা হওয়ার ভিতরে করা নিহিত আছে; হইতে হইলেই করিতে হয়: দয়ালু হইতে হইলেই আর্ত্ত জনে দয়া করিতে হয়; সাধু হইবেন যিনি তাহাকে সৎকার্য্য করিতেই হইবে।

—বিশপ টেম্পল।

হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান। হওয়া সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম প্রচেষ্টার প্রসূতি। ছোট কাজ, বড় কাজ সকলই হওয়ার সন্তান। প্রসূতি না হইলে সন্তানের অস্তিত্ব অসম্ভব।

—ম্যাকডোনেল্ড।

ব্রাহ্মসমাজ।

প্রচার—শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল নিম্নলিখিত রূপে প্রচারকার্য্য করিয়াছেন :—তেজপুর—একদিন ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার পরে ব্রাহ্মবন্ধুগণের সহিত ব্রাহ্মসাধনা ও ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাঁ, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত বরকাকতি এবং শ্রীমতী স্বর্ণলতা দত্তের গৃহে পারিবারিক উপাসনা সম্পাদন করেন। ব্রহ্মমন্দিরে একটি বক্তৃতা এবং দুই রবিবার সাপ্তাহিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ এবং ধর্ম্মবন্ধুগণের সহিত আলোচনা করেন। গোয়ালপাড়া—প্রতিদিন প্রাতঃকালে বাবু ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের গৃহে পারিবারিক উপাসনা করেন। শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল দাসগুপ্ত ও আনন্দচন্দ্র সেনের গৃহে সমবেত মণ্ডলীতে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। একদিন বাবু ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের পরিবারে কি করিয়া ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মযুবকগণের অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়, সে বিষয়ে উপদেশ দেন ও আলোচনা করেন। স্থানীয় ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী-হলে দুইটি বক্তৃতা করেন। (১) "বর্ত্তমান যুগ।" (২) "বাংলা কবিতায় বিশ্বজনীন ধর্ম্মভাব।" দ্বিতীয় বক্তৃতাটি সাহিত্যসভার উদ্যোগে প্রদত্ত হয়। ইহা ভিন্ন ধর্ম্মবন্ধুগণের সহিত ধর্ম্মালোচনাদি হয়।

বিবাহ—২০শে আষাঢ় কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত মথুরানাথ নন্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শোভনার ও পরলোকগত গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ হিমাংশুমোহনের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

শ্রীযুক্ত হৃদয়চন্দ্র আচার্য্যের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সরোজ-কুমারীর সহিত শ্রীহট্ট নিবাসী শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বিবাহ গত ৮ই জুন প্রসাদপুরে (কাওড়াদি) সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র লাহিড়ী আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতীদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

নামকরণ—শ্রীমান সুকুমার গুপ্তের প্রথম সন্তানের নামকরণ অনুষ্ঠান পুষানগরে ৬ই জুলাই তারিখে সম্পন্ন হয় ও শিশুকে সুকৃতিরঞ্জন নাম প্রদত্ত হয়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। তদুপলক্ষে শিশুর পিতামাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জেনারেল ফণ্ডে দশ টাকা দান করিয়াছেন।

বিগত ১৯শে তারিখে কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষের শিশুকন্যার নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। কন্যার নাম "আশালতা" রাখা হইয়াছে। এই উপলক্ষে কন্যার পিসীমাতা শ্রীযুক্তা বসন্ত কুমারী বসু সাধনাশ্রমে ১৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য বিভাগে ১৲, দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে ১৲ দান করিয়াছেন।

ভগবান শিশুদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

বাগনান ব্রাহ্মসমাজ—নিম্নলিখিত প্রণালীতে বাগনান সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজের ২য় বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে—

২৩শে জ্যৈষ্ঠ উদ্বোধন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। ২৪শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতে উপাসনা—শ্রীযুক্ত পাণ্ডবনাথ সিংহ উপাসনা করেন। তৎপরে বেলা ২ ঘটিকার পর মহিলাদের বিশেষ উৎসবে শ্রীমতী মাখনবালা বসু উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ বেদশাস্ত্রী উপাসনা করেন। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতে উপাসনা—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র উপাসনা করেন। মধ্যাহ্নে আলোচনা ও পাঠ হয়। সন্ধ্যায় কীর্ত্তনের পর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। ২৬শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চক্রবর্ত্তীর সাধনকুটীরে শ্রীযুক্ত পাণ্ডবনাথ সিংহ উপাসনা করেন। সন্ধ্যায় শান্তিবাচন—শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায় উপাসনা করেন।

কুমারখালী ব্রাহ্মসমাজ—১৫ই জুন কুষ্টিয়া হইতে শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র বিদ্যার্ণব, বিপিনমোহন সেহানবীশ, দক্ষিণারঞ্জন আচার্য্য প্রমুখ ব্রাহ্মবন্ধুগণ এখানে উপস্থিত হন। বিদ্যার্ণব মহাশয় "ধর্ম্মজীবনের সহায়" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেওয়ার পর সেহানবীশ মহাশয় উপাসনা করেন।

বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজ—বিশ্বব্যাপী শান্তিস্থাপন জন্য বিশেষ ভাবে ভগবানকে ধন্যবাদ প্রদান উদ্দেশ্যে গত ৬ই জুলাই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে যে বিশেষ উপাসনা হয় তাহাতে যোগদান করিবার জন্য বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ আগমন করিয়া, উৎসাহের সহিত কীর্ত্তনাদি করেন। তৎপরে তাঁহারা বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া সেখানেও বিশেষ উপাসনায় যোগ দেন। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চৌধুরী উপাসনা ও প্রার্থনাদি করেন।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ—নিম্নলিখিত ভাবে বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে—৯ই আষাঢ় মঙ্গলবার সায়ংকালে জমাট সঙ্কীর্ত্তনান্তে "ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন" বিষয়ে আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাবু শ্রীচরণ সেন আলোচনা উপস্থিত করেন। ১০ই আষাঢ় প্রাতে এবং সায়ংকালে সঙ্গীত, সঙ্কীর্ত্তন ও উপাসনা হয়। প্রাতে শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ এবং সায়ংকালে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ১৫ই আষাঢ় সোমবার প্রাতে বরিশালস্থ সর্ব্বানন্দ ভবনে স্বর্গীয় সর্ব্বানন্দ দাস মহাশয়ের পৌত্র, পৌত্রী এবং দৌহিত্র ও দৌহিত্রীগণের এম্, এ, বি, এ, বি, এস্, সি এবং মেট্রিক পরীক্ষায় সফলতায় আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জন্য বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রীতি জলযোগে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

বিগত ১৩ই আষাঢ় সায়ংকালে বরিশালস্থ কল্যাণকুটিরে (মনোমোহন বাবুর গৃহে) শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহের পরলোক গমন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তনাদি হয়। শ্রীযুক্ত মনো-মোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস বি এ, পারলৌকিক তত্ত্বপাঠ ও উপরত আত্মার সম্বন্ধে কিছু বলেন, এবং বাবু রাজকুমার ঘোষ প্রার্থনা করেন। সামান্য প্রীতি জলযোগে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে বিগত ১৫ই আষাঢ় কুমিল্লা নগরীতে পরলোকগত গুরুদয়াল সিংহের কন্যা সুরবালা কলেরা রোগে অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাকে তাঁহার চিরশান্তিতে রাখুন এবং আত্মীয় স্বজনদের প্রাণে সান্ত্বনা বিধান করুন।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Registered No C. 65

অসতোমা সদ্গময়,
তমসোমা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪২শ ভাগ। ৮ম সংখ্যা। | ১৬ই শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৩২৬, ১৮৪১ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯০
1st August, 1919. | অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲
প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে বিশ্ববিধাতা, জগতের* ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ঘটনা তোমারই ইচ্ছাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। মোহান্ধ মানুষ তোমায় স্বীকার করুক আর না করুক, অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া তোমার শক্তিতে ও কর্ত্তৃত্বে নির্ভর করুক আর না-ই করুক, সকল অবস্থাতেই তোমার বিধাতৃত্ব অব্যাহতই থাকে। মানুষ আপনার বুদ্ধি বিবেচনা, খেয়াল প্রভৃতি অনুসারে যে পথেই চলুক না কেন, যাহাই করুক না কেন, তাহাকে ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে তোমার পথেই আসিতে হয়, তোমার কার্য্যই সর্ব্বোপরি সিদ্ধ হয়। আমরা তোমার ইচ্ছাধীন হইয়া চলি না বলিয়াই, তোমার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করি না বলিয়াই, আমাদিগকে পদে পদে কত বাধা বিঘ্ন পাইতে হয়, কত বিষয়ে ব্যর্থমনোরথ, বিফলযত্ন হইতে হয়; এমন কি, অনেক সময় নানাপ্রকার দুঃখ ক্লেশ লাঞ্ছনাও ভোগ করিতে হয়! পরিতাপের বিষয়, এত দেখিয়া শুনিয়াও, এত ভোগ করিয়াও আমাদের শিক্ষা হয় না, জ্ঞানোদয় হয় না—নাস্তিকের ন্যায়ই তোমাকে ভুলিয়া জীবন যাপন করি। হে শুভবুদ্ধিদাতা পিতা, তুমি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান কর, আমাদিগকে এই ভাবে কার্য্যতঃ নাস্তিকের জীবন যাপন করিতে আর দিও না। সকল কার্য্যে তোমাকে বিধাতা বলিয়া স্বীকার করিতে, সকল বিষয়ে তোমারই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে, তোমারই সম্পূর্ণ অধীন হইতে সমর্থ কর। আমাদের জীবনে ও সমাজে সর্ব্বত্র তোমার ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

সম্পাদকীয়।

বিধাতাবর্জ্জন—কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিলাম, জাতিসঙ্ঘের প্রস্তাবনা ও নিয়মাবলীর মধ্যে কোথাও বিধাতার নামোল্লেখ নাই। ইহাতে কোন কোন মার্কিন সংবাদ-পত্র আশ্চর্য্য বোধ করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, যাহার উপর জগতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস নির্ভর করিতেছে এরূপ একটা গুরুতর বিষয়ে বিশ্ববিধাতাকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করা মার্কিন জাতির গূঢ় প্রকৃতির অন্তরনিহিত ভাবের বিরোধী, আর বাহিরের শত আয়োজন সত্ত্বেও আশা করা যায় না এরূপ প্রতিষ্ঠান সাফল্য লাভে সমর্থ হইবে;—মানুষ প্রস্তাবনা করে, বিধাতা বিধান করেন, ইহা চিরদিনই সত্য। বাস্তবিক প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিকেই স্বীকার করিতে হইবে, এই কথার মধ্যে গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে। জয়দৃপ্ত মিত্রশক্তিগণ বিজয়োল্লাসের মধ্যে এই কয় বৎসরের যুদ্ধের কঠোর অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা এত অল্প সময়ের মধ্যে ভুলিয়া গিয়াছেন কি না জানি না। এরূপ বিশ্ব-বিধাতার নামবর্জ্জন ইচ্ছাকৃত, কি মোহ-অজ্ঞানতা সমুৎপন্ন ধর্ম্মহীনতার পরিচায়ক, অথবা শুধু অনবধানতাসম্ভূত, বলিতে পারি না। এরূপ অমার্জ্জনীয় ভ্রম মার্জ্জনা করা সম্ভবপর হইলেও বলিতে হইবে, যে কার্য্যের মূলে একমাত্র আপনাদের বুদ্ধি বিবেচনা, শক্তি সামর্থ্য, নৌ ও সেনাবল, কূটনীতি ও স্বার্থবুদ্ধি বা বাক্চাতুর্য্যের উপর নির্ভর, সে কার্য্য কখনও জয়যুক্ত হইতে পারে না। জগতের সমগ্র ইতিহাস এই সাক্ষ্য দিতেছে, বিগত যুদ্ধের ইতিহাসও উজ্জ্বল ভাবে ইহাই প্রমাণ করিতেছে। মানুষের গভীর চিন্তা ও দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রম-প্রসূত কত আয়োজন উদ্যোগ যে কোন দুর্জ্জ্ঞেয় অলক্ষিত

সূত্রে একেবারে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, মানুষ যাহা কখনও অনুমান বা কল্পনা করিতে পারে নাই এরূপ অচিন্তনীয় ঘটনা যে ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই লক্ষ্য করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। সুতরাং সকল ঘটনার পশ্চাতে বিশ্ববিধাতার হস্তদর্শন না করা, সর্ব্বোপরি তাঁহার কর্তৃত্ব স্বীকার না করা যে মহামূর্খতা ও চিন্তাহীনতার পরিচায়ক, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু মুখে স্বীকার করিলেই যে বিধাতাকে যথার্থ ভাবে স্বীকার করা হইল, তাহা বলা যায় না। যুদ্ধের প্রারম্ভে কাইজারের মুখে—জর্ম্মন-সম্রাটের বক্তৃতাদিতে—বিধাতার নাম অনেকই শ্রবণ করা গিয়াছে; কিন্তু তাঁহার নির্ভর বিধাতার উপর কতটা ছিল আর আপনার শক্তি সামর্থ্য—অগণ্য সুশিক্ষিত সেনা, বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধের আয়োজন, জগদ্ব্যাপী সুপরিচালিত গুপ্তচর-মণ্ডলী, অনন্যসাধারণ কূটরাজনীতির উপর কতটা ছিল, তাহা হয় ত অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এ দেশে কত দস্যু তস্কর যে আপনাদের পাপকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য আপন আপন ইষ্টদেবতার নাম গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা সকলেই বিদিত আছেন। অপর দিকে কোনও ভক্ত সাধু সম্বন্ধে এরূপ কথিত আছে যে, তিনি কখনও আপনার প্রিয়তম ঈশ্বরের নাম মুখে আনিতেন না, লোকে তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়াই মনে করিত; এক দিবস অলক্ষিতে মুখ হইতে ঈশ্বরের নাম বহির্গত হওয়াতে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন—যে নাম অতিপ্রিয়-জ্ঞানে এই সুদীর্ঘকাল হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে একান্ত গোপনে জপ করিয়াছেন, তাহাকে বহুমূল্যজ্ঞানে অতি যত্নে লোকচক্ষুর অগোচরে না রাখিয়া লোকের নিকট প্রকাশ করিয়া বুঝি হেয় ও অপমানিতই করিয়া ফেলিলেন, ইহা বুঝি তাঁহার প্রেমহীনতারই পরিচয় দিল, অবিশ্বাসই প্রকাশ করিল! বাস্তবিক মুখে ঈশ্বরের নাম গ্রহণ না করিয়াও একজন অন্তরে বিশ্ববিধাতার বিধাতৃত্বে বিশ্বাসী হইতে পারে; বাহিরে নাস্তিক হইয়াও ভিতরে কার্য্যতঃ আস্তিক হইতে পারে। এই হেতু আমাদের বাহিরের বিচার অনেক সময় ভ্রান্তিমূলক হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু অপরের বিচার বা সমালোচনা সম্বন্ধে কিছু বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। ইহার মধ্যে যে গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে, আমরা তাহার দিকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। বিশ্ববিধাতাকে ভুলিয়া শুধু আপনার উপর নির্ভর করিয়া চলিলে, ব্যক্তিগত জীবনেই হউক আর সামাজিক জীবনেই হউক, ক্ষুদ্র বৃহৎ কোনও বিষয়েই সফলতালাভের আশা নাই। আমরা অতি সুবিবেচনার সহিত যে পথ নির্দ্দেশ করি এবং পূর্ণ আশার সহিত যে উপায় অবলম্বন করি, তাহাও আমাদিগকে অনেক সময় সফলতা প্রদান করিতে পারে না। জগতের ঘটনাবলী এমনি ভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্বদ্ধ যে, তাহাদের সকল যোগসূত্র নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ করা মানববুদ্ধির পক্ষে কখনও সম্ভবপর নহে। অপর দিকে তাঁহার ইচ্ছা সকল ঘটনার মধ্যে এমনি ভাবে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে, এই বিশ্ববিধানকে এমনি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে যে, সে ইচ্ছাকে ব্যর্থ ও অতিক্রম করিবার শক্তি কাহারও নাই। সুতরাং এই মহাসত্য ভুলিয়া—বিশ্ববিধাতার জীবন্ত বিধান স্বীকার না করিয়া, আপনার উপর নির্ভর করিয়া জীবনপথে চলিতে গেলে ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু শুধু মুখে স্বীকার করিলেই যথেষ্ট হইল না। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে এ বিশ্বাস পোষণ করিতে হইবে—সকল বিষয়ে, সকল সময়ে, এ দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে। আমাদের প্রতিদিনের জীবন, ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্য, একটু সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিলেই দেখিতে পাইব, আমরা অনেক সময়ই ইহা ভুলিয়া যাই, মুখে আস্তিক হইয়াও কার্য্যগত জীবনে নাস্তিকের ন্যায় ব্যবহার করি। এরূপ ভাবে তাঁহাকে ভুলিয়া, জীবন-বিধাতাকে পরিত্যাগ করিয়া জীবনপথে চলিতে গেলে যে কোনও প্রকারেই কল্যাণ নাই, তাহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। এ দিকে আমাদের সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক। আমরা যেন কার্য্যতঃ বিধাতাকে বর্জ্জন করিয়া সংসারপথে না চলি। তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন। তাঁহার ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক।

সদয় ব্যবহার—পশুর প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ নিবারিণী সভার নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। ইঁহারা আহারার্থ প্রাণিহত্যার বিরোধী না হইলেও, পশুপক্ষীদের প্রতি যাহাতে নির্দ্দয় ব্যবহার করা না হয়, সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। এরূপ প্রতিষ্ঠান দ্বারা যে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়, তাহা আর বলিতে হইবে না। যদিও নিষ্ঠুরাচরণ নিবারণ করাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য, তথাপি সদয়ব্যবহারবর্দ্ধনও তাঁহাদের উদ্দেশ্যবহির্ভূত নহে। এই হেতু প্রতি বৎসর জুলাই মাসে এক দিবস প্রতি ভজনালয় হইতে যাহাতে বিশেষ ভাবে এই কর্ত্তব্যের প্রতি লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, ইঁহারা তাহার উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। ইঁহাদের অনুরোধে বিগত ১৪ই জুলাই সায়ংকালীন উপাসনার পর সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ মন্দির হইতেও এ বিষয়ে বিশেষ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহার মর্ম্ম অপর স্তম্ভে প্রকাশিত হইল। এই "অহিংসা পরম ধর্মের" দেশেও যে এ বিষয়ে গুরুতর কর্ত্তব্যে অবহেলা লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। প্রাণিহত্যার একান্ত পক্ষসমর্থনকারী মাংসভোজী ইউরোপীয়-দিগের মধ্যেও সাধারণতঃ পশুর প্রতি অধিকতর সদয় ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহা বলিলে বোধ হয় কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হইবে না। তাহারা যে অনেক সময় মানুষের প্রতি তাহা অপেক্ষা অধিকতর নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা স্বীকার করিলেও, এ বিষয়ে তাহাদের সাধারণ শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করিলে সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা হইবে বলিয়াই অনুমিত হয়। যাহা হউক, তাহাদের চরিত্র সমালোচন আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের মধ্যে এ বিষয়ে যে গুরুতর ত্রুটি লক্ষিত হয়, তাহাই আমাদের দেখিবার ও ভাবিবার বিষয়। আমাদের পরমহিতকারী গোজাতির প্রতি আমাদের ব্যবহার লক্ষ্য করিলেই, ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। পশুদের প্রতি সদয় ব্যবহারের অভাবহেতু যে শুধু তাহাদেরই বৃথা ক্লেশ উৎপন্ন হয়, তাহা নহে; উহাতে যে আমাদেরও গুরুতর ক্ষতি সাধিত হইয়া থাকে, অনেক সময় আমরা তাহা চিন্তা করিয়া দেখি না।

ইহা আমাদের চরিত্রকে যেরূপ হীন করে, আমাদের হৃদয়ের প্রেম ও কোমল ভাব নষ্ট করিয়া যে আধ্যাত্মিক অনিষ্ট সাধন করে, মানুষকে যতদূর পশুতে পরিণত করে, তাহা অপেক্ষা গভীরতর অনিষ্ট ও দুর্দ্দশা আর কি হইতে পারে? এই হৃদয়-হীনতা যে পশুর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহারেই পর্য্যবসিত হয়, তাহাও নহে। ইহা যে ক্রমে মানবের প্রতি, ভ্রাতা ভগিনীর প্রতি, বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনের প্রতি ব্যবহারেও পরিব্যাপ্ত হইবে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। পরিশেষে ইহা অধঃপতনের কোন গভীরতম কূপে আমাদিগকে নিমজ্জিত করিতে পারে, কে বলিবে? সুতরাং ইহা কোনও প্রকারেই অবহেলার যোগ্য নহে। পশুর প্রতি সদয় ব্যবহার সত্ত্বেও মানবের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহারের দৃষ্টান্ত বিরল নহে, স্বীকার করি। কিন্তু পশুর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার ও মানবের প্রতি সদয় ব্যবহার, এতদুভয়ের একত্র সমাবেশ যে আরও সহস্রগুণে বিরল তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এ প্রসঙ্গে স্ত্রীজাতি ও নিম্নশ্রেণীর প্রতি এ দেশীয় লোকের সাধারণ ব্যবহার বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। আমরা ভারতের দয়া ও প্রেমধর্ম্মের যত অহঙ্কারই করি না কেন, সদয় ব্যবহারে যে আমরা অতি দীন, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের মধ্যে এই দীনতা এই হৃদয় হীনতা যেন আরও অধিক পরিমাণে লক্ষিত হইতেছে। সুতরাং দিন দিন আমাদের মধ্যে সদয় ব্যবহার কেন, সাধারণ ভদ্র ব্যবহারেরও কতটা অভাব দেখা যাইতেছে, তাহাও ভাবিবার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মানুষ যদি হৃদয়হীন শুষ্ক যন্ত্রমাত্রে পরিণত হয়, তবে মানবসমাজে বাস করা দুর্বিষহ হইয়া পড়ে। এ বিষয়ে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক হই। প্রেমময় পিতা আমাদিগকে প্রেমসাধনে সমর্থ করুন।

জীবে দয়া।

He prayeth well, who loveth well
Both man and bird and beast,
He prayeth best, who loveth best
All things both great and small;
For the dear God who loveth us,
He made and loveth all.

যিনি এই সৃষ্টির ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলকেই ভালবাসেন তিনিই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপাসক; কেননা, যে ঈশ্বর আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এই সকল তাঁহারই সৃষ্ট এবং প্রিয় বস্তু।

কবি এই ভাবটী ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সর্ব্বস্রষ্টা পরমেশ্বরের সৃষ্টির ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলকে ভালবাসাতেই মানবের আত্মার বিকাশ হয়। সর্ব্বাপেক্ষা মানবের মধ্যেই তাঁর ভালবাসা এবং প্রেমের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্ত প্রিয় পরিজন, পুত্রকন্যা, আত্মীয় বন্ধুর মধ্যে ঈশ্বরের প্রেম দেখিয়া ও তাঁহাদিগকে ভালবাসিয়া ঈশ্বরের দিকে চিত্তকে লইয়া যাইতে পারা যায়। শুধু মানুষ নহে, পশুপক্ষী জীবজন্তুদিগকে ভালবাসিয়াও মানুষ ঈশ্বর-প্রেম উপলব্ধি করিতে পারে। পশুপক্ষীকে আন্তরিক ভালবাসিলে প্রতিদানে তাহাদের নিকট হইতেও ভালবাসা পাওয়া যায়।

Helvellyn dog (হেলভেলিন কুকুর) এর গল্প অনেকেই জানেন। এক পথিক দুর্গম পার্ব্বত্য পথে যাইতে যাইতে বিজন স্থানে কুকুরের ডাক শুনিতে পাইয়া বিস্মিত হইলেন। সেখানে জনমানবের বাস নাই, খাদ্যদ্রব্য কিছুই পাওয়া যায় না। তিনি ভাবিলেন, এস্থানে কুকুর কোথা হইতে আসিল? অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, একটী কুকুর এক কঙ্কাল সম্মুখে লইয়া বসিয়া আছে। তিন মাস পূর্ব্বে এক পথিক পথভ্রান্ত হইয়া সেইস্থানে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার কুকুরটী এই তিন মাস নির্জ্জন স্থানে একাকী থাকিয়া প্রভুর কঙ্কাল রক্ষা করিতেছিল। কুকুর তাহার প্রভুর ভালবাসাতে এমনই আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, মৃত্যুর পরেও প্রভুর মৃতদেহ ছাড়িয়া যায় নাই।

কুকুর তো পোষা জন্তু, মানুষের প্রতি তাহার এরূপ অনুরাগ হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু হিংস্র জন্তুর মধ্যেও এরূপ ঘটনা বিরল নহে।

বহুদিন পূর্ব্বে আলিপুর চিড়িয়াখানায় এক সাপুড়িয়ার নিকট হইতে একটী সাপ কেনা হয়। সাপুড়িয়া সাপ রাখিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু সাপটী আহার পরিত্যাগ করিল। কোনও প্রকার প্রলোভনেই তাহাকে খাওয়াইতে পারা গেল না। শেষে সে না খাইয়া মৃতবৎ হইয়া পড়িল। তখন সেই সাপুড়িয়াকে অনুসন্ধান করিয়া আনাইয়া তাহার সাপ ফেরৎ দেওয়া হইল। তাহাকে দেখিয়াই সাপটী একটু সতেজ হইয়া উঠিল। সাপের ন্যায় হিংস্র জন্তু খুব কমই আছে, কিন্তু ভালবাসার দ্বারা তাহাকেও বশ করা যায়।

রোমের দাস Androcles এর কথা অনেকেই জানেন। প্রভুর অত্যাচার হইতে পলাইয়া সে এক সিংহের গহ্বরে আশ্রয় লইয়াছিল। সে গহ্বরে প্রবেশ করিবার অল্পক্ষণ পরে সিংহ ভয়ানক গর্জ্জন করিতে করিতে সেখানে আসিল; তাহাকে দেখিয়াই Androcles ভয়ে বিহ্বল হইল। কিন্তু সিংহ তাহাকে দেখিবামাত্র কাতরভাবে তাহার নিকট গেল; তাহার এক পায়ে ঘা হইয়া সে অত্যন্ত যাতনা পাইতেছিল, সে Androcles এর দিকে পা বাড়াইয়া দিয়া ক্ষতস্থান দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করিল এবং এরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, যেন Androcles এর নিকট এই প্রার্থনা করিতেছে, সে তাহার যাতনা নিবারণের কোন ব্যবস্থা করুক। Androcles দেখিল সিংহের পায়ে একটী বড় কাঁটা ফুটিয়াছে, সে কাঁটাটী টানিয়া তুলিয়া ফেলিল আর অনেক পূঁজ বাহির করিয়া দিল। সিংহ রোগমুক্ত হইয়া Androclesএর দুই হাতের মধ্যে পা রাখিয়া আরামে নিদ্রা গেল। সেই অবধি Androclesকে সে তাহার প্রিয় সুহৃদ্ জানিয়া সুহৃদের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিল।

Androcles প্রভুর হাত হইতে উদ্ধার পাইলনা। সে ধৃত হইয়া পুনরায় রোমে আনীত হইল। তাহাকে হিংস্র সিংহের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বধ করা হইবে স্থির হইল। কিন্তু রঙ্গক্ষেত্রে

বিগত ১০ই জুলাই সায়ংকালীন উপাসনায় শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম।

সিংহের সম্মুখে নিক্ষিপ্ত হইলে পর সিংহ তাহাকে আক্রমণ করিল না, উপরন্তু তাহার হস্ত পদ লেহন করিতে লাগিল। দর্শকবৃন্দ অবাক! ঘটনাক্রমে সেই সিংহটিও ধৃত হইয়া রোমে আনীত হইয়াছিল। উক্ত সিংহ সহজেই তাহার পরমোপকারী বন্ধুকে চিনিতে পারিয়াছিল। সব ঘটনা শুনিয়া বিচারকেরা তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। সিংহটা পোষা কুকুরের স্থায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

কোনও জীবের প্রতি দয়া করিলে সে যে কৃতজ্ঞ হয় তাহার দৃষ্টান্ত আমরা প্রতিদিনের জীবনেই দেখিতেছি। দুষ্ট অশ্ব কিছুতেই নড়িতে চাহিতেছে না, কিন্তু যেই তাহার প্রিয় প্রভু আদর করিয়া চলিতে আদেশ করিল অমনি সে ছুটিয়া চলিল। তাহাদের মধ্যে ভালবাসায় অভিমানও দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও দিন যথা সময়ে আহার প্রদান না করিলে রাগ ও অভিমানের সহিত আহারীয় ছুড়িয়া ফেলিতে অথবা উক্ত ভাব-ব্যঞ্জক দৃষ্টিতে আহারদাত্রীর পানে তাকাইতে দেখা গিয়াছে। স্বচক্ষে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি।

শুধু জীবজন্তুর প্রতিই যে মানব স্নেহপরবশ হয়, তা নয়। বৃক্ষলতার প্রতিও মানবের ভালবাসার অনেক নিদর্শন দেখি। যাঁহারা ধর্ম্মপথে একটু বেশী দূর অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহাদের জড়চেতনে প্রায় সমান স্নেহ দেখিতে পাওয়া যায়। সেণ্ট ফ্রান্সিসের কথা আমরা শুনিয়াছি যে তিনি পশু পক্ষী বৃক্ষলতাদি ও প্রস্তরখণ্ডের নিকট ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। তাঁহার কোনও চরিতাখ্যানে ইহা নিম্নলিখিত প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে :—

* * * And this in brief
Was what Saint Francis preached to them :"O birds
My sisters, much to your Creator God
Are ye beholden and in every place
Should alway praise Him, who hath given to you
Twofold and threefold raiment, and beside
Hath made you free to fly abroad at will,
And further did preserve you in Noah's ark
A seed of you, that so your race i' the world
Might minish not: nor less are ye to God
Beholden for the element of air
By Him bequeathed you: and, beside all this,
Ye sow not, neither do ye reap, and God
Doth feed you, giving you the springs and streams
To, drink of, and for refuge hills and vales,
And the high trees to make your nests therein:
And seeing ye know not how to spin or sew,
God clothes you, and eke your little ones ;
Right well doth your Creator love you then,
Who all these benefits vouchsafeth you.
Wherefore, my little sisters, look to it
Ye sin not through ingratitude, but strive
Ever your utmost to give praise to God."
And, as Saint Francis spoke these words to them
Lo! those birds began to ope their beaks,
Stretch out their necks, and spread abroad their wings,
Bow reverently their heads to earth, and shew
By songs and gestures what great joy the words
Of the holy Father gave them ; and with them
Rejoiced Saint Francis likewise, and was glad ;
And much amazed him all that multitude
And wondrous fair diversity of birds,
And how they hearkened, and their friendly ways ;
For the which cause devoutly did he laud
Their Maker in them. Last, the preaching done,
Saint Francis o'er them made the sign o' the cross,
And gave them leave to go : then all those birds
Did in one flock uplift them into air
With marvellous songs,... ..

সেণ্ট ফ্রান্সিস তাহাদের নিকট এই মর্ম্মে প্রচার করিলেন— "আমার প্রিয় ভগিনী পাখী সকল, তোমরা তোমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের নিকট বিশেষ ঋণী এবং সকল স্থানে ও সকল সময়ে তাঁহার প্রশংসা কীর্ত্তন করা তোমাদের কর্ত্তব্য। তিনি তোমাদিগকে দুইতিনটি পরিচ্ছদ দিয়াছেন, যেখানে ইচ্ছা উড়িয়া বেড়াইবার স্বাধীনতা দিয়াছেন, এবং নোওয়ার নৌকাতে তোমাদের বংশধরদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তোমাদিগকে যে বায়ুমণ্ডল দিয়াছেন তাহার জন্যও তোমরা পরমেশ্বরের নিকট কম ঋণী নও। তোমরা বপনও কর না শস্যকর্ত্তনও কর না, অথচ ঈশ্বর তোমাদিগকে আহার প্রদান করেন; জলপান করিবার জন্য নদী ও প্রস্রবণ দিয়াছেন, আশ্রয়ার্থ পর্ব্বত ও উপত্যকা দিয়াছেন, কুলায় নির্ম্মাণের জন্য উচ্চ বৃক্ষ সকল দিয়াছেন। তোমরা বস্ত্র বয়ন ও সেলাই করিতে জান না, ঈশ্বর তোমাদিগকে ও তোমাদের শিশু সন্তানদিগকে পরিচ্ছদ দিয়া থাকেন। যিনি কৃপা করিয়া এই সকল দিয়াছেন, তোমাদের সেই সৃষ্টিকর্ত্তা তোমাদিগকে খুবই ভাল বাসেন। অতএব আমার ক্ষুদ্র ভগিনীগণ, দেখিও যেন তোমরা অকৃতজ্ঞ হইয়া পাপ না কর; কিন্তু ঈশ্বরের প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে সর্ব্বদা যতদূর সাধ্য যেন চেষ্টা কর।" সেণ্ট ফ্রান্সিস এই সকল কথা বলিলে পাখীরা সকলে তাহাদের মুখ খুলিল, গলা বাড়াইয়া দিল, ডানা বিস্তার করিল এবং ভক্তিভরে ভূমিতলে প্রণাম করিল, এবং সঙ্গীত ও অঙ্গভঙ্গীদ্বারা সাধুর বক্তৃতা শ্রবণে তাহাদের আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। সেণ্ট ফ্রান্সিসও তাহাদের সঙ্গে আনন্দ প্রকাশ করিলেন, সেই সকল নানা প্রকারের অসংখ্য অতুলনীয় সুন্দর পাখী দেখিয়া এবং তাহারা কিরূপ ভাবে তাঁহার কথা শুনিয়াছে এবং বন্ধুভাবে ব্যবহার করিয়াছে তাহা ভাবিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং সেই হেতু ভক্তিভরে তাহাদিগের মধ্যে তাহাদের সৃষ্টিকর্ত্তার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার প্রচার শেষ হইলে সেণ্ট ফ্রান্সিস্ তাহাদের মাথার উপর ক্রুশের চিহ্ন অঙ্কিত করিলেন এবং তাহাদিগকে

যাইতে অনুমতি দিলেন। তখন আশ্চর্য্য সঙ্গীত করিতে করিতে সকল পাখী এক সঙ্গে আকাশে উড়িয়া গেল।

এই বর্ণনা মধ্যে কবির কল্পনা ও অতিরঞ্জন আছে, স্বীকার করি। কিন্তু তথাপি ইহার মধ্যে কিছু সত্য আছে, সন্দেহ নাই। প্রেমের শক্তি অতি অদ্ভুত। প্রেমের নিকট অনেক অসম্ভবই সম্ভব হয়। ভক্ত জীবনের প্রেমের শক্তি কে পরিমাণ করিবে? প্রেমের অধিকারও সর্ব্বাগ্রগণ্য। শাক্যসিংহ এবং তীরবিদ্ধ পাখীর আখ্যায়িকা সকলেই জানেন। বুদ্ধত্বলাভের পূর্ব্বে শাক্যসিংহ একটি তীরবদ্ধ পাখীকে সম্মুখে পতিত হইতে দেখিয়া অতি স্নেহে ও যত্নে শুশ্রূষা করিয়া উহাকে বাঁচান। তাঁহার ভাই ঐ পাখীটিকে তীরবিদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া উহা দাবী করেন এবং শাক্যসিংহ তাঁহার হস্তে পাখীটিকে প্রদান করিতে সম্মত না হওয়াতে রাজদ্বারে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন। শাক্যসিংহ বলেন, যিনি বিনাশ করিয়াছেন তাঁহার অপেক্ষা যিনি জীবন দিয়াছেন তাঁহার অধিকারই অগ্রগণ্য। রাজাও সেরূপ মীমাংসাই করিলেন।

প্রেমের চক্ষে পশুপক্ষীদের লীলা দর্শন করিতে না পারিলে আমরা অনেক আনন্দ হইতেও বঞ্চিত হই। পাখীর সুমধুর কাকলি, জলের মধ্যে মৎস্যগণের আনন্দ কেলি, প্রখর রৌদ্রতাপে তপ্ত পশুদিগের বৃক্ষছায়াতে বিশ্রাম প্রভৃতি দেখিলে কত আনন্দ লাভ করা যায়! কিন্তু এই সকল উপভোগ করিতে হইলে প্রেমের চক্ষে দৃষ্টি করিতে হয়। স্থির দৃষ্টি না হইলে চঞ্চল নয়নে এই মাধুর্য্য দর্শন করা যায় না। প্রেমই স্থির দৃষ্টি প্রদান করে। আমরা সংসারের এই আনন্দ হইতে কেন বঞ্চিত থাকিব? আনন্দময়ের বিশ্ব আনন্দে পূর্ণ, আমরা প্রেমের দৃষ্টিলাভ করিয়া এই আনন্দ উপভোগ করি।

পশু পক্ষীদের নিকট হইতে আবার অনেক শিক্ষাও লাভ করিতে পারি। ইমার্সন বলিয়াছেন,—we have many things to learn even from birds and beasts. তাহারা কিরূপ স্থির ভাবে আপনার কাজ করিয়া যায়! কাহারও প্রশংসার দিকে তাহাদের দৃষ্টি নাই, আপন আনন্দে সকল কার্য্য সম্পন্ন করে। এই কর্ম্ম যোগ ইহাদের নিকট হইতে আমরা শিখিতে পারি। এইরূপ নিন্দা প্রশংসার অতীত হইয়া সংসারে আপনাদের কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে হইবে। এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইলেও প্রেমের চক্ষে ইহাদের সমুদয় কার্য্য দেখিতে হইবে। প্রেমের চক্ষুতে দেখিতে না পারিলে আমরা কোনও শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিব না।

বাস্তবিক জগতে প্রেম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কিছু নাই। ইহাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব, ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, ইহাতেই ধর্ম্মের প্রকৃত পরিচয়। ইহাতেই সংসারের সকল সুখ। প্রেমে দুঃখও আছে। কিন্তু প্রেমের বেদনাও সুখের। সে দুঃখ ত আমাদিগের পরম কল্যাণের কারণ। সেই দুঃখের ভয়ে আমরা প্রেম বিসর্জ্জন দিতে পারি না। আমাদের মধ্যে এই প্রেম আরও অধিক পরিমাণে আসুক। আমরা প্রেমে বড়ই দরিদ্র। এবিষয়ে নিজের দারিদ্র্য দেখিয়া ক্ষোভে মরি। তাহার জন্য সর্ব্বদাই প্রাণে যাতনা রহিয়াছে। প্রেমদাতা পিতার নিকট আমরা এই প্রেম ভিক্ষা করি। ইহা না হইলে আর চলে না। তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে প্রেমধনে ধনী করুন। শুধু মানুষকে নয়, সকল প্রাণীকেই আমরা যাহাতে প্রকৃত প্রেম দিতে পারি, তিনি আমাদিগকে সে শক্তি প্রদান করুন।

ভারতীয় ধর্ম্মে উপাসনার উৎপত্তি ও বিকাশ।*

'উপাসনা'র ধাত্বর্থ নিকটে বসা—নীচের পক্ষে উচ্চের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনপূর্ব্বক তৎপার্শ্বে বসা, তাহা হইতে গৌণার্থ হইল সম্মান-প্রদর্শন। ধর্ম্মজীবনে উপাসনার অর্থ অসীমের সহিত সসীমের সম্বন্ধ-সাধন। উপাস্য-উপাসকের মধ্যে অসীম-সসীমের ভাব যে সর্ব্বত্র স্পষ্ট থাকে তাহা নহে, কিন্তু আমরা ক্রমশঃ দেখিব যে, এই ভাব স্পষ্টরূপে হউক্ আর অস্পষ্টরূপেই হউক্, সর্ব্বপ্রকার উপাসনার মধ্যেই বর্ত্তমান আছে। আত্মার তিনটী বৃত্তি বা শক্তি —জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা, সুতরাং পূর্ণাঙ্গ উপাসনাতে এই তিন বৃত্তিরই পরিচালনা আবশ্যক। ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত উপাসনা-প্রণালী বিজ্ঞানসম্মত, তাই ইহাতে জ্ঞানসাধনের জন্য ধ্যান, ভাবসাধনের জন্য আরাধনা এবং ইচ্ছাসাধনের জন্য প্রার্থনা বিহিত হইয়াছে। এই উপাসনা-প্রণালী যাঁহারা অবলম্বন করেন না, তাঁহারা উপাসনার বিজ্ঞান জানেন না অথবা বিজ্ঞানসম্মত পূর্ণাঙ্গ উপাসনা-সাধনে প্রয়াসী নহেন। যাহা হউক্, আমাদের আলোচনার এই প্রাথমিক সোপানে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-প্রণালীর আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে; কেবল উপাসনা-বিকাশের ইতিহাস বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমি প্রথমেই বলিয়া লইলাম আমি উপাসনা বলিতে কি বুঝি। দেবতার নিকট কিছু চাওয়া, দেবতার গুণচিন্তা করিয়া তাঁহার স্তবস্তুতি, দেবতার সাক্ষাৎ দর্শন ও তাঁহার সত্তায় মগ্ন ভাব, এই প্রত্যেকটিই উপাসনার অঙ্গ এবং সেই অর্থে উপাসনা। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ উপাসনাতে এই সমুদায়েরই সমাবেশ থাকে। এই সমাবেশ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা ছাড়া আর কোন উপাসনা-প্রণালীতে আমি দেখিতে পাই না।

যাহা হউক, উপাসনার এই ধারণা লইয়া আমি নিজ সামান্য জ্ঞানানুসারে ভারতীয় ধর্ম্মে উপাসনার উৎপত্তি ও বিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করি। স্বর্গীয় আচার্য্য ম্যাক্স মূলার সত্যই বলিয়াছেন যে, বৈদিক সাহিত্যে এই ইতিহাস অধ্যয়নের যে সুযোগ পাওয়া যায় এমন সুযোগ আর কোথাও নাই। বেদই মানবের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্য। আর বেদের মধ্যে ঋগ্বেদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বেদ এবং বলিতে গেলে ইহাই একমাত্র প্রকৃত বেদসংহিতা। সাম ও যজু পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগ্রন্থের সহিত মিশ্রিত আকারে ছিল, যজ্ঞের সুবিধার জন্য ইহাদিগকে ব্রাহ্মণাংশ হইতে পৃথক্ করিয়া ঋগ্বেদের ন্যায় সংহিতার আকার দেওয়া হয়। অথর্ব্ববেদে কতিপয় অতি প্রাচীন মন্ত্র থাকা সত্ত্বেও ইহা মোটের উপর অন্য বেদত্রয় অপেক্ষা আধুনিক, এবং ইহার বেদত্ব অনেক কাল পর্য্যন্ত স্বীকৃত হয় নাই। ফলতঃ

* ফরিদপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে পঠিত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ লিখিত বক্তৃতা।

প্রকৃতপক্ষে চতুর্থ বেদ বলিয়া কোন বেদ থাকিতে পারে না; মূলতঃ বেদ ত্রয়ী। কবিতাত্মক বেদের নাম ঋক্, সংগীতাত্মক বেদ সাম, এবং গদ্যাত্মক বেদ যজু। এই তিন প্রকার রচনা অনুসারে বেদ ত্রয়ী। চতুর্থ প্রকার রচনা কিছু নাই, সুতরাং প্রকৃত বৈদিক সাহিত্যে চতুর্থ বেদের স্থানও নাই। যাহা হউক্, ঐ যে প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদ, তাহাতে আমরা কিরূপ উপাসনা দেখিতে পাই? ঋগ্বেদ বহু ঋষির এবং বহু যুগের রচনা, সুতরাং ইহাতে নানা প্রকার উপাসনাই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত উপাসনাকে সময় ও বিকাশক্রম অনুসারে বিভক্ত করিলে আমরা প্রথমেই পাই প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে পৃথক্ পৃথক্ দেবতাবোধে সম্ভাষণ ও পূজা। অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র অর্থাৎ বজ্রের দেবতা, বরুণ অর্থাৎ আকাশ এবং সমুদ্রের দেবতা, এই সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে ব্যক্তিরূপে কল্পনা করিয়া প্রাচীন ঋষিগণ তাহাদিগের গুণকীর্তন করিতেছেন এবং তাহাদের নিকট ধন, সহায়তা, আশ্রয় ও শত্রুদমন প্রভৃতি ভিক্ষা করিতেছেন। সেই আদিম অনুন্নত যুগে তাঁহাদের ঐ কল্পনা অতি স্বাভাবিক, সন্দেহ নাই। যে সকল শক্তিদ্বারা তাঁহারা আপনাদিগকে বেষ্টিত দেখিতেন, যাহাদের প্রভাব সর্ব্বদা অনুভব করিতেন, তাহাদিগকে দেবতা কল্পনা করিয়া তাহাদের পূজা অর্চ্চনা, তাহাদের নিকট প্রার্থনা, ইহা অপেক্ষা অধিকতর স্বাভাবিক আর কি হইতে পারে? আর তাঁহারা দেবপূজায় যে সকল উপকরণ ব্যবহার করিতেন সে' সকলও সেই অনুন্নত সময়েরই উপযোগী। আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ হইবার পূর্ব্বে মানুষ আহার পান প্রভৃতি শারীরিক ব্যাপারকেই পরম শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করে। আধুনিক সভ্য সময়েও বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদিগকে নানা প্রকার সুখাদ্য খাওয়ান সামাজিক জীবনের একটী প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং আমাদের প্রাচীনতম ঋষিগণ তাঁহাদের উপাস্য দেবতাদিগকে ঘৃত, ফল, শস্য, পশুমাংস ও নানা প্রকার পিষ্টক ('পুরোডাশ') উপহার দিতেন। নিজেরা এই সকল বস্তু উপাদেয় বলিয়া মনে করিতেন, সুতরাং দেবতারাও এই সকল বস্তু চান, তাঁহারা সরল ভাবেই ইহা বিশ্বাস করিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল দেবতাদের পুরোহিত অগ্নি এই সকল দ্রব্য দগ্ধ করিয়া এই সকলের সার ভাগ ধূমের আকারে উর্দ্ধে দেবলোকে লইয়া যান আর দেবতারা তাহা উপভোগ করেন।

ক্রমশঃ বহুদেববাদে ঋষিদের সন্দেহ হইতে লাগিল, একদেববাদ বা একেশ্বরবাদের বিকাশ হইতে লাগিল এবং উপাস্যের সহিত আধ্যাত্মিক যোগের ধারণা জন্মিতে লাগিল। প্রথম মণ্ডলের ১৬৪তম সূক্তে ঋষি বলিতেছেন,

> ইন্দ্রম্ মিত্রম্ বরুণম্ অগ্নিম্ আহুঃ
> অথো দিব্যঃ সঃ সুপর্ণঃ গরুৎমান্।
> একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি
> অগ্নিম্ যমম্ মাতরিশ্বানম্ আহুঃ।

অর্থাৎ একমাত্র সদ্বস্তুকে বিপ্রেরা ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, দিব্য পক্ষযুক্ত গরুৎমান, যম, মাতরিশ্বা প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত করেন।

হিরণ্যগর্ভ, বিশ্বকর্ম্মা ও প্রজাপতি-বিষয়ক ঋক্‌সমূহে একেশ্বরবাদ অনেক পরিমাণেই বিকশিত হইয়াছে; কিন্তু এই একেশ্বরবাদ, এমন কি পরবর্ত্তী উপনিষদ্‌যুগের ব্রহ্মবাদও বহু-দেববাদকে একবারে তাড়াইতে পারে নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক অদ্বৈত ব্রহ্মের আংশিক প্রকাশরূপে যেমন বহু জন্তু ও প্রাণী, তেমনি বহু দেবতাও কল্পিত হইয়া আসিতেছিলেন। কেবল বিজ্ঞানের আলোকই দেবতাদের অসহ্য হইয়াছে। বিজ্ঞান প্রকৃতির সকল বিভাগে অলঙ্ঘ্য নিয়ম ও কার্য্যের একতা দেখাইয়া প্রাচীন বিভাগসমূহের কৃত্রিমতা সপ্রমাণ করিয়াছে এবং এক এক বিভাগে এক এক জন অধিষ্ঠাতৃ দেবতা কল্পনার আনর্থক্য প্রদর্শন করিতেছে। জলের উষ্ণতায় বাষ্পের উৎপত্তি, মেঘসৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্র ও বৃষ্টিপাত। এই সমস্ত একই নিয়মের ফল, একই কার্য্যপ্রণালীর ভিন্ন ভিন্ন সোপান; সুতরাং এ' স্থলে সূর্য্য, ইন্দ্র, পর্জ্জন্য এই তিন দেবতা কল্পনার কোন প্রয়োজনই নাই। প্রাণিশরীরের উৎপত্তি, বিকাশ ও বিনাশ একই কার্য্যপ্রণালীর ভিন্ন ভিন্ন ফলমাত্র, সুতরাং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু, এবং বিনাশকর্ত্তা শিব, এই ত্রিমূর্ত্তি কল্পনা সম্পূর্ণই বিজ্ঞানবিরুদ্ধ। কেবল অশিক্ষিতদের মধ্যে নহে, কোন কোন শিক্ষিত লোকের মধ্যেও যে এখনও বহুদেববাদ বর্ত্তমান রহিয়াছে তার কারণ এই যে, আমাদের শিক্ষাপ্রণালী এখনও বহুল পরিমাণে কেবল সাহিত্যিক (literary) রহিয়াছে, বৈজ্ঞানিক হয় নাই। কেবল বর্ণনাত্মক, কেবল কল্পনা ও কবিত্বপূর্ণ রাশি রাশি গ্রন্থ-পাঠেও প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তি স্ফুরিত হয় না। জড়, প্রাণ, আত্মা, সমাজ, ধর্ম্ম, জগতের সকল বিভাগে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অর্থাৎ পর্য্যবেক্ষণ, (observation), পরীক্ষা (experiment), বিশ্লেষণ (analysis), একীকরণ (synthesis), এই সমস্ত প্রক্রিয়া প্রবিষ্ট না হইলে তথাকথিত উচ্চশিক্ষা উচ্চশিক্ষা নামের উপযুক্ত হইবে না এবং ধর্ম্ম ও অন্যান্য বিষয়ক কুসংস্কারও সম্পূর্ণরূপে দূর হইবে না।

যাহা হউক্, বৈদিক উপাসনার আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে যাহা বলিতেছিলাম—বরুণের স্তবগুলিতে উপাস্যকে অন্তরদর্শী, পুণ্যের অনুমোদক, পাপের শাস্তারূপে স্পষ্টভাবেই স্বীকার করা হইয়াছে এবং উপাসক কাতর ভাবে দেবতার নিকট পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু যেমন একেশ্বরবাদের বিকাশেও বহুদেববাদ একবারে দূর হইল না, তেমনি আধ্যাত্মিক উপাসনার আস্বাদেও বাহ্যপূজা, যাগযজ্ঞ, বন্ধ হইল না। না হইবারই কথা। বৈদিক যুগের মধ্যভাগে,—সামবেদ, যজুর্ব্বেদ ও ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির রচনা ও প্রভাবের সময়ে—প্রাচীন কর্ম্মভেদ বর্ণভেদে পরিণত হইল; যাগযজ্ঞ একটি বর্ণ বা জাতির একচেটিয়া ব্যবসায় হইয়া উঠিল। এই যাজকসম্প্রদায়ের স্বার্থ হইয়া দাঁড়াইল, যাগযজ্ঞকে চিরস্থায়ী করা, কারণ ইঁহারা দেখিলেন ইহার চিরস্থায়িত্বের উপরই আর্য্যসমাজের উপর ইঁহাদের আধিপত্য নির্ভর করে। কাজে কাজেই ইঁহাদের কষ্টে উপাসনা বা ধর্ম্মচিন্তার বিকাশ প্রায় কিছুই হইল না। বিকাশ আসিল উপনিষদ্‌বর্ণিত জনক, চিত্র, ব্রহ্মদত্ত, অজাতশত্রু, সনৎকুমার প্রভৃতি স্বাধীন চিন্তাশীল ক্ষত্রিয় ঋষিদের চেষ্টায়। ঔপনিষদ্ ব্রহ্মবাদের প্রধান নায়ক এই রাজর্ষিগণ। উদ্দালক আরুণি এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ নায়কগণ

রাজর্ষিদের শিষ্য। যাজ্ঞবল্ক্য ক্ষত্রিয়-শিষ্য না হইলেও রাজর্ষি জনকের বন্ধু ও প্রভাবাধীন। পরবর্তী সময়েও স্বাধীন চিন্তা অনেক স্থলেই কৃষ্ণ, বুদ্ধ, মহাবীর, নানক প্রভৃতি ক্ষত্রিয় নেতৃদিগের প্রভাবের ফল। যাহা হউক, ঔপনিষদ ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ ব্রহ্মবিচার ও ব্রহ্মোপাসনা। উপনিষদের ঋষিগণ দেবতার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই এবং যাগযজ্ঞ দ্বারা দেবতাপূজার অনাবশ্যকতাও প্রচার করেন নাই। কিন্তু যাগযজ্ঞ যে ইহলোকে ও পরলোকে অস্থায়ী ভোগপ্রাপ্তির উপায়মাত্র, ব্রহ্মলোক ও মুক্তিপ্রাপ্তির উপায় নহে, তাহা ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ সর্ব্বত্রই স্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ দেবতাদের প্রতি অবজ্ঞাও প্রকাশ করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, দেবতারা ইচ্ছা করেন না যে মানুষ প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা শিখে; কেন না, তাঁহাদের ভয় এই যে, তাহা শিখিলে সে তাঁহাদের পূজা ছাড়িয়া দিবে। এখনকার ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থকই হইয়াছে। তাঁহার কথাগুলি এই—"যথা পশুরেবং স দেবানাং। যথা হ বৈ বহবঃ পশবো মনুষ্যং ভুঞ্জ্যুরেবমেকৈকঃ পুরুষো দেবান্ ভুনক্তি। একস্মিন্নেব পশাবাদীয়মানেঽপ্রিয়ং ভবতি কিমু বহুষু। তস্মাদেষ তন্ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যুঃ"।—অর্থাৎ মানুষের পক্ষে যেমন পশু, দেবতাদের পক্ষে তেমনি দেবোপাসক; যেমন অনেক পশু এক জন মানুষের ভোগসাধন, তেমনি এক একটী দেবোপাসক মানুষ দেবতাদের ভোগসাধক। একটী পশু হারানও মানুষের পক্ষে অপ্রিয়, অনেক পশুর ত কথাই নাই। সেই জন্য মানুষ ইহা (অর্থাৎ প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা) জানে, ইহা দেবতারা ভাল বাসেন না। কেনোপনিষদের মতে অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ দেবতারাও ব্রহ্মকে জানিতেন না, অসুর জয় করিয়া নিজ বলবীর্য্যের অহংকারে তাঁহারা আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। ব্রহ্ম অগ্নি ও বায়ুর শক্তি হরণ করাতে তাঁহারা একগাছি তৃণও পোড়াইতে ও নড়াইতে পারেন নাই, অথচ বুঝিলেন না যে, ব্রহ্মই তাঁহাদের শক্তির আধার। অবশেষে ইন্দ্র সাধনক্ষেত্র হিমালয়-সম্ভূতা উমা অর্থাৎ রক্ষণকর্ত্রী ব্রহ্মবিদ্যার নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা করিলেন। কিন্তু উপনিষদের সকল ঋষি দেবতাদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন নহেন। কৌষীতকি উপনিষদের মতে কোন কোন দেবতা ব্রহ্মলোকবাসী এবং ব্রহ্মের নিত্য উপাসক। ছান্দোগ্যের প্রজাপতি ব্রহ্মবিদ্যার আচার্য্য, দেবরাজ ইন্দ্র ও অসুররাজ বিরোচন তাঁহার শিষ্য। যাহা হউক, উপনিষদের ঋষিগণ ব্রহ্মবিদ্যায় উন্নত হইয়াও এই কথাটী বুঝিতে পারেন নাই—যাহা আমাদের কাছে অতি সহজ বলিয়া বোধ হয়—যে দেবতারা ব্রহ্মোপাসনার পক্ষপাতী বা প্রতিপক্ষ যাহাই হউন্ না কেন, ঘৃত, ফল, শস্য, মাংস, পুরোডাশ প্রভৃতিতে, বিশেষতঃ এই সকল বস্তু যখন অগ্নিতে দগ্ধ বা অর্দ্ধদগ্ধ হয় তখন, তাঁহাদের কোন প্রয়োজনই নাই। এখনকার সামান্য মানুষও যখন পোড়া জিনিসকে এত ঘৃণা করে তখন দেবতারা প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ বিভাগের কর্ত্তা হইয়া—উৎকৃষ্ট উপাদেয় ভোগ্যসামগ্রীর নিয়ন্তা হইয়া—যে উপাসকদিগের নিকট এই সকল অতি হেয় বস্তু চাহিবেন, তাহা ত এক মুহূর্ত্তের জন্যও সত্য বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং অবৈজ্ঞানিক ও অপেক্ষাকৃত অমার্জ্জিত যুগের ঋষিদের কথা বরং বাদ দেওয়া যায়, কিন্তু বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক এবং সুমার্জ্জিত যুগের যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি নৈবেদ্য, বলি, যাগযজ্ঞ সহ দেবপূজার অনুষ্ঠান বা অনুমোদন করেন, তাঁহাদের চিন্তাশীলতা বা সরলতা কোন্‌টার বেশি প্রশংসা করিব তাহা বুঝিতে পারি না।

যাহা হউক, উপনিষদের ঋষিগণ দেবতায় বিশ্বাসী বলিয়া দেবোপাসক বটেন, কিন্তু ব্রহ্মোপাসনাই তাঁহাদের মুখ্য সাধন। ব্রহ্মের স্বরূপানুধ্যানের আকারে ব্রহ্মোপাসনা উপনিষদের সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই সকল স্বরূপ-বর্ণনাকে বৈদান্তিক ভাষায় বিদ্যা বা উপাসনা বলে। বেদান্তসূত্র গ্রন্থের উপাসনা-প্রকরণে এই ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে যে, সাধনকালে এই সকল বিদ্যার সমুচ্চয় বা সংগ্রহ করিতে হইবে। উপনিষদের কোন কোন স্থলে এই সকল বিদ্যা বা উপাসনা সংক্ষিপ্ত স্তবের আকার ধারণ করিয়াছে, কিন্তু সর্ব্ব-স্বরূপ-সমন্বিত দীর্ঘ ও মধুর স্তব কোথাও নাই। পরবর্ত্তী সময়ে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রকার উপনিষদের ভাবে একটী সরস স্তোত্র রচনা করেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-প্রণালীতে তাহা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে গৃহীত হইয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর চারি খানি উপনিষদ্ হইতে চারিটী শ্রুতির অংশ সমুচ্চিত করিয়া আমাদের উপাসনার মন্ত্ররূপে ব্যবস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই মন্ত্রে আমাদের জ্ঞাত সমস্ত ব্রহ্মলক্ষণই উল্লিখিত আছে। "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম" এই অংশ তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ হইতে গৃহীত, "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" ইটী মুণ্ডক উপনিষদ্ হইতে, "শান্তং শিবমদ্বৈতম্" ইটী মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ হইতে এবং "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" ইটী ঈশোপনিষদ্ হইতে গৃহীত। উপনিষৎ-সাগর মন্থনপূর্ব্বক এই মন্ত্র উদ্ধারকে আমি সময়ে সময়ে পুরাণ-কল্পিত সমুদ্রমন্থন ও অমৃত উদ্ধারের সঙ্গে উপমা দিয়াছি। এই মন্ত্রোক্ত ঈশ্বর-স্বরূপ অনুধ্যানপূর্ব্বক কিরূপে সরস আরাধনা করিতে হয় তাহা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু চিন্তা ও বিচারযোগে উপনিষৎ-প্রতিপাদিত ব্রহ্মবাদের দার্শনিক ভিত্তি না বুঝিলে এরূপ আরাধনা ক্রমশঃ মৌখিক ও শুষ্ক হইয়া যায়। ব্রহ্মবাদের দার্শনিক ভিত্তি বুঝিবার পক্ষে অন্যান্য সাধনের মধ্যে গভীর ভাবে উপনিষদ্ অধ্যয়ন একটি বিশেষ উপযোগী সাধন। উপনিষদুক্ত সাধনপ্রণালী সংক্ষেপে বৃহদারণ্যকের মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে উল্লিখিত হইয়াছে। সেই সাধনের লক্ষ্য ব্রহ্মদর্শন, উপায় প্রথমতঃ শ্রবণ অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ-গ্রহণ, দ্বিতীয়তঃ, মনন অর্থাৎ সেই উপদেশ বিচারদ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করা, তৃতীয়তঃ, নিদিধ্যাসন অর্থাৎ বিচারদ্বারা বোঝা ব্রহ্মবস্তুকে বিশেষরূপে ধ্যান করিয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা। এই চেষ্টার ফল দর্শন। এই দর্শনকে পরবর্ত্তী সময়ে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিন সোপানে বিভক্ত করা হইয়াছিল। 'ধারণা'র অর্থ ব্রহ্মবস্তুকে ধরা, 'ধ্যানে'র অর্থ বিক্ষেপশীল মনকে বারবার টানিয়া আনিয়া ব্রহ্মে স্থাপন করা, 'সমাধি'র অর্থ ব্রহ্মে মগ্ন হওয়া। এই সমস্ত চেষ্টাই সাক্ষাৎ জ্ঞানমূলক। জ্ঞানলাভ না করিয়া কেবল অন্ধবিশ্বাস বা কল্পনার সাহায্যে এই সকল শাস্ত্রীয় সাধন করিবার চেষ্টা করিলে তাহা কেবল কৃত্রিম ও নিষ্ফল শ্রমে পর্য্যবসিত হয়।

যাহা হউক, উপনিষৎ-প্রতিপাদিত উপাসনার বিষয় সংক্ষেপে যতটুকু বলা হইল তাহাতেই বোঝা যাইবে যে, ইহা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার, ইহাতে বাহ্য উপকরণ বা ক্রিয়া-কলাপের কোন স্থান নাই। কিন্তু উপনিষদে প্রতীকোপাসনা বলিয়া এক প্রকার উপাসনার ব্যবস্থা আছে, যাহাকে কেহ কেহ আধুনিক প্রতিমাপূজার সঙ্গে সম্বন্ধ করেন। কিন্তু বস্তুতঃ প্রতীকোপাসনা ও প্রতিমাপূজা সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সর্ব্বকারণত্ব উপলব্ধির জন্য ঋষিগণ আকাশ, অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, মন, ওঁকার, এই সমস্ত পদার্থে ব্রহ্মবোধ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। এই সমস্তই ব্রহ্মের কার্য্য, ব্রহ্মের আংশিক প্রকাশ, এই সমুদায়ের মধ্যে কারণরূপী আধাররূপী ব্রহ্মের সত্তানুভব দ্বারা ক্রমশঃ তাঁহার অনন্তত্ব উপলব্ধ হইবে, এই ধারণাতেই এরূপ প্রতিকোপাসনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু যাহাতে এরূপ উপাসনা দেবপূজায় পরিণত না হয়, অনন্তের উপাসনার ব্যাঘাত না করে, সে বিষয়ে উপনিষদের ঋষিগণ ও পরবর্ত্তী বৈদান্তিক আচার্য্যগণ সাবধান ছিলেন। এই বিষয়ে সাবধানবাক্য আপনারা ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চমাধ্যায়, কৌষীতকি উপনিষদের প্রথমাধ্যায় এবং বেদান্ত-সূত্রের চতুর্থাধ্যায় প্রথম পাদে বিশেষভাবে দেখিতে পাইবেন। প্রতীকোপাসকের যে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় না তাহা বেদান্তসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ের তৃতীয় পাদে অতি স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে। ঋষি ও আচার্য্যদের মতে প্রতীকোপাসনা সাময়িক অবলম্বনমাত্র, ক্রমশঃ তাহা ছাড়িয়া নিরবলম্ব অনন্তের উপাসনায় উঠিতে হইবে। আর যাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উপনিষদুক্ত প্রতীকোপাসনার সঙ্গে পরবর্ত্তী প্রতিমাপূজার কোনও সাদৃশ্যই নাই। প্রতীক্ কোন মূর্ত্তি নহে, এবং প্রতীকোপাসনায় প্রতিমাপূজার বাহ্য উপকরণাদির কোনও স্থান নাই। (ক্রমশঃ)

প্রাপ্ত।

সত্যদর্শী ও সত্যে বিশ্বাসী।

(প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর)

গত ১৬ই আষাঢ়ের তত্ত্বকৌমুদীতে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের 'আধ্যাত্মিক প্রভাব' বিষয়ে বিগত মাঘোৎসবের সময় সঙ্গতসভার উৎসব-দিনে আমি যে বক্তৃতা করিয়াছিলাম, তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের নাম দিয়াছেন—"বিশ্বাসে অবিশ্বাস।" একস্থানে লিখিয়াছেন,—"ঘোষাল মহাশয় বিশ্বাসের বিকৃতির দৃষ্টান্ত অনেকগুলি দেখাইয়াছেন; কিন্তু জ্ঞানের বিকৃতি বা বদ্‌হজমির দৃষ্টান্ত একটিও দেখান নাই।" প্রবন্ধটির লিখনভঙ্গী দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। মনে প্রশ্ন উদিত হইল,—"তিনি কেন এই ভাবে প্রতিবাদ করিলেন?" আমার সেই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া একজন ভক্তিভাজন প্রবীন আচার্য্য আমাকে আনন্দের সহিত বলিয়াছিলেন,—"বক্তৃতাটি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করুন।" অথচ আমার বন্ধু রায় মহাশয় ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন! ইহার কারণ এই মনে হইল, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের বক্তৃতাদি পাঠ করিয়া রায় মহাশয়ের মনে যে ধারণার 'পলি' পড়িয়াছে, সেই 'পলি' ভেদ করিয়া তিনি আমার বক্তৃতার আসল রূপটি দেখিতে পান নাই। আমার এইরূপ চিন্তা যে কল্পনা নয়, তাহার প্রমাণ প্রবন্ধের মধ্যে পাইয়াছি। রায় মহাশয় একস্থানে লিখিয়াছেন,..."তবু যদি তিনি বলিতে চান যে, একটা জ্ঞান-প্রণালী প্রাচীনদের ছিল সন্দেহ নাই * * * কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞান-প্রণালী যখন পাচ্ছিনে, তখন বল্‌তে হবে তা' কোন রকমে নষ্ট হয়েছে, হারিয়ে গ্যাছে"—ইত্যাদি। এ কথা আমি কোন খানে বলি নাই। একথা পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের। তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের নাম না করিয়া যে ভাবে কথাটি বসাইয়াছেন তাহাতে পাঠকের মনে ও কথাটি আমার কথা বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। যা হউক, জ্ঞান-পথ ও বিশ্বাস-পথের আলোচনাদ্বারা ধারণা পরিষ্কার হইবে, এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আমার বক্তব্যগুলি লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। রায় মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি আমি সংগ্রহণ করিয়াছি ;—

"মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে তিনি বিশ্বাসপন্থী না জ্ঞানপন্থী বলিয়া বিবেচনা করেন?"

"কবীর, নানক, দাদু প্রভৃতি মহাত্মারাই বা ঘোষাল মহাশয়ের মতে কোন্ পথাবলম্বী সাধক ছিলেন?"

"খৃষ্ট জ্ঞানপথাবলম্বী না বিশ্বাস-পথাবলম্বী ছিলেন?"

"মন বিশ্বে ব্যাপ্ত হওয়া এবং অনন্তের সহিত যুক্ত হওয়া ক ঠিক্ একার্থবাচক কথা?"

"জ্ঞান ও ভাব দুইটা বস্তু নহে; একই অভিজ্ঞতার দুই দিক্ মাত্র"...এই উক্তিটাকে নিজের বক্তৃতায় কেন কি উদ্দেশ্যে উদ্ধৃত করিয়া দিলেন?"

আমি প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত প্রত্যুত্তর প্রদান করিব। তত্ত্বকৌমুদীর কলেবর ক্ষুদ্র। সকল কথারই উল্লেখ করিব; ব্যাখ্যা করিব না। প্রথম বিষয়,...জ্ঞানপন্থী ও বিশ্বাসপন্থীর সংজ্ঞা নির্ণয়। জ্ঞানপন্থী কাহাকে বলে, বিশ্বাসপন্থী কাহাকে বলে? ব্রাহ্মসাহিত্য বলিতেছে,— যাঁহারা বিচারপূর্ব্বক সত্য গ্রহণ করেন, তাঁহারা জ্ঞানপন্থী, যাঁহারা অবিচারিত ভাবে, শাস্ত্র ও মহাপুরুষদিগের এবং গুরুর বাণী শুনিয়া সত্যে বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বিশ্বাসপন্থী। সূক্ষ্ম ভাবে দর্শন করিলে এই দুই শ্রেণীর ভক্তিভাজনদিগকে "সত্যদর্শী" ও "সত্যবিশ্বাসী" বলা যাইতে পারে। দ্রষ্টা ও বিশ্বাসীর মধ্যে পার্থক্য নাই কি?

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কি ছিলেন? তিনি জ্ঞানপন্থী ...সত্যদর্শী ছিলেন। তিনি জ্ঞানের দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেন, একই অখণ্ড ধর্ম্ম, সকল ধর্ম্মের সাররূপে...মেরুদণ্ডরূপে দণ্ডায়মান। আবর্জ্জনা বাদ দিলে সকল ধর্ম্মকেই এক অখণ্ড ধর্ম্মের (বিশ্বজনীন ধর্ম্ম) অঙ্গ-কান্তি রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজার এই উদ্ভাবিত তত্ত্ব 'তুলনামূলক ধর্ম্ম'* নামে অভিহিত হইয়াছে। ভট্ট মোক্ষ মূলার বলিয়াছেন,—"রাজা রামমোহন রায় তুলনামূলক ধর্ম্মের পিতা ছিলেন।" মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় তুলনা-মূলক ধর্ম্মের আবিষ্কর্ত্তা...ব্রহ্মবাদপ্রচারক এবং ব্রাহ্মসমাজ

* তুলনামূলক ধর্ম্ম—Comparative Religion.

স্থাপয়িতা; তিনি যে সত্যদর্শী ছিলেন, এ কথা কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার প্রয়োজন হয় না।

রাজা রামমোহন রায়ের পর সত্যদর্শী দেবেন্দ্রনাথ অভ্যুদিত হইলেন। তিনি ব্রহ্মযোগ, ব্রহ্ম-রস-সুধা-ধারায় ডুবিয়া গেলেন তিনি সাধনরাজ্যের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়া যে মহাবাক্য প্রকাশ করিলেন, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম-সাহিত্যের উজ্জ্বলতম কিরীটমণি। সেই বাণী এই ;—

"ব্রহ্ম সিদ্ধান্তসাপেক্ষ নহে; আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ।"

"ব্রহ্ম আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ"—এ কথাটি জ্ঞানবাদের চরম কথা। এই আত্মপ্রত্যয়ই জ্ঞানবাদের ভিত্তিভূমি এবং একমাত্র তত্ত্ব। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় জার্ম্মন ব্রহ্মবাদী হেগেলের দর্শনশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া আত্মপ্রত্যয় বা আত্মোপলব্ধি বা আত্মজ্ঞান কাহাকে বলে তাহার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হেগেলের ব্রহ্মবাদ তিনি বাংলা পাঠকের নিকট উপস্থিত করিয়া বাংলা সাহিত্যের উপকার সাধন করিয়াছেন; এ জন্য আমাদের হৃদয় তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

দেবেন্দ্রনাথ সত্যদর্শী ঋষি ছিলেন। তাঁহাকে যে আমরা ঋষি বলি, তাহা কি লোকের কাছে শুনিয়া? তাহা নহে। তাঁহার বিষয় যখন চিন্তা করি, তাঁহার মহাবাক্য যখন পাঠ করি, তখন প্রাণ স্বতঃই বলিয়া উঠে,—"মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ!" যাঁহারা সত্যদর্শী, ভারতবর্ষে তাঁহারাই মহর্ষি নামে অভিহিত। দেবেন্দ্রনাথ সত্যদ্রষ্টা ছিলেন। তিনি এই মর্ম্মে বলিয়াছেন,—"শাস্ত্রে আছে বলিয়া আমি কোন সত্য গ্রহণ করি নাই, যেখানে আমার প্রাণ সায় পাইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি।" অর্থাৎ তিনি স্বীয় আলোক-পথে নিয়ত চলিয়াছেন। স্বীয় আলোকে দর্শন করিয়াই উপনিষদ্ হইতে আরাধনা-মন্ত্র তিনি চয়ন করেন। যে আরাধনার অমৃত-ধারা এখন ব্রাহ্ম সাধকের প্রাণে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা মহর্ষির সত্যদর্শনের ফল। এ স্থলে ইহা বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি যে, মহর্ষির সত্যদর্শনের মধ্যে একটি বিশেষ ভাব ছিল, তাহা ভারতীয় ঋষিধারার ভাব।

সে ভাবটি কি? বিচারমূলক জ্ঞানের প্রকাশ। এটি এব্রাহিম-ধারার প্রফেটগণের মধ্যে বিকাশপ্রাপ্ত হয় নাই। এই বিচারমূলক জ্ঞানই তত্ত্বশাস্ত্রের—দর্শনশাস্ত্রের জনক। যাহাকে সাধারণ লোকে বলে "ফিলসফির কচ্‌কচি," তাহার নাম বিচারমূলক জ্ঞান। রাজা রামমোহন রায়ের মধ্যে এই জ্ঞান মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, মহর্ষির মধ্যে এই জ্ঞান বিকশিত হইয়াছিল। তাই তিনি বেদান্তবাদ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্বাধীন ভিত্তিতে স্থাপন করিলেন এবং সেই ভিত্তির নামকরণ হইল—"আত্মপ্রত্যয়।" মহর্ষির "ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস" নামক পুস্তকখানি কতবার পাঠ করিয়াছি; তাহা বিচারমূলক জ্ঞানেরই প্রকাশ।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন,—"বিশ্বাস প্রত্যক্ষ দর্শন।" এই কথা শুনিয়া কেহ কি মনে করিবেন, তিনি সত্যদর্শী ছিলেন না, সত্যে বিশ্বাসী ছিলেন? তিনি যে বিশ্বাসের কথা বলিয়াছেন, সেই বিশ্বাস এবং জ্ঞান একই বস্তু; পার্থক্য নামকরণে। শাস্ত্রে বিশ্বাস, অবতারে বিশ্বাস এবং কেশবচন্দ্রের 'বিশ্বাস' এক জিনিস নহে। যিনি বিবেকবাণী শুনিয়া চলিতে উপদেশ দিয়াছেন এবং বিবেকবাণীকে ঈশ্বরের বাণী বলিয়াছেন, তাঁহার 'বিশ্বাস' কথাটা চলিত বিশ্বাস নহে। তিনি ইংরাজি দর্শনশাস্ত্র হইতে একটি বাণী আনিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তিরূপে স্থাপিত করিয়াছেন, তাহার নাম—"সহজ জ্ঞান।" + মহর্ষির আত্মপ্রত্যয় এবং ব্রহ্মানন্দের সহজ জ্ঞান একার্থবাচক কথা নহে। 'আত্মপ্রত্যয়' যেমন অতি পাকা কথা, 'সহজ জ্ঞান' তেমন নহে। ব্রহ্মানন্দের বাক্যে—ভাবে—কার্য্যে আমরা এব্রাহিম-ধারার প্রফেট-ভাব দেখিতে পাই; ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের প্রভূত কল্যাণই হইয়াছিল।

দাদূর গ্রন্থাদি আমি পাঠ করিতে পাই নাই, সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলিতে পারি না। নানক, কবীর সত্যদর্শী ছিলেন। কিন্তু বঙ্গের চৈতন্য দেব সত্যে বিশ্বাসী ছিলেন। ঋষিগণ—উপনিষদরচয়িতাদিগের মধ্যে অনেকে সত্যদর্শী ছিলেন; পুরাণকারদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই সত্যে বিশ্বাসী ছিলেন। মহাত্মা যীশু সত্যদর্শী ছিলেন; তাঁহার শিষ্যগণ—ভক্ত, সাধুগণ সত্যে বিশ্বাসী ছিলেন। আবার কোন কোন সাধু, সাধ্বী মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় আলোকপথে বিচরণ করিয়াছেন—শাস্ত্র ও মণ্ডলীর জাল ছিন্ন করিয়া মুক্ত আকাশে বিহার করিয়াছেন। এই শ্রেণীর মধ্যে মাদাম গেঁওর নাম স্মরণ হইতেছে।

মন বিশ্বে ব্যাপ্ত হওয়া ও অনন্তের সহিত যুক্ত হওয়া একই কথা। সাধনার দ্বারা এটি উপলব্ধির বিষয়। এই সাধনাই মহর্ষির জীবনব্যাপী ছিল। "ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং," তাঁহার মূল মন্ত্র ছিল। তিনি নিখিল বিশ্বে অনন্তকে দেখিতেন, আবার অনন্তের মধ্যে নিখিল বিশ্বকে দেখিতেন। যিনি অনন্তের সহিত যুক্ত হন, তাঁহারই মন নিখিল বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়। এই ব্যাপ্তি জড়ের ব্যাপকতা নহে—এই ব্যাপ্তি—জ্ঞানে। জ্ঞান যখন ধ্যানে পরিণত হয়, তখনই এটি সম্ভব। একজন জ্ঞানী বলিয়াছেন,—"এক বিন্দু জমিতে আমি নিখিল বিশ্বকে দেখিতে পাই।" এ দেখা স্থূল-দর্শন নহে—জ্ঞানের দিব্য দর্শন।

"জ্ঞান ও ভাব দুইটা বস্তু নহে; একই অভিজ্ঞতার দুই দিকমাত্র।" এই কথা আমি কেন লিখিয়াছিলাম, রায় মহাশয় তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। আমাদের দেশে সাধারণতঃ জ্ঞান ও ভক্তি দুইটি জিনিস বলিয়া কথিত হয়। বাস্তব পক্ষে ইহা দুইটি জিনিস নহে, 'একই অভিজ্ঞতার দুই দিকমাত্র।' আবার যাঁহারা জ্ঞানপন্থী তাহাদিগকে বলা হয়, ইঁহারা প্রেমকে ছাড়িয়া কেবল জ্ঞানকে ধরিয়াছেন; বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং বিশুদ্ধ প্রেম যে একই বস্তু তাহা বুঝিতে ভুল করেন। আমি এই জন্যই উক্ত দার্শনিক তত্ত্ব কথাটির উল্লেখ করিয়াছিলাম। বিশুদ্ধ জ্ঞান ও প্রেমের অভিন্ন মূর্ত্তি আমরা কোথায় দেখিতে পাই? উপলব্ধিমূলক আরাধনার মধ্যে; উপলব্ধিমূলক আরাধনায় ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মপ্রেমের অভেদ মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। উন্নত জ্ঞান ও উন্নত ভাব যে একখানি কাগজের দুই পৃষ্ঠার ন্যায় তাহা রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীতেও দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞানবাদ, প্রেমহীন শুষ্ক 'তার্কিক জ্ঞান' নহে। জ্ঞান ও প্রেমের অভিন্ন ভাব দর্শন করাই জ্ঞানবাদের উদ্দেশ্য। এই দার্শনিক তত্ত্বের অভিব্যক্তি ব্রাহ্মসাধকদিগের সাধনায় দ্রষ্টব্য।

+ সহজাত জ্ঞান—Intuition

রায় মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়ের কথাও তাঁহার চিঠিতে উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বন্ধে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি। তিনি যে সকল বক্তৃতা করিয়াছেন, উপদেশ দিয়াছেন, তাহার সারতত্ত্ব গ্রহণ করিয়া নিজেই একটি 'মটো' করিয়াছেন, তাহা এই ;—

"জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, চরিত্রে সংযম এবং কর্ত্তব্যকার্য্যে দৃঢ়তাই মানবত্ব।"

ইহাই শাস্ত্রী মহাশয়ের মহাবাক্য—বাণী। পাঠকগণ, এই বাণী শুনিয়া বিচার করিবেন, শাস্ত্রী মহাশয় কোন্ পন্থী। ব্রাহ্মসমাজ জ্ঞানপন্থী। জ্ঞানালোকে পরিচালিত হওয়াই ব্রাহ্মজীবনের লক্ষণ। যাঁহারা জ্ঞানপন্থী তাঁহাদের মধ্যে স্বাধীন ভাবে দার্শনিক আলোচনা হওয়া স্বাভাবিক। ব্রাহ্ম সমাজে দার্শনিক আলোচনার সৃষ্টি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের দ্বারাই হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় মাত্র দুইখানি উৎকৃষ্ট দার্শনিক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। সে দুইখানিই ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্যদিগের দ্বারা লিখিত। আদি সমাজের 'তত্ত্ববিদ্যা', 'ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা', নববিধান সমাজের 'ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজ' তত্ত্ব গ্রন্থ, 'দর্শন' নহে। বাস্তবিক 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা,' ও 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' দর্শনগ্রন্থ নামে অভিহিত হইতে পারে। বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত জ্ঞানপ্রবীন প্রচারক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া শক্তিবাদ, অভিপ্রায়বাদ, নীতিবাদ অতি সুললিত প্রাঞ্জল ভাষায় 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন। পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় হেগেলের জ্ঞানবাদ লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়।" 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা', ও "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" বঙ্গসাহিত্যে প্রকৃত দার্শনিক গ্রন্থ। ✽ এই বিচারমূলক দর্শন-গ্রন্থ পাঠ করিলে সন্দেহ বিদূরিত হয়, জ্ঞান মার্জ্জিত হয়, ঈশ্বরচিন্তা এবং আরাধনার সাহায্য হয়।

হিন্দু সমাজের সহিত—হিন্দু শাস্ত্রের সহিত ব্রাহ্ম সমাজের অতি নিকটতম সম্বন্ধ। আবর্জ্জনা সরাইয়া হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যে সত্য দর্শন করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। হিন্দু শাস্ত্র বুঝিবার জন্য তিনখানি উপাদেয় গ্রন্থ রচিত হইয়াছে ; উপাধ্যায় গৌর গোবিন্দ রায় মহাশয়ের "গীতা সমন্বয়" "বেদান্ত সমন্বয়" এবং শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের "গীতা পাঠ।"

কেহ বলিতে পারেন, জ্ঞানালোচনায় দরকার কি ? উপাসনার দ্বারাই সকল লাভ হইবে। একথা জ্ঞানপন্থীর কথা নহে। যাঁহারা অভ্রান্ত শাস্ত্র মানেন না, গুরু মানেন না, অবতার মানেন না, তাঁহারা যদি জ্ঞান পথ পরিত্যাগ করেন, তবে ব্রাহ্ম সমাজে থাকিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। যাঁহারা এক সময়ে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের নিশান হস্তে ধারণ করিয়া উৎসাহের সহিত ব্রহ্ম নাম প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা আবার মূর্ত্তির চরণে প্রণত হইলেন কেন ? এ কথার আমার মনে একমাত্র প্রত্যুত্তর জাগিতেছে, "তাঁহারা বিশ্বাস পন্থী ছিলেন।" ব্রাহ্ম সমাজ সত্যদর্শী সমাজ জ্ঞান পন্থী সমাজ। ✝ প্রত্যেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাকে সত্যের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে পরিচিত হইতে হইবে, ব্রাহ্ম সাধক গণ এই শিক্ষাই দিতেছেন।

কাশীচন্দ্র ঘোষাল।

✽ সম্প্রতি বঙ্গভাষায় গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও ফরাসী দার্শনিক ভিক্টোর কুঁজর দর্শনের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

✝ যদি কোন ব্রাহ্ম মনে করেন যে, ঈশ্বর যে আছেন, তাহার কোন প্রমান নাই ; কেবল বিশ্বাস করিতে হয় তিনি আছেন, তাহা হইলে তিনি বিশ্বাসপন্থী। যদি কোন ব্রাহ্ম মনে করেন যে, এক জন বিশেষ ব্যক্তিকে কেন্দ্র রূপে না ধরিলে ধর্ম্মসাধন হয় না, তাহা হইলে বলিব তিনি বিশ্বাসপন্থী। গুরুকরণ ভিন্ন সাধনা লাভ হয় না, যদি কোন ব্রাহ্ম এ জন্য কাহারো কাছে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে বলিব তিনি বিশ্বাসপন্থী।

প্রেরিত পত্র।

[প্রেরিত পত্রের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

আচার্য্য ও মণ্ডলী।

বিগত ১লা বৈশাখের তত্ত্বকৌমুদীতে "আচার্য্য মণ্ডলী" নামে যে প্রবন্ধটী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রতি আমি ব্রাহ্ম সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। দেশে দেশে যে সকল ব্রাহ্মসমাজ রহিয়াছে ইহাদের কার্য্য স্থানীয় আচার্য্যগণদ্বারাই সম্পন্ন হয়। সুতরাং ইঁহারা অধিকতর উপযুক্ত হইলে, ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যের জন্য অধিকতর সময় ও সুবিধা পাইলে সমাজের কার্য্য যে ভাল হইবে তাহার সন্দেহ নাই। এবং এ সকল সমাজ উন্নত ও বিস্তৃত হইয়া সম্মিলিত হইলেই ব্রাহ্মসমাজ দেশময় হইবে। প্রচারকের অভাবে ব্রাহ্ম সমাজের কাজের যে অসুবিধা হইয়াছে এই ব্যবস্থাতে অনেক পরিমাণে তাহার প্রতিকার হইবে। অতএব আমি ব্রাহ্ম সাধারণকে বিনীত ভাবে অনুরোধ করি আচার্য্যের নিয়োগ প্রণালী, আচার্য্যের শিক্ষার ব্যবস্থা ও আচার্য্যকে অনন্য-কর্ম্মা করিবার উপায় চিন্তা ও আলোচনা করিয়া তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

বিনীত

শ্রীহরিশচন্দ্র দত্ত।

ব্রাহ্মসমাজ।

প্রচার—কটক—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কটক গমন করিয়া তিন সপ্তাহ অবস্থিতি করেন। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি দুই রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা, স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে "ভারতে ধর্ম্মসমস্যা" বিষয়ে বক্তৃতা এবং ব্রাহ্মবন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইয়া স্থানে স্থানে উপাসনা ও

"ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধন" "ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি" বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মযুবকদিগকে একত্র করিয়া ধর্ম্মালোচনা, ভিক্টোরিয়া স্কুলের ও বঙ্গবিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের নিকট এবং কয়েকটি ব্রাহ্মপরিবারের বালক-বালিকাদিগের নিকট গল্প ও জীবনচরিত বলিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ময়ূরভঞ্জ—কটক হইতে ময়ূরভঞ্জ গমন করেন। উক্ত স্থানে তিন ঘর আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম আছেন; রবিবারের সাপ্তাহিক উপাসনার কোন বন্দোবস্ত নাই। স্থানীয় অনেক ভদ্রলোকের ব্রাহ্মসমাজের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। একদিন শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার রাওর গৃহে সংক্ষিপ্ত উপাসনার পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনচরিত বর্ণনা করিয়া একটি উপদেশ প্রদান করেন। একদিন লাইব্রেরী হলে "শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার ভক্তি" বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তা বক্তৃতার শেষদিকে বৈষ্ণবধর্ম্মের অবনতির কারণ নির্ণয় করিয়া, অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরের অর্চ্চনায়ই মানবহৃদয় চরিতার্থ হয়, তাহা বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করেন। রাঁচি—ময়ূরভঞ্জ হইতে রাঁচি গমন করিয়া তিন সপ্তাহ অবস্থান করেন। এসময়ের মধ্যে রাঁচি সহরের ব্রহ্মমন্দিরে দুই রবিবার উপাসনা করিয়াছেন। একদিন স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয় গৃহে ছাত্রীগণ এবং স্কুলের নিকটবর্ত্তী ভদ্রলোকদিগের গৃহের মহিলাগণ মিলিত হইলে বালিকাদিগের নিকট একটি গল্প বলিয়া ও তৎপরে মহিলাদিগের নিকট দুইটি ভক্তিমতী নারীর জীবনচরিত বর্ণনা করিয়া ভক্তি বিষয়ে উপদেশ দেন। তাহা ছাড়া কয়েকটি পরিবারে উপাসনা করেন। তদ্ভিন্ন ডুরাণ্ডায় বাস করিয়া প্রতিদিন সকালে একটি পরিবারে উপাসনা এবং কয়েকদিন সন্ধ্যাকালে ব্রাহ্মবন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইয়া উপাসনা ও "ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি ও সেবা" বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। কয়েকদিন অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত তুষিতকুমার দত্তের গৃহে মহিলা এবং বালকবালিকাগণ মিলিত হইয়াছেন; অমৃতবাবু ধার্ম্মিক লোক-দিগের জীবনচরিত বর্ণনা করিয়া মহিলাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন এবং বালক বালিকাদিগকে গল্প শুনাইয়াছেন। তাহা ছাড়া লাহোরের দয়ালসিংহ কলেজের অধ্যক্ষ মিষ্টার সতীশচন্দ্র রায় বিবাহের পরে তাঁহার ভ্রাতা মিষ্টার রাধানাথ রায়ের গৃহে আগমন করিলে যে বিশেষ উপাসনা হয়, তাহাতে আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন।

শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল গোয়ালপাড়া হইতে ধুবড়ীতে গমন করিয়া নিম্নলিখিত রূপে কার্য্য করিয়াছেন!—একদিন সন্ধ্যাকালে বাবু নির্ম্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গৃহে স্থানীয় উপাসকগণ উপাসনার্থে মিলিত হন, তিনি উপাসনা ও সঙ্গীত করেন ও উপদেশ দেন। নিম্নলিখিত গৃহে পারিবারিক উপাসনা করেন:— বাবু জগচ্চন্দ্র দাস একষ্ট্রা আসিষ্টাণ্ট কমিশনার, বাবু মতিলাল সরকার এবং বাবু কামিনী কুমার চক্রবর্ত্তী। এক দিন বাবু উপেন্দ্র নাথ বসুর গৃহে একটি পরলোক গত আত্মার স্মরণার্থ উপাসনা করেন এবং উপদেশ দেন। এই উপাসনায় স্থানীয় উপাসকগণ প্রায় সকলেই মিলিত হইয়াছিলেন ব্রহ্ম মন্দিরে এক দিন বক্তৃতা করেন এবং এক রবিবার সাপ্তাহিক উপাসনা সম্পাদন করেন। দুই দিন স্থানীয় ব্রাহ্মগণ বাবু উপেন্দ্র নাথ বসুর গৃহে মিলিত হইলে তিনি উপাসনার পর আলোচনা করেন এবং এক দিন ঐ গৃহে উপাসনা ও উপদেশের পর উপস্থিত ব্রাহ্মগণের কতক গুলি লিখিত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দান করেন। ইহা ভিন্ন ধর্ম্ম বন্ধুগণের সহিত আলোচনা করেন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

শ্রীযুক্ত যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের পুত্র ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটের শিক্ষা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সুধাংশুনাথ চক্রবর্ত্তী হঠাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত মে মাসে রেঙ্গুন নগরীতে রেঙ্গুন ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম স্থাপয়িতা মিঃ নমঃ শিবায় পরলোক গমন করেন। রেঙ্গুন ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনবধানতাবশতঃ সংবাদটি যথাসময়ে তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত না হওয়াতে দুঃখিত আছি।

বিগত ২৫শে জুলাই কলিকাতা নগরীতে পরলোকগত মোহিনীমোহন মজুমদারের পত্নীর আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান পুত্রকন্যাগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন ও জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র মজুমদার মাতার জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীযুক্তা লীলাবতী বসু প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের বিবিধ বিভাগে ১৫৲ টাকা দান করা হইয়াছে এবং তাঁহার নামে একটী স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপনের সংকল্প জ্ঞাপিত হইয়াছে। পরদিবস সায়ংকালে উপাসনা সংকীর্ত্তনাদি হয় ও বন্ধুগণকে আহার করান হয়। ২৭শে জুলাই প্রাতে দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী শৈলবালা দত্ত শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করেন। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন ও জামাতা শ্রীযুক্ত রসিকলাল দত্ত প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে স্থায়ী প্রচার ভাণ্ডারে ৫৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ২৮শে আষাঢ় কুমিল্লা নগরীতে পরলোকগতা সুরবালা সিংহের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। ঐ দিন কাঙ্গালীদিগকে চাউল ও পয়সা বিতরণ করা হইয়াছে এবং নিম্নলিখিত রূপ দান করা হইয়াছে,—কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজ ৪৲, কালীকচ্ছ ব্রাহ্মসমাজ ৪৲, কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ (দাতব্য বিভাগ) ৪৲ ময়মনসিংহ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ২৲, শিলং অনাথাশ্রম ২৲, ঢাকা অনাথাশ্রম ২৲, অনাথ ব্রাহ্মপরিবার সংস্থান ধনভাণ্ডার, ঢাকা ৫৲, কলিকাতা নববিধান সমাজ ২৲, মোট ২৫৲ টাকা। এতদ্ব্যতীত সুরবালার নামে ১২৫৲ টাকার একটী স্থায়ী ফণ্ড করিয়া কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হাতে দেওয়ার সঙ্কল্প করা হইয়াছে। এই টাকার সুদদ্বারা কোন ব্রাহ্ম গরিব মেয়ের বিদ্যাশিক্ষার সাহায্য করা হইবে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের প্রাণে সান্ত্বনা বিধান করুন।

বিবাহ—বিগত ১৯এ জুলাই বারাণসী নগরীতে পরলোকগত জগচ্চন্দ্র সিংহের কন্যা শান্তিলতার ও শ্রীযুক্ত

সতীশচন্দ্র রায়ের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সেন আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রেমময় পিতা নবদম্পতীকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজ—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, বাঁকুড়া ব্রহ্মমন্দিরে গত ৬ই জুলাই "বিলাতের ছাত্রজীবন," ১৫ই জুলাই "ভারতের ধর্ম্ম" ও ১৬ই জুলাই "বিলাতের শিক্ষা" বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছেন। প্রতি রবিবার আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। ১৯ জুলাই শান্তি উৎসবের দিনে ব্রাহ্মসমাজ বাটীতে যে নৈশবিদ্যালয় আছে তাহার দরিদ্র বালকদিগকে সাধারণ ব্রহ্মসমাজ হইতে ১খানি করিয়া নূতন কাপড় বিতরণ করা হইয়াছে; বালকগণ আনন্দের সহিত নববস্ত্র পরিধান করিয়া ব্রাহ্মমন্দির হইতে পতাকা হস্তে লইয়া শান্তি উৎসব সভায় যোগদান করিয়াছিল। শান্তি উৎসবের দিন প্রাতে ৭॥০ ঘটিকায় বিশ্বব্যাপী শান্তির জন্য ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত বাবু জিতেন্দ্রকুমার বিশ্বাস উপাসনা, প্রার্থনা ও সঙ্গীতাদি করিয়াছিলেন।

কুমারখালী ব্রাহ্মসমাজ—১২৫৮ সালের ৩০শে আষাঢ় তারিখে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে উপস্থিত থাকিয়া কুমারখালী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত করেন। সেই শুভ ৩০শে আষাঢ় সমাজের ৭২ বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ প্রামাণিক উপাসনান্তে "আত্মা" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন।

উৎসব—ফরিদপুর ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে :—

২৮শে জুন সন্ধ্যায় উৎসবের উদ্বোধন; আচার্য্য শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল। ২৯শে জুন প্রাতে উপাসনা। আচার্য্য প্রিন্সিপাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়। সন্ধ্যায় উপাসনা; আচার্য্য শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল। ৩০শে জুন, প্রাতে উপাসনা। আচার্য্য প্রিন্সিপ্যাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় সন্ধ্যায় উপাসনা; আচার্য্য কাশীবাবু। ১লা জুলাই, প্রাতে উপাসনা। আচার্য্য শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্র। সন্ধ্যায় বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন। ২রা জুলাই, সন্ধ্যায় "বর্ত্তমান যুগ" বিষয়ে বক্তৃতা; বক্তা কাশীবাবু। ৩রা জুলাই, সন্ধ্যায় "কতিপয় প্রশ্নের উত্তর" বিষয়ে বক্তৃতা। বক্তা কাশীবাবু। ৪ঠা জুলাই, সন্ধ্যায় "ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব" বিষয়ে বক্তৃতা; বক্তা কাশীবাবু। ৫ই জুলাই, সন্ধ্যায় "ভারতীয় ধর্ম্মে উপাসনার উৎপত্তি ও বিকাশ" বিষয়ে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ লিখিত বক্তৃতা তাঁহার অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্র পাঠ করেন। ৬ই জুলাই, সন্ধ্যায় শান্তিস্থাপন উপলক্ষ্যে বিশেষ ধন্যবাদসূচক উপাসনা হয়। আচার্য্য কাশীবাবু।

পত্রপ্রেরকের প্রতি—জিজ্ঞাসু—আপনার নামও ঠিকানা অবগত হইলে আপনার সহিত উক্ত বিষয়ে আলোচনা করিতে পারি এবং তৎপর আবশ্যক বোধ করিলে তাহার মর্ম্ম তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিতে পারি।

শান্তিপুর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—গত ৬ই আষাঢ় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র শান্তিপুর গমন করিয়া নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি করিয়াছেন :—

৭ই আষাঢ় প্রাতে শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করেন। রাত্রে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করেন। ৮ই আষাঢ় প্রাতে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিকের দ্বিতীয়া কন্যার নামকরণ করিয়াছেন। বৈকালে স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল স্কুল হলে ছাত্রদিগকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। রাত্রে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিকের বাসায় উপাসনা করেন। ৯ই আষাঢ় প্রাতে উপাসনা করেন ও মধ্যাহ্নে শান্তিপুর অবনতজাতির উন্নতিবিধায়িনী সমিতির প্রতিষ্ঠিত সুনীতি-বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। বৈকালে মুক্তাগড় নদীয়া মহারাজার স্কুলে 'মানব জীবন' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত মুকুন্দকৃষ্ণ বাগচীর বাড়ীতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় অধিবেশন হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত মুকুন্দকৃষ্ণ বাগচী কার্য্যকরী সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই সভায় একটী 'ছাত্র সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ছাত্রসমাজের সহিত একটী নৈশবিদ্যালয় ও দরিদ্রভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত মুকুন্দকৃষ্ণ বাগচী এককালীন ৫৲ পাঁচ টাকা দান করেন। সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত যোগানন্দ প্রামাণিকের ভবনে প্রার্থনা ও সঙ্কীর্ত্তন হয়। ১০ই প্রাতে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিকে প্রথমা কন্যার জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। বৈকালে কালনার টাউনহলে 'ভারতের সাধনা' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ১১ই আষাঢ় কালনা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধিকাপদ পানের ভবনে প্রাতে পারিবারিক উপাসনা করেন।

বিজ্ঞাপন।

১৯১৯ সনে মেট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে এরূপ কোন গরীব ব্রাহ্ম বালক অথবা বালিকাকে পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ ব্রজসুন্দর বৃত্তি নামে একটি মাসিক ১০৲ টাকার বৃত্তি দুই বৎসরের জন্য প্রদান করিবেন। ১৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে।

শ্রীনেপালচন্দ্র কর।
সম্পাদক,
পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজ, পাটুয়াটুলী, ঢাকা।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Registered No C. 65

অসতোমা সদ্গময়,
তমসোমা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—
১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত

৪২শ ভাগ। ৯ম সংখ্যা। | ১লা ভাদ্র, সোমবার, ১৩২৬, ১৮৪১ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯০ | অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩
18th August, 1919. | প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে করুণাময় পিতা, তুমি কৃপা করিয়া তোমাকে সাক্ষাৎ ভাবে জানিবার ও পূজা করিবার যে উচ্চ অধিকার আমাদিগকে দিয়াছ, আমরা তাহার উপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছি না। মোহান্ধ মানুষের মোহ ও অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্য চিরদিন তুমি কত আয়োজন করিতেছ, কত উন্নত তত্ত্ব সকল প্রকাশ করিতেছ, পবিত্র ধর্ম্মের আদর্শ উপস্থিত করিতেছ! যে দেশ তোমাকে ভুলিয়া অসারের পূজায় নিতান্ত অসার ও মৃতপ্রায় হইয়াছিল সেখানে তোমার সাক্ষাৎ আধ্যাত্মিক পূজা প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত করিয়া, কি অপার করুণাই না দেখাইলে! পরিতাপের বিষয়, তোমার উপাসনাতে যে জীবন ও আনন্দ তাহা আমরা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। তোমার উপাসনাকে আমরা সমগ্র মনঃপ্রাণ দিয়া অবলম্বন করিতে পারিতেছি না। তাই আমরা মৃতের ন্যায় জীবন যাপন করিতেছি, আনন্দ ও শান্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া অতি দুঃখেই কাল কাটাইতেছি। আমাদের অবস্থা দেখিয়া অপর লোকেও ইহাকে অবলম্বন করিতে অগ্রসর হইতেছে না— ইহার শক্তিতে সন্দিহান হইতেছে। আমাদের দ্বারা কোথায় তোমার ধর্ম্মবিস্তারলাভ করিবে, না আমরাই সে পথের কণ্টক-স্বরূপ হইতেছি! আমাদের জীবন দেখিয়া লোকে তোমার ধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধই হইতেছে। তুমি ভিন্ন আর কে আমাদের এই দুর্দ্দশা দূর করিবে? তুমি কৃপা করিয়া আমাদের জীবনে তোমার উপাসনা প্রতিষ্ঠিত কর, আমাদিগকে তোমার ধর্ম্মের যে উচ্চ অধিকার দিয়াছ তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ কর। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

সম্পাদকীয়।

ভাদ্রোৎসব—ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে ৬ই ভাদ্রই যে সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় দিন, এ কথা বহুদিন আমাদের জানা ছিল না। তাই ভাদ্রোৎসবের গৌরব আমাদের মধ্যে এখনও সম্যক্‌-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এখন আমরা জানিতে পারিয়াছি ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র (১৮২৮ সালের ২০এ আগষ্ট) বুধবারই ব্রাহ্মসমাজ প্রথম স্থাপিত হয়। অবশ্য ইহার পূর্ব্বে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে আত্মীয় সভা স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু সেখানে শুধু সঙ্গীত, শাস্ত্রপাঠ ও ধর্ম্মালোচনা হইত—ব্রহ্মোপাসনা তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, ব্রাহ্মসভা বা ব্রাহ্মসমাজ নামও তখন পর্য্যন্ত গৃহীত হয় নাই। ইহার পূর্ব্বেই ত্রিত্ববাদী খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক এডাম সাহেবের মত পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া রাজা তাঁহার সাহায্যে একেশ্বরবাদীদের উপাসনা সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু তাহার কার্য্যাদি সম্পূর্ণরূপে খৃষ্টীয় সমাজের প্রণালী অনুসারেই সম্পন্ন হইত। ব্রহ্মোপাসনা তখনও যথার্থরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাহা স্বতন্ত্র জিনিষ। প্রত্যেক ধর্ম্মের মধ্যেই যে সত্য নিহিত রহিয়াছে উদার ভাবে তাহা গ্রহণ করিলেও, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকদের নিকট প্রচারে তাঁহাদের আপন আপন শাস্ত্রের সাহায্যগ্রহণ করিলেও উদার বিশ্বজনীন ব্রাহ্মধর্ম্মই যে তাঁহার আপনার প্রাণের ধর্ম্ম ছিল এবং জগতে প্রচার করাই যে তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। এই বিশ্বজনীন ধর্ম্মের কথা বলিতে তিনি কিরূপ আনন্দ ও উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইতেন তাহা সকলেই অবগত আছেন। অনেকে তাঁহার গ্রন্থাদি পাঠ করেন না বলিয়াই এই ধর্ম্মের বিশেষত্ব সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। তিনি একেশ্বরবাদী খৃষ্টীয়ানও ছিলেন না, বৈদান্তিক হিন্দুও ছিলেন না। তিনি অনেক স্থলে

আপনাকে শঙ্করের শিষ্য বলিয়া পরিচিত করিলেও, তিনি যে শঙ্করের অনুসরণ না করিয়া স্বাধীন ভাবে বেদান্তাদির ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থাদি পাঠ করিলে সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মমন্দিরের ট্রাষ্ট্‌ডিড্‌, হিন্দু ও খৃষ্টীয়গণের সহিত তাঁহার বিচারগ্রন্থগুলি এবং উপনিষদ্‌গুলির ভূমিকা প্রভৃতি পুস্তিকা সকল সামঞ্জস্য করিয়া মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের নূতনত্ব ও বিশেষত্ব বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ থাকে না। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইতে শুধু যে এই উন্নত বিশুদ্ধ ধর্ম্মমতই আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা নহে। তাহা অপেক্ষাও সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠতর ব্রহ্মোপাসনা আমরা এই দিনে পাইয়াছি। এই অসংখ্য কাল্পনিক দেবদেবীর বাহ্যপূজায় নিমগ্ন দেশে এক অদ্বিতীয় সত্যদেবতার আধ্যাত্মিক পূজা প্রতিষ্ঠা সামান্য ব্যাপার নহে। এই ব্রহ্মোপাসনা মানবজীবনের সার্থকতা সম্পাদনের ও অনন্ত উন্নতি সাধনের দ্বার খুলিয়া দিয়াছে; ইহা অপেক্ষা মহত্তর ও কল্যাণতর আর কিছু হইতে পারে না। তিনি যেমন নিজে দৈনিক জীবনে ইহাকে একান্ত নিষ্ঠার সহিত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তেমনি সম্মিলিত সকল শ্রেণীর লোকের জন্যও ইহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পুরাকালে জ্ঞানী ঋষিগণ ইহাকে অবলম্বন করিলেও ইহা কখনও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল না, ইহাতে সর্ব্বসাধারণের অধিকার পূর্ব্বে কখনও স্বীকৃত হয় নাই, এই হেতুও ইহা বিশেষ স্মরণীয় দিন। আমাদের বর্ত্তমান উপাসনাপ্রণালী সে সময়ের অবলম্বিত প্রণালী হইতে কিছু পৃথক্ হইলেও মূলতঃ উহারা একই। একটি অপরটিরই বিকাশমাত্র। উক্ত পার্থক্য হেতু আমাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ কিছুমাত্র ন্যূন হইতেছে না। তাঁহার রচিত এই প্রথম দিনের সঙ্গীত "ভাব সেই একে" চিরদিনই আমাদিগকে এই মহা পূজায় আহ্বান করিবে। সে বাণী আমরা ভুলিতে পারি না। আর, যিনি প্রথম দিবস হইতে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আচার্য্যরূপে ইহার পোষণ ও রক্ষণকার্য্যে জীবনপাত করিয়াছিলেন, এই প্রসঙ্গে সেই রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কেও স্মরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। ৬ই ভাদ্র আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন, আনন্দ ও শান্তি পাইবার দিন, নূতন জীবন লাভ করিবার দিন—উৎসবের শ্রেষ্ঠ দিন। কিন্তু ভাদ্রোৎসব ভালরূপে সম্ভোগ করিতে হইলে দীনতা, ব্যাকুলতা প্রভৃতি সাধারণ আধ্যাত্মিক আয়োজনের উপরে রাজার গ্রন্থাবলী একবার মনোযোগ সহকারে পাঠ করাও একান্ত কর্ত্তব্য। দেশের ধর্ম্মনৈতিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখাও আবশ্যক; তাহা না হইলে এই উৎসব হইতে আমরা সম্যক্ উপকার লাভ করিতে পারিব না। আমরা যেন বিশেষ ভাবে এই উৎসবের জন্য প্রস্তুত হই। প্রেমময় পিতা কৃপা করিয়া আমাদিগকে যে অমূল্য ধন দিয়াছেন এবং আরও যাহা দিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন, আমরা তাহা উপযুক্ত রূপে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হই। ব্রহ্মোপাসনা আমাদের জীবনে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করুক। আমাদের দ্বারা তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মের যেন অগৌরব সাধিত না হয়। তাঁহার অপার প্রেম ও করুণা আমরা হৃদয় পাতিয়া গ্রহণ করি। তাঁহার ইচ্ছাই আমাদের সকলের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক।

আবর্জ্জনারাশির সঞ্চার—যখন প্রবল বেগে জলস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে তখন উহা ধরাপৃষ্ঠকে বিধৌত করিয়া সকল প্রকার আবর্জ্জনারাশিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়—কোথাও কোন প্রকারের মলিনতা সঞ্চিত হইতে পারে না। স্রোত যতই মন্দীভূত হইতে থাকে ততই ভাসমান্ আবর্জ্জনা-সকল তলদেশে সঞ্চিত হইতে থাকে, অবশেষে উহাই আবার স্রোতোনিরোধের হেতু-স্বরূপ হয়। তাহা যে তখন নানা রোগোৎপত্তির ও অনিষ্টপাতের মূলীভূত কারণ হয় তাহা আর বলিতে হইবে না। যে সকল দেশ বর্ষার প্লাবনে প্লাবিত ও ধৌত হইয়া যায়, তথায় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না; আর যেখানে বদ্ধজলস্রোত সেখানেই উহার প্রবল আক্রমণ। এমন কি, কোনও বৎসর প্লাবনের ন্যূনতা ঘটিলেও ম্যালেরিয়ার আক্রমণ প্রবল হইতে দেখা যায়। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনেও এই প্রাকৃতিক নিয়মের কার্য্য লক্ষিত হইয়া থাকে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ধর্ম্মের স্রোত যখন প্রবল ভাবে বহিতে থাকে, তখন সর্ব্বপ্রকার পাপ ও কুসংস্কার বিধৌত হইয়া যায়; কোনও প্রকার মলিনতা কোথাও সঞ্চিত হইতে পারে না। আমাদের প্রত্যেকের জীবন ও ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস এই সাক্ষ্যই প্রদান করিবে। ব্রাহ্মজীবনে এক সময়ে কি বিশুদ্ধতাই দেখা গিয়াছে! ব্রাহ্মগণ কি কঠোর নির্ম্মম হস্তেই সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার ও আবর্জ্জনা সমূলে উৎপাটিত করিয়াছেন! কোথাও কোনও প্রকার আবর্জ্জনা বিন্দুপরিমাণে রাখিতেও তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন না—এক দিনের জন্যও ধর্ম্মজীবনের শত্রুর সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে তাঁহারা স্বীকৃত হন নাই। যেখানে যে কোনও প্রকার বাধা দেখিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বপ্রযত্নে পরিত্যাগ করিয়াছেন, কোনও প্রকার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া অনিষ্টকর দেশাচার বা লোকাচারকে প্রশ্রয় দেন নাই। কিন্তু আজ কাল দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ কেহ মিথ্যা স্বাজাত্য ও স্বাদেশিকতার মোহে মুগ্ধ হইয়া পূর্ব্বপরিত্যক্ত কুসংস্কার ও কুপ্রথাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একান্ত আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছেন। সংস্কারোৎসাহের প্রথম আবেগে যদি অজ্ঞতা বা উৎসাহাধিক্য বশতঃ আবর্জ্জনারাশির সহিত কোনও লুক্কায়িত রত্নরাজি, কুপ্রথার সহিত কোনও সুপ্রথাও দূরীভূত করা হইত এবং বর্ত্তমানে জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে এরূপ দেখা যাইত, তাহা হইলে আমাদের বলিবার কিছু থাকিত না; বরং তাহা জীবনের পরিচায়ক বলিয়া আনন্দেরই কারণ হইত। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এ ক্ষেত্রে সেরূপ কিছু দৃষ্ট হইতেছে না। এ সকলের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা প্রমাণিত করিবার জন্য কাহাকেও ইহাদের স্বপক্ষে 'স্বাজাত্য ও স্বাদেশিকতা সর্ব্বোপরি রক্ষণীয়,' ইহা ভিন্ন অপর কোনও সুযুক্তি প্রদর্শন করিতে দেখা যায় না। ধর্ম্মজীবন রক্ষণ ও পরিপোষণের জন্য উহাদের কোনও আবশ্যকতা আছে বলিয়া কেহ বলেন না, প্রমাণ প্রদর্শন করিতেও পারেন না। ইহাদের একমাত্র কথা—'স্বদেশ ও স্বজাতির বংশপরম্পরাগত সংস্কার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, কুলক্রমাগত প্রথা-সকল পরিত্যাগ করিয়া, আমরা নিতান্তই বৈদেশিক ও বিজাতীয় হইয়া পড়িতেছি। পুরাতনের সঙ্গে যোগ ছিন্ন হইয়া যেমন বর্ত্তমান

দাঁড়াইতে পারে না, এরূপ অবস্থায়ও তেমনি আমাদের জীবন বাঁচিতে পারে না। পূর্ব্ব-সংস্কারবর্জ্জিত জীবন ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় অচিরেই শুষ্ক ও মৃতদশা প্রাপ্ত হইবে। স্বদেশ ও স্বজাতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিশ্বজনীন জীবন যাপন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার।' এ সকল কথার মধ্যে অনেক সত্য আছে স্বীকার করিয়া লইলেও কোনও রূপে প্রমাণিত হয় না যে, স্বদেশের ও স্বজাতির সকল সংস্কার ও প্রথাকে অবিচারিত ভাবে গ্রহণ না করিলেই পূর্ব্বের সহিত যোগ একেবারে ছিন্ন হইল, মৃত্যুর হস্ত হইতে আর রক্ষা পাইবার উপায় রহিল না। যুক্তি কিম্বা পরিদৃশ্যমান্ ঘটনাবলীর সাক্ষ্য, ইহাদের কিছুতেই প্রমাণিত হয় না এরূপ যোগের উপর জীবন ও বিকাশ নির্ভর করে; বরং ইহাই প্রমাণিত হয় যে, এরূপ ভাবে জড়িত হইতে গেলে মৃত্যুই সুনিশ্চিত। কিছু মাত্র বর্জ্জন না করিয়া পুরাতনকে স্তরে স্তরে সঞ্চয় করিয়া রাখিলে কেহ কোনও প্রকারেই বাঁচিতে পারে না। জীবনের পক্ষে গ্রহণ ও বর্জ্জন উভয়ই একান্ত আবশ্যক। পুরাতন বর্জ্জন ও নূতন গ্রহণ ব্যতীত উন্নতি ও বিকাশ একেবারেই অসম্ভব। বর্জ্জনের অভাবে যে আবর্জ্জনার বিষ সঞ্চিত হয় তাহা পরিশেষে মৃত্যুরই কারণ হয়। সুতরাং এই যে পুরাতনের প্রতি অত্যধিক প্রীতি হেতু সর্ব্বপ্রকার পূর্ব্বতন প্রথাগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস, ইহা কোনও প্রকারেই কল্যাণের কারণ হইতে পারে না। অপর দিকে দেখা যায়, যেখানে জীবনের গতি মন্দীভূত সেখানেই এই বর্জ্জনে অসামর্থ্য, বিষাক্ত আবর্জ্জনারাশিদূরীকরনে অক্ষমতা। সুতরাং এই যে কোন কোন স্থানে ধীরে ধীরে নানা কুসংস্কার ও আবর্জ্জনা-রাশি সঞ্চিত হইতে দেখা যাইতেছে তাহা নিতান্ত আশঙ্কারই কারণ হইয়াছে, তাহা ধর্ম্মজীবনের স্রোত মন্দীভূত হইয়াছে বলিয়াই প্রমাণ করিতেছে। এ সকল বিষ দূরীকরণে উদাসীনতা বা অবহেলা প্রদর্শন করিলে কালে যে উহা মৃত্যুরই কারণ হইবে, লোককে কুসংস্কার ও কুপ্রথার দাস করিয়া স্বাধীন ধর্ম্মজীবনের গতিকে একেবারে রুদ্ধ করিয়া ফেলিবে, তাহা আর বলিতে হইবে না। সুতরাং এদিকে চিন্তাশীল সমাজ-হিতৈষিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা সময় থাকিতেই সাবধান হই—এ সকল আবর্জ্জনারাশি দূরীকরণে বদ্ধপরিকর হই। এখনও অধিক প্রবল হয় নাই বলিয়া যেন উপেক্ষা না করি। শত্রুর সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া যেন উহাকে প্রবলতর হইবার সুযোগ না দেই। মঙ্গলবিধাতা আমাদিগকে সে বল ও বুদ্ধি প্রদান করুন।

মহাবাক্য।*

সাধারণ রীতি এই, উপাসনান্তে, এমন কি, পাঠ ও উপদেশাদির পরও, কোন মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়া পবিত্র কার্য্য সমাপন করিতে হয়। সকল শ্রেণীর সাধকদের মধ্যেই এই রীতি রক্ষিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মসমাজেও এই রীতি রক্ষিত হইবার ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে। ইহাদ্বারা সে সময়ের ভাব ও অবস্থাও কিছু ব্যক্ত হয়। ব্রাহ্মসমাজের মহাবাক্য তিনটি। তাহার প্রথমটি ব্রাহ্মসমাজের প্রথমাবধি ব্যবহৃত হইতেছে; সেটি "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" এটি রাজা ও মহর্ষি বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত করিতেন; এখনও এর ব্যবহার আছে। এটির দ্বারা সে সময়ের প্রধান তিনটি ভাব ব্যক্ত হইয়াছে,—বহু ঈশ্বর বা দেবদেবীবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। এটি রাজার বিশেষ ভাব। তৎপরে দ্বিতীয় ভাবে প্রতিমাপূজা খণ্ডিত হইয়াছে। পৌত্তলিকতা দেশমধ্যে প্রবল ভাবে প্রচলিত ছিল; ইহা দূর করিবার জন্য এবং বেদান্তের অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের জন্য নূতন অর্থের সহিত এই মহাবাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা মহর্ষির বিশেষ ভাব। এ সব কথা তিনি আত্মচরিতে প্রকাশও করিয়াছেন—পৌত্তলিকতা ও অদ্বৈতবাদ এ দুইকেই বর্জ্জন করিতে হইবে। এক মহাবাক্য উচ্চারণদ্বারা মহাকার্য্য সাধন করিয়াছেন।

তৎপরে দ্বিতীয় মহাবাক্য "সত্যমেব জয়তে।" এই বাক্যটি ব্রহ্মানন্দ বিশেষ ভাবে উচ্চারণ করিতেন। উপাসনান্তে, পাঠ ব্যাখ্যায়, উপদেশের পরেও করিতেনই, এমন কি বিশেষ স্থলে দেখা গিয়াছে নামসই করিবার স্থানেও এই মহাবাক্য ব্যবহার করিতেন। তাঁহার মধ্যে যে নূতন ভাব আসিয়াছিল তাহাকে সত্য বলিয়া জানিতেন এবং তাহার জয় নিশ্চিত, ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বজনীন ধর্ম্ম, ইহা বিশেষ কোন জাতিতে বা দেশে আবদ্ধ থাকিবে না, ইহা বিশ্বসংসারকে জয় করিবে, এই ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য সংক্ষেপে এই মহাবাক্য উপাসনান্তে ব্যবহার করিতেন। ইঁহারা ক্ষমতাশালী পুরুষ, ইঁহাদের ভাব স্বতন্ত্র; তাই ইঁহারা বিশেষ ভাবে এই মহাবাক্যগুলি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

তৎপরে বিশেষ মহাবাক্য বা নূতন মহাবাক্য "ব্রহ্মকৃপাহি-কেবলম্।" ইহার ব্যবহার সাধারণ সাধকদের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত দেখা যায়। ইহাদের অসাধারণ ক্ষমতা নাই। কিন্তু ইঁহারা ব্রহ্মকৃপায় বিশ্বাসী; তাই ইঁহাদের মধ্যে এই বাক্য বিশেষ ভাবে উচ্চারিত হয়। ইঁহারা আপনাদের সাধন এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়া সমাপ্ত করেন। এই মহাবাক্যটি মহর্ষির মধ্যে ঈশ্বরের প্রেরণায় ফুটিয়াছে; ভক্তিধর্ম্মের এটি প্রাণ। কিন্তু মহর্ষি নিজে সাধনান্তে, উপদেশাদির অন্তে, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্যবহার করিতেন। এখনও আদি ব্রাহ্মসমাজ এই মহাবাক্য উচ্চারণ দ্বারা পবিত্র কার্য্য শেষ করেন; তবে আর দুটি বাক্য যে উচ্চারণ করেন না তাহা নহে। কিন্তু মুখ্যরূপে যেন এই বাক্যটি উচ্চারিত হয়। তেমনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে, যাহা এখন শুধু নামান্তরে নয়, কিছু ভাবান্তরে, মতান্তরে পরিণত হইয়া 'নববিধান সমাজ' নামে খ্যাত, সেখানেও দেখা যায় "সত্যমেব জয়তে" মূলবাক্য; তবে অপর দুটি মহাবাক্যও ব্যবহৃত হয়।

এখন কেহ কেহ ঐ মূল মহাবাক্য ব্যবহার না করিয়া সাধারণ সাধকের মহা-আশাবাক্য "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্" উচ্চারণ করিয়া থাকেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এই মহাবাক্যই যেন মহাবলম্বন বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, এরূপ বোধ হয়। দুর্ব্বলের জয়ের আশা এই মহাবাক্যের উপর নির্ভর করে, তাই তাঁহারা

* শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাসের অপ্রকাশিত প্রবন্ধাবলী হইতে।

প্রায় সকল সময়েই পবিত্র কার্য্য সমাপনান্তে এই মহাবাক্য উচ্চারণ করেন। ইঁহারা অন্য দুটি বাক্যও উচ্চারণ করিয়া থাকেন; কিন্তু যে মহা উদ্দেশ্য ক্ষমতাশালী সাধকের নিকট ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই এই মহাবাক্যদ্বারা দুর্ব্বল কৃপাবিশ্বাসী সাধকদের নিকট ব্যক্ত হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ এখানে, বল এখানে, আশ্চর্য্য কার্য্য এখানে। ইঁহারা যে আপনাদের বিশ্বাসের জয় দেখিতেছেন, তাহা এই কৃপাবিশ্বাসী হইয়া। ইঁহাদের মধ্যে তেমন ক্ষমতাশালী পুরুষ নাই, কিন্তু ক্ষমতাশালী ব্রহ্মের আশ্চর্য্য কার্য্য আছে।

মহাবাক্যগুলিকে, সাধক, বিশেষ ভাবে ধর এবং জগতের নিকট উচ্চারণ কর। মহাবাক্য প্রত্যেক জীবনে মহাকার্য্য সাধন করিবে।

ভারতীয় ধর্ম্মে উপাসনার উৎপত্তি ও বিকাশ।

(২)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এখন বৈদিক ও বৈদান্তিক যুগ ছাড়িয়া সূত্র ও বৌদ্ধযুগে আসা যাক্। এ' পর্য্যন্ত বৈদিক যাগযজ্ঞ ও বৈদান্তিক ব্রহ্মোপাসনা এই দুই প্রকার পূজাপদ্ধতি আমরা পাইতেছি। পরবর্ত্তী সময়ের প্রতিমা-পূজার চিহ্নমাত্র আমরা এ' পর্য্যন্ত পাইতেছিনা। কেবল বৈদিক গ্রন্থ নহে, মহাভারত, মনুসংহিতা প্রভৃতি পরবর্ত্তী গ্রন্থেও আমরা প্রতিমাপূজার বিধি পাই না। প্রতিমাপূজা তবে কোথা হইতে আসিল? কখন আসিল? এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তরে কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ বলেন, প্রতিমাপূজা বৌদ্ধেরাই প্রথমে প্রচলিত করেন, বৌদ্ধযুগেই ইহার উৎপত্তি, অন্ততঃ বৈদিক আর্য্যসমাজে ইহার প্রবেশ। বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বিগণ বৌদ্ধদের হইতেই মূর্ত্তিপূজার অনুকরণ করেন। কোন কোন কল্পসূত্রে দেবমূর্ত্তির সামান্য উল্লেখ দেখা যায়। কল্পসূত্র গ্রন্থগুলির অন্ততঃ কোন কোনটা বৌদ্ধযুগে রচিত। সম্ভব এই যে, যজ্ঞ ও ব্রহ্মোপাসনা-ত্যাগী বৌদ্ধগণ তাঁহাদের অবলম্বিত ধ্যানপ্রধান সাধন সাধারণ লোকদিগের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচনা করিয়া তাহাদের জন্য দ্রাবিড় ও মঙ্গলীয় জাতির মধ্যে প্রচলিত মূর্ত্তিপূজার ব্যবস্থা করেন এবং ক্রমশঃ বৈদিক আর্য্যগণ সাধারণ লোককে সমাজে রাখিবার জন্য চিন্তাহীন লোকদিগের চিত্ত-আকর্ষণকারী এই পূজাপদ্ধতির অনুকরণ করেন।

মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত হইবার পরেও অনেক দিন পর্য্যন্ত যে উচ্চশ্রেণীর আর্য্যগণ এই পূজাপদ্ধতি পসন্দ করিতেন না, ইহাকে কেবল অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর লোকদের জন্যই উপযোগী মনে করিতেন, তাহার কিছু কিছু চিহ্ন পাওয়া যায়। মনুসংহিতাকার যে একজন খুব রক্ষণশীল লেখক তাহা আপনারা জানেন। আর্য্যগৌরব রক্ষার জন্য তিনি বিশেষ প্রয়াসী। আর্য্যসমাজের বশীভূত অনার্য্য শূদ্র এবং স্বাধীন অনার্য্য জাতির উপরও তাঁহার দারুণ অবজ্ঞা। তাঁহার গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই তিনি কুত্রাপি মূর্ত্তিপূজার বিধি দেন নাই। কিন্তু ইহাও বোঝা যায় যে, তাঁহার সময়ে মূর্ত্তিপূজা ধীরে ধীরে বৈদিক আর্য্যসমাজে প্রবেশ করিতেছিল। প্রবেশ করিতেছিল, অথচ উচ্চশ্রেণীর আর্য্যগণ তাহা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেছিলেন। মনু যে সকল শ্রেণীর লোককে যজ্ঞস্থলে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন তন্মধ্যে একশ্রেণী "দেবল ব্রাহ্মণ" অর্থাৎ প্রতিমা-পূজক ব্রাহ্মণ। প্রতিমা-রক্ষক ব্রাহ্মণ—'পূজারী বামুণ'—এখনও অনেক পরিমাণে অবজ্ঞার পাত্র। প্রতিমা পূজা যদি আর্য্যধর্ম্মের অঙ্গীভূতই হইবে তবে মনু দেবল ব্রাহ্মণকে কেন যজ্ঞস্থলে যাইবার অনুপযুক্ত মনে করেন এবং এখন পর্য্যন্ত পূজারী বামণ কেন অবজ্ঞার পাত্র? প্রাচীনতম পুরাণগুলিতে পর্য্যন্ত,—যেমন বিষ্ণুপুরাণে—মূর্ত্তিপূজার ব্যবস্থা নাই,—মূর্ত্তির উল্লেখমাত্রও নাই। আর যে সকল পুরাণে ইহার ব্যবস্থা আছে—নিম্নাধিকারীর জন্য—সে সকল পুরাণেও ইহার প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করা হইয়াছে। যেমন ভাগবত পুরাণ—যাহা প্রত্নতত্ত্ববিৎদের মতে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দির লেখা—মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে ভগবৎমুখে বলিতেছেন,—

> অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
> তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্॥
> যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
> হিত্বার্চ্চাং ভবতে মৌঢ্যাদ্ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥

অর্থাৎ "আমি সকল প্রাণীর আত্মারূপে সকল প্রাণীতে সর্ব্বদা অবস্থিত আছি। মানুষ আমার এই আত্মারূপকে অবজ্ঞা করিয়া মূর্ত্তিপূজারূপ বিড়ম্বনা প্রাপ্ত হয়। সকল প্রাণীতে আত্মারূপে বর্ত্তমান ঈশ্বর যে আমি, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যে মূঢ়তাবশতঃ মূর্ত্তিপূজা করে সে কেবল ভস্মে ঘৃতাহুতি দেয়।"

ফলতঃ মানুষের নিজের গড়া মূর্ত্তির সম্মুখে মাথা হেঁট করা যে অতিশয় বালকোচিত ও নিন্দনীয় ব্যাপার তাহা প্রাচীন আর্য্যগণ বিশেষরূপেই বুঝিতেন। দেবপূজা এক জিনিস, মূর্ত্তিপূজা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। প্রকৃতিতে ক্রিয়াবতী শক্তির পূজা করা যে আদিম মানবের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর্য্যগণ সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া সেরূপ স্বাভাবিক পূজায়ই সন্তুষ্ট ছিলেন; নিজহস্তে নিজ উপাস্য দেবতা গড়ারূপ হীন কৃত্রিম পূজার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। চারি দিকে অনার্য্যজাতিকে মূর্ত্তিপূজা করিতে দেখিয়াও তাঁহারা ইহার অনুকরণ করেন নাই। কেবল যখন দেখা গেল নাস্তিক বৌদ্ধেরা বুদ্ধ, গোপা ও বোধিসত্ত্ব-দিগের মূর্ত্তির পূজা প্রবর্ত্তিত করিয়া সহস্র সহস্র নিম্নশ্রেণীর লোককে তাহাদের দলে আকর্ষণ করিতেছে, আর্য্যসমাজ বৌদ্ধপ্লাবনে ডুবিয়া যাইতেছে, তখনই নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে ব্রাহ্মণ্য সমাজে রাখিবার জন্য অথবা যাহারা সে সমাজ ছাড়িয়া গিয়াছে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য আর্য্যধর্ম্মের পুনরুত্থানকারিগণ —revivalists—আর্য্যধর্ম্মে মূর্ত্তিপূজার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা হিন্দুর প্রকৃতশাস্ত্র বেদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ—কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড উভয়েরই বিরুদ্ধ। ইহা Hindu orthodoxy নহে, Hindu heterodoxy. Hindu orthodox কেবল কর্ম্ম-কাণ্ডবিহিত যাগযজ্ঞ এবং জ্ঞানকাণ্ডবিহিত ব্রহ্মোপাসনা। মূর্ত্তিপূজকগণ orthodox (সুগবিশ্বাসী) হিন্দু নহেন, বৌদ্ধ জৈনদের মতন heterodox (বিশ্বাসভ্রষ্ট) হিন্দু। হিন্দুনামধারী সকলেই এখন মূর্ত্তি-পূজক, সুতরাং ইহাদের কেহই orthodox

হিন্দুনামের উপযুক্ত নহেন। যদি orthodox হিন্দু এখন কেহ থাকেন, তবে তাঁহারা উপনিষদ্-বিহিত ব্রহ্মোপাসনাকারী ব্রাহ্মগণ।

যাহা হউক্, মূর্ত্তিপূজা যেমন বেদবিরুদ্ধ এবং বৌদ্ধপ্রভাবের ফল, অবতারবাদও তেমনি বেদবিরুদ্ধ ও বৌদ্ধপ্রভাবের ফল। কোনও বৈদিক গ্রন্থে অবতারবাদ নাই এবং বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্বে কোন ব্যক্তিবিশেষকে আর্য্যগণ ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করেন নাই। পুরাণোক্ত সমস্ত অবতারই বুদ্ধের পরবর্ত্তী সময়ে কল্পিত। জীব ও ব্রহ্মের মৌলিক একত্ব বা ভেদাভেদ উপনিষদের সর্ব্বত্রই উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই শাস্ত্রীয় অবতারবাদ বা ভেদাভেদ হইতে চলিত অবতারবাদ আসে নাই। যে নিজ আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করে সে কখনও মহাপুরুষের শরীর পূজায় বা বিশেষভাবে তাঁহার লীলা-চিন্তনে প্রবৃত্ত হয় না। যাহাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে নাই অথবা খুলিয়াও বন্ধ হইয়া গিয়াছে তাহারাই বাহিরে অবতার অন্বেষণ করে এবং অবতার পাইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস হইলে তার পশ্চাৎ ধাবিত হয়। প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মে শাস্ত্র এবং আচার্য্যের উপদেশই ধর্ম্মশিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট সহায় বলিয়া বিবেচিত হইত। সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া আর্য্যগণ ধর্ম্মসাধনে কোন মানবীয় কেন্দ্রের আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। আবশ্যকতা বোধ করিলেন প্রথমে বৌদ্ধগণ। তাঁরা ত করিবেনই। কারণ, তাঁরা দেবতাও মানিতেন না, ঈশ্বরও মানিতেন না। তাঁদের অবলম্বন হইলেন স্বয়ং বুদ্ধ। বুদ্ধজীবনের আকর্ষণ সহস্র সহস্র লোককে বৌদ্ধ সমাজে আনিতে লাগিল। বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যদের সম্বন্ধে ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিলেন। কেবল তাহাই নহে। তাঁহার অসংখ্য পূর্ব্বজন্ম ও সেই সেই জন্মের কীর্ত্তি কল্পিত হইতে লাগিল। এই হইল অবতারবাদের মূল। বৈদিক আর্য্যেরা দেখিলেন আর্য্য-সমাজকে রক্ষা করিতে গেলে, বৌদ্ধপ্লাবন প্রতিরোধ করিতে হইলে, আর কেবল শাস্ত্রে চলিবে না, তাঁদেরও একটি বা কয়েকটি অবতার চাই। এই অভিসন্ধি হইতেই পৌরাণিক অবতারবাদ কল্পিত হইল। প্রাচীন যোদ্ধা ও ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ, যাঁহারা পূর্ব্বাবধিই লোকের শ্রদ্ধাপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছিলেন, হয়ত স্থানে স্থানে দেবতারূপে পূজিতও হইতেছিলেন, তাঁহারা ঈশ্বরের অবতাররূপে বর্ণিত হইতে লাগিলেন। কবিকল্পনা নব নব অবতার সৃষ্টি করিল এবং প্রাচীন মহাপুরুষদের নামে অসংখ্য কাহিনী রচনা করিল। এই কবিত্বের জাল যাঁহারা বিস্তার করিলেন, ক্রমশঃ তাঁহারা নিজেরাই সেই জালে ধরা পড়িলেন; উপনিষদের জ্ঞানমূলক ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইল, সমগ্র দেশ পৌত্তলিকতা ও অবতারবাদের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল।

পরবর্ত্তী সময়ের ইতিহাস আমি আর বিশেষ ভাবে বলিব না, তাহা আপনাদের অনেকেরই জানা আছে। বিশেষতঃ এই দেশব্যাপী প্রতিমাপূজা ও অবতারবাদ বর্জ্জনপূর্ব্বক কি রূপে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় উপনিষৎপ্রতিপাদিত ব্রহ্মোপাসনাকে পুনর্জ্জীবিত করেন, কিরূপে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মবাদকে মধ্যসময়ের শাস্ত্রান্ধতারূপ নিগড় হইতে মুক্ত করেন এবং কিরূপেই বা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদকে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার গণ্ডী হইতে মুক্ত করিয়া সার্ব্বভৌমিক আকার প্রদান করেন এবং আমাদের সাধুভক্তিকে বিশ্বব্যাপিনী করেন, এই পুণ্যকাহিনী ক্ষুদ্র বৃহৎ সমুদয় ব্রাহ্মমণ্ডলীতেই পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু এখনও যে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে কুতর্কের জাল ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা বোধ হয় না। যেমন মধ্যযুগে,—মূর্ত্তিপূজা ও অবতারবাদের প্রাদুর্ভাব সময়ে—ভ্রান্ত দার্শনিক যুক্তিদ্বারা এই সকল ভ্রম সমর্থিত হইত, দেখিতেছি বর্ত্তমান সময়েও স্থানে স্থানে ভ্রান্ত দর্শন ও রুচিবিজ্ঞানের নামে এই সকল মত সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে সমর্থিত হইতেছে। এরূপ সমর্থনের অসারতা প্রদর্শন করিতে হইলে সুদীর্ঘ দার্শনিক বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হয়। সেরূপ দীর্ঘ সমালোচনা আপনাদের প্রীতিকর হইবে না বিবেচনা করিয়া আমি যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত আকারে এই বিষয় কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। মধ্য যুগের যে সকল গ্রন্থে ভক্তিসাধনের নামে সাকারবাদ, মূর্ত্তিপূজা ও অবতারবাদ সমর্থিত হইয়াছে, দেখা যায় সেই সকল গ্রন্থ বহুলরূপে সাংখ্যদর্শনের দ্বারা প্রভাবিত। ঐ সকল গ্রন্থলেখক সাংখ্যমত খণ্ডন করিতে না পারিয়া উহা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহাকে বেদান্তমতের সহিত মিশ্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিশুদ্ধ বৈদান্তিক মত—যাহা উপনিষদের ঋষিদের অনুমোদিত—তাহা এই সকল গ্রন্থে সাংখ্যপ্রভাবে আচ্ছন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। সাংখ্যদর্শন প্রকৃতি ও পুরুষে একান্ত ভেদ করেন। এই মতে প্রকৃতিই সমুদায় কার্য্যের কর্ত্রী, পুরুষ নিষ্ক্রিয় সাক্ষীমাত্র। পঞ্চভূত, স্থূল শরীর, মনবুদ্ধি এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীর, এবং কারণ-শরীর অর্থাৎ প্রকৃতির সেই অংশ যাহা আমাদের ব্যক্তিত্বের মূল, এই সমস্তই প্রকৃতির কার্য্য। আমাদের দর্শন শ্রবণাদি এবং ব্যক্তিগত জ্ঞান প্রেম ইচ্ছাদি সমস্ত আধ্যাত্মিক ব্যাপারও প্রকৃতিরই কার্য্য। পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতি এই সকল অসংখ্য রূপ ধারণ করিতেছে। পুরুষের স্বরূপ এই সমুদায়ের অতীত, তাহা নির্বিষয় চৈতন্যমাত্র; প্রেম, ভক্তি, ইচ্ছা, সঙ্কল্প প্রভৃতি সমন্বিত বিচিত্র ব্যাবহারিক জ্ঞানের সঙ্গে উহার কোন সাদৃশ্য নাই। কল্পিত প্রকৃতিসংস্রব হইতে মুক্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থিত হওয়াই পুরুষের মুক্তি। বিশুদ্ধ সাংখ্যমতে পুরুষ বহু, কিন্তু তাহাদের মূল স্বরূপ একই প্রকার। সাংখ্যপ্রভাবিত বেদান্তমতে পুরুষ মূলে এক, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ ঐ সাংখ্যবর্ণিত নির্গুণ ভাব—নির্বিষয় জ্ঞান,—সুতরাং মোক্ষের লক্ষণ সম্বন্ধে দুই মতে কোন মৌলিক প্রভেদ নাই। সাংখ্যমতে প্রকৃতি পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র। সাংখ্যপ্রভাবিত বেদান্তমতে প্রকৃতি ব্রহ্মাশ্রিত মায়া বা অবিদ্যা। ইহাকে ব্রহ্মের শক্তি বলা যায় না, কারণ ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, অথচ ইহাকে ব্রহ্মাতিরিক্তও বলা যায় না, কারণ উপনিষদ্ মতে ব্রহ্মের অতিরিক্ত কিছু থাকিতে পারে না। ফলতঃ এই সাংখ্য-প্রভাবিত বেদান্তমত উপনিষদের ব্রহ্মবাদ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে না পারিয়া এক প্রকার দ্বৈতবাদে পরিণত হইয়াছে। কারণ উপনিষদ্ মতে ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি নিষ্ক্রিয় নহেন, কিন্তু এই সাংখ্যপ্রভাবিত বেদান্তমতে মায়াই জগৎকর্ত্রী। যাহা হউক্, ভক্তি সম্বন্ধে এই কৃত্রিম বেদান্তমতের শিক্ষা দেখুন্। প্রকৃতি বা মায়ার কর্ত্তৃত্বে যেমন আমাদের মত ক্ষুদ্র জীব উৎপন্ন

হইয়াছে তেমনি ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি ঈশ্বরগণও উৎপন্ন হইয়াছেন। এই ঈশ্বরগণের মধ্যে কে প্রধান এবং পরমেশ্বর নামের উপযুক্ত সেই বিষয়ে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণববাদি সাম্প্রদায়িক সাধকগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণব পুরাণমতে সত্ত্বগুণপ্রধান বিষ্ণুই পরমেশ্বর এবং পরাভক্তির পাত্র। বিষ্ণু যে সাকার তাহা ত স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, কারণ এই মতে উৎপন্ন বস্তু এবং ব্যক্তিমাত্রই সাকার। আর ভক্তি সাধন করিতে হইলে সাকারেই ভক্তি করিতে হইবে, কেন না নির্গুণ, অচিন্ত্য, অপরিচ্ছেন্ন পরব্রহ্ম কিরূপে ভক্তির পাত্র হইবেন? পরব্রহ্ম কেবল নির্বিষয় ভাবশূন্য জ্ঞানের গোচর। সাকার ঈশ্বরোপাসনাদ্বারা চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া, এবং অদ্বৈতজ্ঞান-দ্বারা জীবাত্মা-পরমাত্মার দ্বৈতবোধরূপ ভ্রম হইতে মুক্ত হইয়া পরব্রহ্মে লীন হইতে হইবে। এই লয়ই মোক্ষ। এই মোক্ষ কেবল শঙ্করপ্রমুখ জ্ঞানপন্থীদের লক্ষ্য নহে, ভাগবতকার প্রভৃতি ভক্তিপথাবলম্বীদেরও লক্ষ্য।

এই সাংখ্যপ্রভাবিত বেদান্তমত বিচারাস্ত্রদ্বারা খণ্ডন করিতে না পারিলে শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে পৌত্তলিকতা ও অবতারবাদের অনুসরণ হইতে নিবৃত্ত করা অসম্ভব। কিন্তু দেশীয় দার্শনিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে আমি ইহার সর্বাঙ্গীন খণ্ডন কুত্রাপি দেখিতে পাই না। খণ্ডনের বীজ উপনিষৎ শাস্ত্রেই রহিয়াছে, কিন্তু সেই বীজ কোন বিচারগ্রন্থে প্রস্ফুটিত হইয়াছে বলিয়া জানি না। এই বিষয়ে আমি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ, বিশেষতঃ হেগেল-প্রমুখ জ্ঞানবাদিগণের (Idealist) নিকট বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি এবং আমার চিন্তালব্ধ খণ্ডন আমার প্রণীত ইংরেজি ও বাঙ্গালা "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা", "The Vedanta and its Relation to Modern Thought," "The Philosophy of Brahmoism" প্রভৃতি দার্শনিক গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছি। বিচারে দেখা যায় বিষয়-বিষয়ী, প্রকৃতি-পুরুষ, এই ভেদ একান্ত ভেদ নহে, এই ভেদের ভিতর অভেদ বর্ত্তমান। বিষয়ছাড়া বিষয়ী, এবং বিষয়ী-ছাড়া বিষয় থাকিতে পারে না। বিষয়বিষয়ী ভেদ আত্মারই কৃত, আত্মাই দেশ ও দেশাতীত, কাল ও কালাতীত, সসীম ও অসীম, এক ও বহু এই সমস্ত ভেদ করে এবং আত্মাই এই সব ভেদের আশ্রয়। জগতের বিচিত্রতা অচেতন প্রকৃতিরও কার্য্য নহে, মায়া বা অবিদ্যারও কার্য্য নহে, এক অনন্ত জ্ঞানময় প্রেমময় ইচ্ছাময় ভগবানেরই কার্য্য। জীব তাঁহার আশ্রিত, তাঁহার চৈতন্যে সচেতন, অথচ সসীমরূপে তাঁহা হইতে ভেদযুক্ত। এই ভেদ অনপনেয়, ইহা ব্রহ্মস্বরূপের অন্তর্ভূত। জীব যতই জ্ঞানী হউক, শক্তিশালী হউক, সে কখনও অনন্তের সমান হইবে না এবং অনন্তে লীন হইবে না, সর্ব্বদাই অনন্তের জ্ঞাতা, ভক্ত ও সেবক থাকিবে। আমি আমার বেদান্ত সম্বন্ধীয় গ্রন্থে দেখাইয়াছি যে, বেদান্তসূত্রকার মূলে এই মতাবলম্বী, কিন্তু শঙ্করের অভেদবাদিনী ব্যাখ্যা সূত্রকারের ভেদাভেদবাদকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। চলিত মতের মূল ভ্রম অভেদ-ন্যায় (The logic of abstract identity or of exclusion.) কোন দুটী তত্ত্ব—যেমন বিষয়-বিষয়ী, সসীম-অসীম, সৃষ্ট-স্রষ্টা,—ভিন্ন করিয়া দেখিলেই সহসা বোধ হয় ইহারা পরস্পর হইতে পৃথক্, পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে। ইংরেজি কথায় বলিতে গেলে distinction কে division বা separation বলিয়া ভ্রম হয়। সূক্ষ্মতর দৃষ্টিতে distinction এর মূলে relation, ভেদের মূলে সম্বন্ধ, দেখা যায়। এই সম্বন্ধ ভেদও বটে অভেদও বটে, ইহা ভেদাভেদ, ইহা দ্বৈতাদ্বৈত, unity-in-difference. এই ভেদাভেদ ন্যায় (logic of comprehension or identity-in-difference) অবলম্বন করিলেই প্রচলিত দ্বৈত-বাদ ও অদ্বৈতবাদের কল্পনা (abstraction) হইতে মুক্ত হইয়া সম্বন্ধবাদে উপনীত হইতে হয়। তখন ভক্তির প্রকৃত ভিত্তি দেখা যায়। তখন দেখা যায় পরাভক্তির পাত্র কল্পিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব নহেন, কোন সসীম ব্যক্তি নহেন, সমুদয় ভেদ ও বিচিত্রতার আশ্রয় অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মই পরাভক্তির একমাত্র আস্পদ। তিনি দূরে নহেন, তিনি "একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা", তিনি সকলের ভিতরে অথচ সকলের বাহিরে "তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ", তাঁহার উপাসনার জন্য কোন মূর্ত্তিরূপ অবলম্বনের প্রয়োজন নাই। (ক্রমশঃ)

স্বর্গীয়া মোক্ষদায়িনী রক্ষিত।*

আমাদের স্বর্গগতা মা বিগত ১১ই অগ্রহায়ণ (১৩২৫ সন) ৬৪ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এই কর্ম্মক্ষেত্রের কঠিন ভূমিতে তিনি যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত যেরূপ অসাধারণ সরলতা, সত্যবাদিতা, পবিত্রতা ও সহিষ্ণুতা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সহিত মিশিবার ও ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার সাধুতা ও সরলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন।

মা ধনী পিতামাতার বড় আদরের কন্যা ছিলেন। তিনি সাত বৎসর বয়সে বিবাহিতা হইয়াছিলেন এবং দরিদ্র শ্বশুরের গৃহে আসিয়া দরিদ্রতাকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, বালিকা বয়সে তিনি যখন শ্বশুরগৃহে আসিলেন, তখন হইতেই নিজের সরল ও নম্র ব্যবহারে সকলকে মুগ্ধ করিলেন। কোনও দিনই তাঁহার ব্যবহারে ধনগর্ব্ব বা সুখস্পৃহার চিহ্নমাত্র লক্ষিত হইত না।

মার যখন ১৬ বৎসর বয়স, তখন বাবা প্রকাশ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইহাতে আত্মীয়গণের মধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া যায়। তদবধি বাবা গয়ায় গিয়া বাস করেন; সেই সময়ে সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কেবল মা অতি শান্তভাবে শ্বশুর শাশুড়ীর আদর যত্ন, পিতা মাতার ঐশ্বর্য্য ও স্নেহের কোল উপেক্ষা করিয়া বাবার অনুগামিনী হইয়াছিলেন।

বাবা পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন বলিয়া সংসারের ভার তাঁর উপরেই ছিল এবং ব্রাহ্ম হইবার পরেও হিন্দু আত্মীয়গণ ক্রমে ক্রমে তাঁর পরিবারভুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি অসাধু উপায়ে অর্থোপার্জ্জনকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন এবং যাহা উপার্জ্জন করিতেন তারও অধিকাংশ পরোপকারে ব্যয় করিতেন বলিয়া আমাদের

* শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার দ্বিতীয়াকন্যা শ্রীমতী সুকৃতিবালা চৌধুরী-দ্বারা পঠিত।

সুবৃহৎ সংসারে অনেক সময়ে অর্থের অভাব হইত; কিন্তু আমাদের ধর্ম্মশীলা মা পরিবারস্থ কাহাকেও সে অভাব জানিতে দিতেন না; অতি গোপনে নিজ অলঙ্কার বন্ধক দিয়া অর্থাভাব দূর করিতেন। এমন যে কতবার হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

আর একটি ঘটনা আমার বেশ মনে আছে,—মা একদা সূতিকাগারে ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে জনৈকা প্রতিবেশিনী তিন-দিনের শিশু কন্যা রাখিয়া কলেরা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। মা তাহা শুনিয়া প্রতিদিন পাল্কি চড়িয়া শিশুটিকে দুগ্ধপান করাইয়া আসিতেন। ইহাতে আমার পিতামহী ভীতা হইয়া বলিলেন,—'মা, তুমি এ কি কর? পরের ছেলে বাঁচাতে গিয়া, নিজের ছেলে হারাবে যে'! মা অতি শান্ত স্বরে বলিলেন, 'না মা, যিনি জীবন দিয়াছেন তিনিই রক্ষা করিবেন।' তাঁহার নিস্বার্থতার আর একটি দৃষ্টান্ত এই,—এক দিন কোন প্রতিবেশিনী ভৃত্যাভাবে গাভীর খাদ্য আনিতে না পারাতে তাঁহার গাভীটি সমস্ত দিন উপবাসী ছিল। সন্ধ্যার সময় মা আর এই দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া একাকী রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন এবং কতক খড় কিনিয়া একটি মুটিয়ার মাথায় দিয়া প্রতিবেশিনীর বাড়ীতে পঁহুছাইয়া দিলেন।

মার সমস্ত জীবনটি এই রকম সরল, আড়ম্বরশূন্য ধর্ম্মভাবে পূর্ণ ছিল। তাঁর এই সরল শান্তস্বভাবের ভিতর যে কি তেজস্বী আত্মা বাস করিত, তাহা আমাদের পিতার মৃত্যুর পর বুঝিতে পারা গেল। পিতার মৃত্যু সময়ে আমার মাতামহ ও মাতুলগণ আসিয়া বলিলেন যে, "ইঁহার ধর্ম্মান্তর গ্রহণজনিত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কর, আমরা সৎকার করিব।" মা সেই দারুণ শোকের সময়ে অতি স্থির ও দৃঢ় ভাবে বলিলেন, "তিনি ত ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ অপরাধ বলিয়া মনে করেন নাই, আমিও করি নাই; তবে এমন পুণ্যবান্ লোকের জন্য প্রায়শ্চিত্তের কি প্রয়োজন? তাঁর ধর্ম্ম-বন্ধুরাই তাঁর সৎকার করিবেন।"

এইরূপে আমাদের ১১টি ছোট ছোট ভাই বোনকে রাখিয়া বাবা পরলোকে চলিয়া গেলেন। আমাদের মাতামহ মহাশয় মাকে বলিলেন, "তোমার কন্যাগুলির হিন্দুসমাজে বিবাহ দিয়া তোমাকে আমার কাছে লইয়া যাই।" কিন্তু মা অবিচলিত ভাবে বলিলেন, "তাঁর বড় ইচ্ছা ছিল কন্যাগুলির ব্রাহ্মসমাজে বিবাহ হয়; আমি তাঁর ইচ্ছার বিপরীতে কাজ করিতে পারিব না।" তাঁহার এই কথায় মাতামহ কন্যার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং মাকে আর কোন রকম সাহায্য করিলেন না।

আমাদের মা সেই সময়ে পিতা ও ভ্রাতাদিগের সাহায্য হইতে সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত হইয়া অশেষ কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া আমাদিগকে প্রতিপালন করেন, ব্রাহ্মসমাজে শিক্ষাদান ও বিবাহ দেন এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সকল সুখ স্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করিয়া শান্ত ভাবে জীবন যাপন করেন।

আমাদিগের তিনটি ভাই ক্রমে ক্রমে হিন্দুসমাজে বিবাহ করেন। ইহাতে মার শেষজীবন বড়ই কষ্টকর হইয়াছিল; কিন্তু তিনি অশেষ সহিষ্ণুতার সহিত সব কষ্ট সহিয়াছেন। কোনও দিনই তাঁহার সরল শান্তিস্নিগ্ধ, স্নেহসিক্ত হৃদয়টি কঠোর হয় নাই। কত দুঃখ যন্ত্রণায় হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল, কতই ঝড় তুফান মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সব সময়েই তাঁর সরল মুখ খানি অম্লান দেখিয়াছি। শারীরিক রোগ, শোক, দরিদ্রতা এবং নানা মানসিক অশান্তি, কিছুতেই মার শান্ত, সরল মনটিকে বিচলিত করিতে পারে নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই—মৃত্যুও তাঁর কাছে তেমনি শান্ত ও সরল ভাবে আসিল। মায়ের মহাযাত্রার দুই মাস পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার সমস্ত রোগ দূর হইয়াছিল। তিনি সুস্থ লোকের মত নিজের সব কাজ নিজে করিতেন। উপাসনার সময় প্রতিদিন বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবদ্গীতা পাঠ করিতেন। অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া স্তোত্র পাঠ করিতেন; ইহাতে সকলেই মনে করিয়াছিল যে, তিনি আবার পূর্ব্বের ন্যায় সংসারে মন দিবেন। কিন্তু তাহা হইল না, সকল মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া মৃত্যুর দিন প্রাতে কথা বলিতে বলিতে যেন ঘুমাইয়া পড়িলেন। ইহা মৃত্যু, কিম্বা দুর্ব্বলতাজনিত নিদ্রা তাহা সহজে কেহ বুঝিতে পারে নাই।

এইরূপে আমাদের মা আমাদের সম্মুখে তাঁহার আদর্শ পবিত্র জীবনটি রাখিয়া শান্তিতে পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। মনে হইতেছে, তাঁহার জীবন যেন অনন্ত গুণের আধার হইয়া আমাদের সম্মুখে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

প্রাপ্ত।

সম্বন্ধবাদ।

(প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর)

গত ১লা শ্রাবণের তত্ত্বকৌমুদীতে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় মহাশয় আমার ব্রাহ্মসমাজে 'আধ্যাত্মিক-প্রভাব' বক্তৃতার দ্বিতীয় প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এবারের চিঠিখানি পাঠ করিয়াও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। আমার ধারণা, তিনি আমার বক্তৃতাটি মনোযোগ সহকারে পাঠ না করিয়াই প্রতিবাদ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যে কারণে আমার এই ধারণা হইয়াছে, তাহা এই;—আমি বক্তৃতায় বলিয়াছিলাম, "জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার মন ব্যাপ্ত হইবে, কর্ম্মের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার শক্তি ব্যাপ্ত হইবে এবং সৌন্দর্য্যবোধের দ্বারা সমস্ত জগতে আমার আনন্দ ব্যাপ্ত হইবে, মনুষ্যত্বের ইহাই লক্ষ্য। অর্থাৎ জগতে জ্ঞানরূপে পাওয়া, শক্তিরূপে পাওয়া ও আনন্দরূপে পাওয়াকেই মানুষ হওয়া বলে।" রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য' নামক পুস্তক হইতে এ কথা আমি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম, তত্ত্বকৌমুদীর ফুট্‌নোটে তাহা লিখিত আছে। অথচ রায় মহাশয় লিখিলেন,—"বিশ্বকে সমগ্ররূপে জানা কিম্বা বিশ্বমানবের ব্যাপ্তিবিষয়ক উক্তিটা যে পণ্ডিত তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের কণ্ঠেরই প্রতিধ্বনি ইহাও কি আবার বলিতে হইবে?" এই কথা বলিয়া তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের "Philosophy of Brahmoism" হইতে তিন ছত্র ইংরাজি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা কি সঙ্গত হইয়াছে? আমি ঐ গ্রন্থের সহিত পরিচিতও নহি। আমি রবীন্দ্রনাথের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি। তিনি কি করিয়া বলিতে পারেন ঐ বাক্য আমি তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের প্রতিধ্বনি রূপে ব্যবহার করিয়াছি? দ্বিতীয়, আমি রামানুজাচার্য্যের নামও আমার বক্তৃতায় উল্লেখ করি নাই, অথচ রায় মহাশয় লিখিলেন,—"ইহার পরে কেহ আর বলিতে পারেন কি ব্রাহ্ম-

সমাজের পূর্ব্বনেতারা রামানুজের ব্যাখ্যাত দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের খবর রাখিতেন না?" রায় মহাশয় এই কথা বলিয়া অক্ষয়কুমার দত্ত ও স্বামী বিবেকানন্দের রামানুজ-মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমি বক্তৃতায় যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা তত্ত্বকৌমুদী হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি;—"বৈষ্ণবগণ অদ্বৈতবাদ হইতে ভক্তিবাদকে রক্ষা করিবার জন্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, ভেদাভেদবাদ প্রভৃতির দ্বারা অদ্বৈতের মধ্যে দ্বৈতকে, অভেদের মধ্যে ভেদকে দেখাইবার চেষ্টা করিলেও অবশেষে মূর্ত্তিপূজা, অবতারের আবর্জ্জনায় পড়িয়া স্বীয় মতের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে পারেন নাই। নিরাকার চিন্ময় শিব-সুন্দরের পূজা অবলম্বন করিতে পারেন নাই।" আমার বক্তৃতার প্রতিবাদ করিতে গিয়া কেন তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের লেখা উদ্ধৃত করিলেন? রামানুজকে আনিলেন? বেদান্তই বা আনিলেন কেন? আমি এবং তত্ত্বভূষণ মহাশয় কি এক ব্যক্তি?

আর একটি কথা লিখিয়া আমার প্রবন্ধের ভূমিকা শেষ করিব। রায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—"কিন্তু তাঁহার (পণ্ডিত তত্ত্বভূষণের) লেখা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহার অধ্যয়নের ফলে যখন তাঁহার জ্ঞানদৃষ্টিটা খুলিয়া গেল, তখন তিনি বুঝিলেন, তাঁহার সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইয়াছে এবং ব্রাহ্মসাধারণকে সেই সিদ্ধির ফলস্বরূপ ভেদাভেদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদে বিশ্বাসের অংশ-ভাগী করিবার জন্য তিনি স্বভাবতঃই ব্যগ্র হইলেন।" এরূপ ভাষাপ্রয়োগ শিষ্টাচারবিরুদ্ধ নয় কি? এরূপ ভাবে না লিখিলে কি রায় মহাশয়ের প্রবন্ধের অঙ্গকান্তি ম্লান হইত?

রায় মহাশয় দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদবাদকে বড়ই অপ্রিয় চক্ষে দর্শন করিয়াছেন। পরমেশ্বরের সহিত মানবাত্মার যে সম্বন্ধ তাহারই দার্শনিক নাম ভেদাভেদবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। মানবাত্মার সহিত ব্রহ্মের এবং জগতের কি সম্বন্ধ তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাই দ্বৈতাদ্বৈত দর্শনের উদ্দেশ্য। নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ কোন সম্বন্ধই স্বীকার করে না। তাহার মতে সম্বন্ধগুলি ব্যবহারিক, মায়িক,—পারমার্থিক নহে। অপর দিকে ভেদবাদও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দেখাইতে পারে না। কেবল দ্বৈতাদ্বৈত দর্শনই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দেখাইয়া দেয়; এজন্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদ আমার কাছে প্রিয়। জগতের ব্রহ্মসাধকগণ এই সম্বন্ধ অনুভব করিয়া, সম্বন্ধ-সাগরে ডুবিয়া যে সকল মহাবাক্য বলিয়াছেন, তাহাতে দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্বই প্রকাশ পায়। যে দার্শনিক এই সম্বন্ধ-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন, সম্বন্ধকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন, তিনি কি ব্রাহ্মসাধকের উপকারী বন্ধু নহেন?

ব্রাহ্মসাধক এই সম্বন্ধ কোথায় উপলব্ধি করেন? গভীর আরাধনায়। আরাধনার মধ্যেই অহং ইদং এবং ব্রহ্মের সম্বন্ধ উপলব্ধি হয়। পরমেশ্বরের অপার করুণায় আরাধনা-সাধন আমাদের কাছে উপস্থিত হইয়াছে। এই আরাধনারাজ্যে আমরা ব্রহ্ম-সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া থাকি। এই সম্বন্ধকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ইহা দ্বৈতাদ্বৈতভাব-বিশিষ্ট। আমাদের আরাধনার মধ্যে দুইটি স্তর আছে,—একটি জ্ঞানস্তর আর একটি প্রেমস্তর। সত্য, জ্ঞান, অনন্ত পরব্রহ্মের এই তিনটি স্বরূপের ভিতর দিয়া মানবাত্মার সহিত যে সম্বন্ধের মধুর ধারা প্রবাহিত হইতেছে, আজ সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিয়া দেখাইব যে, এই সম্বন্ধ অদ্বৈত নহে, দ্বৈত নহে; দ্বৈতাদ্বৈত।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মচরিতে বলিয়াছেন,—"তিনি 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,' তাঁহাকে অন্তরে উপলব্ধি করি।" মহর্ষি উপলব্ধি-রাজ্যে বাস করিয়া পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ বিষয়ে যে তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি;"—এই উজ্জ্বল শ্রেষ্ঠ কোষ মধ্যে সেই সূর্য্যপ্রভা প্রকাশ পায়, তখন কি হয়? প্রাতঃকালে সূর্য্য চন্দ্র একত্র উদয় হইলে যাহা হয়, তাহাই হয়। তখন দেখিতে পাই, সেই সূর্য্যের প্রকাশেই এই চন্দ্র প্রকাশ পাইতেছে; আত্মা তাঁহার প্রকাশেতেই প্রকাশিত হইতেছে। জীবাত্মার জীবন, তাহার ধর্ম্ম, তাহার জ্ঞান, তাহার প্রেম, সকলেরই প্রকাশ তাঁহা হইতে দেখা যায়।" (ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—ষষ্ঠ অধ্যায়) মহর্ষি সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া যে ভাবে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা 'দ্বৈতবাদ' নহে; 'ভেদাভেদবাদ।' এখন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এ বিষয়ে কি বলিতেছেন, তাহা শ্রবণ করি। তিনি বলিতেছেন,—"যাহাকে জীবাত্মা বলি, তাহাকে পরমাত্মা বলি। বলপূর্ব্বক বলিতেছি, কেহ পৃথক্ করিতে পারে না।" "জীব ব্রহ্ম একত্র বাস। নরের সাধ্য নাই, জীবাত্মা পরমাত্মাকে ভেদ করে।" "এক বস্তু যাহাকে তুমি মনুষ্য বলিতেছ, তাহারই মধ্যে ঈশ্বর এমনি ভাবে রহিয়াছেন, কেহ বলিতে পারে না ঐ দিকে হরি, ঐ দিকে আমি।" "পরমাত্মা খেলা করেন জীবাত্মার ভিতর দিয়া, জীবাত্মা খেলা করে পরমাত্মার ভিতর দিয়া।" (ব্রহ্মগীতোপনিষদ্—দ্বিতীয়ার্দ্ধ) কেশবচন্দ্রের এ সকল কথার মধ্যে দার্শনিক কোন্ তত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে? সম্বন্ধবিহীন অদ্বৈতবাদ নহে, আবার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ-বিহীন দ্বৈতবাদও নহে; প্রকাশ পাইতেছে, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ।

এখন উপলব্ধিমূলক আরাধনায় কি ভাব প্রকাশ পায় তাহা দেখা যাউক। আরাধনা দুই প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়,—এক প্রকার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধমূলক আরাধনা, আর এক প্রকারের পরোক্ষ আরাধনা। পরোক্ষ আরাধনায় সম্বন্ধের ভাব প্রকাশিত দেখা যায় না। প্রত্যক্ষ আরাধনায় সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মের সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ প্রকাশ পায়? এই সম্বন্ধ প্রকাশ পায়—"তুমি সত্য, তুমি প্রাণ—আমি প্রাণী। তুমি জ্ঞান—আমি জ্ঞানী। তুমি পূর্ণ, আমি অপূর্ণ; পূর্ণতার দিকে তুমি আমাকে আকর্ষণ করিতেছ।" ইহার মধ্যে একত্ব আছে, দ্বৈতভাবও আছে। ব্রহ্মের সহিত একত্ব ভাব উপলব্ধি না হইলে আমাদের আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস উজ্জ্বল হয় না। আবার দ্বৈতভাব উপলব্ধি না হইলে আত্মার অনন্ত উন্নতিশীলতায় বিশ্বাস গাঢ় হয় না। এই একত্ব ও ভেদ প্রত্যক্ষ বিষয়; পরোক্ষ নহে। এই ভেদাভেদ ভাব সাধনার দ্বারা লভ্য, দর্শনশাস্ত্র তাহার ব্যাখ্যা-কারক। এই ভেদাভেদ ভাব মহাপুরুষ যীশুর জীবনে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল; * হেগেল্ যে দর্শন লিখিয়াছেন, তাহা যীশু জীবনের ব্যাখ্যা। আমরা এই ভেদাভেদ ভাব কোথায় পাইয়াছি? পাইয়াছি, ব্রাহ্মসাধকগণের সাধনার অভিজ্ঞতার ফলে।

* যীশু এই মর্ম্মে বলিয়াছেন—আমি এবং আমার পিতা এক; পিতার মধ্যে আমার অনন্ত পুত্রত্ব।

মহর্ষি ও ব্রহ্মানন্দের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি। ব্রাহ্মসাধকগণ সত্য, জ্ঞান, অনন্তের সহিত সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া অমৃতময়ী ভাষায় যে সংগীত করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা হইতে কয়েকটি অমর সঙ্গীত উদ্ধৃত করিতেছি। সাধু পুণ্যদাপ্রসাদ গাহিলেন ;—

"তুমি প্রাণ আমার প্রাণের প্রাণ
আমার সকলি ত তুমি হে ;
আমার অস্তিত্ব, চৈতন্য সকলি ত তুমি
তুমি ত প্রাণের স্বামী হে।"

ভক্ত কালীনারায়ণ তাঁহার ভাবসঙ্গীতে বলিলেন ;—

"তুমি বৃক্ষ, আমি ফল,
তোমাতে আমার সকল ;
তোমার যত ডাল পাতা রস
সরসে আমার জীবন।"

* * * *

"অদৈন্য সংসার দিয়ে
তবু মন উঠ্‌ল না তোমার
তাই তুমি হ'য়ে আমার—
'আমি' হইলে আমার।"

গুপ্ত মহাশয়ের 'মত ও সাধনা' সম্বন্ধে আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে একবার মাঘোৎসবের সময় একটি বক্তৃতা করিয়াছিলাম। বক্তৃতার নাম দিয়াছিলাম, "কালীনারায়ণ গুপ্তের মত ও সাধনা।" 'ভাবসঙ্গীত'দ্বারা দেখাইয়াছিলাম, তিনি মতে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ছিলেন। সাধু পুণ্যদাপ্রসাদ এবং ভক্ত কালীনারায়ণ ইংরাজী জানিতেন না, "দ্বৈতাদ্বৈতবাদ" বলিয়া যে একটা বস্তু আছে তাহা তাঁহারা শুনিতে পাইয়াছিলেন কি না, সন্দেহ। অথচ তাঁহারা যে ভাবে 'সম্বন্ধ' প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। ভক্ত কালীনারায়ণ পরমেশ্বরের সহিত সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া বলিলেন,—"তুমি বৃক্ষ আমি ফল।" আবার স্পষ্ট করিয়া বলিলেন,—"তুমি আমার 'আমি'!" এখানে তিনি ব্রহ্মের সহিত একত্ব দর্শন করিলেন।

এখন জগৎ-কবি রবীন্দ্রনাথ এই সত্যং জ্ঞানমনন্তং সম্বন্ধে যে সকল মহাগীতি লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। রবীন্দ্রনাথের দেহে যেমন মহর্ষির রক্তধারা প্রবাহিত তেমনি তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মানন্দ-রস-পানকারী মহর্ষির ভাবধারা প্রবাহিত।

"তুমি প্রশান্ত চির নিশিদিন
আমি অশান্ত বিরামবিহীন
চঞ্চল অনিবার,
যত দূর হেরি দিগ্‌ দিগন্তে
তুমি আমি একাকার।"

* * * *

"কে গো অন্তরতর সে ?
আমার চেতনা আমার বেদনা,
তারি সুগভীর পরশে।"

* * * *

"তুমি আপনি জাগাও মোরে।"

* * * *

"সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর,
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।"

সত্যং জ্ঞানমনন্তং সম্বন্ধে অমর কবির মহাসঙ্গীত হইতে যাহা উঠাইলাম, ইহার মধ্যে দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্বই উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ইহা যেমন অদ্বৈতবাদ নহে, তেমনি একান্ত ভেদবাদও নহে। ইহাতে মানবাত্মার সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ ফুটিয়া উঠিয়াছে। "গীতাঞ্জলি" "গীতিমাল্য" "দীপালী" গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের যে সকল পরমার্থ সঙ্গীত প্রকাশিত হইয়াছে, যাহার অনুবাদ পাঠ করিয়া ইউরোপ আমেরিকার ভাবুকগণ মুগ্ধ হইয়াছেন, তাহা মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ-সঙ্গীত। উচ্চতর ব্রাহ্ম-সাহিত্য এই সম্বন্ধকেই নানাভাবে প্রকাশ করিতেছে। পণ্ডিত তত্ত্বভূষণ, 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'য় হেগেল দর্শনের দ্বারা এই সম্বন্ধবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধবিহীন একমাত্র ব্রহ্মসত্তা স্বীকার করে ; ভেদবাদ বা দ্বৈতবাদ প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ দেখাইতে পারে না। 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'য় সম্বন্ধবাদ দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্ব নামে অভিহিত হইয়াছে। হেগেলের জ্ঞানবাদ যাহা 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'য় পাঠ করি এবং যাহা শ্রবণ করি, তাহার সকল কথাই যে গ্রহণ করিয়া থাকি বা বুঝি তাহা নহে, তবে সম্বন্ধবাদ সম্বন্ধে হেগেল দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছি।

'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'র স্থূলমর্শ্বের সংক্ষিপ্ত সার এইরূপ বলা যাইতে পারে ;—ব্রহ্ম জ্ঞাতা-জ্ঞেয় সম্বন্ধবিশিষ্ট ; সসীম অসীম, পূর্ণ অপূর্ণ সম্বন্ধযুক্ত। আত্মজ্ঞান দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান সাক্ষাৎ ভাবে লব্ধ হয়। আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মলাভের ভিত্তিভূমি। মানবাত্মা ও পরমাত্মায় স্বাতন্ত্র্য নাই ; পার্থক্য আছে। পরমাত্মা প্রাণ, মানবাত্মা প্রাণী ; তিনি জ্ঞান, মানবাত্মা জ্ঞানী ; তিনি পূর্ণ মানবাত্মা অপূর্ণ ; মূলে একই এই প্রাণ প্রাণী, জ্ঞান জ্ঞাণী, পূর্ণ অপূর্ণ ব্রহ্মের প্রকাশ। এক দিকে যেমন একত্ব, অপর দিকে সুস্পষ্ট দ্বৈতভাব। প্রাণ প্রাণীতে, জ্ঞান জ্ঞানীতে, পূর্ণ অপূর্ণে যে উজ্জ্বল দ্বৈতভাব বিদ্যমান তাহা ব্যাখ্যার সাহায্যে বুঝিবার প্রয়োজন হয় না। ব্রহ্মের সহিত আমাদের যেমন একত্ব আছে, তেমনি সম্বন্ধ আছে। এই একত্ব ও সম্বন্ধ না থাকিলে তাঁহাকে আমরা জানিতে পারিতাম না—বুঝিতে পারিতাম না। 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' সম্বন্ধবাদের দর্শনশাস্ত্র। সুতরাং 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' পাঠ করিলে আরাধনা সাধনের সাহায্য হয়। পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার যে সম্বন্ধ রহিয়াছে, বিজ্ঞানদ্বারা তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা কি ব্রাহ্মসাধকের একটি অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য নহে ?

রায় মহাশয় এই বলিয়া তাঁহার প্রবন্ধ শেষ করিয়াছেন—"জীবন্ত সত্য ধর্ম্মকে বিশ্বাসী প্রাণের উৎস হইতে প্রবাহিত হইতে দেখিয়াছি, জ্ঞানের কৃত্রিম প্রস্রবণ হইতে নহে।" তাঁহার এই কথার অর্থ এই যে, যাহা কৃত্রিম, তাহাই জ্ঞান, যাহা অকৃত্রিম অর্থাৎ সত্য, তাহাই বিশ্বাস। জ্ঞান কি কৃত্রিম বস্তু ? সত্যাসত্যের বিচার কে করে ?—জ্ঞান। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের—পাপ

পুণ্যের বিচার কে করে?—জ্ঞান। মানবকে অন্ধকার হইতে আলোকে, অবনত অবস্থা হইতে উন্নত অবস্থায় কে লইয়া যায়?—জ্ঞান। যে জ্ঞান সকল কৃত্রিমতা দেখাইয়া দেয়, যে জ্ঞান মানবের গন্তব্য পথের আলোক, সেই জ্ঞান কি কৃত্রিম? যে সকল হিন্দুসন্তান জ্ঞান-বিচারে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মূর্ত্তি-উপাসনা সত্য নহে, একমাত্র নিরাকার চিন্ময় পরমেশ্বরের উপাসনাই সত্য এবং জাতিভেদ মানবীয় কৃত্রিম বন্ধন, তাঁহারাই মূর্ত্তিপূজা ও জাতিভেদ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম-সাধনার্থে মিলিত হইয়াছিলেন। মহর্ষির সম্বন্ধে এরূপ কথিত আছে যে, তিনি বিদ্যালয় গমন কালে প্রতিদিন ঠন্ঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী মূর্ত্তিকে প্রণাম করিতেন। একদিন তাঁহার মনে এই প্রশ্নের উদয় হইল—"আমি এই যে দেবতাকে প্রণাম করিতেছি, ইনি কি অনন্ত?" তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন 'পরিমিত দেবতা অনন্ত হইতে পারে না,' তখন হইতে দেবতা-প্রণাম পরিত্যাগ করিলেন। প্রত্যেক ব্রাহ্মই জ্ঞানের পথে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। * ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বলিয়াছেন;—"কর্ত্তব্য বুঝিব যাহা, নিশ্চয় করিব তাহা, যায় যাক্, থাকে থাক্, এ ছার জীবন।"

ব্রাহ্ম জ্ঞানকে কৃত্রিম বলিতে পারেন না। জ্ঞানকে কৃত্রিম বলা আর আত্মহত্যা করা একই কথা। যাহা হউক আমি আমার প্রবন্ধে দেখাইলাম, ব্রাহ্মসাধকগণ আরাধনার ভিতর দিয়া পরমেশ্বরের সহিত সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া থাকেন। সেই সম্বন্ধের বিষয় ভক্তবাণী এবং ব্রহ্মসঙ্গীতে প্রকাশিত হইতেছে। এই সম্বন্ধকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ইহা যেমন অদ্বৈতবাদ নহে, তেমনি দ্বৈতবাদও নহে; ইহাকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বলা যাইতে পারে। সাধকগণ ইহাকে সম্বন্ধবাদ বলিতে পারেন।

কাশীচন্দ্র ঘোষাল।

প্রেরিত পত্র।

(১)

[প্রেরিত পত্রের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু

কথকতার অনিষ্টকারিতা।

যেভাবে ব্রাহ্মপ্রচারকেরা কথকতা করেন তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার না হইয়া বিষম অনিষ্ট হইতেছে, একথা আমি অনেকবার বলিয়াছি। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু পণ্ডিত অবিনাশচন্দ্র কাব্যপুরাণ-তীর্থ মহাশয় এবিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় এক পত্র লিখিয়াছেন।

কার্য্যতঃ কি হয় নিম্নে তাহার দু একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি; ব্রাহ্ম ভাই ব্রাহ্মিকা ভগিনীগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন। হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া কথকতা করিলে বহু শ্রোতা পাওয়া যায়; প্রচারকেরা তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া ভবিষ্যৎচিন্তাবিহীন হইয়া পড়িতেছেন দেখিলে নিতান্ত কষ্ট হয়, প্রাণে আঘাত লাগে।

১। বর্দ্ধমানে কোন প্রচারকের কথকতার প্রশংসা ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারে পাঠ করিয়া তথাকার কোন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত প্রশ্ন কয়টি জিজ্ঞাসা করি;

(ক) কোন শ্রেণীর লোক কথকতা শুনিতে আসেন অর্থাৎ তাঁহারা গোঁড়া হিন্দু কি না?

(খ) কথকতা শুনিয়া কেহ ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ পাইয়াছেন, এমন কথা আপনি জানেন কি না?

(গ) শ্রোতারা কথকতা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সোপান মনে করিয়াছেন, কি বৈষ্ণবধর্ম্মের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ভাবিয়াছেন?

উত্তর।

(ক) অধিকাংশ শ্রোতাই গোঁড়া হিন্দু ছিলেন।

(খ) আমি বিশ্বাস করি কেহই ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ পান নাই।

(গ) কেহই কথকতা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সোপান ভাবেন নাই। খুব সম্ভব বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ভাবিয়াছেন।

২। দেওঘরে ডাক্তার ফকিরচন্দ্র সাধুখাঁ মহাশয়ের বাসায় যে কথকতা হয়, তৎসম্বন্ধেও আমি কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধুকে ঐরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি যে উত্তর দিয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে বাঙ্গলায় উদ্ধৃত করিলাম।

"এই কথকতা হিন্দুভাবে খুব সফল হইয়াছিল, কেননা ইহাতে ব্রাহ্ম আদর্শ প্রচারের কোন চেষ্টা হয় নাই। কেবলমাত্র শেষে "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্" এই কথা কয়টি উচ্চারণ করা হয়। যেরূপ দেখা গেল শ্রোতাদের তাহা ভাল লাগে নাই। তাঁহারা অনেকেই বলিতে লাগিলেন, আবার ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্ একথা বলা কেন?"

হায়! এতদিন পরে কি আমাদের এই অধোগতি হইল যে, ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করিতেও আমরা ভীত হইব? কপটভাবে হিন্দু সাজিয়া প্রচার না করিলে কি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হয় না? ব্রহ্ম-নামের নিশানহস্তে নির্ভীকচিত্তে ব্রহ্মনাম প্রচার করিবার যদি কাহারও প্রাণে বল এবং বিশ্বাস না থাকে তবে তাহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে দেওয়া বৃথা। এই শ্রেণীর প্রচারকের দ্বারাই ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ মলিন হইতেছে।

শ্রীরজনীকান্ত দে।

(২)

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

প্রস্তাবিত আশ্রম।

সবিনয় নিবেদন,

শ্রদ্ধেয় জগচ্চন্দ্র দাস মহাশয় আপনার কাগজে একটা আশ্রম স্থাপনের আবশ্যকতা বিষয়ে আলোচনা উপস্থিত করেছেন। ভারতের এই সুদূর প্রান্ত থেকে সেই আলোচনায় যোগ দিবার জন্য আপনার আশ্রয়ের ভিখারী হয়ে আজ হাজির হচ্চি। আশা করি আশ্রয় দান করিয়া বাধিত করবেন।

আশ্রম যে একটা দরকার তা অনেকেই অনুভব করচেন।

* ব্রাহ্মগণ যে জ্ঞানপন্থী তাহা 'সত্যদর্শী ও সত্যে বিশ্বাসী' প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। (তত্ত্ব-কৌমুদী, ১৬ই শ্রাবণ)

কিন্তু আশ্রমটা প্রকৃত আশ্রম হওয়া দরকার। যেখানে গেলে শরীর মন ও আত্মা শান্ত, সুস্থ ও সবল হবে এমন একটা জায়গা দরকার। আমাদের ধর্ম্মটা যে সাধনের ধর্ম্ম এটা লোকে এখনও ভাল ক'রে বোঝে নি। অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় এখানেও সাধনের ক্রম ও স্তরভেদ আছে, এই কথাটা বেশ ক'রে আমাদেরও বোঝা দরকার, পরকেও বোঝান দরকার। এই কাজটা করতে হ'লে প্রকৃত সাধক সংগ্রহ করা চাই, সাধনার শিক্ষক বা গুরু দরকার এবং সাধনা ভেদে সাধকের কর্ম্মভেদ নির্দ্দেশ করারও ব্যবস্থা করা দরকার। এই সব ব্যবস্থা ছাড়া সাধনাশ্রম নামে স্থাপিত হ'লেও সেটা কানা পুতের পদ্মলোচন নামের মত হবে ব'লে মনে করি। গোড়াতেই এই কথাটা জগতবাবুর বিচারের বা ধ্যানের জন্য নিবেদন করলুম।

দ্বিতীয় কথা, আশ্রমের কাজের দিক। আশ্রমে থাকবেন সাধক, সাধন-শিক্ষার্থী শিষ্যবর্গ এবং সেবাপ্রার্থী নরনারী। এই সেবাপ্রার্থীদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য আমাদের সমাজের নিপীড়িতা, নির্য্যাতিতা ও পতিতা ভগ্নীদিগের কথা। তাঁরা নিজেরা কেবল অবলা নন, তাঁদের হ'য়ে কথা বলার লোকও সমাজে বড় বিরল। আমরা তাঁদের উপর অত্যাচার করি; তাঁরা সেই অত্যাচারে যে কেঁদে প্রাণ জুড়ুবেন তার অবসরও দিই না; যদি বা কখনও কোথাও ক্ষীণ ক্রন্দনস্বর উঠে তা হলে অমনি আমাদের শাসনদণ্ড তাঁদের সন্তাড়িত করবার জন্যে খাড়া হ'য়ে উঠে। এঁদের সেবা করার জন্যে জগৎ বাবুর প্রাণ যে ব্যথিত হয়েছে, সেটা তাঁর মহাপ্রাণতারই পরিচায়ক।

কিন্তু সাধন ব্রত ও ভগ্নী-সেবাব্রত একসঙ্গে চলতে পারে কি না, খুব ধীর ভাবে তা চিন্তা করা দরকার। দুটো কাজ খুব গুরুতর হ'লেও একই রকমের কাজ না হওয়ায় ঠিক মিশ খাবে ব'লে মনে করিনা। তেল ও জলের মত দুটো এক জায়গায় ঠেকাঠেকি হ'য়ে থাকলেও মিশবেত নাই-ই বরং একসঙ্গে জুটে থাকার জন্যে কোনটারই স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ব্যবহার করা চলবে না এবং এক অপরকে দুর্ব্বল ক'রে দেবে।

দু অবস্থায় কাজ ক'রে মানুষ আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। প্রথমতঃ সাধন নিরপেক্ষ কাজের তাড়নায় বা মোহে এবং দ্বিতীয়তঃ সিদ্ধিলাভের পর (যদি সিদ্ধি ব'লে কোন অবস্থা থাকে), যখন সর্ব্বভূতে হরিদর্শন হয়। প্রথম অবস্থায় সর্ব্ব সাধারণে কাজ ক'রে মনটাকে অহঙ্কারে স্ফীত করে, আর দ্বিতীয় অবস্থায় সকল কাজই ব্রহ্মপূজার নামান্তর হয়। সংসারে প্রথম অবস্থার লোকই বেশী, দ্বিতীয় অবস্থার লোক থাকলে তার সঙ্গে ভগ্নী-সেবাব্রত মিলিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রথম উদ্দেশ্যও বিফল হ'য়ে যাবে।

তবে এর মধ্যেও একটা মীমাংসার পথ আছে। দুটো ভাগ সম্পূর্ণ আলাদা ক'রে প্রথম ভাগের দুই একজন বাছাবাছা লোকের দ্বারা কোন কোন বিশিষ্টা মহিলার সুহায়তায় ও তত্ত্বাবধানে এরূপ কর্ম্ম- সংযোজন করা চলে। আশ্রমে প্রথম ভাবের যদি কোন স্বামী স্ত্রী থাকেন, তবে তাঁহারাই এই কাজের ভার লইবার উপযুক্ত পাত্র।

কাজ চালাবার জন্যে অবশ্যই একটা কমিটি দরকার। এই কমিটি কি রকম লোকের দ্বারা সংগঠিত হবে? যাঁরা কাজ করবেন না, কেবল কমিটিই করবেন, তাঁরা নমস্য হ'লেও বাইরে থাকবারই যোগ্য। কেউ কেউ মনে করেন কমিটি করাটাই একটা কাজ, মস্ত কাজ, আমি তা মনে করি না। এই রকম অ-কেজো লোকের কমিটি হয় দর্শনে অদূরদর্শী, সহানুভূতিতে সীমাবদ্ধ, বিশ্বাসে ক্ষীণ, সাহসে দুর্ব্বল; এই প্রকার লোকের চেষ্টা প্রায়ই ধাবিত হয় অপরের শক্তি খর্ব্ব করিবার দিকে এবং ব্যয় সংকোচনের দিকে। এই শক্তি ও ব্যয় সংকোচনেরও যে দরকার আছে, তাও সময় বিশেষে স্বীকার করি। কিন্তু কাজের লোকের ঘাড়ের উপর একটা শাসনের ভীতি সর্ব্বদা থাকলে কাজের হাত মুষড়ে যায়। কাজেই কমিটিটা এমন হওয়া দরকার যাতে কাজের লোকেরই প্রাধান্য থাকে।

অর্থ সংগ্রহের উপায় কি হবে, নাম কি হবে, কোন জায়গায় আশ্রম বসান যাবে তার আর কি বিচার করব? এসব সহজেই মীমাংসিত হবে।

ভবদীয়
শ্রীসুধীর চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মসমাজ।

দীক্ষা—বিগত ২রা আগষ্ট সাধনাশ্রমের মাসিক উৎসব উপলক্ষে হাওড়া জেলার হীরাপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন; শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার নবজীবন লাভের সহায়তা করুন। দীক্ষাকালে তিনি নিজের জীবন-পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মর্ম্মে বিবরণ প্রদান করেন;—

ইনি দেশে থাকিয়া প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মমতে নারায়ণপূজাদি করিতেন এবং দরিদ্রদিগের উপকারার্থ গত ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর মাসে গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত করিয়া উক্ত চিকিৎসালয়ের ব্যয়ভার ট্রেনযাত্রীদের নিকট হইতে ভিক্ষাসংগ্রহপূর্ব্বক চালাইতেন। হঠাৎ ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে গত জানুয়ারী মাসে তাহার স্ত্রী, পরে ভ্রাতা ও পুত্রটি পরলোকে চলিয়া যায়। ইহাতে তিনি অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া ভগবানের বিচার বিষয়ে সন্দিহান হইলেন। আর নারায়ণপূজার দিকে লক্ষ্য রহিল না, শোকার্ত্ত হৃদয়ে ব্যাকুল ভাবে সেই অনন্ত-পুরুষের অনুসন্ধানে ঘুরিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ খৃষ্টান্ পাদ্রীদের নিকট যান। তথায়ও প্রাণে শান্তি না পাওয়াতে, হিন্দুধর্ম্মের আধুনিক বক্তা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর উপদেশ অনুসারে বাটীতে কালীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য পূজা করিতে আর চিকিৎসালয়টি চালাইতে চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু জ্ঞাতিবর্গ ও বিশেষতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতা আপত্তি করাতে, পুনরায় শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের (এটর্ণি—হাইকোর্ট) উপদেশ অনুসারে আহুতি বা হোম করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই প্রাণে শান্তি না পাইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে ঘুরিতে থাকেন। ঐ সময় একটি হিন্দু বন্ধুর নিকট ব্রাহ্মসমাজের কথা শুনেন। সেও হাঁসপাতালে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়ের সহিত পরিচয় হইয়া তাঁহার অবস্থার

বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইলে, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার তাঁহাকে সাধনাশ্রমে থাকিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। সেই অবধি তিন মাস সাধনাশ্রমে থাকিয়া ধর্ম্মপুস্তক পাঠ এবং উপাসনা, প্রার্থনা ও সঙ্গীতাদিতে যোগ দিতে দিতে প্রাণে শান্তিও আনন্দের সঙ্গে যেন সেই অনন্ত পুরুষের আভাস একটু পাইতে লাগিলেন। পরে বাঁকুড়া দুর্ভিক্ষের কার্য্যে যাইয়া সেখানকার দরিদ্রদিগের দুরবস্থা দেখিয়া, শোকার্ত্ত হইয়া দয়াময়কে বেশী মনে পড়িল এবং পূর্ব্বে যে দরিদ্র বলিয়া ঘৃণা হইত সে সংস্কার একেবারে দূর হইয়া গেল এবং সকলকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হইল। সেই অবধি তিনি এক নবশক্তি নব উৎসাহ লাভ করিয়া এখন বেশ আনন্দে ও শান্তিতেই আছেন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে, বিগত ২৫শে শ্রাবণ (১০ই আগষ্ট) রাণাপাড়া গ্রামে প্রাচীন ব্রাহ্মবন্ধু কালীমোহন ঘোষ মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সেও স্বগ্রামে একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। তাঁহার পরলোক গমনে ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। শান্তিদাতা পিতা তাঁহাকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের প্রাণে সান্ত্বনা বিধান করুন।

বিবাহ—বিগত ২৬শে শ্রাবণ (১১ই আগষ্ট) কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত স্যার্ নীলরতন সরকারের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী নলিনীর ও পরলোকগত ডাক্তার মোহিনীমোহন বসুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ দেবেন্দ্রমোহনের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২৭শে শ্রাবণ (১২ই আগষ্ট) কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত স্যার্ নীলরতন সরকারের চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী মীরার ও পরলোকগত চণ্ডীচরণ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুধীরকুমারের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতীদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ—বিগত ২৫শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে বরিশাল ব্রহ্মমন্দির-প্রাঙ্গণে পরলোকগত ঈশ্বরচন্দ্র সেনের মৃত্যুদিনে তাঁহার পত্নীর উইলের সর্ত্তানুসারে প্রায় ৬০০ কাঙ্গালীকে পয়সা এবং অন্ধ আতুরদিগকে বস্ত্র দান করা হয়। ইহাতে সর্ব্বসমেত ৫০৲ টাকা ব্যয়িত হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী কাঙ্গালীদিগকে উপদেশ দান ও প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যাকালে মন্দিরে পারলৌকিক উপাসনাদি হয়। মনোমোহন বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২৩শে শ্রাবণ সায়ংকালে বরিশাল সর্ব্বানন্দ-ভবনে পরলোকগত হরিচরণ দাসের প্রথম বার্ষিক পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী উপরত আত্মার গুণাবলী উল্লেখ করিয়া তদীয় জীবন বিষয়ে কিছু বলেন এবং প্রার্থনা করেন। এই অনুষ্ঠানে নিম্নলিখিত ভাবে দান করা হয়,—কলিকাতা দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে ২৲, বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ সাধারণ বিভাগে ২৲, প্রচার বিভাগে ২৲, বরিশাল নাইট্ স্কুলে ৩৲, ছাত্রসমাজে ১৲, দুঃস্থ ও গরীবের সাহায্য বাবত ৫৲, মোট ১৫৲ টাকা।

বিগত ১৩ই শ্রাবণ সায়ংকালে ছাত্রসমাজের উদ্যোগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মরণার্থ এক মহতী সভার অধিবেশন হয়।

বিগত ২১শে শ্রাবণ ব্রাহ্মিকা সমাজের মাসিক অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে পাঠ ব্যাখ্যা এবং সঙ্গীত ও আচার্য্যের কার্য্য করেন।

দান—গত ২৮শে শ্রাবণ মহাত্মা রামতনু লাহিড়ীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পৌত্র শ্রীমান্ সন্তোষকুমার লাহিড়ী সাধনাশ্রমে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

উৎসব—ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজের চতুশ্চত্বারিংশৎ সাম্বৎসরিক উৎসব ১১ই জুলাই হইতে ১৬ই জুলাই পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইয়াছে। সেই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী ধুবড়ীতে গমন করেন ও সমাজ মন্দিরে উপাসনা এবং "নবযুগের সাধনা ও রবীন্দ্রনাথ" বিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনাদি করেন। এতদ্ব্যতীত পারিবারিক উপাসনাতেও আচার্য্যের কার্য্য করেন।

ভাদ্রোৎসব—আগামী ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে নিম্নলিখিত প্রণালীতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উপাসনাদি হইবে। সকলকে এই উৎসবে যোগ দিবার জন্য সাদরে আহ্বান করা যাইতেছে।

৫ই ভাদ্র, ২২শে আগষ্ট শুক্রবার—

সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহ মহাশয় "ব্রহ্মোপাসনা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

৬ই ভাদ্র, ২৩শে আগষ্ট শনিবার—

উষাকীর্ত্তন—কলেজ স্কোয়ার হইতে আরম্ভ

প্রাতে ৭ ঘটিকা—উপাসনা, আচার্য্য—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস।

বৈকালে ৫ ঘটিকা—পাঠ ও ব্যাখ্যা—শ্রীযুক্ত অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত সুকুমার রায়

সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা—উপাসনা—আচার্য্য—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ

৭ই ভাদ্র, ২৪শে আগষ্ট রবিবার—

প্রাতে ৭ ঘটিকা—উপাসনা—আচার্য্য—শ্রীযুক্ত প্রিন্সিপাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়।

সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা, উপাসনা—আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Registered No C. 65.

তত্ত্ব-কৌমুদী

অসতোমা সদ্গময়,
তমসোমা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময় .

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৪শ ভাগ।	১৬ই ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৩২৬, ১৮৪১ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯০	অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩.
১০ম সংখ্যা।	2nd September, 1919.	প্রতি সংখ্যার মূল্য ৶০

প্রার্থনা।

হে সত্যস্বরূপ, যথার্থরূপে তোমাকে জানিলে ও পূজা করিলে মানুষ আর অসত্যে ডুবিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে না,—সত্যকেই সে প্রীতি করিতে শিখে, সত্যের জন্যই সে ব্যাকুল হয়, তাহার সমস্ত জীবনই সত্য হইয়া যায়; মিথ্যা কোনও আকারেই আর তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না, প্রতারিত করিতে পারে না। তোমার জ্যোতিতে মিথ্যা অতি সহজেই আপনার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ফেলে; মিথ্যাকে বুঝিতেও তখন কিছুমাত্র কষ্ট পাইতে হয় না, মিথ্যার আকর্ষণ একটুও থাকে না। আমরা যে অনেক সময় সত্য ছাড়িয়া মিথ্যার পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াই, নামের মোহে মুগ্ধ হইয়া প্রকৃত বস্তু পরিত্যাগ করি, নামের জন্যই অধিকতর ব্যাকুল হই, তাহা তোমাকে জীবনে সত্যভাবে পাই না বলিয়াই, তোমার পূজা সফল হয় নাই বলিয়াই। হে অন্তরদর্শী দেবতা, আমরা কি লইয়া সংসারে মত্ত আছি, কি ভাবে জীবনযাপন করিতেছি, আমাদের জীবন কতটা সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা তুমিই দেখিতেছ; তোমার নিকট কিছুই লুক্কায়িত নাই। তুমি কৃপা করিয়া আমাদের দুর্দ্দশা দূর কর, আমরা সর্ব্বোপরি সত্যকেই প্রীতি করি, সত্যকেই বরণ করি, সত্যকেই অনুসরণ করি। আমাদের জীবন সত্য হউক, সমস্ত কার্য্য সত্য হউক। তুমিই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, প্রভু ও চালক হও। তোমার ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

সম্পাদকীয়

নামের মোহ—সংসারে যত প্রকারের মোহ মানুষকে মুগ্ধ ও অভিভূত করিয়া থাকে, তন্মধ্যে নানা অর্থেই নামের মোহ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। প্রথমতঃই দেখিতে পাওয়া যায়, নাম বা যশের মোহ হইতে মুক্ত হইয়াছে সংসারে এরূপ লোক অতীব বিরল। এই জন্যেই ইংরেজ-কবিকুলগুরু ইহাকে the last infirmity of a noble mind—মহদন্তঃকরণের শেষ দুর্ব্বলতা—বলিয়াছেন। বাস্তবিক ইহা যে মানুষের মধ্যে কত সূক্ষ্মভাবে কার্য্য করিয়া থাকে তাহা বিশেষ আত্মপরীক্ষা ব্যতীত কেহ আপনিও অনেক সময় বুঝিতে পারে না। অতি উচ্চ লক্ষ্য লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া যখন মনে হয়, তখনও যে লুক্কায়িত ভাবে নামের মোহটাই আমাদের প্রকৃত চালক নয়, এ কথা নিশ্চিত রূপে প্রমাণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। ইহাই যে সাধারণ লোকের প্রায় সকল কার্য্যের চালক ও নিয়ামক, তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপেই বলা যায়। কিন্তু এখানেই উহার সর্ব্বগ্রাসী ভীষণ মূর্ত্তির সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় না। এরূপ ভাবেও প্রকৃত কল্যাণকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, নিজের যতই অধঃপতন ও অনিষ্টসাধন হউক না কেন, অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও অপরের মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, সংসারের কল্যাণ অনুষ্ঠিত হইতে পারে। উহার সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ অনিষ্টকারিতা এই যে, ইহার মোহে একবার অভিভূত হইলে আর প্রকৃত কার্য্যের দিকে দৃষ্টি থাকে না,—তখন সাধু অসাধু যে কোনও উপায়ে ইহাকে পাইবার আগ্রহ ও চেষ্টাই প্রাণে জাগিয়া উঠে, তখন "কাম" অপেক্ষা "নাম"ই বড় হইয়া দাঁড়ায়। এরূপ অবস্থায় যে কাহারও অনিষ্ট ব্যতীত কোনও প্রকার ইষ্ট সাধিত হয় না, তাহা সহজেই বুঝা

যায়। এখানে কার্য্য বা প্রকৃত বস্তুর পরিবর্ত্তে নামের উপর দৃষ্টি থাকাতে যে সত্যকে পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যাকেই বরণ করিয়া লওয়া হয়, তাহাও আর বলিতে হইবে না। ইহা হইতেই দ্বিতীয় অর্থে ইহার দ্বারা যে অনিষ্ট সাধিত হয়, তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। জগতে এরূপ চিন্তাবিহীন দৃষ্টিশূন্য লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে, যাহাদের নিকট বস্তু অপেক্ষা নামেরই মূল্য অনেক অধিক, অতি অসার অকিঞ্চিৎকর বস্তুও নামের মাহাত্ম্যে বহুমূল্যবান্ বলিয়া আদৃত হয়। এক শ্রেণীর বিকৃত-রুচি লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা যে সকল দেশীয় আহার্য্য অতি ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করেন, তাহাই ফরাশী নামে মহা আদরের সহিত পরম উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহার ঠিক্ বিপরীত ভাবাপন্ন লোকও অবশ্য অনেক আছেন, যাঁহারা তাঁহাদের নিকট কোনও সুস্বাদু পুষ্টিকর আহার্য্যকে বিদেশী নামে উপস্থিত করিলে, নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া দূর করিয়া দিবেন, আর কোনও পূতিগন্ধময় বিষাক্ত বৈদেশিক পদার্থকেও দেশীয় বা সংস্কৃত নামে ভূষিত করিয়া উপস্থিত করিলে, অতি কষ্টে হইলেও, আগ্রহের সহিত পরম হিতকারী জ্ঞানে গ্রহণ করিতে বিরত হইবেন না। ইহা যে অল্প কয়েক জন রুচি-বিকারগ্রস্ত লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে। আর, দৃষ্টান্তটা যে শুধু আহার্য্য বিষয়েই প্রযোজ্য তাহাও নহে। একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, সংসারে এরূপ লোকের সংখ্যাই অধিক—সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষানৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক কোনও ক্ষেত্রেই এরূপ লোকের অভাব নাই। ইহারা এমনই অন্ধ ও বিচারবিহীন যে, শুধু নামের দ্বারাই সকল বস্তুর মূল্য নির্দ্ধারণ করেন; বস্তুটা স্বরূপতঃ কি, তাহার মূল্যই বা কতটা, তাহা একবারও ভাবিয়া না দেখিয়া, উহা দেশীয় বিদেশীয়, উহা কোনও মাহাজনের নামের সঙ্গে যুক্ত কিনা, তাহার দ্বারাই উহার বিচার করেন। ইহারা প্রকৃত বস্তু কতটা লব্ধ হইল তাহা না দেখিয়া, শুধু নামেতেই সন্তুষ্ট থাকেন, মিথ্যার সেবাতেই জীবন অতিবাহিত করেন। কতকগুলি কথা বা তত্ত্ব আয়ত্ত হইলেই যথেষ্ট হইল মনে করেন; বিধিব্যবস্থাগুলি চিরপূজিত কোনও উচ্চ নামে অভিহিত হইলেই উহারা আদরণীয় ও পূজার্হ হইল ভাবেন; উহারা প্রকৃত পক্ষে সমাজকে উন্নতি কি অবনতির পথে লইয়া যাইবে, সকল শ্রেণীর মানবের কল্যাণ ও শান্তির কারণ হইবে, না, তদ্বিপরীতই হইবে, জীবনের প্রকৃত বিকাশে সাহায্য করিবে, না, অজ্ঞতা ও অক্ষমতাকেই বর্দ্ধিত করিবে, ধর্ম্মপথে—ব্রহ্মসংস্পর্শলাভে—অগ্রসরই করিবে, না, তাহা হইতে দূরেই লইয়া যাইবে, সে দিকে একবারও চাহিয়া দেখেন না। নাম যতই গৌরবান্বিত ও মনোমুগ্ধকর হউক না কেন, উহা যে কোনও প্রকারেই সত্যবস্তুর স্থান অধিকার করিতে পারে না, একমাত্র সত্যের সংস্পর্শেই যে উন্নতি, বিকাশ ও কল্যাণলাভ সম্ভবপর, অপর কোনও উপায়েই যে তাহা হইতে পারে না, এ কথা অধিক করিয়া বলিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। সুতরাং সকল ক্ষেত্রেই দেখিতে হইবে, আমরা কাহার অনুসরণ করিতেছি, যাহা ধরিয়াছি বা পাইয়াছি, তাহা স্বরূপতঃ কি বস্তু, উহা কতটা সত্যাশ্রিত, প্রকৃত কল্যাণ লাভের সহায়। "সত্যে কর প্রীতি পাইবে পরিত্রাণ।" রাজা গাহিয়াছেন, "সত্যসূচনা বিনা সকলি বৃথায়।" বাস্তবিকই সত্যকে ছাড়িয়া আর যাহা কিছু ধরি, বা করি, সকলই নিতান্ত বৃথা। নাম কাম, বিধিব্যবস্থা যাহা কিছু সকলের উপরে সত্য, প্রকৃত জীবন। সত্যই জীবনের প্রতিষ্ঠাভূমি; সুতরাং সত্যই একমাত্র লভনীয় ও অনুসরণীয়। সর্ব্বপ্রকার নামের মোহই সে পথের পরম পরিপন্থী। স্বদেশী বিদেশী, সংস্কৃত ফরাশী, কোনও নামই বস্তুর স্বরূপ পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না; পৃথিবীব্যাপী যশোগীতিও মিথ্যা জীবনের মহাশূন্যতাকে দূর করিতে পারে না। সুতরাং নামের মোহ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। এ দিকে আমাদের সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক। আমরা কোথায় আছি, কাহার অনুসরণ করিতেছি, পরীক্ষা করিয়া দেখি। আমাদের বাক্য, চিন্তা, কার্য্য, লক্ষ্য ও জীবন, সমস্তই সত্যাশ্রিত হউক। সত্যস্বরূপ জীবন দেবতা আমাদের সহায় হউন।

পাশ্চাত্য প্রচারব্যবস্থা——ব্রাহ্মসমাজের প্রচারোদ্যম উপযুক্তরূপ ফল প্রসব করিতেছে না বলিয়া অনেককেই দুঃখপ্রকাশ করিতে শুনা যায়। কিন্তু ইহার প্রকৃত কারণ কি এবং কি প্রকারে ইহা বিদূরিত হইতে পারে, সে চিন্তা ও তদনুরূপ উপায় অবলম্বন অল্প লোকেই করিয়া থাকেন। আমাদের যেরূপ কর্ম্মপ্রচেষ্টা তাহাতে ইহা অপেক্ষা অধিকতর ফলের আশা করিবার কোনই কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের মধ্যে পাশ্চাত্য কর্ম্মোৎসাহ ও কর্ম্মব্যবস্থা উভয়েরই একান্ত অভাব। তাঁহারা কিরূপ নিষ্ঠা ও উৎসাহের সহিত এবং কিরূপ সুচিন্তিত প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহার নানা দৃষ্টান্ত আমরা সর্ব্বদাই চারিদিকে দেখিতে পাই। সম্প্রতি একটি নূতন দৃষ্টান্ত আমরা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছি। মেথডিষ্ট এপিস্কোপেল চার্চ্চ সংকল্প করিয়াছেন আগামী পাঁচ বৎসর মধ্যে প্রচারোদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে মোট ৫৬,২৪,৫৬৯ ডলার (এক ডলার প্রায় ৩৲ টাকা) ব্যয় করিবেন। ইহার মধ্যে ১২,৪৭,০০০ ডলার দ্বারা কতক-গুলি প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপিত হইবে; ২৭,১৯,৭১৩ ডলার ২৭৫টা গ্রাম্য গির্জ্জা, প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মীদের জন্য ৪৫০টা বাসগৃহ ও ৪৫টা প্রচারকনিবাস নির্ম্মাণে ও তাহার জন্য জমী ক্রয়ে ব্যয়িত হইবে। ১০০টা গ্রাম্য স্কুল, ১,০০০ শিক্ষকদের বাসভবন, ১৫টা প্রচারকনিবাস স্থাপনের, দুইটি শিক্ষাবিষয়ক প্রতিষ্ঠানকে সুচারুরূপে চালিবার উপযুক্ত সাহায্য প্রদানের এবং ৩টি হাঁসপাতাল ও একটি ঔষধালয়ের উন্নতি-সাধনের ব্যবস্থা করা হইবে। অবশিষ্ট ১৬,৫৭,৮৫৬ ডলার ১,০৫০ জন দেশীয় কর্ম্মী, ৭৪ জন প্রচারক, ১,৩০০০ জন গ্রাম্য শিক্ষক, ২০ জন শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত প্রচারক, ১৪ জন দেশীয় শুশ্রূষাকারিণী, এবং ৪ জন প্রচারক-ডাক্তার এবং প্রচারিকা-শুশ্রূষাকারিণীর ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ব্যবহৃত হইবে। পাশ্চাত্যগণ আমাদের অপেক্ষা বহুগুণে অর্থশালী বলিয়াই যে তাঁহারা এরূপ অকাতরে অর্থব্যয় করিতে পারিতেছেন, তাহা নহে। তাঁহারা অর্থের সদ্ব্যবহার করিতেও আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী

জানেন, জনহিতকর কার্য্যে মুক্তহস্তে দান করিতে অধিকতর অভ্যস্ত। আমাদের যে পরিমাণ অর্থ আছে, সদনুষ্ঠানে তদনুরূপ দান করিবার প্রবৃত্তি থাকিলে যে যথেষ্ট টাকা সংগৃহীত হইতে পারিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা যে অর্থের অনেক অপব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এ স্থলে টাকাই প্রধান দেখিবার বিষয় নহে। তাঁহাদের সুচিন্তিত কার্য্যপ্রণালী এবং কর্ম্মব্যবস্থাই অধিকতর লক্ষ্য করিবার বিষয়। কি প্রকারে কর্ম্ম সুফলপ্রসূ হইতে পারে উহা তাঁহারা বিশেষ রূপেই অবগত আছেন—তাঁহাদের লক্ষ্য ও তৎসাধনের উপায় পূর্ব্ব হইতেই সুবিবেচনার সহিত নির্দ্ধারিত হয় এবং অতি নিষ্ঠার সহিত ধীরভাবে তাঁহারা উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত থাকেন। তাঁহাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টার মধ্যে আমাদের ন্যায় বিকারগ্রস্ত রোগীর সাময়িক আক্ষেপণ দেখা যায় না। দুই একদিন দুই চারি স্থানে বক্তৃতা প্রদান বা আলোচনা উপাসনাদি করিয়াই আমরা মনে করি যথেষ্ট প্রচারকার্য্য করা হইল, দলে দলে লোককে ব্রাহ্ম করিবার পথ প্রস্তুত হইল। বৎসরের পর বৎসর, মাসের পর মাস আমরা কোনও একটা কাজে লাগিয়া থাকি না। তদ্ব্যতীত আমরা মূলেও প্রবেশ করি না, গাছের মাথায় দুই এক ফোঁটা জল দিয়াই মনে করি গাছ সতেজ হইয়া উঠিবে, প্রচুর ফল প্রসব করিবে। ইহার জন্য যে কত দিকে কত প্রকার আয়োজন করিতে হয় কতভাবে জমী প্রস্তুত করিতে হয়, শিক্ষাদির দ্বারা লোককে গড়িয়া তুলিতে হয়, সে দিকে আমরা কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত করি না। তৃতীয়তঃ, আমাদের মধ্যে তাঁহাদের ন্যায় উৎসাহী কর্ম্মীরও একান্ত অভাব। খড়ের আগুনের ন্যায় আমাদের উৎসাহ জ্বলিয়াই নিবিয়া যায়—অল্প পরিশ্রমেই আমরা কাতর হইয়া পড়ি। ইহা অপেক্ষা অনেক সহজ কার্য্যসাধনে যে পরিমাণ উৎসাহ ও পরিশ্রম আবশ্যক হয়, আমাদের মধ্যে তাহারও একান্ত অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। চতুর্থতঃ, আমাদের যাহা একটু শক্তি ও উৎসাহ আছে, তাহাও অধিকাংশ সময় নানা বৃথা কাজে ও অকাজে বিনষ্ট হইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় অধিকতর ফল লাভের আশা কি নিতান্ত দুরাশা নহে? ইঁহাদের নিকট হইতে আমাদের এ সকল শিক্ষা গ্রহণ না করিলে চলিবে না। বিনা আয়োজনে, বিনা আয়াসে, ও স্বার্থত্যাগ ব্যতীত কোনও কার্য্যেই সিদ্ধি লব্ধ হয় না, ইহা যেন আমরা ভুলিয়া না থাকি। মঙ্গল বিধাতা আমাদিগকে আমাদের কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ করুন।

ব্রহ্মোৎসব।*

ব্রহ্মকে লইয়া আনন্দ করা সহজ কথা নয়। তাই, এই ব্রাহ্মোৎসব কাহার পক্ষে উৎসব? যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে লইয়া আনন্দ করিতে জানে, যে ব্রহ্মোপাসনার রস পাইয়াছে, তাহার পক্ষেই ইহা উৎসব। নতুবা, ব্রহ্মোপাসনার প্রথম দিন বলিয়া যে উৎসব, তাহা একটা প্রণালী রক্ষা করা মাত্র। ব্রাহ্মসমাজের লোক হইলেই সে ব্রহ্মোপাসক, তাহাও নয়; এদিনে তাহার উৎসবও নয়। নতুবা, লোকেরা কি বলিতে সুযোগ পাইত—'অমুক ধনী বা পদস্থ ব্রাহ্ম বা এত বড় ব্রাহ্মের ছেলে মেয়ে, ইহারা সমাজে যায় না ত?' বা, তাহারাই কি বলিত, 'ওখানে না গেলে কি আর ধর্ম্ম হয় না?' ব্রাহ্মসমাজে গেলে কাহারও উপকার হয় না তাহা বলি না, তবে যে সকলকেই যাইতে হইবে তাহা নয়। পরিবার লইয়া যে নিত্য উপাসনা করিতেই হইবে বা পূর্ণাঙ্গ উপাসনা না করিলেই নয়, ইহা কিছু বাড়াবাড়ি!' এখন ভেবে দেখ তাহারা ব্রাহ্ম কি সেইরূপ নয় যেরূপ 'মুই হিন্দু'? যাহা হউক, এরূপ লোক সমাজ মধ্যে থাকিবে; তবে ইহারা চালক নেতা বা আচার্য্য হইলেই সন্তাপের কারণ, সমাজের অধোগতি নিশ্চিত। ভাই ভগ্নী, সব কাজ করিবার সময় ভাবিয়া চিন্তিয়া করিও, কাহাকে নেতা ভাব, কাহাকে আচার্য্য কর। এখানেই সমাজরক্ষার মূল। উৎসব তবে ব্রাহ্ম নামধারী হইলেই তাহার জন্য নয়।

রাজা রামমোহন এ উপাসনায় কি পেয়েছিলেন, তাহা কাহারও বলিবার শক্তি নাই; তবে কিছু পাইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তিনি দেশকে ইহার আনন্দ দিবার পূর্ব্বেই বিদেশ থেকে চিরস্বদেশে চলিয়া গেলেন।

ব্রহ্মোপসনার সাধন, আজ অন্যরূপ দেখাইব—বরাবর যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা নহে। ইহার পূর্ণাঙ্গ সাধন ত চাই-ই। কিন্তু তাহা অনেকবার বলা হইয়াছে। এবার বলিব, মোটামুটী ত্রিবিধ সাধন। ব্রহ্মোপাসনার প্রথম সাধন বা শিক্ষা, সামাজিক উপাসনা। যদিও এটী খৃষ্টীয় ভাব এবং এক সময় শুধু সমাজে গিয়া উপাসনায় যোগ দিলেই উপাসনা হইল মনে করা হইত। এমন কি সাধকদল বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারাও মিলিত উপাসনাকেই সর্ব্বস্ব মনে করিতেন। ইঁহারা খৃষ্টীয়ভাবে গঠিত; তাঁহারা যতই না কেন আপনাদিগকে হিন্দু বলুন না, তাঁহারা হিন্দুভাব প্রাপ্ত হন নাই। হিন্দুভাব নির্জ্জনে একাকী সাধন। এই সাধন যাঁহারা করেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বিতীয় ভাব সাধন করেন। কিন্তু ইহাতেও বিপদ্ আছে; হিন্দুভাব অনেক সময় সাধককে সমাজ-বিমুখীন করে। ধর্ম্মসাধন যখন সমাজবিমুখীন হইতে থাকে, তখন সমাজের ধর্ম্মভাব কমিতে থাকে, তখন সমাজ ও ধর্ম্ম দুই পৃথক্ জিনিষ হইতে থাকে। এজন্য সাধক এ বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন। সতর্কতা আর কি? সমাজে যাইতে উৎসাহ বাড়িতেছে কি কমিতেছে, ইহা দ্বারা আপনাকে পরীক্ষা করিয়া লইবেন,—সমাজে যাইতে যেমন নিষ্ঠা থাকিবে, তেমনি নিত্য একাকী নির্জ্জন সাধন করিবেন; নতুবা জীবনে আধ্যাত্মিকতার গভীরতা কখনই জন্মিবে না। শুধু সামাজিক উপাসনায় যোগ দিলে সে গভীরতা জন্মিবে না—নির্জ্জন সাধন চাই। কিন্তু এই সামাজিক বা নির্জ্জন উপাসনা করিলেই ধর্ম্মজীবন লাভ হইবে, তাহা নহে। ইহার সঙ্গে তৃতীয় সাধন ভিন্ন ব্রাহ্মজীবন কখনই লাভ হইবে না। সে তৃতীয় সাধন কি? পরিবার মধ্যে পারিবারিক অনুষ্ঠান, সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি ব্রহ্মোপাসনাদ্বারা সম্পন্ন করিতে হইবে। অনেকে মনে করেন অনুষ্ঠানের উপাসনা একরূপ হইলেই হইল, কিন্তু এখানেই ধর্ম্মসাধনের পরীক্ষা। লোকেতে লোকাচার, ব্রহ্মোপাসকের সঙ্গে ব্রহ্মোপাসক, ইহা

* ৬ই ভাদ্র প্রাতঃকালীন উপাসনায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রদত্ত উপদেশ।

করিলে চলিবেনা। খাঁটি ঈশ্বরবিশ্বাসীর পক্ষে এরূপ করা অসম্ভব। যাহাদের গৃহে এ সাধন আছে তাহাদের যদি ইহাতে শ্রদ্ধা না দেখি,—তাহারা কেহ ইহাতে উপস্থিত আছে, কেহ নাই, আচার্য্য প্রাণান্ত ক'রে দুটী কথার বিল্বপত্র ফেলা সাঙ্গ করিলেই অমনি সকলে বাহ্য কোলাহলে মাতিল,—সেরূপ অনুষ্ঠানের সাধন শুধু আনুষ্ঠানিক নামটারক্ষা করা মাত্র। এরূপ আনুষ্ঠানিকের অহঙ্কার মৃত্যুর চিহ্ন। একস্থানে সে দিন বলিয়াছিলাম, "অনুষ্ঠানের দ্বারা ব্রাহ্মণ নাম লওয়া যেমন মিথ্যাচরণ, তেমনি এইরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা ব্রাহ্ম নামে পরিচিত হওয়া গৌরবের কারণত নয়ই, বরং লজ্জার কারণ"। অনেক আচার্য্যও মনে করেন, এ উপাসনাটা কিছু নয়। কিন্তু কিছুতেই ইহাকে কিছু নয় হইতে দেওয়া উচিত নয়; যাহাতে ইহা সাধনের অঙ্গ হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। নতুবা, আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম নামের বৃথা গৌরব ত্যাগ কর।

এখন বলিতেছি, এই ত্রিবিধ ব্রহ্মোপাসনার সাধনকে একটা বাঁধা প্রণালীতেও আনিবে না। উপাসনার পুস্তকখানা পড়িলাম, উপাসনা হইল, বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যেরা যে প্রণালী করিয়া গিয়াছেন শুধু তাহাকে রক্ষা করিয়া গেলাম, তাহাতে কোন সমাজ জীবন্ত ধর্ম্মসমাজ বলিয়া জনসমাজে পরিগৃহীত হইতে পারে না; তাহাকে ধর্ম্মজীবনের সহায় করিয়া লইতে হইবে। উপাসনাও প্রণালীরক্ষা নয়, অনুষ্ঠানও প্রথারক্ষা নয়। ইহা সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মজীবন লাভের উপায়, একথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। অনুষ্ঠানগুলিকে স্বেচ্ছাচারীতাতে পূর্ণ করিবে না। 'আমি এইরূপ করি, আমি এইরূপ বলি, ইহাতে তোমরা আমাকে ব্রাহ্ম বল ভাল, না বল নাই', এরূপ স্বেচ্ছাচারী হইলে ধর্ম্মসমাজ গঠিত হয় না, ইহা মনে রাখিয়া তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা করিবেনা ধর্ম্মাচার্য্যদের কথাও শুনিবে এবং বিচার করিয়া দেখিবে। তখন তোমার সমাজের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পাইবে। যিনি এই ত্রিবিধ সাধন করেন, তিনিই ভাদ্রোৎসবের মহিমা বুঝিতে সক্ষম হইবেন, তাঁহারই পক্ষে আজ উৎসবের দিন,আনন্দের দিন। ভাদ্রোৎসবে যদি একজনের প্রাণও এই ত্রিবিধ সাধনের জন্য ব্যাকুল হয়, তাহাতে ঈশ্বরের নাম ধন্য হইল, উৎসব সফল হইল মনে করিব। ইহাতেই ভারতের বা পৃথিবীর সুদিন আসিবে এ উপাসনায় মানবের অনুরাগ জন্মিবে। এখনও ইহাতে যোগ দিবার মত লোকের অভাব আছে, এখনও ব্রাহ্মদের মধ্যে উপাসনায় অনুরাগহীনতা আছে; কিন্তু ভবিষ্যতের গর্ভে সেইকলা উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে—ব্রহ্মোপাসনাতেই জীবের গতি মুক্তি, কল্যাণ, আনন্দ এবং শান্তি; ব্রহ্মোপাসনাই জীবের সর্ব্বস্ব। ব্রাহ্মসমাজ সেইজন্য, ভাদ্রোৎসব সেইজন্য। প্রেমময় পিতা এই কৃপা করুন, উপাসনাই আমাদের সর্ব্বস্ব হউক।

ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

ভারতীয় ধর্ম্মে উপাসনার উৎপত্তি ও বিকাশ।

(৩)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী"। দেখা গিয়াছে প্রকৃত উপনিষৎ-প্রতিপাদিত ব্রহ্মবাদ এবং আধুনিক পাশ্চাত্যজ্ঞানবাদ (Idealism) ভাল করিয়া না বোঝাতে, আংশিক বোঝা হইতে, এক প্রকার পৌত্তলিকতা-সমর্থন আসে। বিশ্ব যখন ভগবানেরই রূপ,—"সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম",—তখন মূর্ত্তিপূজাতে দোষ কি? প্রত্যেক বস্তুতেই তো ব্রহ্ম প্রকাশিত, সুতরাং মূর্ত্তিপূজা ব্রহ্মেরই পূজা। এই কথার উত্তর এই যে, প্রত্যেক বস্তু ব্রহ্মের প্রকাশ বটে, কিন্তু মূর্ত্তির চলিত অর্থে তাহা ব্রহ্মের মূর্ত্তি নহে। মূর্ত্তির অর্থ চক্ষু-কর্ণাদিযুক্ত, হস্তপদাদিযুক্ত, দেহপ্রতিমা, যার সাহায্যে দেবতার কার্য্য প্রকাশিত হয় বলিয়া মূর্ত্তিপূজকের বিশ্বাস। মানবদেহ-যেমন মানবাত্মার যন্ত্র, পৌত্তলিকের মতে পুত্তলিকাও তেমনি দেবাত্মার যন্ত্র। এরূপ যন্ত্রবোধেই মূর্ত্তিপূজক মূর্ত্তির পূজা করে, উহার সমক্ষে নৈবেদ্যাদি অর্পণ করে এবং জীবিত মানবদেহ দর্শনের আনন্দ প্রতিমাদর্শনে সম্ভোগ করে, অথবা করিতে চায়। প্রতিমাতে এই যন্ত্রবোধ যাঁহার তিরোহিত হইয়াছে, যিনি কেবল ইহাকে অন্যান্য বস্তুর ন্যায় ভগবানের সাধারণ প্রকাশস্থানমাত্র বলিয়া বোধ করেন, তাঁহার পক্ষে মূর্ত্তিকে অজ্ঞানের ন্যায় পূজা করা, উহার সমক্ষে পূজা-উপহার প্রদান করা, কখনই উচিত নহে। তদ্দ্বারা কেবল ভ্রমের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, জ্ঞানসম্মত আধ্যাত্মিক পূজা প্রচারের ব্যাঘাত করা হয়। আর ইহাও বিবেচ্য যে, বস্তুমাত্রই ভগবানের প্রকাশ বটে, কিন্তু জড়, প্রাণ, চৈতন্য, বুদ্ধি, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতি ভেদে ব্রহ্মপ্রকাশের তারতম্য আছে, সুতরাং বিশ্ব ভগবানের রূপ হইলেও সর্ব্বত্র সমদর্শন সম্যক্ জ্ঞানের কার্য্য নহে। সম্যক্ জ্ঞান যেমন অভেদ দেখে তেমনি ভেদও দেখে। ইন্দ্রিয়-গোচর পদার্থে ভগবানের শক্তিমাত্র প্রকাশিত, তাঁহার জ্ঞান প্রেমাদি বরণীয় লক্ষণ প্রকাশিত নাই।

যাহা হউক, অজীর্ণ বেদান্তমত ও জ্ঞানবাদ (Idealism) যেমন লোককে পৌত্তলিকতার দিকে টানে, তেমনি অবতারবাদের দিকেও টানে। অবতারবাদের চলিত দার্শনিক ব্যাখ্যা এই যে, ধ্যানযোগে যখন সাধক ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্ব অনুভব করেন তখন তিনি "সোঽহং," "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি বৈদান্তিক "মহাবাক্য" উচ্চারণের অধিকারী এবং অবতারের সম্মান-প্রাপ্তির উপযুক্ত হন। "ভগবদ্গীতা"র শ্রীকৃষ্ণ, "ভাগবতের" কপিলদেব প্রভৃতি নাকি এই অর্থেই ভগবানের অবতার। "ভগবদ্গীতা"র শ্রীকৃষ্ণ "অনুগীতা"তে বলিতেছেন, তিনি যে যোগের অবস্থায় "ভগবদ্গীতা"র উপদেশ দিয়াছিলেন সেই যোগ হারাইয়াছেন, সুতরং অর্জ্জুনকে আর সেই সকল উপদেশ দিতে পারেন না। যোগেশ্বর ভগবান্ কখনও যোগচ্যুত হইতে পারেন, ইহা অত্যন্ত অযৌক্তিক কথা। সাধক যোগস্থ ও যোগচ্যুত দুইই হইতে পারেন, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাধক যতই বড় হউন্ না কেন, তিনি কখনই অনন্ত হইতে পারেন না, অনন্তের সহিত সকল অবস্থাতেই তাঁহার ভেদ থাকে। সুতরাং যে অবস্থাকে অবতারবাদের ভিত্তি করা হয়, তাহা কখনও ব্রহ্মের সহিত একান্ত অভেদের অবস্থা নহে। সম্যক্ যোগের অবস্থায় জীব ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছু দেখে না, ইহা ঠিক্। অজ্ঞানতাপ্রসূত স্থূলভেদ তখন বিলুপ্ত হয়। বিলুপ্ত হয় এই জন্য যে, তাহা মিথ্যা, তাহা অজ্ঞানতামূলক অন্ধকারমাত্র, জ্ঞানালোকে তাহা থাকিতে পারে না। দিব্যজ্ঞানের অবস্থায় সাধক দেখেন, তিনি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র অর্থাৎ পৃথক্ নহেন, তাঁহার জ্ঞান, শক্তি,

প্রেম, পবিত্রতা সবই ব্রহ্মের। তিনি তখন ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছু দেখেন না, কারণ প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুই নাই, সকলই ব্রহ্মাশ্রিত, ব্রহ্মাধীন। যাহা হউক, সাধক তখন ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছু দেখেন না বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি যে তখন ব্রহ্মের সমস্ত ঐশ্বর্য্য, সমস্ত মহিমা, দেখেন, ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা লাভ করেন, তাহা নহে। তিনি বোধ করেন তিনি "ব্রহ্মভূত" হইলেও ব্রহ্ম অসীম, তিনি সসীম; ব্রহ্ম পিতা, তিনি পুত্র। পিতার সহিত পুত্রের যে অভেদ তাহা একান্ত অভেদ নহে, তাহা ভেদগর্ভ অভেদ, তাহা ভেদাভেদ। সুতরাং "সোঽহং" "অহং ব্রহ্মাস্মি" প্রভৃতি বৈদান্তিক "মহাবাক্য" মুখ্যার্থে, অক্ষরার্থে, গৃহীত হইতে পারে না এবং অবতারবাদের ভিত্তিরূপেও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। লৌকিক অবতারবাদ যেমন ভ্রান্ত, শাস্ত্রীয় দার্শনিক অবতারবাদও তেমনি ভ্রান্ত। উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন আকারে সসীম অসীমের ভেদ অস্বীকার করে।

এখন আর একটী কথা বলিয়াই এই দীর্ঘ প্রবন্ধ শেষ করিব। রুচিবিজ্ঞান Aestheticsএর বহুল আলোচনা বশতঃ আজ কাল কোন কোন ব্রহ্মবাদীও ধর্ম্মে লিঙ্গবাদ (symbolism)এর পক্ষপাতী হইয়াছেন। উপযুক্ত সীমার ভিতরে symbolism এ কোন বিপদ্ নাই। দাম্পত্যের আদর্শ সাবিত্রী-সত্যবানের বা সীতারামের ছবি,—এই সমুদায় চিত্র ইতিহাস-মূলক হউক্ বা নাই হউক্,—মাতৃস্নেহের আদর্শ মেরির ক্রোড়ে যিশু বা যশোদার ক্রোড়ে শ্রীকৃষ্ণ, ধর্ম্মার্থে আত্মবিসর্জ্জনের আদর্শ ক্রুশ কাষ্ঠস্থ খ্রীষ্ট এবং দারুণ উৎপীড়নে উৎপীড়িত খ্রীষ্ট শিষ্যগণ, অর্জ্জুনের রথে সারথী ও উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ, ধ্যানস্থ বুদ্ধদেব এবং সঙ্কীর্ত্তনে প্রমত্ত গৌর নিতাই—এবম্বিধ চিত্র বা মূর্ত্তি ঘরে রাখাতে কোন ক্ষতি নাই, বরং প্রভূত লাভ; কিন্তু এই সমুদায়কে পুষ্প নৈবেদ্যাদি দিয়া পূজা করিলেই সমূহ বিপদ্। এই বিপদ্ যাঁহারা দেখেন না তাঁহারা ধর্ম্মের ইতিহাস জানেন না। ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ব নেতৃগণ অতীব দূরদর্শী ছিলেন, বর্ত্তমান নেতৃগণও অতি সাবধান। সেই জন্যই আমাদের উপাসনা-মন্দির-গুলিতে সামান্য সাজসজ্জা এবং সঙ্গীতাদি ব্যতীত সমস্ত লিঙ্গ-ব্যবহার (symbolism) নিষিদ্ধ। অসাবধান হইবার দিন যদি কখনো আসেও, এখন তাহা আসে নাই। আমাদিগকে অতি সতর্ক ভাবে ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মোপাসনার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে হইবে। উপনিষদের প্রাচীন ঋষি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এখনও আমাদের স্মরণীয় ও অনুসরণীয়—

> উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
> ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
> দুর্গম্ পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥

হে জীবগণ, অজ্ঞাননিদ্রা হইতে উত্থান কর, জাগ্রত হও, উৎকৃষ্ট আচার্য্যগণের নিকট যাইয়া পরমাত্মাকে জ্ঞাত হও। ক্ষুরের শাণিত ধার যেমন দুরতিক্রমণীয়, তত্ত্বজ্ঞানরূপ পথকে পণ্ডিতগণ তেমনি দুর্গম বলিয়াছেন।

ওঁ ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

পরলোকগতা কৃষ্ণভাবিনী দাস।*

বহুকাল পূর্ব্বে, সন তারিখ কিছুই স্মরণ নাই, দার্জ্জিলিংএ আমি ও আমার একটী বন্ধু সকালবেলা দোকানে যাব বলিয়া বেরিয়েছি এবং পথে যেতে যেতে বল্‌ছি যে দুটী মেয়ে কি করে দোকানে যা'বো, বড় সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে, এমন সময় গাউনপরা বনেট মাথায় দেওয়া একটী বাঙ্গালী মেয়েকে সেই পথে যেতে দে'খে তাঁর মুখের দিকে তাকাইলাম এবং নিঃসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলাম:—আমাদের সঙ্গে ঐ নীচের রাস্তায় একটু দোকানে যাবেন কি? আমাদের বড় সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে। অমনি সেই মহিলাটী আমাদিগকে সঙ্গে ক'রে দোকানে নিয়ে গেলেন। বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল, পরিচয় নাই তবু দে'খেই নিঃসঙ্কোচে কেমন ক'রে সাহায্য চাইতে পারিলাম। পরে অপরের নিকট তাঁর পরিচয় পেলাম। তারপর বহুদিন সে মুখখানি কোথাও দেখি নাই। ১০ বৎসর পূর্ব্বে একদিন অপরাহ্নে মোটা থান কাপড় পরা, থান চাদর গায়ে দেওয়া, শুধু পায়ে একটী স্ত্রীলোক সরলা দেবীর সঙ্গে আমাদের বাড়ী এলেন। দে'খে মুখখানি পরিচিত মনে হলো কিন্তু তিনিই যে সেই, একথা মনে স্থান দিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া রহিলাম। পরে সরলা দেবীর নিকট সকল কথা শুনিলাম এবং জানিলাম ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের সভ্য করিবার জন্য তাঁরা দুজনে বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমাকে সভ্য হবার জন্য অনুরোধ করিলেন। থান পরা পবিত্র মুখখানিতে যে কি জ্যোতি দেখিলাম, কোন প্রশ্ন না করিয়া স্ত্রী মহামণ্ডলের সভ্য হইলাম। তার পর থেকে মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখা শুনা হ'ত। বৎসরের শেষে চাঁদা দিতাম। অনেক সময় নিজেই এসে চাঁদা নিয়ে যেতেন। লোকের মুখে শুনতাম তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা, সেবার কথা, আত্মোৎসর্গের কথা, শু'নে ও দে'খে দিন দিন শ্রদ্ধায় হৃদয় ভ'রে যেতে লাগ্‌ল। কিন্তু তখনো তাঁকে দিদি বলে ডাকি নাই, এত আপনার ব'লে মনে হয় নাই।

আজ তাঁর দেহান্তরে কত ভগিনী অনাথা হয়েছে, কতজনে কত শোকের উচ্ছ্বাস জাগাইতেছেন, কত জন কত ভাবে তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্যের কথা বলিতেছেন, তাঁর অতুলনীয় গুণের কথা বলিতেছেন! আমার এমন ভাষা নাই, তাঁদের মত তাঁর মধুর-চরিত্রের সকল কথা বর্ণনা করিতে পারি। সকলকেই বলিতে দেখিয়া প্রাণ আঁকুবাঁকু করিতেছে; কিন্তু সে শক্তি নাই। তারপর আর একটী কথা সকলেরই কি চক্ষু থাকে? এবং থাকিলেও কি দৃষ্টি থাকে? সকলেরই কি হৃদয় থাকে? থাকিলেও কি গ্রহণ ও দানের ক্ষমতা থাকে? এমন যে অমূল্য জীবন চোখের কাছ দিয়া চ'লে গেল, এমন অযাচিত ভাবে এতকাল ধ'রে কত স্নেহ ভালবাসা দিয়ে গেলেন, কত সেবা নিলাম, সে দেব চরিত্রের কি বুঝিলাম? কোন দিক বুঝিলাম? আজ তাই প্রাণে হাহাকার উঠিয়াছে, কি অন্ধ, কি হৃদয়হীন আমি! এমন ক'রে প্রাণের সঙ্গে মিশিয়াছিলেন, তবুও বুঝি নাই। এমন ক'রে ধরা দিয়েছিলেন, তবু ধরিতে পারি নাই। আবার ভাবি, যদি কিছুই বুঝিলাম

* শ্রাদ্ধসভাতে শ্রীযুক্তা সুবালা আচার্য্য কর্ত্তৃক পঠিত।

না, তবে এ বেদনা অনুভব করিতেছি কেন? তাঁর জন্য চোখে জল আসে কেন? অন্ধেরও যে সময় সময় চোখ ফোটে, তাহা নিজের জীবনে দেখেছি। একটা ঘটনা বিশেষভাবে আমার চোখ ফুটাইয়া দিয়াছিল।

সে আজ তিন বৎসরের কথা। তিন বৎসর পূর্ব্বে গ্রীষ্মের সময় আমরা একত্রে নবদ্বীপ যাই। আমি যাই আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে দেখিতে। তিনি যান নবদ্বীপের "সেবাশ্রম" ও "মাতৃভবন" দেখিতে। তিন দিন একত্রে ছিলাম। তাঁর জীবনের অনেক কথা শুনিলাম—কি করিয়া অল্পবয়সে স্বামীর বিরহযাতনা সইতে না পেরে, বঙ্গের হিন্দুগৃহের কুলবধূ হ'য়ে সুদূর ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন—শ্বশুর প্রথমে খুব বিরোধী হ'য়েছিলেন, পরে অনুমতি দিলেন ও বলিলেন, 'নাতিনীটিকে রেখে যাও, নতুবা কি নিয়ে থাকবো'—শ্বশুরের মনের দিকে চেয়ে একমাত্র শিশু কন্যাকে রেখে গেলেন,—ভেবেছিলেন শীঘ্রই ফিরিবেন। কিন্তু সেখানে ৭ বৎসর কেটে গেল। স্বামী নানা ভাষা শিক্ষা ক'রে, সুপণ্ডিত হ'য়ে, নিজে পাশ্চাত্যের কতগুণে মণ্ডিত হ'য়ে দেশে ফিরে এলেন; প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনে জীবন যে কত সুন্দর ও কত গুণের আধার হ'তে পারে, তাহা নিজের জীবনে দেখালেন। কিন্তু কন্যাটিকে যে শিশু বয়সে কাছ ছাড়া ক'রেছিলেন, তার ফলে তার জীবনের ভবিষ্যৎ বড়ই দুঃখময় হ'য়েছিল। শৈশবে মাতৃস্নেহে ও যৌবনে প্রণয়ে বঞ্চিত হ'য়ে, কৈশোরে অশ্রুময় ভারবহ জীবন ত্যাগ ক'রে যখন পিতার সঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে অপর পারে চ'লে গেল, তখন তার জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন ক'রে, জীবন নিষ্ফল ও ভারবহ মনে করলেন না। ভগবানের বাণী শুনলেন, তিনি বলিলেন, "তোমার এক কন্যা গিয়াছে, তার জন্য দুঃখ ক'রে জীবনপাত ক'রো না, তার জন্য জীবনে কোন কর্ত্তব্য করিবার তোমার অবসর হয় নাই। সে জন্য অনুশোচনা করিও না। কত দুঃখিনী কন্যা রয়েছে, এখন বন্ধন মুক্ত হ'য়ে তাদের সেবা ক'রে জীবন ধন্য কর।" জীবনে বল পেলেন, আশা ও শান্তি পেলেন। এই কাহিনী শু'নে স্তম্ভিত হইলাম। তাই পার্থিব জীবনের বাকী দশ বৎসর—

"যাহা যায় আর যাহা কিছু থাকে
সব যদি সঁপিয়া তোমাকে
তবে নাহি ভয়, সবাই জেগে রয়
তব মহা মহিমায়"

এই কথার সার্থকতা দেখাইয়া নারীজীবন ধন্য ক'রে চ'লে গেলেন।

ষ্টেসন হ'তে রেলে উঠে নবদ্বীপ পৌঁছা পর্য্যন্ত দেখিলাম, দুখানি হাত সর্ব্বক্ষণ সেবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। আরোহীদের হাত ধ'রে নামাচ্ছেন, উঠাচ্ছেন, বসবার জায়গা ক'রে দিচ্ছেন; এমন ব্যবহার ক'রছেন যেন তারা তাঁর কত পরিচিত। আমরা কি করি? ষ্টেসনের নিকটে গাড়ী আসিলেই নিজে হাত পা ছড়াইয়া বসি, সঙ্গে লোক বেশী না থাকলে বিছানাসকল বেঞ্চের উপর তু'লে এমন ভাবে স্থান জুড়ে রাখি, যেন কেউ আর গাড়ীতে না আসতে পারে। কিন্তু তাঁর ব্যবহার কি দেখিলাম? চোখ খু'লে এইটী দেখলাম প্রথম। তারপর বাড়ী এলাম। বাসন মাজা থেকে আরম্ভ ক'রে কূয়র জল তোলা পর্য্যন্ত সবই নিজ হাতে করিতে যান, পাছে কেউ তার জন্য কিছু ক'রে ফেলে। আমরা কারো বাড়ী গেলে সেখানে আমাদের সমাদরের কোন ত্রুটি হ'ল কি না, এইটিই দেখবার জন্য ব্যস্ত থাকি। মা (আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী) তো তাঁর এরকম দে'খে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন। এই তিন দিনে তার এই সকল মিষ্ট ব্যবহারে মা একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। ভারততন্ত্রী মহামণ্ডলের কর্ত্তৃপক্ষগণ তার জন্য যে স্মৃতিসভার আয়োজন করিয়াছিলেন, মা তাতে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তাঁর জীবনের নানা কথা শু'নে বাড়ী এসে বলিলেন, "আহা এমন লোক আমার বাড়ী গিয়াছিলেন, আমি তাঁর উপযুক্ত সমাদর করিতে পারি নাই! ভগবান অতিথির বেশেই আমাদের ঘরে ঘরে লীলা ক'রে বেড়ান, কিন্তু অজ্ঞান আমরা বুঝিতে পারি নাই।" এই ব'লে চক্ষের জল ফেলিতে লাগিলেন। তারপর খাওয়া দাওয়ার পর "সেবাশ্রম ও মাতৃভবন" দেখিতে গেলাম। সেখানে গিয়ে প্রত্যেক ঘরে মেয়েদের কাছে গিয়ে গিয়ে তাদের দুঃখের কাহিনী শুনতে লাগলেন, আর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "আমার সঙ্গে যাবে কি? কেন এ দুঃখের জীবন ল'য়ে থাকবে?" কেউ কেউ যেতে চাইল। তারপর একটি দু বৎসরের শিশুকে দেখলাম, তার দুই চক্ষে ঘা, ঘরের দাবায় প'ড়ে কাঁদিতেছে। আমার ছেলেটি তখন ছোট, চোখের ঘা ছোঁয়াচে হতে পারে, ছোট ছেলের পাছে ছুঁত লাগে, এই ভাবনা মনে হল; ছেলেটিকে কোলে নিতে পারলাম না। তিনি দেখামাত্রই ছু'টে গিয়ে তাকে কোলে করলেন। তার সকল কান্না থেমে গেল, সে আর কোল ছাড়িতে চায় না। কোনও রূপে তখন তাহাকে রাখিয়া আসিলেন। পরে কলিকাতায় আসিবার সময় ষ্টেসন থেকেই যে তাঁর কোল লইল, ট্রেনে সমস্তক্ষণ একবারও তাঁর কোল ছাড়িল না। কি সস্নেহ আদর ও স্নেহের কোল! পিতৃমাতৃহীন অনাথ শিশু জন্মে যে স্নেহ আদর পায় নাই, সে সেই কোল ছাড়িবে কেন? আর একটি ২৪।২৫ বৎসর বয়সের কালা বোবা মেয়েকেও সঙ্গে ক'রে আনলেন। তাঁর আর আনন্দ ধরে না; তাদের যে কোথায় রাখবেন ভেবে পান না। এই মাতৃমূর্ত্তি স্বচক্ষে দে'খে জীবন সার্থক করিলাম! সেই দিন থেকে তাঁকে "দিদি" ব'লে ডেকেছি; ভক্তি ও শ্রদ্ধায় হৃদয় পূর্ণ হল, তাঁকে আর পর মনে করিতে পারি নাই। এইরূপ যারা তাঁর সংস্পর্শে এসেছে সকলেই তাঁকে আপনার মনে করেছে। কলিকাতায় এসেই পথে গাড়ী ডাকাইয়া ছেলেটিকে ডাক্তার দেখাইলেন ও ঔষধ কিনিয়া বাড়ী গেলেন। কিছুদিন নিজের কাছে রাখিয়া ছেলেটিকে অনাথাশ্রমে দিলেন ও মেয়েটিকে শুশ্রূষাশ্রমে পাঠাইলেন।

সে সময়কার একখানি চিঠি আমার কাছে আছে; তিনি লিখেছেন, "সেই ছেলেটির চোখ অনেকটা ভাল আছে,—হাবা মেয়েটি কাল শুশ্রূষাশ্রমে যাবার সময় বড় কেঁদেছিল, তার জন্য মনটা ব্যাকুল আছে, আজ আবার তাকে দেখতে যাবো।" সেই থেকে তাঁর সঙ্গে একটা প্রাণের যোগ সর্ব্বদা অনুভব করেছি। ডাকিবামাত্রই ছুটে আসতেন, কতদিন দুপুর রোদে

হেঁটে এসেছেন, কত বলেছি, দিদি, এমন ক'রে আসবেন না। নিজে যাই না, তিনি এমন ক'রে আসেন, বড় লজ্জা হল। তাঁর ত আর মান অপমান ছিল না। তাঁকে দে'খে ভক্ত চৈতন্তের কথাটি মনে হয়—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

উপাসনায় তার কত নিষ্ঠা দেখেছি! স্বামীবিয়োগের পর তিনি তাঁহার ভাসুর ও জায়ের কাছেই থাকতেন। তাঁর পরলোক-গমনের কয়েকমাস পূর্ব্বে তাঁর জা মারা যান। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। ভাসুর সেই সময় বলিলেন, "মা, আজ থেকে আমি তোমার সন্তানের মতই হলাম, আমার তো আর কেউ নাই।" তিনি সে কথা উপেক্ষা করিলেন না, সেই অবধি তাঁর সকল পরিচর্য্যার ভার তিনি লইলেন। একদিন তিনি সন্ধ্যা বেলা বলছিলেন, "ভগবান আমাকে সংসারের সকল বন্ধন হ'তে মুক্তি দিয়ে আবার বাঁধিলেন কেন? সন্ধ্যা বেলা তাঁর চরণে একান্ত হ'য়ে খানিকক্ষণ না বসিলে ভাল লাগে না, অথচ ঠিক সেই সময়ই আমার ভাসুরের খাবার সময়। ঠিক সময় বসিতে পারি না ব'লে মন চঞ্চল হয়, তাই ভাবি কেন তিনি আবার এমন ক'র্লেন।"

এমনি ক'রেই তিনি আমাদের মধ্যে থাকবেন মনে ক'রে বসেছিলাম। কিন্তু যাবার সময় একবার বলেও গেলেন না। হঠাৎ যখন শুনলাম দিদি নাই, প্রাণটা দমে গেল। কত যে শিখবো তাঁর কাছে মনে করিতাম, কিছু তো শেখা হয় নাই। আশীর্ব্বাদ করুন, সে লোক থেকে এ জীবনে ঐ দেবচরিত্রের মধুর স্মৃতি যেন প্রাণে জেগে থাকে।

প্রাপ্ত।

বিশ্বাসে অবিশ্বাস্।

(৩)

আমার দ্বিতীয় প্রবন্ধে রামানুজের ব্যাখ্যাত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদটা সমালোচনা করিয়া দেখিতে পাইয়াছি যে, সেটাকে কিম্বা তৎসংশ্লিষ্ট দার্শনিক জ্ঞানটাকে গ্রহণ করিতে গেলে ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মমতের বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয় না। এবার হেগেলের অধ্যাত্মবাদকে (idealismকে) একটুকুন্ বুঝিতে পারি কি না চেষ্টা করিয়া দেখিতে চাই। ডাঃ হীরালাল হালদার মহাশয়ের "Rational Basis of Theism" নামক ভাষ্যের সাহায্যেই সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

ঐ অধ্যাত্মবাদ বলে—

(ক) জড় (matter) ও আত্মা (mind) পরস্পরসাপেক্ষ নিত্য পদার্থ—অর্থাৎ, উহাদের একের সহিত অন্যটির এতই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যে, উভয়ের অস্তিত্বই উহাদের পরস্পরের মধ্যকার কথিত সম্বন্ধের উপরেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে,—অর্থাৎ, একটিকে ছাড়িয়া অন্যটির অস্তিত্বই সম্ভবপর হয় না ("Mind and matter are complementary to each other and have existence in virtue of their mutual relation")। আবার, অন্যস্থলে জড়কে আত্মার আধেয়ও বলা হইয়াছে (on the other hand the matter is nothing but the context of mind or spirit) এবং উহার মূল বস্তুটাকে—Substanceটাকে—জড়রাজ্য হইতে টানিয়া লইয়া সেই আত্মার সহিতই একীকরণ করা হইয়াছে।

(খ) মানবাত্মা সেই অনাদি অনন্ত আত্মারই আংশিক পুনর্জ্জাত সত্তা বা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বিশেষ ("a certain reproduction of itself on the part of the Eternal mind as the Self of man".)।

(গ) জড়জগৎ সেই অনাদি অনন্ত আত্মারই প্রকাশ (manifestation) বা তাঁহার জীবন্ত চিন্তার অভিব্যক্তি (expression of its living thoughts.)। কোন কোন স্থানে শুধু অভিব্যক্তি (expression) শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে।

(ঘ) এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা সেই অনাদি অনন্ত আত্মার যোগ-স্থাপনকারী (unifying) বা সম্বন্ধস্থাপনকারী (relation-making) মৌলিক বৃত্তি (principle) দ্বারাই রচিত।

এই কথাটার বিশদ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ডাঃ হালদার বলেন, আত্মার যোগস্থাপনকারী মৌলিক বৃত্তিটা আত্মজ্ঞানের একত্ব বা আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নহে। (what is this unifying principle? The answer is, it is the unity of self consciousness or mind)।

এখন উল্লিখিত মতগুলির সম্বন্ধে প্রধানতঃ আমার যাহা বক্তব্য তাহা বলিবার পূর্ব্বে স্বীকার করিতেছি যে, ইংরেজী mind শব্দটা লইয়া আমি কিঞ্চিৎ গোলযোগেই পড়িয়াছি। ইহাকে কোথাও 'mind' অন্যত্র 'self' এবং কোন কোন স্থানে 'spirit বলা হইয়াছে। ইহার বাঙ্গালা তরজমায় মন শব্দ ব্যবহার করিলে ইহার প্রতি সমুচিত সুবিচার করা হয় না বলিয়া 'আত্মা' শব্দই ব্যবহার করিলাম। কিন্তু বাঙ্গালাতে ইহার ঠিক্ প্রতি-শব্দ আছে কি না জানি না। আর আত্মজ্ঞানের একত্বকে (unity of self-consciousnessকে) আত্মা বলা হইয়াছে কি অর্থে, তাহার তাৎপর্য্যটাও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না; যদিও দেখিতেছি যে, উহার উপরেই এই অধ্যাত্মবাদের বিশ্বরচনাবিষয়ক দার্শনিক যুক্তি তর্ককে সম্পূর্ণ রূপেই সংস্থাপিত করা হইয়াছে। অধ্যাত্মবাদের সকল মতামতের সম্যক্ পর্য্যালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা করাও অসম্ভব। আমি কেবলমাত্র সেই সেই মতেরই কিছু কিছু সমালোচনা করিব, যে যে মতের সহিত ধর্ম্মবিজ্ঞানের বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, মানবেতর জীবসমূহের কোন প্রকারের আত্মা ও আমিত্ব বোধ আছে কি না? এই বিষয়ে এই অধ্যাত্মবাদ সম্পূর্ণরূপেই নীরব। তাহার এই নীরবতায় এবং সমস্ত জীব-জগতের মধ্যে একমাত্র মানুষের আত্মা ও আত্মজ্ঞানকেই অনাদি অনন্ত আত্মার আংশিক সংস্করণ বলিয়া গ্রহণ করায় ইহাই মনে হয় যে, তৎকর্ত্তৃক অপরাপর জীবসমূহ আত্মা ও আমিত্বের অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। তবে তাহাদের যে একটা বাজালা আত্মা আছে তাহা সাক্ষাৎ ভাবে না হইলেও

গৌণভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু অধ্যাত্মবাদে এই আত্মাটার কোনরূপ ব্যাখ্যাই দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশ্ব-সৃষ্টি-প্রকরণে এই আত্মাটাও কি তবে জড়জগতেরই অন্তর্ভুক্ত এবং জড়জগতের ন্যায়ই সেই অনাদি অনন্ত আত্মার চিন্তাসম্ভূত পদার্থমাত্র?—তাহার অংশ বিশেষ নয়?

মানবাত্মা সম্বন্ধে একান্ত অধ্যাত্মবাদী ইংলণ্ডীয় দার্শনিক-প্রবর গ্রীন্ বলেন,—'আমরা যে আমাদিগকে সীমাবদ্ধ বলিয়া জানি এবং পৃথক্ ও স্বতন্ত্র বলিয়া অনুভব করি, ইহাই প্রমাণিত করে যে, আমাদের মধ্যে অসীমত্বের বীজ বিদ্যমান রহিয়াছে। অন্য একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তিকে আমার জানিতে হইলে, তাহা আমি আমার নিজকে অতিক্রম না করিয়া (transcend না করিয়া) জানিতে পারি না। আমি কেবলমাত্র একটা সীমাবদ্ধ ব্যক্তি হইলে অন্যের অস্তিত্বকে জানা আমার পক্ষে সম্ভবপর হইত না। বাস্তব-পক্ষে আমার মধ্যে যে এক অসীম আছেন, তিনিই আমাকে জানেন, অন্যান্য ব্যক্তিগণ হইতে আমার তুলনামূলক প্রভেদও করেন।'

এখানে সাধারণ জ্ঞান জিজ্ঞাসা করিতে পারে না কি যে, একটা কুকুর আপনাকে অন্য একটা কুকুর হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া কি জানিতে পারে না? এবং আপনাকে, অন্ততঃ সময়ে সময়ে, সীমাবদ্ধ বলিয়া বোধ করে না? তাহা যদি না করিত,—আপনার শক্তি সামর্থ্যকে যদি সীমাবদ্ধ বলিয়া অনুভব না করিত,—তাহা হইলে সে লড়াই করিবার জন্য আক্রমণকারী একটা ব্যাঘ্রের সম্মুখীন্ হইতে সাহস পায় না কেন? যদি বল যে, আত্মরক্ষার্থ সেই সাহস না পাওয়াটা তাহার সহজ জ্ঞানেরই (instinct এর) কার্য্য, তাহা হইলে প্রত্যুত্তরে বলিতে পারা যায় না কি যে, মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও সীমাবদ্ধতার বোধও তাহার সাধারণ জ্ঞান হইতেই উৎপন্ন, তজ্জন্য অসীমাভিমুখীন জ্ঞানের প্রয়োজনাভাব? বস্তুতঃ সাধারণ জ্ঞান, এমন কি, বিজ্ঞানও, এই ক্ষেত্রে মানবাত্মা ও পশু-আত্মার মধ্যে পরিমাণের প্রভেদ ছাড়া প্রকারের প্রভেদ কিছু দেখিতে পায় না। আর যদি আমার ভিতরকার অসীমই আমাকে জানেন এবং আমাকে অন্য একজন ব্যক্তি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া জানেন, তাহা হইলে ঐ কুকুর সম্বন্ধীয় তদ্বিধ জ্ঞানের মালীক কে বা কি? মানবাত্মায় অসীমত্বের বীজ নিহিত নাই, ইহা আমি বলিতেছি না; আমার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ইহাই বলা যে, যে যুক্তিটার বলে অধ্যাত্মবাদ মানবাত্মাকে অসীম-ভাবাপন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছে এবং পশুর আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছে, আমি তাহার সারবত্তা অনুভব করি না। আবার, অধ্যাত্মবাদের এই বচনানুসারে কিছুকে কাহারো জানিতে হইলেই সেই কিছুকে তাহার অতিক্রম করা—transcend করা যদি অপরিহার্য্যই হয়, তাহা হইলে যে প্রভুভক্ত কুকুর তাহার প্রভুকে জানে ও চিনে, সেই প্রভুকে অতিক্রম করাও তাহার পক্ষে অনিবার্য্য হয় না কি? তদ্রূপ উপনিষদের যে ঋষি বলিয়াছেন,—"হে অমৃতের পুত্রগণ! তোমরা শোন, আমি অমৃতময় পুরুষকে জানিয়াছি," সেই ঋষির পক্ষেও ঈশ্বরকে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল না কি? আরো একটা কথা এই যে, পশুর আত্মা যদি বিশ্বাত্মার অংশবিশেষই না হইল, কিম্বা তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপেই স্বতন্ত্র প্রকৃতিবিশিষ্ট হইল, তাহা হইলে আমাদিগকে এই বিশ্বরাজ্যে দুইটা বিভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হয় না কি? তদবস্থায় 'বিভিন্নতার ভিতর একতা' ('Unity in difference') কথাটার স্বার্থকতা তো কিছুমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।

তার পর, 'আবার মানবাত্মা সেই অনাদি অনন্ত আত্মারই সঙ্কিপ্ত সংস্করণ', অধ্যাত্মবাদের এই উক্তিটাকে বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য ডাঃ হালদার কহিয়াছেন,—"Verily the 'I', of which we are conscious, is the divine Being Himself, God is we, we are God. The Father is identical with the Son, the Son is identical with the Father & etc"—অর্থাৎ 'আমি', যে 'আমি'র বোধ আমাদের প্রত্যেকরই আছে, সেই আমি আর কেহ নহে, সেই পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরই, ঈশ্বরই আমরা, আমরাই ঈশ্বর। পিতা পুত্রের সহিত একাত্ম, পুত্র পিতার সহিত একাত্ম। এটা ত দেখা যায় "সোঽহং"বাদের সমতুল্য কথাই। তবে তিনি (ডাঃ হালদার) এতদুপলক্ষে একটুকুন্ প্রভেদের কথাও যে না বলিয়াছেন এমত নহে, যথা,—"The difference lies only in its being a partial reproduction of the supreme consciousness under certain conditions."—অর্থাৎ আমাদের আত্মজ্ঞান সেই মহান্ জ্ঞানের আংশিক সংস্করণ বলিয়াই সেই উভয় জ্ঞানের ভিতর যা কিছু প্রভেদ। প্রভেদটা কি বস্তুতঃই সামান্য? তা যাহাই হউক, আমি কিন্তু অনাদি অনন্ত আত্মার আংশিক পুনর্জ্জন্মগ্রহণটা কিরূপ তাহা আদবেই বুঝিতে পারিলাম না। সেই পবিত্রস্বরূপ পরমাত্মন্ আপনার অনাদি অনন্ত ও অখণ্ড সত্তা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া সেগুলিকে দেশকালে সীমাবদ্ধ, পাপ প্রলোভনের বশীভূত ও হিংসাদ্বেষাদির অধীন করিয়া মানবাত্মা-রূপে জন্মদান করিলেন কি? অথচ তাহাতে তাঁহার আপনার পূর্ণ ও পবিত্রস্বরূপত্ব অব্যাহত রহিল? তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া যথেচ্ছাচারী, ইচ্ছাময় বলিয়া খামখেয়ালী হইতে পারেন কি? তাঁহার সেই অংশগুলি তাঁহার নিকটে এমন কি অপরাধ করিতে পারে, যে জন্য এই সংসাররূপ আণ্ডামান দ্বীপে তাহারা দীন হীন দুর্ব্বল মানবাত্মারূপে ইহজীবনের জন্য নির্ব্বাসিত হইল?

আরো দেখিতে পাওয়া যায়, অধ্যাত্মবাদ পরমাত্মা ও মানবাত্মার মধ্যে অভেদ ভাব দেখাইবার জন্য যেরূপ ব্যস্ত, ভেদ-ভাব দেখাইতে সেরূপ যত্ন ও চেষ্টা করে নাই। মানুষের জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য ও পবিত্রতা সেই অসীম জ্ঞানের প্রেম, পুণ্য ও পবিত্রতার তুলনায় যে কত অকিঞ্চিৎকর ও সামান্য তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে "ঈশ্বরই আমরা, আমরাই ঈশ্বর" কোন ধর্ম্মজীবনলাভার্থী মানুষ জিহ্বাগ্রেও আনিতে পারে কি? তবে যদি সেরূপ কথা কখনও কেহ কহিয়া থাকেন, যেমন খৃষ্ট কহিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে—তাহা ঐতিহাসিক হিসাবে সত্য কি না, এবং সত্য হইলেও তাঁহার ধর্ম্মসাধনার কোন্ অবস্থায় তিনি তাহা কহিয়াছিলেন এবং সেটা আত্মপ্রত্যয়েরই কথা না আত্মজ্ঞানের কথা, এই সমস্ত বিষয় না জানিয়া রামা, শ্যামা আমরা সকলেই যদি সে কথার প্রতিধ্বনি করিতে যাই, তাহা একটা হাস্যকর ব্যাপার হয় না কি? আর,

খৃষ্ট বলিয়াছিলেন বলিয়াই সে উক্তিটা ভ্রম ও প্রমাদের অতীত? এরূপ মনে করিবার কারণ তো কিছু দেখিতে পাই না। তাঁহার কোন কোন পাপীর পক্ষে অনন্ত নরকভোগের কথা এবং মৃত্যুর পরে সকল মানব আত্মারই বিচারের একটা বিশেষ দিনের কথাটা কি অধ্যাত্মবাদিগণ স্বীকার করেন? আরো বোধ হয় বলা যাইতে পারে যে, ঐরূপ কথা যদি কেহ কহিতে পারে, তবে তাহা ধর্ম্মবিশ্বাসীই পারেন, ধর্ম্মজ্ঞানী পারেন না। আবার, পরমাত্মা এবং মানবাত্মার মধ্যকার বৈষম্য কেবলমাত্র পরিমাণগত নহে, অনেক স্থানেই প্রকারগতও। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মানবাত্মার প্রেমে ভক্তি ও দাম্পত্য প্রেম অতি উচ্চ স্থানই অধিকার করে, কিন্তু ঈশ্বরের প্রেমে তদ্রূপ কিছু থাকিতে তো পারে না। মানুষের দয়া উপচিকীর্ষা ইত্যাদি বহুলপরিমাণেই স্বার্থজাত সহানুভূতিমূলক—অর্থাৎ আমি যদি আমার দুঃস্থ প্রতিবাসীর ন্যায় দুরবস্থায় পতিত হই, তাহা হইলে আমাকেও তো তাহার ন্যায় ক্লেশই পাইতে হইবে, এইরূপ একটা আশঙ্কা আমার মনের মধ্যে কার্য্য করে বলিয়াই আমি সচরাচর ঐ প্রতিবাসীর ক্লেশমোচনের জন্য ব্যস্ত হই এবং তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হই। কিন্তু ভগবানের সম্বন্ধে তদ্বিধ স্বার্থজাত সহানুভূতি আমরা কল্পনায়ও আনিতে পারি কি? আমাদের উপকারপ্রাপ্তির জন্য কৃতজ্ঞতা বোধ আছে, কিন্তু ঈশ্বরের তদ্রূপ কিছু থাকিতে পারে কি? দৃষ্টান্ত বাড়াইবার প্রয়োজন দেখি না। যাহা বলা হইল তাহা হইতেই এই প্রবন্ধের পাঠকগণ আমার মনোভাবটা বুঝিতে পারিবেন বলিয়া আশা করি।

আর, আমরা সকলেই যদি 'ঈশ্বরের সঙ্ক্ষিপ্ত সংস্করণ' হই, তাহা হইলে আমাদের পরস্পরের মধ্যেই বা এত প্রভেদ দৃষ্ট হয় কেন? একজন গারো বা কুকী কি মানসিক বা আত্মিক বিষয়ে একজন হেগেল্ বা গ্রীণের সমকক্ষতার দাবী করিতে পারে? আর সভ্যসমাজেও জ্ঞানে, প্রেমে ও পুণ্যে বিশেষ প্রভেদবিশিষ্ট মানুষের সংখ্যা কি কম? (ক্রমশঃ)

অতুলচন্দ্র রায়।

বিশ্বাস।

(প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর)

গত ১৬ই আষাঢ়ের তত্ত্বকৌমুদীতে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় মহাশয়ের লিখিত আমার বক্তৃতার প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়, সেই প্রতিবাদের আমার প্রত্যুত্তর ১৬ই শ্রাবণের তত্ত্বকৌমুদীতে 'সত্যদর্শী ও সত্যে বিশ্বাসী' শিরোণামে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই প্রবন্ধে চলিত বিশ্বাস সম্বন্ধে আলোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল, সুতরাং বিশ্বাসের বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন কথা আমি বলি নাই। এজন্য রায় মহাশয় আমাকে ভুল বুঝিতে পারেন, এই মনে করিয়া বিশ্বাসের মৌলিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আমার বক্তব্য অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি। মহর্ষি বলিয়াছেন;—'ব্রহ্ম সিদ্ধান্তসাপেক্ষ নহে, আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ'।

আত্মপ্রত্যয় কি? আপনাকে প্রত্যয় অর্থাৎ আপনাকে বিশ্বাস করিবার নামই 'আত্ম প্রত্যয়।' মহাত্মা সক্রেটিসের জনৈক শিষ্য তাঁহাকে এই মর্ম্মে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'ধর্ম্মের সার কথাটি বলিয়া দিন্।' সক্রেটিস্ বলিলেন, 'আপনাকে জান, আপনাকে চিন,'; অর্থাৎ আপনাকে বিশ্বাস কর। 'আত্মপ্রত্যয়' স্বতঃসিদ্ধ। 'আমি আছি' এই বিশ্বাস সকল বিশ্বাসের মূলে। আমি দর্শন করিতেছি, স্পর্শ করিতেছি, শ্রবণ করিতেছি, আস্বাদন করিতেছি, ইহাতে সন্দেহ আসিতে পারে না। সন্দেহ আসিলেও 'আমি সন্দেহ করিতেছি' এই ভাব থাকে। 'আমি আছি',—কিরূপে আছি? দ্রষ্টা, শ্রোতা, কর্ত্তা, মন্তা রূপে আছি। এই যে বিষয়জগৎ, ইহা কি আমা হইতে স্বতন্ত্র স্বাধীন বস্তু? জ্ঞাত বিষয়ের সহিত আত্মার সম্বন্ধ কি? আত্মপ্রত্যয় ও বিষয়প্রত্যয় মূলে একই বস্তু, এক বস্তুর দুইটি দিক্-মাত্র। বিষয়প্রত্যয়ও আত্মপ্রত্যয়ের অন্তর্গত।

"প্রথমতঃ একটি বিশ্বাস এই যে, আমরা যে কোন বস্তুই জানি না কেন, প্রত্যেক জ্ঞাতবস্তু অনুক্ষণই আত্মার জ্ঞানে বর্ত্তমান আছে; অর্থাৎ বস্তুসমূহ আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইবার সময়ে যে রূপে—জ্ঞানের বিষয়রূপে প্রকাশিত হয়, ইন্দ্রিয়সান্নিধ্যে না থাকিলেও সেরূপ জ্ঞানের বিষয়রূপেই বর্ত্তমান থাকে।"

'দুইটা বা ততোধিক দেশ আছে, তাহাদের মধ্যে কোন যোগ নাই, একটার সীমা হইতে আর একটা আরম্ভ হয় নাই'—এরূপ বিশ্বাস অসম্ভব। দেশের একত্বে বিশ্বাস যদি অনতিক্রমণীয় হয়, তবে দেশের সাক্ষীরূপী আত্মার একত্বে বিশ্বাসও অনতিক্রমণীয়।"

"ধর্ম্মসাধক যে নিজ জীবনে সত্য, ন্যায় ও প্রেমের আধিপত্য স্থাপনের সম্ভাবনায় বিশ্বাস করেন, এই বিশ্বাস বস্তুতঃ সত্য, ন্যায় ও প্রেমময় ঈশ্বরে বিশ্বাস ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

"নাস্তিকের আত্মপ্রত্যয়েও অতর্কিত ভাবে পরমাত্মপ্রত্যয়—শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পুরুষে বিশ্বাস—নিহিত রহিয়াছে।" "ফলতঃ ব্রহ্মপ্রত্যয় ও ব্রহ্মজ্ঞান মূলে একই বস্তু। একই বস্তুকে অস্ফুট অবস্থায় প্রত্যয় এবং স্ফুট অবস্থায় জ্ঞান বলা যায়। ইহা যখন অজ্ঞাত ভাবে আমাদের সমুদায় বিশ্বাস ও চিন্তাকে নিয়মিত করে, যখন মানব বুঝিতে পারে না যে, ইহা বস্তুতঃই তাহার সমুদায় বিশ্বাসের ভূমি, তখন ইহাকে কেবল 'প্রত্যয়' বলা যাইতে পারে। যখন চিন্তার সাহায্যে ব্রহ্মপ্রত্যয়কে সমুদায় প্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠা বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তখন ইহাকে 'ব্রহ্মজ্ঞান' বলা যায়।" *

মানবাত্মার অন্তরস্থ বিশ্বাস বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, তাহার গতি অনন্তমুখীন্।

"চিনি না জানি না বুঝি না তাঁহারে, তথাপি তাঁহারে চাই।
সজ্ঞানে অজ্ঞানে পরাণের টানে তাঁর পানে ছুটে যাই।"

সাধক কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় এই গতিকে বলিয়াছেন—"ব্রহ্ম টান।" তিনি আরো স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, এই টানই

* পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রণীত "অদ্বৈতবাদ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" নামক পুস্তকের 'আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান' প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

আমাদের প্রাণ; অর্থাৎ মানবাত্মা অনন্ত পথে—অনন্তের দিকে চলিয়াছে, এই চলাই আত্মার জীবন। মানবাত্মার অনন্তমুখীন গতির ভাব যাহাদ্বারা প্রকাশ পায় তাহাই প্রত্যয়—বিশ্বাস। এই বিশ্বাসে তিনটি সত্য প্রকাশিত হয়;

(১) ব্রহ্মের সহিত একত্ব।

"তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই, কোন বাধা নাই ভুবনে।"

(২) মানবাত্মার অমরত্বে বিশ্বাস।

"অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে, দেখা দেয় অবশেষে,
কালের তিমির রজনী ভেদিয়া তোমার মুরতি এসে,
চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুব তারকার বেশে।"

(৩) পরলোক।

"দু দিন দিয়ে ঘেরা ঘরে, তাইতে যদি এতই ধরে,
চিরদিনের আবাস খানা সে কি শূন্যময়? জয় অজানার জয়!"

(৪) মানবাত্মার উন্নতিশীলতা।

"অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা।
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।"

সাধারণ লোকে কবির বাণীকে ভাবুকের কথা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায়। এ স্থলে সম্বন্ধবাদী দার্শনিক আসিয়া বলেন,—'কবি ঠিক কথা বলিয়াছেন।' "সত্যং জ্ঞানমনন্তং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং ব্রহ্মে বিশ্বাস অনতিক্রমণীয়, ইহা অন্য সমুদায় বিশ্বাস ও চিন্তার সহিত অপরিহার্য্য রূপে জড়িত।" অর্থাৎ ঈশ্বর আছেন, আত্মার অমরত্ব ও উন্নতিশীলতায় বিশ্বাস আত্মপ্রত্যয়ের সহিত একীভূত। পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখন আবার বলিতেছি, এ বিশ্বাস চলিত বিশ্বাস নহে। ইহা আত্মপ্রত্যয়, ইহা ব্রহ্মজ্ঞান বা বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের 'গোমুখী' হইতেই জগতে ধর্ম্মধারা প্রবাহিত হইতেছে। নির্ঝরিণীর জল যখন উৎস হইতে উৎসারিত হয়, তখন অতি নির্ম্মল ও পবিত্র থাকে, যতই মৃত্তিকা ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে, ততই কর্দ্দমাক্ত হয়, পঙ্কিল হয়; তেমনি মানব অন্তরের আত্ম-প্রত্যয়লব্ধ সত্য—বিশ্বাসলব্ধ সত্য দেশাচার, কুসংস্কার, কুব্যাখ্যা-কারকগণের হাতে পড়িয়া কদাকার হইয়া যায়। এই আত্ম-প্রত্যয়ের প্রকৃতি—বিশ্বাসের প্রকৃতি, পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া যে ব্রাহ্মসমাজের একটি বিশেষ কার্য্য, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে?

সত্যং জ্ঞানমনন্তং এবং মঙ্গল ও পবিত্রস্বরূপে 'অনতিক্রমণীয় বিশ্বাস' আত্মপ্রত্যয় রাজ্যে প্রবেশ করিয়া জ্ঞানিগণ উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পান। অসত্যের মধ্যে সত্যে বিশ্বাস, অজ্ঞানতার মধ্যে জ্ঞানে বিশ্বাস, অপূর্ণতার মধ্যে পূর্ণতায় বিশ্বাস, অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গলে বিশ্বাস, অপবিত্রতার মধ্যে পবিত্রতায় বিশ্বাস, মানবাত্মার প্রকৃতি। এই প্রকৃতি হইতে কেহ তাহাকে বিচ্যুত করিতে পারে না। মানবাত্মার এই প্রকৃতি দেখিয়াই ভট্ট মোক্ষমূলার বলিয়াছেন,—"মানবাত্মার গতি অনন্তমুখীন।" এই বিশ্বাসই "ধর্ম্মের মূল।"

আর এক প্রকারের বিশ্বাস আছে; তাহাকে 'চলিত বিশ্বাস' বলা যাইতে পারে। শাস্ত্র, গুরু, লোকাচার, দেশাচার হইতে মানব-মনে এই বিশ্বাস জন্মগ্রহণ করে। মহর্ষি-তনয় রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই চলিত বিশ্বাসের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হন না কি? এই আত্ম-তত্ত্ব-মূলক বিশ্বাসকে সকলের নিকট উপস্থিত করা অপর দিকে কল্পিত বিশ্বাস দুর্গ চূর্ণ করাই সম্বন্ধবাদী দার্শনিক-দিগের মুখ্য কার্য্য। যখন পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ পণ্ডিতগণ কল্পিত বিশ্বাসের জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন,—জাতিভেদ, মূর্ত্তিপূজা এবং অভ্রান্তরূপে শাস্ত্র মানিয়া চলার সুফল বর্ণনা করিতে লাগিলেন, তখন সাহিত্যিক, বাগ্মী, ধর্ম্মোপদেষ্টা নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বজ্রগম্ভীর স্বরে তাহার প্রতিবাদ করিলেন। সেই সকল দার্শনিক বক্তৃতার সারসংগ্রহ 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। এই স্থলেই আমরা দার্শনিকের কার্য্য ও প্রয়োজনীয়তা বিশেষ রূপে দেখিতে পাই। কোন্‌টি মানবাত্মার প্রকৃত বিশ্বাস, কোন্‌টি কাল্পনিক বিশ্বাস, তাহা দেখাইয়া দেওয়াই উচ্চতম দর্শনের কার্য্য।—"বিজ্ঞান আবিষ্কার করে, বর্ণনা করে, ঘটনাগুলিকে দেশ ও কালগত নিয়মের সহিত মিলাইয়া দেখে। দর্শনশাস্ত্র তাহার কারণ-তত্ত্ব ও তাৎপর্য্য নির্ণয় করে।"

"অতএব দেখা যাইতেছে দৃশ্যমান দ্রব্যগুলিকে স্বতন্ত্র সত্তা বলিয়া না মানিয়া, তাহাদিগকে অদৃশ্য শক্তির ক্রিয়া বলিয়া আজ কাল গণ্য করা হয়।"

"জাগতিক কারণ-তত্ত্বের কেবল আকার এবং প্রণালীই বিজ্ঞানের আলোচ্য। তাহার প্রকৃতি ও অভিপ্রায়ের আলোচনা দর্শন ও ধর্ম্মের অধিকারভূত।"

"এক্ষণে আমরা কোন ইঙ্গিত বা অলৌকিক কোন ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের শক্তিকে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করি না; কিন্তু তাঁহারই জগতের মধ্যে আমাদের ইতিহাস, বিজ্ঞান ও জীবনের মধ্যেই তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করি। তিনি সর্ব্বত্রই রহিয়াছেন এবং তাঁহার ক্রিয়া নির্ভরযোগ্য নিয়মের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে।" *

রায় মহাশয় আমার বক্তৃতার প্রতিবাদ করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার নাম দিয়াছেন—"বিশ্বাসে অবিশ্বাস।" তিনি যে বিদ্রূপভাবে এই 'নামকরণ' করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। আমি উহা সত্যভাবে গ্রহণ করিতেছি। চলিত বিশ্বাসে অবিশ্বাস না জন্মিলে কেহ 'আত্মপ্রত্যয়'-রাজ্যে প্রবেশ করিয়া 'আত্মার অনতিক্রমণীয় বিশ্বাস' লাভ করিতে পারে না। শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণ এ কার্য্যে আমাদের সহায়, এ কথা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? আত্মপ্রত্যয়ের ভূমিতে—বিশ্বাসের ভূমিতে মানবাত্মা উপস্থিত হইয়াই গাহিতে থাকে,—

"প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরম ধন হে।
চিরপথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে।

* 'প্রবাসী' শ্রাবণ, ১৩১৮, হিবার্ট জার্ণেলের সন্দর্ভ হইতে গৃহীত।

তৃপ্তি আমার অতৃপ্তি মোর, মুক্তি আমার বন্ধন-ডোর,
দুঃখ সুখের চরম আমার জীবন মরণ হে।
আমার সকল গতির মাঝে পরম গতি হে,
নিত্য প্রেমের ধামে আমার পরম পতি হে ;—"

ইতঃপূর্ব্বে চলিত বিশ্বাসের যে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা স্থূল ; আর এক প্রকার অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম চলিত বিশ্বাস আছে ; তাহাও খাটি বিশ্বাসে উপনীত হইতে বাধা প্রদান করে। তাহা একেশ্বরবাদসম্বন্ধীয় চলিত বিশ্বাস। এই শ্রেণীর সাধকগণ বলেন, জড়বস্তু এবং জ্ঞান দুইটি স্বতন্ত্র জিনিস। ঈশ্বর, মানবাত্মা এবং জগৎ এই তিনটিই পরস্পর স্বতন্ত্র। অহং ইদং এবং ব্রহ্ম এই তিনের মধ্যে মৌলিক একতা নাই। এই এব্রাহিম ধারার চলিত বিশ্বাস যে আত্মপ্রত্যয়প্রসূত স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদ তাহা দেখাইয়া দেয়।*

শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল।

ব্রাহ্মসমাজ।

ভাদ্রোৎসব—একাধিকনবতিতম ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে ৫ই ভাদ্র সায়ংকালে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ও শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ "ব্রহ্মোপাসনা" বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ৬ই ভাদ্র প্রাতে কলেজ স্কোয়ার হইতে উষাকীর্ত্তন করিয়া মন্দিরে পৌছিলে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশ অন্যত্র প্রকাশিত হইল। অপরাহ্নে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমান্ সুকুমার রায় শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর সঙ্কীর্ত্তনান্তে উপাসনা। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৭ই ভাদ্র প্রাতে উপাসনা—শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়ংকালে সংকীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। সকলেই বিশেষভাবে সম্মিলিত ব্রহ্মোপাসনার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বলেন।

দাতব্য বিভাগ—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য বিভাগের সম্পাদক কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত দানপ্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন :—

(১৯১৮ সাল—জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর)

শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ ১৲, ডাঃ আর, সি, নাগ ১২৲ শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ (পিতৃশ্রাদ্ধে দান) ৩০৲ মিসেস্ হিমাংশু-নাথ চক্রবর্ত্তী ১৲, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে ৫৲ মিসেস্ গগনচন্দ্র হোম ৩৲, শ্রীযুক্ত বাণীকণ্ঠ রায় চৌধুরী ১৲, লেডি নির্ম্মলা সরকার ৫৲, শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর রায় ২৲, মিসেস সুখদা নাগ ৫৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৲ শ্রীমতী সুবালা আচার্য্য ৫৲, মাঃ সমাজ আফিস—(শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বসু ১৲, সরলা মহলানবীশ ফণ্ড ৩৸০, কালীপ্রসন্ন বসু ফণ্ড ৩৸০, সৎসঙ্গী ফণ্ড ৩৲, কানাইলাল সেন ফণ্ড ৩৫৲, অভয়াচরণ মল্লিক ফণ্ড ৩৸০, হিমাংসুবালা গুহ ফণ্ড ৩৸০, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন ১৲, শ্রীযুক্ত বিভূতি-ভূষণ মল্লিক ২৲, মিসেস্ বি, ধর ৩৲, শ্রীমতী কুমুদবালা রাহার ভগিনীগণ ৩৲, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখার্জ্জি ১৲, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ পাল ৫৲, মিঃ জে, চট্টোপাধ্যায় ৫৲, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু ১৲, কাজী আবদুল গফুর ১৲, শ্রীযুক্ত কে, সি, নিয়োগী ২৲, শ্রীযুক্ত আশুতোষ দাস গুপ্ত ১৲, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মুখার্জ্জি ৩৲, শ্রীযুক্ত মণিমোহন মজুমদার ১৲, শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র বসুর পুত্র কন্যাগণ ৫৲, শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার গুপ্ত ২৲, শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী মুখার্জ্জি ৫৲, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ রায় ৫৲, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস ১৲, শ্রীযুক্ত অনন্তনাথ মিত্র ৩০৲, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ ব্রহ্মব্রত ১৲, শ্রীযুক্ত হৃদয়কৃষ্ণ দে ১৲, শ্রীযুক্ত শিবনাথ দত্ত ২৲, শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র গুপ্ত ২৲, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ দে ২৲, শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী ৫৲, মিঃ এইচ, এল, খাস্তগির ৫৲, মিঃ ইউ, মঙ্গাপ্পা ৫৲, শ্রীযুক্ত মধুসূদন জানা ৮০, ডাঃ এস্, এন, গুপ্ত ২৲, কুমারী উষাপ্রভা দত্ত ১৲, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র ব্যানার্জ্জি ৫৲, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চৌধুরী (জমিদার, হেমনগর) ২৫৲, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ঘোষাল ৩৲, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত বরকাকুতি ৫৲, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ৫৲, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ও ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১০৲, শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত রায় চৌধুরী ৫৲, শ্রীযুক্তা সারদামঞ্জরী দত্ত ২৲, মিঃ এ, সি, বাগচী ৫৲, শ্রীযুক্ত হরকুমার গুহ ৫৲, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ দাস ১৲, শ্রীযুক্ত সত্যব্রত মুখার্জ্জি ও শ্রীমতী লীলালতিকা ব্যানার্জ্জি ২০৲, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস ৪৲, ডাঃ এন, কে, ধর ৫৲, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি ২৲, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র ব্যানার্জ্জি ৩৲, রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র দেব ২৲, মিসেস্ চারুবালা দেবী ২৲), সেভিংস-ব্যাঙ্কের সুদ ৮৸৩ মোট ৫৫৩৵৩।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

শান্তিপুর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত ষষ্টিদাস সেন, কলিকাতা মেডিকেল হাসপাতালে গত ২২শে আগষ্ট তারিখে একটি কন্যা ও বিধবা পত্নী রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন।

বিগত ৩০শে আগষ্ট কলিকাতা নগরীতে ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও পরলোকগত প্রসন্নচন্দ্র মজুমদারের পত্নী মাতঙ্গিনী দেবী ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন।

বিগত ২৭শে আগষ্ট বাঁকীপুর নগরীতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের অন্যতম প্রচারক ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী অল্প কয়েক দিনের জ্বরে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত নানা ভাবে সমাজের সেবা করিতেছিলেন। এরূপ হঠাৎ চলিয়া যাইবেন কেহই মনে করিতে পারে নাই। তাঁহার অভাবে সমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

বিগত ১লা জুন রেঙ্গুন নগরীতে পরলোকগত মিঃ নমঃ শিবায়ের বিধবা পত্নী ও পুত্র তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

পুর্ণিয়ার রায় নিশিকান্ত সেন বাহাদুরের মাতৃদেবী শ্যামাসুন্দরী সেন গত ২৭শে শ্রাবণ কলিকাতা নগরে

* ব্রহ্মবাদের দার্শনিক ব্যাখ্যা পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ প্রণীত 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' নামক পুস্তকে ব্যাখ্যাত আছে।

পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ৯ই ভাদ্র পূর্ণিয়া নগরে সেন-ভবনে সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কালীচন্দ্র ঘোষাল আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। শাস্ত্র পাঠের পর নিশি বাবু দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা পাঠ করেন। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত রূপ দান করা হইয়াছে;—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রচার বিভাগ—২৫৲, সাধনাশ্রম—১৫৲, দাতব্য বিভাগ—২৫৲, ঢাকা—দরিদ্র ব্রাহ্ম সাহায্য ভাণ্ডার—৩৫৲। পূর্ণিয়া জেলা স্কুলের হাতে ৫০০৲ শত টাকায় শ্যামাসুন্দরী নামে একটি ফণ্ড স্থাপিত হইবে। যে ছাত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অঙ্কে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবে, প্রতি বৎসর তাহাকে ঐ টাকার সুদ হইতে পুরস্কার বিতরিত হইবে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চির শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের প্রাণে সান্ত্বনা বিধান করুন।

প্রচার—কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মসমাজসমূহের উন্নতি সাধনে নিযুক্ত প্রচারসমিতির সভ্য শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন বেদশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত অমৃতকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ শীল ও শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দে বিগত ১৭ই আগষ্ট বরাহনগর ব্রাহ্মসমাজে গমন করেন। বাবু রজনীকান্ত দে সংক্ষেপে প্রার্থনা করিলে সারদা বাবু ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্য এবং আবশ্যকতা বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বাবু বসন্তকুমার চৌধুরী এবং স্থানীয় শ্রমজীবিগণ সঙ্গীত করেন।

নামকরণ—গত ২রা ভাদ্র বহরমপুরে শ্রীযুক্ত সত্যশরণ সিংহের প্রথমা কন্যার নামকরণ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। বাবু সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। কন্যার নাম নীলিমা রাখা হইয়াছে। কন্যার মাতা এই উপলক্ষে দরিদ্র ব্রাহ্মদিগের সাহায্যার্থে ১০৲ দান করিয়াছেন।

কুমারখালী ব্রাহ্মসমাজ—ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে ৬ই ভাদ্রে মন্দিরে উপাসনা সংগীত ও পাঠ হইয়াছিল; সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ প্রামাণিক আচার্য্যের কাজ করিয়াছিলেন।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ—নিম্নলিখিত ভাবে ভাদ্রোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে—৫ই ভাদ্র সায়ংকালে প্রথমে সঙ্কীর্ত্তন হয়। তৎপরে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী "ব্রহ্মোপাসনার প্রকার ও প্রসার" বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। ৬ই ভাদ্র শনিবার সায়ংকালে সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন এবং উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৭ই ভাদ্র রবিবার প্রাতে বাবু রাজকুমার ঘোষ উপাসনা করেন। সায়ংকালে সঙ্কীর্ত্তনান্তে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২৯শে শ্রাবণ সায়ংকালে ছাত্রসমাজের উদ্যোগে সাধু রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের স্মরণার্থ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত শ্রীচরণ সেন, শ্রীযুক্ত তরণীকান্ত সেন এবং সভাপতি বক্তৃতা করেন।

বরিশালস্থ বয়স্কা ব্রাহ্ম কন্যাগণকে লইয়া গত ৬ই ভাদ্র এখানে একটী সঙ্গত সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ইহার সভাপতিরূপে উপদেশ প্রদান এবং ধর্ম্মগ্রন্থের অধ্যাপনার কার্য্য করিবেন। উক্ত দিবস মনোমোহন বাবু প্রার্থনান্তে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপদেশ অবলম্বনে সঙ্গতের উদ্দেশ্য ও সাধনা বিষয়ে কিছু বলেন। প্রতি সোমবার ইহার অধিবেশন হইবে।

জাতকর্ম্ম—২৮শে আগষ্ট গিরিডিতে বাবু ফণীন্দ্রনাথ বসুর চতুর্থ কন্যার জাতকর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। যুক্ত উমেশচন্দ্র নাগ আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে গিরিডি ব্রাহ্মসমাজে ১৲ এবং রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজে ১৲ দান করা হইয়াছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ব্রাহ্মসমাজ—ব্রাহ্মণবাড়িয়া উপাসনা সমাজের অষ্টাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালীতে সুসম্পন্ন হইয়াছে—৫ই ভাদ্র সন্ধ্যার পর উৎসবের উদ্বোধন সূচক উপাসনা হয়। শ্রীযুত ভবসিন্ধু দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৬ই ভাদ্র পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত উপাসনা করেন। অপরাহ্ণে শ্রীযুত রজনীনাথ নন্দী উপাসনা করেন। রাত্রিতে শ্রীযুত ভবসিন্ধু দত্ত কথকতা করেন। স্থানীয় এড্ওয়ার্ড বিদ্যালয়ে কথকতার স্থান করা হয়। ৭ই ভাদ্র—শ্রীযুত নবকুমার চক্রবর্ত্তী উপাসনার কার্য্য করেন। ৪টার সময় বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুত মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সম্পাদক শ্রীযুত রামকানাই দত্ত বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন। পরে সম্পাদক মহাশয় "ব্রহ্ম পূজা" সম্বন্ধে একটী নাতি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অসীমের উপাসনা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

৮ই ভাদ্র—পূর্ব্বাহ্ণে নৌকাতে শ্রীযুক্ত প্রসন্ন বাবুর মাতৃ স্মৃতির শ্মশান মন্দির স্থানে উপাসনা হয়—তথায় এক প্রীতিভোজ হয়। অপরাহ্ণে মন্দিরে শ্রীযুত ভবসিন্ধু দত্ত বক্তৃতা করিয়াছিলেন—বক্তৃতার বিষয় ছিল "ভারতে ধর্ম্মের ধারা"।

৯ই ভাদ্র—মঙ্গলবার—প্রাতে শ্রীযুক্ত রায় প্রসন্নকুমার দাস গুপ্ত বাহাদুর উপাসনা করেন ও শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত উৎসব পরিসমাপ্তির প্রার্থনা করেন। অপরাহ্ণে তিন ঘটিকায় ভবসিন্ধু বাবু "চরিত্র গঠন" বিষয় এডুওয়ার্ড বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের আহ্বানে বক্তৃতা করেন।

অধ্যক্ষসভার বিশেষ অধিবেশন—আগামী সোমবার ৮ই সেপ্টেম্বর অধ্যক্ষসভার একটি বিশেষ অধিবেশন হইবে। তাহাতে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দত্ত ও শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাসের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যপদ পরিত্যাগ পত্র বিবেচিত হইবে এবং পদত্যাগ পত্র গৃহীত হইলে তাঁহাদের স্থলে দুই জন সভ্য নিযুক্ত হইবেন।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

Registered No C. 65

অসতোমা সদ্গময়,
তমসোমা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—
১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৪শ ভাগ। ১লা আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩২৬, ১৮৪১ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯০ অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩,
১১শ সংখ্যা। 18th September, 1919. প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে বিশ্ববিধাতা, তোমার এই জগতের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য যখন যাহা আবশ্যক হয়, তুমিই উপযুক্ত সময়ে তাহা বিধান করিতেছ। মানুষ আপন ইচ্ছায় যে পথেই চলুক না কেন, তাহাকে সুপথে আনিবার জন্য তুমি সর্ব্বদাই নানা আয়োজন করিতেছ। এই দেশ বহুশতাব্দী তোমাকে ভুলিয়া অধঃপতনের দিকেই চলিতেছিল। তাহাকে মৃত্যুর পথ হইতে ফিরাইবার জন্য তুমি নানা ব্যবস্থাই করিয়া আসিতেছ; বিশেষ ভাবে তোমার প্রিয় সন্তানের জীবন ও মৃত্যুর দ্বারা যে মহাবাণী প্রচার করিয়াছ, যে মহাআহ্বান প্রেরণ করিয়াছ, তাহা আমাদের পরম সৌভাগ্যেরই কারণ হইয়াছে। যদিও এখন পর্য্যন্ত দেশের মোহনিদ্রা সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় নাই,—সমগ্র দেশ তোমার আহ্বান শুনিয়া চলিতেছে না—তথাপি আমরা আশার সহিত তোমার মঙ্গলবিধাতৃত্বেই বিশ্বাসস্থাপন করিতেছি। তুমিই এ দেশকে মহামৃত্যু হইতে উদ্ধার করিবে, তোমার পূজায় নিযুক্ত করিবে। তোমার প্রিয়সন্তানের মহাত্যাগ কখনও বৃথা যাইবে না, তোমার মঙ্গল ইচ্ছা কখনও ব্যর্থ হইবে না। পরিতাপের বিষয়, আমাদের উপর যে কার্য্যভার প্রদান করিয়াছ, আমরা তাহা সম্যক্‌রূপে সম্পন্ন করিতে পারিতেছি না। যে মহৎ জীবনের আদর্শ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছ, আমরা তাহার উপযুক্ত হইতে পারিতেছি না। হে করুণাময় পিতা, তোমার কৃপা ব্যতীত আমরা কিছু করিতে পারি না। আমাদের অক্ষমতা, দুর্ব্বলতা তুমি সবই জান। তুমি কৃপা কর, আমাদিগকে তোমার উপযুক্ত কর, আমাদের দ্বারা তোমার কাজ করাইয়া লও। তোমার ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক। তোমার মঙ্গল ইচ্ছারই জয় হউক।

সম্পাদকীয়।

নবযুগের ঋষি—বর্ত্তমান সভ্যজগতের সর্ব্বত্র রাজর্ষি রামমোহন রায়ই ভারতের নবযুগের ঋষি ও প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকৃত। তাঁহার দৃষ্টি যেরূপ সুদূর ভবিষ্যতে প্রসারিত হইয়াছিল, ঘন তিমিরাচ্ছন্ন গভীর রজনীতে তিনি যে সত্য-সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণচ্ছটা দর্শন করিয়াছিলেন, চতুর্দ্দিকের মহা মোহান্ধতার মধ্যে থাকিয়াও যে নিগূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, মহান্ পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎ ভাবে জানিয়াছিলেন, তাহাতে তিনিই যথার্থ ঋষিপদবাচ্য। যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে, তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারাও এ কথা স্বীকার না করিয়া পারেন না। তথাপি তিনি যে সম্যক্‌রূপে পূজিত হইয়াছেন, তাহা বলা যায় না। উচ্চ শিখর যেমন অতি নিকট হইতে নয়, কিন্তু কিয়ৎ-দূর হইতেই, ভালরূপে দেখা যায়, তেমনি যত দিন যাইতে থাকে ততই মহাপুরুষের প্রকৃত মহত্ত্ব যথার্থরূপে ধারণা করা যায়। মহাপুরুষগণ সময়ের বহু অগ্রবর্ত্তী বলিয়া সাধারণতঃ লোকে কোথাও তাঁহাদিগকে সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারে না। এক শ্রেণীর লোক নিজেদের ক্ষুদ্রতা ও অজ্ঞানতাহেতু তাঁহাদের মহত্ত্ব ধরিতে পারে না, আর অপর শ্রেণীর লোক তাঁহাদের লোকাতীত গুণ দর্শনে এমনই অন্ধ হইয়া যায় যে, তাঁহাদিগকে আর মানুষ বলিয়া মনে করিতে পারে না, ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতারজ্ঞানে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হয়। জগতের ইতিহাসে সর্ব্বত্রই এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়—এ দেশে ত ইহার কোনও অভাব নাই। এখানে প্রকৃত মহত্ত্বের যথার্থ সমাদর অতি অল্পই আছে, যদিও অন্ধ পূজার প্রাবল্য চারিদিকেই রহিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বল জ্ঞানরশ্মিও এই মহা মোহান্ধতা দূর করিতে সমর্থ হয় নাই। এই জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগেও লোকে কত জনকে অবতার বা অবতারস্থানীয়

করিয়া মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। মহত্তের সমাদর করিতে না পারিলে যেমন কোনও ব্যক্তি বা জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে না, তেমনি অন্ধ পূজার দ্বারাও অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট সাধিত হইতে পারে না, এ কথা অধিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু অন্ধ পূজা পরিত্যাগ করিতে যাইয়া মহত্তের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিহীন, মহত্ত্বের অনুসরণে উদাসীন হইলেও কল্যাণ ও উন্নতির আশা নাই। সুতরাং আমরা যে এখনও এই নবযুগের মহাপুরুষকে সম্যক্‌রূপে সমাদর করিতে পারিতেছি না, ইহা নিতান্তই অকল্যাণের কারণ। তিনি নবযুগের যে মহান্ আদর্শ লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহার অবলম্বন ও অনুসরণ ব্যতীত আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবনে কোথাও প্রকৃত কল্যাণের আশা নাই। মুখে তাঁহার প্রশংসা-গীতি গান করিলেই তাঁহার সম্যক্ সমাদর করা হইল না; সে মৌখিক সমাদরদ্বারা কাহারও বিশেষ কোনও লাভ নাই। অবশ্য তাহা যে একেবারেই নিরর্থক, তাহা আমরা বলিতেছি না। বৎসরান্তে তাঁহার মৃত্যুদিবসে যে একদিন আমরা তাঁহার স্মরণার্থসভা করিয়া তাঁহার চরিতালোচনা করি, তাহাতে—সাময়িকভাবে হইলেও—সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি ও চিন্তা আকৃষ্ট হয়। ইহার দ্বারাও কিছু উপকার সাধিত হয়। কিন্তু ইহা যথেষ্ট নহে। জীবনে পরিবর্ত্তন সাধিত না হইলে, মহত্ত্বের পথে অন্ততঃ কিছু দূর অগ্রসর না হইলে, বিশেষ কিছুই হইল না। সে আদর্শ আমাদের জীবনে ফুটাইয়া তুলিতেই হইবে। এমন সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির আদর্শ আর কোথাও নাই। ব্যক্তিগত কি জাতীয় জীবনের এমন কোনও দিক্ নাই যাহার আদর্শ আমরা তাঁহাতে দেখিতে না পাই। তাঁহার মধ্যে যে কোনও প্রকার অভাব বা ত্রুটি ছিল না, এরূপ কথা আমরা বলিতেছি না। বিচারহীন অনুকরণ কখনও কল্যাণকর নহে। তাঁহাকে অনুসরণ করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমেই আমরা এই শিক্ষা লাভ করিব; অন্ধ বিচারহীন অনুসরণ তাঁহার শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব। সুতরাং যাহা কিছু ত্রুটি লক্ষিত হইবে তাহা সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া দোষ ত্রুটি অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান বা সে দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কোনও প্রকারেই কল্যাণকর নহে। মহত্ত্বের উপরই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হইবে; তাহাতেই প্রকৃত কল্যাণ। শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক,—সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক—জ্ঞান, কর্ম্ম, প্রেম ভক্তি—যে দিক্ দিয়াই দেখি না কেন, তাঁহাকে নবযুগের নব আদর্শরূপেই দেখিতে পাই। তিনি যে শুধু নূতন আদর্শ দেখিয়াছেন বা ঘোষণা করিয়াছেন তাহা নহে; উহা নিজ জীবনে ফুটাইয়াও তুলিয়াছেন এবং জাতীয় জীবনের সর্ব্ববিভাগে নূতন যুগের সূচনাও করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সকলের মূলে তাঁহার ধর্ম্ম, এই কথা ভুলিয়া গেলেও তাঁহাকে যথার্থরূপে বুঝা হইবে না। তথাপি কেহ তাঁহাকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে না পারিয়া যদি আংশিক ভাবেও গ্রহণ করেন, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি যদি কোনও বিশেষ দিকই গ্রহণ করেন, তাহাতেও ক্ষতি নাই। যাঁহারা সমগ্রভাবে গ্রহণ করিতে পারেন না, তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের বিরোধ নাই। সম্যক্ অনুসরণের উপরই প্রকৃত উন্নতি ও কল্যাণ নির্ভর করিলেও, উহাদ্বারা যে আংশিক উপকার সাধিত হইবে তাহাতে ত সন্দেহ নাই। সুতরাং যে ভাবেই হউক তাঁহার যথার্থ সমাদর দেশে যতই বিস্তারলাভ করে ততই মঙ্গল। কিন্তু এই কথাও ভুলিলে চলিবে না যে, ইহাঁদের দ্বারা আমাদের কার্য্য সম্পন্ন হইবে না, দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে না। তাঁহাকে সমগ্র ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার ভার আমাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে, এবং তাহা ব্যতীত নবযুগ প্রতিষ্ঠিত হইবে না, প্রকৃত উন্নতি ও কল্যাণ সাধিত হইবে না। সুতরাং এই সময়ে আমাদের গুরুতর দায়িত্ব আমরা স্মরণ করি। আমরা জীবন ও কার্য্যদ্বারা তাঁহাকে প্রকৃত সমাদর করি, তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিয়া দেশে ও জীবনে নবযুগ প্রতিষ্ঠিত করি। মঙ্গলবিধাতা আমাদের সহায় হউন। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

বর্ত্তমান ধর্ম্মনৈতিক অবস্থা—দেশের পূর্ব্বতন ও বর্ত্তমান ধর্ম্মনৈতিক অবস্থার কথা স্বভাবতঃই এই সময় আমাদের মনে উদয় হয়। অবস্থার যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা উন্নতির দিকে কি অবনতির দিকে, তাহা কতটা কল্যাণকর বা অকল্যাণকর, সে মীমাংসা তত সহজ নহে। শাস্ত্রালোচনা ও ধর্ম্মতত্ত্বের জ্ঞান যে বর্দ্ধিত হইয়াছে, অপর দিকে কাল্পনিক দেব-দেবীতে বিশ্বাস, পৌত্তলিক অনুষ্ঠানাদি যে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে। যাঁহারা দৃশ্যতঃ দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও উক্ত বিভিন্ন নামে ও ভাবে যে এক ঈশ্বরেরই পূজা করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে প্রতীকরূপেই ব্যবহার করিয়া থাকেন, বাহ্য ক্রিয়াকাণ্ডের কোনও অনৈসর্গিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন না, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাদি দ্বারা তাহা প্রমাণ করিবার জন্যই সকলে ব্যস্ত। অপর দিকে কেহ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাদিতে গমন করিলেই যেমন তাঁহাকে ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া সমাজচ্যুত করা হইত, তাঁহার উপর নানা প্রকার উৎপীড়ন করা হইত, তাহা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রহ্মোপাসনাই যে শ্রেষ্ঠ, উহাই যে হিন্দুধর্ম্মের সার, এরূপ উদার ভাবই চারিদিকে ব্যক্ত হইয়া থাকে। জাতিভেদের সে কঠোরতা আর নাই, তাহার পরিবর্ত্তে মহা উদারতাই দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল দেখিয়া সহজেই মনে হইতে পারে, দেশ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, রাজা যাহার জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজ এতদিন যে কার্য্যে ব্রতী আছেন, তাহা অন্ততঃ বহুপরিমাণে সুসিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু একটু গভীর ভাবে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে পূর্ব্বে ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে যে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও খাঁটি সরল বিশ্বাস ছিল তাহার একান্তই অভাব ঘটিয়াছে। সে বিশ্বাস কুসংস্কারাপন্ন অজ্ঞানতাপ্রসূত মিথ্যার উপর স্থাপিত হইলেও সন্দেহবিমুক্ত হওয়াতে উহার মধ্যে যে কপটতার লেশমাত্র ছিল না, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। গোপনে একরূপ অনুষ্ঠান আর প্রকাশ্যে অন্যরূপ ব্যবহার, উদারতার নামে মিথ্যা-

চরণের প্রশ্রয়দান যে দেখা যাইত না, তাহাতে সন্দেহ নাই। শাস্ত্রাদির আলোচনাদ্বারা সত্য নির্দ্ধারণ অপেক্ষা মিথ্যার সমর্থন চেষ্টা, মিথ্যা ব্যাখ্যার সাহায্যে অপর লোককে প্রতারিত করিবার ও গৌরব লাভের প্রয়াস সে সময় মোটেই ছিল না। নিজের ধর্ম্মজীবনের প্রকৃত উন্নতি ও বিকাশ অপেক্ষা ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইবার, পরলোকে অনিশ্চিত স্বর্গভোগের আশায় ইহ সংসারের সুখসুবিধা পরিত্যাগ না করিয়া এখানেই সম্মান ও প্রতিষ্ঠা, আরাম ও আনন্দ লাভের জন্য ব্যস্ততা কখনও দেখা যাইত না। জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন গঠন অপেক্ষা উচ্চতত্ত্ব প্রচারে অধিকতর আগ্রহ দৃষ্ট হইত না। মিথ্যা কপটাচার ও অন্তঃসারশূন্যতা অপেক্ষা অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারপূর্ণ সরল বিশ্বাস, অকপটাচরণ ও সত্যনিষ্ঠা অধিকতর বাঞ্ছনীয় কি না কে বলিবে? কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (Wordsworth) প্রাণের গভীর দুঃখেই বলিয়াছিলেন—Great god! I'd rather be A pagan suckled in a creed outworn," মহান্ ঈশ্বর, আমি ইহা অপেক্ষা কোনও পরিত্যক্ত ধর্ম্মবিশ্বাসে বর্দ্ধিত পৌত্তলিক হওয়াও অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করিব।" বাস্তবিকই যে পৌত্তলিকতা তিনি পছন্দ করিতেন, তাহা নহে। উহা যে অবলম্বনীয় নহে তাহাও তিনি জানিতেন। তথাপি যে এরূপ বলিতেছেন, তাহাতে ইহাই বুঝা যায় যে তিনি আন্তরিক তাকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করেন। ধর্ম্মের প্রাণ প্রেম ভক্তি, সত্যানুরাগ, সত্যনিষ্ঠা, অকপটাচরণ, জ্ঞান প্রেম ইচ্ছাযোগে মহান্ ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত হওয়া; তাহা না হইলে আর সবই বৃথা। সুতরাং ওরূপ জ্ঞানোন্নতির যে কোনও মূল্য নাই, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু তাই বলিয়া যে অজ্ঞানান্ধকারে, মিথ্যা কুসংস্কারে ডুবিয়া থাকা কল্যাণকর বা বাঞ্ছনীয়, এরূপ কথা অবশ্য কেহ বলিবে না। সরল অবিশ্বাস এবং—সন্দেহ, অকপট নাস্তিকতাও,—কপটাচার ও সত্যের প্রতি উদাসীনতা, কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর—অধিকতর কল্যাণকর। কেন না সরল সত্যানুরাগ ও সত্যনিষ্ঠা একদিন না একদিন প্রকৃত সত্যে লইয়া যাইবেই, ঈশ্বরের সমীপে উপনীত করিবেই। অপর পক্ষে অজ্ঞানান্ধকারে থাকিয়া যে তৃপ্তিবোধ করিতেছে, সে আর সত্যের অনুসন্ধানে উৎসুক হইবে না। তথাপি এরূপ লোকের হৃদয়েও সত্যের আলোক পতিত হইতে পারে; একবার সত্যের জ্ঞান জন্মিলে, ইহারা সমগ্র হৃদয়ের প্রেম ভক্তি দিয়া সত্যস্বরূপকেই পূজা করিবে, তাঁহাতেই আত্মসমর্পন করিবে। এইজন্য ইহাদেরও উন্নতির আশা আছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের কপটাচার ও মিথ্যার সেবকদের পক্ষে সেরূপ পরিবর্ত্তন বা উন্নতির কোনই সম্ভাবনা নাই। কেন না, ইহারা অসত্যকেই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্যই ব্যস্ত, প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণের আকাঙ্ক্ষা বা চেষ্টা ইহাদের মধ্যে একবারেই নাই। সুতরাং দেশের পক্ষে ইহা অপেক্ষা ভীষণতর দুর্গতির অবস্থা আর কিছুই হইতে পারে না। এ বিষয়ে আমাদেরও প্রকৃত অবস্থা কি, তাহা বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা একান্ত কর্ত্তব্য হইবে। এ সম্বন্ধে আমাদের যে গুরুতর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য রহিয়াছে, তাহা ভুলিয়া থাকিলেও চলিবে না। এ দিকে আমাদের সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক, আমাদের সমাজ ও দেশ প্রকৃত ধর্ম্মধনে ধনী হউক। আমরা সত্য ধর্ম্মলাভ করিয়া কৃতার্থ হই। ভারতের 'পুণ্যভূমি' নাম সার্থক হউক। পরমপিতার পবিত্র ইচ্ছারই জয় হউক।

প্রচারক-জীবন।*

ব্রহ্মমন্দিরে ত উপদেশের ছড়াছড়ি। প্রত্যেক রবিবার দু বেলা দুটি উপদেশ ত হয়ই; তাহা ছাড়া আজ এ উপলক্ষে কাল সে উপলক্ষে নানারূপে বহু উপদেশ আপনারা প্রাপ্ত হন; তবু আরও উপদেশ শুনিবার আকাঙ্ক্ষা কোন কোন লোকের থাকে। তাই কেহ কথা বলিতে যেমন ভালবাসে, তেমনি কেহ কেহ শুনিতেও ভালবাসে। ঈশ্বরের কথা বলাতে ও শুনাতে পুণ্য আছে। তবে তাহা শ্রদ্ধার সহিত বলিতে ও শুনিতে হইবে এবং প্রাণপণে তাহা প্রতিপালন করিতে হইবে; নতুবা এ বলাতে এবং শুনাতে অপরাধ হয়, ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা উপস্থিত হইতে থাকে। এইজন্যই ঋষি বলিয়াছেন, "তাঁহার বিষয়ে বক্তা শ্রোতা উভয়ই সুদুর্লভ।"

আজ আশ্রমের মাসিক উৎসবের দিনে ত কিছু উপদেশ বলিতেই হইবে। সে কিরূপ উপদেশ এবং কাহার জন্য? এখানে আশ্রমবাসিগণকেই বেশী লক্ষ্যের মধ্যে রাখিয়া উপদেশ দিতে হইবে; তবে তাহা অন্য লোকের না শুনিলেও হয়, এমন কথা এখানে হইবে না। প্রথম শিক্ষার্থী ভ্রাতাদিগকে বলি,—তোমরা ধর্ম্মজ্ঞান লাভের জন্য দর্শনশাস্ত্র পড়িবে, ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাস পড়িবে—তাহা যে শুধু নিজ ধর্ম্মের তাহা নহে, অন্য ধর্ম্মেরও পড়িবে। তবে, সর্ব্বোপরি নিজধর্ম্মের অভিজ্ঞতা লাভ করিবে; নতুবা অন্যকে কি বলিবে ও কি বুঝাইবে? ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করা কঠিন, তবে তোমাদের জানা ভাষায় অনুবাদই পাঠ করিবে। ধর্ম্মপ্রচারকের শাস্ত্রজ্ঞান থাকা ভাল, বিশেষ বর্ত্তমান সময়ে যে প্রণালীতে ধর্ম্মপ্রচারক প্রস্তুত ও নিয়োগ করা হইতেছে, তাহাতে এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। কিন্তু ইহার শিক্ষক যে শ্রেণীর হইবেন তাঁহারা কেবল পুস্তকের জ্ঞানই দিবেন, তাঁহাদের জীবন আদর্শস্থানীয় হইবে না। ইহার সামঞ্জস্য করা বড়ই কঠিন, কিন্তু তবুও জ্ঞানলাভার্থ ইহা করিতে হইবে। এ সব বিষয় আর অধিক না বলিয়া আজ অন্য কিছু বলি।

যিনি প্রচারক হইবেন, তিনি অন্যের কথা অধিক বলিবেন না, তাহাতে জীবন পরিবর্ত্তিত হয় না। দর্শনশাস্ত্রের কথাকেও তেমনি জানিবেন, তাহাও জীবনপরিবর্ত্তনের জন্য নয়; কবিত্বপূর্ণ কথাতেও জীবনের পরিবর্ত্তন হয় না। লোকেরা বলিবে, "মানুষের সুখ দুঃখ দেখ, তাহার সহভাগী হও, তবে ত তোমার কথা শুনিবে; আগে শরীর, তাহার পর ধর্ম্ম।" এ সব কথায় মন দিবে না। তবে,

* সাধনাশ্রমের মাসিক উৎসব উপলক্ষে পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস প্রদত্ত উপদেশ।

ইহা অতিসত্য, জগতে পাপী তাপীর জন্ম যাঁর প্রাণ ব্যথিত হইয়াছে, তিনি যেমন আধ্যাত্মিক সেবক, তেমনই তাহাদের শরীরের ক্লেশও দূর করিবার জন্ম ব্যাকুল। ইহা শুধু ঐতিহাসিক সত্যরূপে আপনাদের নিকট বলিতেছি না। যে সব জীবন্ত মানুষ প্রচারকরূপে এই সমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। কিন্তু একশ্রেণীর লোক শরীরবাদী, তাহারা কেবল শরীর লইয়াই রহিয়াছে, তাহারা আত্মার বিষয় ভাবে না—ভাবিতেও চায় না; কাজেই তাহারা আত্মার সেবাবাদীদিগকে উপেক্ষার চক্ষে দেখে। কিন্তু তোমাদের প্রধান লক্ষ্য আত্মার সেবা। শুধু অন্নজলের জীবনই জীবন নয়, বিশ্বাস ভক্তির আধ্যাত্মিক জীবনই জীবন। শারীরিক জীবন যাহা চক্ষে দেখিতেছি, তাহাকে কেমন ক'রে অস্বীকার করিব? কিন্তু মানুষের মূল্যবান্ নিত্যজীবনের দিকে দৃষ্টি ফিরানই তোমাদের কাজ।

তোমাদের নিকট এ সময় যদি কেহ নিরাশার কথা বলে, তাহা তাহারা বলিবে তোমাদের ধর্ম্মবিশ্বাসকে টলাইবার জন্ম, তোমাদের জীবনকে সংসারমুখীন্ করিবার জন্ম। শুধু যে কথা বলিবে তাহা নয়, তাহাদের সংসারিক সুখে পূর্ণ জীবন তোমাদের সম্মুখে ধরিবে এবং বলিবে, "এই যে সব বড় বড় লোক সমাজমধ্যে নানারূপ কাজ করিতেছে, ইহারা কাহারও উপর নির্ভর করে না, নিজেরা আনে, খায়, সুখ স্বচ্ছন্দে থাকে, অথচ সমাজের কাজ করে; এইত বেশ!" এ সব কথাকে সাংসারিক কথা মনে করিবে। ইহা তোমাদের ঈশ্বরের কথা নয়; তাঁহার পথ থেকে ফিরাইয়া লইবার জন্ম সংসারই যেন সব বলিতেছে, ইহাই মনে করিবে।

তবে আমরা কাহার কথা শুনিব এবং কি শিখিব? এই প্রশ্ন যদি মনে হয়, আমি উহার উত্তরে বলিব, তোমাদিগকে কে ডাকিয়া আনিয়াছে এখানে? ইহার উত্তরই তোমাদিগকে সব কথা বলিয়া দিবে। সে উত্তরে লোকেরা হাসিবে এবং বলিবে "তোমাদের মূর্খতা তোমাদিগকে এ পথ দেখাইয়াছে।" তোমরা কি তাহা স্বীকার করিবে? কখনই না! তবে যাঁহার কথায় এ পথ ধরিয়াছ, তাঁহার কথা শুনিয়াই চিরজীবন চলিবে। বিশ্বাসীদের এই কথা। এইখানেই তোমরা দার্শনিকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এখানেই তোমরা শাস্ত্রীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এখানেই তোমরা ভাবুক কবিদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এখানেই তোমরা শরীরবাদী শারীরিক সেবকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তোমরা যাহা বলিবে, তাহা তোমাদের মধ্য দিয়া ঈশ্বর বলিতেছেন, তোমরা তাঁহার অনুভূতিতে পূর্ণ হইয়া তাঁহার আদেশের কথাই উপদেশ করিতেছ। জগতের হিসাবে সাধারণ লোকদের অর্থাৎ জ্ঞানে ধনে মানে ক্ষুদ্র লোকদের কথায় যে জনসাধারণ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল, বা এখনও উঠে, তাঁহাদের কথায় যে ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া, শান্তি শান্তি করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাঁহার মূলমন্ত্র এই। তাঁহারা তাঁহাদের প্রিয়তম ঈশ্বরের বাণীই জগতে ঘোষনা করিতেছেন, জগৎ তাই আজও সে কথা মাথা পাতিয়া শুনিতেছে। তোমরা তাঁহাদেরই পরবর্ত্তী ঈশ্বরের ক্ষুদ্র দাসদল। হে আমার প্রিয় ভাইসকল, হে ঈশ্বরের প্রিয় দাসদল, আজ তোমাদের প্রিয় মাসিক উৎসবে তোমরা তোমাদের প্রিয়তমের কথা শুনিয়া লও। জীবনকে বৃথা নষ্ট করিও না, ঈশ্বরের নামকে বৃথা ব্যবহার করিও না। যে ডাক শুনে এসেছ তাহা চিরদিন সুখে দুঃখে সকল সময় অন্তরে রাখিয়া তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য হও। তোমাদিগকে দেখিয়া তাঁহার পুত্রকন্যা আত্মার সেবাধর্ম্মে জীবন অর্পণ করুক। পিতাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হউক, তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

উপাসনা কিরূপে সম্ভবপর হয়?

ব্রাহ্মধর্ম্ম উপাসনামূলকধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যের ঘোষণাকালে তাহা অবধারিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মহর্ষি মহাশয় তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন,—"ঈশ্বরের সঙ্গে উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ, এইটি ব্রহ্মধর্ম্মের প্রাণ।" উপাসনাকে অবলম্বন করিয়া যে ধর্ম্ম উদ্ভূত হয় ও অবস্থিতি করে, সে ধর্ম্ম উপাস্য ও উপাসক এই দুইএর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই অবস্থিত। উপাস্য ও উপাসকের অস্তিত্ব স্বীকৃত না হইলে কোনও ক্রমেই উপাসনা সম্ভবপর হয় না। এজন্য যে স্থলে পূজা—উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে স্থলেই মহান্ অনন্ত পরমাত্মা এবং শান্ত ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চন দীনাত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। তাহা হইলেই প্রশ্ন উপস্থিত হয়—কিরূপে এ দুয়ের সম্ভাবনা হইল। অনন্ত মহান্ও আছেন এবং শান্ত দীনাত্মাও আছে, ইহা কিরূপে স্বীকৃত হইতে পারে? এ প্রশ্নের মীমাংসার অনুকূলে কি বলিবার আছে?

এ প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতে গিয়া প্রথমেই জ্ঞানের অল্পতাস্বীকারপূর্ব্বক বলিতে হয় এ প্রকার প্রশ্নের মীমাংসার একান্ত প্রয়োজনীয়তা নাই। এ প্রশ্নের মীমাংসার উপরে উপাসনা ব্যাপার তেমন নির্ভর করে না। এ প্রকারের প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া, মানব স্মরণাতীত কাল হইতে কেবলই পরস্পরবিরোধী তত্ত্বের প্রচার করিয়াছে। তাহাতে বিরোধের পর বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে—বিবাদের আর শেষ হয় নাই। তাহা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। আমাদের মনে হয়, উক্ত প্রশ্নের মীমাংসার উপযুক্ত শক্তি ও জ্ঞান মানুষের নাই। এ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া মানুষ অবসন্নই হইতেছে, চেষ্টার সাফল্যলাভ তাহাদের ভাগ্যে ঘটে নাই।

কিন্তু উক্ত প্রকারের কিছু বলিয়াত অনুসন্ধিৎসুকে—জিজ্ঞাসুকে থামাইয়া রাখা যাইবে না। জিজ্ঞাসুও অনুসন্ধিৎসুর অনুসন্ধান চলিবে এবং চলিয়া আসিতেছে। এরূপ অনুসন্ধিৎসুকে বলিতে পারা যায়, যদিও কিরূপে ইহা সম্ভবপর হইল—অনন্তও অনুভূত হইতেছেন, সান্তও অনুভূত হইতেছে, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইল যদিও তাহার সমাধান সম্যকরূপে হয় না, তথাপি এ দুইই যে আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহা নিত্য নিয়তই অনুভূত হইতেছে। আত্মায় আত্মায় যে প্রভেদ, তাহা-ত অনুভবের ব্যাপার। কিরূপে এত আত্মার উৎপত্তি হইল তাহার নিরূপণে অসমর্থ হইলেও সকলেই তাহা অনুভব করিতেছে। ইহা ত প্রত্যক্ষের ব্যাপার যে, এক আত্মা জ্ঞানী হইলে অপর আত্মা জ্ঞানী হয় না, এক আত্মা সুখী হইলে অপর আত্মা সুখী হয় না, এক আত্মা প্রেমিক হইলেই অপর আত্মা প্রেমিক হয় না। এ প্রকারের বহু প্রভেদ ত

আত্মায় আত্মার নিত্যই অবস্থিতি করে। এ অনুভবকে এমন বলা যায় না—দুই এক জনেই এরূপ অনুভব করে। ইহা সর্ব্বজনসুলভ অনুভব। ইহাকে ত অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করা যায় না। এ সকল আত্মা যে সেই এক পরমাত্মার আশ্রয়েই অবস্থিতি করে তাহাও ত অনুভবের ব্যাপার।

অনুভব যে একটি প্রমাণ তাহা দার্শনিকগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং সর্ব্বজনসুলভ অনুভবকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াই আমাদের কার্য্য করিতে হইবে। কিরূপে ইহা হইল, কেন হইল তাহা না হয় নির্ণীত না-ই হইল। যাহা আছে —যাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহার উপরে নির্ভর করিয়াই জীবনব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়া যাইতে হইবে। দীন অকিঞ্চন যে তাহাকেত সেই অনন্তমঙ্গল, অনন্তপ্রেম ও পবিত্রতার আলয়ের আশ্রয়ে যে সে বাস করে, তাহা অনুভব করিতে ও জানিতেই হইবে। সেই অনন্তমঙ্গল ও অনন্তপ্রেম-পুণ্যের আলয়ের সহিত তাহার যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহাও অনুভব ও প্রত্যক্ষ করিতেই হইবে। সেই পুণ্যময়ের সহিত যুক্ত হইয়াই তাহাকে ধন্য ও কৃতার্থ হইতে হইবে, কেননা, তাহার জীবনের সার্থকতার আর অন্য কোন উপায় নাই। তাহা না হইলে তাহার দীনতারও শেষ নাই। তাহার প্রাণের ভয় উদ্বেগেরও শেষ নাই। তদ্ভিন্ন শাশ্বতি শান্তি, যাহা তাহাকে পাইতেই হইবে, তাহাও পাইবার সম্ভাবনা নাই।

এই শুভযাত্রায় পদক্ষেপ করিতে, এমন মহৎ ব্রত গ্রহণপূর্ব্বক জীবনযাত্রায় প্রবৃত্ত হইবার প্রাক্কালে ত ইহা জানা আবশ্যক হয় না যে, কেমন করিয়া অনন্ত ও সান্তের একত্র অবস্থিতি সম্ভব হইল। ইহাও জানা আবশ্যক নহে যে, কিরূপে তাহার উৎপত্তি হইল। তাহার ইহাই জানা আবশ্যক যে, সে দীনহীন, তাহার দীনতার হীনতার অবসান হওয়াই আবশ্যক। সেই সত্য সুন্দর ও প্রেমময়কে জানিয়া ও তাঁহার হইয়াই যে তাহাকে অদীন, সুস্থ, সুন্দর ও সবল হইতে হইবে এবং সর্ব্বপ্রকারের সংশয় সন্দেহের উপরে গিয়া, ভয় উদ্বেগের অতীত হইয়া তাহাকে বাস করিতে হইবে এবং সেই অনন্তমঙ্গল এবং অনন্তআনন্দের, অনন্তপুণ্যের উদ্দেশেই তাহাকে অনন্তযাত্রা করিতে হইবে। এ যাত্রার জন্য—এ লক্ষ্য সাধনের জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় পরব্রহ্মের উপাসনা। পরমাত্মার—স্মরণ মনন ধ্যান ও তাঁহার নিকটে প্রার্থনা রূপ উপাসনা এবং তাঁহার প্রিয়-কার্য্যে রত থাকা।

এই শুভকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া ত তাহার পক্ষে কঠিন ব্যাপার নহে। পরমেশ্বরকে পিতারূপে জানা এবং "পিতানোঽসি" বলিয়া তাঁহার নিকটে কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার কৃপার ভিক্ষুক হইয়া তাঁহার সম্মুখে আকুলপ্রাণে দাঁড়ানত অস্বাভাবিক বা একটা কঠিন কার্য্যে রত হওয়া নহে। অতি সহজে অতি স্বাভাবিক ভাবেই মানব তাহার এই শুভব্রতের সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারে এবং পরমেশ্বরকে সকলের পিতা বলিয়া জানিয়া মানবমণ্ডলীর সহিত মধুর ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের পরস্পরের সাহচর্য্যে ও আনুকূল্যে এ জগতে সে আনন্দেই কাল কাটাইতে পারে। তাহা হইলেই তাহার পক্ষে এ ভবভবন শোভাসুখপূর্ণ হইতে পারে এবং এ ভবভবন আনন্দআলয় রূপে অনুভূত হইয়া সে এখানেই স্বর্গের বিমল জ্যোতি দেখিয়া, বিমল আনন্দে কৃতার্থ হইতে পারে। এ সাধনার জন্য তাহার ইহা জানা তেমন আবশ্যক নহে যে, সান্ত ও অনন্ত কিরূপে একত্র অবস্থিত হইল, অথবা ক্ষুদ্রের উদ্ভব কিরূপে হইল?

আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।

মহাত্মা রাজা রামমোহনরায়ের ধর্ম্মমত।*

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যোড়াসাঁকো চিৎপুর রোডের উপর কমললোচন বসুর একটি বাড়ী ভাড়া লইয়া ১৮২৮ সালের ৬ই ভাদ্র, বুধবার, সর্ব্বপ্রথমে উপাসনা সভার সংস্থাপন করেন। পরে প্রতি শনিবার সন্ধ্যা সাতটা হইতে নয়টা পর্য্যন্ত সভার কার্য্য সম্পন্ন হইত। ৬ই ভাদ্র তারিখেই ব্রাহ্মসমাজের সূচনা এবং ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইয়াছিল। সেই জন্যই আজ এই ৬ই ভাদ্র তারিখে আমরা ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার করুণা স্মরণ এবং তাঁহাকে অন্তরের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রদান করিবার জন্য এই পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরে সম্মিলিত হইয়াছি।

আজ ঈশ্বরের অসীম করুণা স্মরণ করিয়া যেমন তাঁহাকে হৃদয়ের ভক্তি অর্পণ করা প্রয়োজন, সেইরূপ মহাত্মা রামমোহন রায়কে স্মরণ করিয়া তাঁহার নিকট অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও একান্ত আবশ্যক। এই জন্যই আমি এখন আমাদের সেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আমার বোধ হয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের সুগভীর ভাবের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে, রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম, সমাজ ও নীতিবিষয়ে কিরূপ মত ও বিশ্বাস ছিল, তাহা অতি উৎকৃষ্টরূপেই আলোচনা করা আবশ্যক। সত্য বটে, রাজার মৃত্যুর পরে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু মহাজ্ঞানী রামমোহন রায় যেরূপ সকল দেশের সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্মসাহিত্য ও ধর্ম্মবিজ্ঞান পাঠ করিয়া, এক উদার ও উন্নত দৃষ্টিতে তন্মধ্যে বিশ্বজনীন সত্যসকল দর্শন করিয়াছিলেন এবং ঐ সকল সত্যের দ্বারা পরিচালিত হইয়া, এই জ্ঞানোন্নত যুগের বিশ্বমানবের উপযোগী এক মহাধর্ম্মের বিরাটমূর্ত্তি অন্তরে ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পরে, এ দেশে অথবা অন্য দেশে কে আর সেইরূপ আত্মার সমস্ত শক্তি সর্ব্বধর্ম্মের আলোচনায় নিয়োগ করিয়া, ধর্ম্মের বিশ্বব্যাপী মহাপ্রকাশ নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন? সেই জন্যই আজ স্বর্গীয় আচার্য্য নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত রাজার জীবনচরিত হইতে তাহার মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে কয়েকটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা সংগ্রহ করিয়া আপনাদের নিকট পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। সকলেই জানেন এ দেশের শ্রেষ্ঠপণ্ডিত ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় রাজার একজন অনুরাগী শিষ্য এবং তিনিই তাঁহার ইংরাজী, বাঙ্গালা এবং আরব্য ও পারস্য ভাষার রচনাসকল মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া উহার নিগূঢ় ভাবের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আচার্য্য নগেন্দ্রনাথ

* ৬ই ভাদ্র গিরিডি ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনার পরে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কর্ত্তৃক পঠিত উপদেশ।

সেই ব্রজেন্দ্রনাথের সাহায্যে রাজার জীবনচরিতের যে অতি উৎকৃষ্ট দুইটি অধ্যায় রচনা করিয়াছেন, আমি সেই দুই অধ্যায় হইতে অনেকগুলি কথা সংগ্রহ করিব। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া এই পুরাতন কথাগুলি শ্রবণ করিলেই অতিশয় আনন্দলাভ করিব।

১৮২৮ সালের ৬ই ভাদ্র ত উপাসনা সভা সংস্থাপিত হইল; তাহার পরে রাজা এবং তাঁহার বন্ধুগণ প্রচুর অর্থসংগ্রহ করিয়া ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। ১৮২৯ সালের ১১ই মাঘ এই নূতন মন্দিরে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য আরম্ভ হইল; সেই মন্দিরকে এখন আমরা আদি ব্রাহ্মসমাজের মন্দির বলিয়া উল্লেখ করি এবং ১১ই মাঘকেই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন ধরিয়া লইয়া মহাসমারোহের সহিত মাঘোৎসব সম্পন্ন করিয়া থাকি। এই ১১ই মাঘ, ব্রাহ্মসমাজে উপাসনাপ্রতিষ্ঠার দিন, মহাত্মা রামমোহন রায় দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মসমাজের যে একটি উদার ও উন্নত নিয়মাবলী পাঠ করেন, তাহার কয়েকটি কথা এই—

"এই মন্দিরে একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা হইবে, উপাসনালয়ে কোন ছবি প্রতিমূর্ত্তি ব্যবহৃত হইবে না। নৈবেদ্য, বলিদান প্রভৃতি কোন অনুষ্ঠান হইবে না। কোন প্রাণী হিংসা হইবে না। কোন ধর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হইবে না। যে কোন ব্যক্তি ভদ্রভাবে শ্রদ্ধার সহিত উপাসনায় যোগদান করিতে আসিবেন, তাঁহার জন্যই দ্বার উন্মুক্ত। জাতি, সম্প্রদায়, পদ, এ সকলের বিচার করা হইবে না। যাহাতে জগতের স্রষ্টা ও পাতা ঈশ্বরের ধ্যান ধারণার উন্নতি হয়, প্রেম, নীতি, ভক্তি, দয়া, সাধুতার উন্নতি হয় এবং সকল সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়, এখানে সেইরূপ উপাসনা, বক্তৃতা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইবে।"

এখন দেখা যাউক, মানবাত্মায় ঈশ্বরের প্রকাশ ও সাধন সম্বন্ধে রাজা কিরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। রাজা তাঁহার প্রকাশিত বেদান্ত গ্রন্থের একটি স্থানে লিখিয়াছেন,—

"জীব আর পরমাত্মা হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট হয়েন, যেহেতু এই দুয়ের চৈতন্য স্বীকার করা যায়; আর, ঈশ্বরের হৃদয়াকাশে প্রবেশ হওয়া অসম্ভব নহে, যেহেতু ঈশ্বরের হৃদয়ে বাস হয়, এ মত বেদে দেখিতেছি; আর, সর্ব্বময়ের সর্ব্বত্র বাসে আশ্চর্য্য কি হয়॥১১ বিশেষণাচ্চ ॥১২ বেদে ঈশ্বরকে গম্য, জীবকে গন্তা বিশেষণের দ্বারা কহেন; অতএব বিশেষণের দ্বারা জীব আর ঈশ্বরের ভেদের প্রতীত আছে॥"

রাজার জীবনচরিত লেখক বলিতেছেন—"ঋষিরা যোগযুক্ত অবস্থায় আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করিতেন, ইহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। রাজা কি ভাবে স্বীকার করিতেন যে, ঋষিরা যোগযুক্ত হইয়া সত্য লাভ করিয়াছিলেন? ইহাতে কিছুই অলৌকিক আছে বলিয়া তিনি স্বীকার করিতেন না। শমদমাদি সাধন, ধর্ম্মপালন অর্থাৎ জীবের প্রতি প্রেম ও জীবের সেবা, ভক্তি ও আত্মচিন্তা বা উপাসনায় সিদ্ধ হইলে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। তখন জ্ঞানী সর্ব্বদা নিত্যযুক্ত অবস্থায় থাকেন। এইরূপ ব্রহ্মযোগের অবস্থায় যে সকল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা জন্মে, তাহাই উপনিষদাদি দেশীয় শাস্ত্রে এবং বাইবেল প্রভৃতি বিদেশীয় শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল অভিজ্ঞতা যে সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্তিশূন্য রাজা তাহা মনে করিতেন না। তথাচ তিনি ঐ সকল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন।

"রাজার আর একটি মানসিক বিচার এই যে, যেমন মোওয়াহহেদীন, সুফী এবং বেদান্তের প্রভাবে রাজা স্থির করিলেন যে, আত্মতত্ত্ব, আত্মজ্ঞান, বা ব্রহ্মজ্ঞানই ধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি, সেইরূপ জীবনগত বা কার্য্যগত ধর্ম্মের দিকেও সমদমাদি ও লোকশ্রেয়ঃ বা মনুষ্যপ্রেমকে কেবল একমাত্র অবলম্বন স্বরূপ না করিয়া ব্রহ্মোপাসনাকেই মূলভিত্তি করিলেন। উপাসনার সিদ্ধাবস্থায় যখন ব্রহ্মই সর্ব্বময় হন, যখন উপাসক কি কর্ম্মে, কি জ্ঞানে, কি প্রেমে, কোন অবস্থাতেই কদাপি ব্রহ্মকে অতিক্রম করেন না, সেই অবস্থাই জীবের চরম লক্ষ্য বলিয়া রাজা সিদ্ধান্ত করিলেন। নিষ্ঠা ও উপাসনাদ্বারা এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে রাজা দর্শনশাস্ত্রকে অতিক্রম করিয়া যুক্তাবস্থার কথা বলিতেছেন। এই ব্রহ্মসাধনে জনহিতসাধন প্রভৃতি সকলই আছে।

"সামাজিক, ধর্ম্মনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের লক্ষ্য কি হইবে? রাজার মত এই যে, একমাত্র লক্ষ্য লোকশ্রেয়ঃ;—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণই লক্ষ্য। রাজা রামমোহন রায়ের মতে, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংস্কারের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত? একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের আধ্যাত্মিক উপাসনা।

"রাজা জগতের প্রচলিত ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া দেখিলেন যে, মানবমনে একটি সাধারণ ধর্ম্মভাব আছে। এই জগতের আদি ও অন্ত কি, এবং ইহা কি কি নিয়মে শাসিত হইতেছে, এই গূঢ় রহস্যের উপরে মানবের ধর্ম্মভাব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মানবের ধর্ম্মবিশ্বাস কিরূপ? এই পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব, ইহার মূলে এক অনন্ত শক্তি বর্ত্তমান। সেই অনন্ত শক্তি হইতেই ইহার উৎপত্তি ও ক্রিয়া হইতেছে। এই আদি শক্তিরূপ গূঢ় রহস্যের উপরেই মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব প্রতিষ্ঠিত। রাজা অনুভব করিয়াছিলেন যে, এক সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম;—ধর্ম্মের এক অস্পষ্ট জ্ঞান, এই সকল পরিমিত পদার্থের অন্তরালে এক অনন্তের সত্তায় বিশ্বাস, সকল কালে ও সকল দেশে বর্ত্তমান। * * যে সকল মানুষ অত্যন্ত অসভ্যাবস্থায় রহিয়াছে, কুসংস্কারান্ধ হইয়া বহু দেবতার উপাসনা করিতেছে, তাহাদের চিত্তেও উক্তরূপ একটি ভাবের আভাস আছে।"

মোক্ষমূলর এ বিষয়ে বলেন যে, মানবজাতি প্রথমাবস্থায় প্রকৃতির মধ্যে দেবত্ব অনুভব করিয়াছিল। তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, মানবজাতির প্রথম অবস্থাতেই পরিমিত স্পৃষ্ট পদার্থের মধ্যে অনন্তের সত্তা অনুভূত হইয়াছিল। হার্বার্ট্ স্পেন্সার বলেন যে, আদিম অবস্থায় মানবজাতি ভূত পূজা করিত। মোক্ষমূলর বলেন যে, মনুষ্যজাতি এই ভূতপূজার পূর্ব্বেও প্রকৃতির মধ্যে অস্পষ্টভাবে অনন্তকে অনুভব করিত

"রাজা অনুভব করিতেছেন যে, মনুষ্য স্বভাবতঃ এক অনাদি পুরুষকে বিশ্বাস করিয়া থাকে। এইরূপ বিশ্বাস বিশ্বজনীন। সুতরাং ইহা মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক। এক জগৎকর্ত্তা

পরমেশ্বরে বিশ্বাস কোন কৃত্রিম উপায়ে কেবল অভ্যাসদ্বারা উৎপন্ন হয় না। * * বিশেষ বিশেষ প্রকার দেবতায় ও বিশেষ বিশেষ প্রকার উপাসনাপ্রণালীতে বিশ্বাস, শিক্ষার ফল; এ সকল স্বাভাবিক নহে; জনশ্রুতি, শাস্ত্র ও চতুঃপার্শ্বের অবস্থার দ্বারা এই সকল মত উৎপন্ন হইয়া থাকে।

"রাজা বলিতেছেন যে, মানুষের এমন একটি স্বাভাবিক মানসিক শক্তি আছে, যদ্দ্বারা মনুষ্য সত্য এবং অসত্যের প্রভেদ বুঝিতে পারে; অর্থাৎ ন্যায়বান্ ও অপক্ষপাতী হইয়া কুসংস্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিলে মনুষ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়। জ্ঞানের আলোচনার দ্বারা ধর্ম্মবিষয়ে সত্যাসত্য বিচার করা একান্ত আবশ্যক।

"সমাজতত্ত্ব কি নীতি বা রাজনীতি অথবা ব্যবস্থাশাস্ত্র, সকল বিষয়েই তিনি মনে করিতেন যে, ব্যক্তিগত ইচ্ছার কোন নিয়ামক থাকা আবশ্যক। রাজা মনে করিতেন যে, এমন কিছু থাকা চাই যদ্দ্বারা সামাজিক বন্ধন ও শৃঙ্খলা রক্ষা পায়। তিনি বলিয়াছেন, কেবল ব্যক্তিগত জ্ঞান ও ইচ্ছা প্রবল হইলে সমাজ উৎসন্ন যাইবে। * * এ স্থলে তিনি ব্যক্তিগত জ্ঞান ও ইচ্ছার সহিত জাতীয় ব্যবস্থা বা শাস্ত্রের সামঞ্জস্য আবশ্যক মনে করিতেন। রাজা দুই দিক্ সমভাবে দেখিয়াছিলেন। তিনি শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে গিয়া দেখিতেন, যাহাতে যুক্তিবিরুদ্ধ কিছু স্বীকার করা না হয়। সেইরূপ আবার দেখিতেন যে, সামাজিক শৃঙ্খলা বা সামাজিক শাসন রক্ষা করিতে গিয়া সামাজিক উন্নতির ব্যাঘাত না হয়, লোকহিত সাধনের ক্ষতি না হয়। * * যাহাতে লোকের হিত তাহাই গ্রহণযোগ্য, আর যাহা তাহার বিপরীত, তাহাই পরিত্যাজ্য। এইরূপ বিচার বা পরীক্ষা করিয়া জাতীয় আচার ব্যবহার,সামাজিক প্রণালী সকলই সংশোধন ও বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে।

"রাজা মানবের কর্ত্তব্য সকলকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন;—আপনার প্রতি কর্ত্তব্য, জনসমাজের প্রতি কর্ত্তব্য, এবং পরমেশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য। রাজা নীতিতত্ত্ব বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি বিশেষ কথা আছে। প্রথম, মানবপ্রকৃতি-নিহিত স্বাভাবিক সহানুভূতি। দ্বিতীয়, স্বার্থ ও পরার্থের সমন্বয়। তৃতীয়, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি নিচয়ের বিকাশ, নীতির চরম লক্ষ্য। এ বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হিগেলের সহিত রাজার সাদৃশ্য দৃষ্ট হইতেছে। * * রাজা মনে করিতেন যে, জনহিতসাধনই নীতির মূলতত্ত্ব। তাঁহার প্রচারিত এই নীতিতত্ত্ব ঈশ্বরনিষ্ঠার সহিত জড়িত। একদিকে পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি, অন্য দিকে জীবের কল্যাণসাধন, রাজার মতে ধর্ম্মের এই দুইটি দিক্। ইহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। রাজা বলিতেন, পরমেশ্বর দয়াময়, সুতরাং তিনি তাঁহার জীবের কল্যাণ ইচ্ছা করেন। সুতরাং জীবের হিতসাধন, ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মনিয়ম।

"রাজার মতে, স্ত্রীলোকেরা শিক্ষিতা হইয়া উপযুক্ত সম্মান, অধিকার ও শিক্ষালাভ করিলে * * দুর্নীতি সমাজ হইতে ক্রমশঃ তিরোহিত হইবে। * * তিনি লোকের নৈতিক বুদ্ধি জাগ্রত করিতে, ঈশ্বরাদেশ ও প্রাচীন শাস্ত্রসকলের প্রতি ভক্তি বৃদ্ধি করিতে, দেশের লোকের মধ্যে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে হীন ও নিকৃষ্ট ভাব রহিয়াছে, তদ্বিরুদ্ধে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত ভক্তি প্রচার করিতে যত্ন করিয়াছিলেন।"

"খ্রীষ্টধর্ম্ম ও বৈদিক হিন্দুধর্ম্ম এই দুয়ের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ? এই প্রশ্নের উত্তরে রাজা বলিতেছেন,—"যদি নীতির অপেক্ষা আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অংশ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি বেদবেদান্তকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। কিন্তু খ্রীষ্টের নীতি উপদেশ সকল অতি অসাধারণ।"

"রাজা বলেন যে, জাতিভেদ আমাদের জাতীয় অবনতির একটি প্রধান কারণ। তিনি এ প্রথার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। * * ১৮২৮ সালের ১৮ই জানুয়ারী রামমোহন রায় একখানি পত্রে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"ইউরোপ ও আমেরিকাবাসী খ্রীষ্টানদিগের অপেক্ষা হিন্দুরা যে অধিকতর দুষ্কার্য্যরত নহে, এ বিষয়ে আপনার সহিত আমার মতের ঐক্য আছে। কিন্তু আমি দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, তাঁহাদের বর্ত্তমান ধর্ম্মপ্রণালী তাঁহাদের রাজনৈতিক উন্নতির অনুকূল নহে। জাতিভেদ আর বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ তাঁহাদিগকে স্বদেশানুরাগে বঞ্চিত করিয়াছে। ইহা ভিন্ন বহুসংখ্যক বাহ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান ও প্রায়শ্চিত্তের বহুপ্রকার ব্যবস্থা থাকাতে তাঁহাদিগকে কোন গুরুতর কার্য্যসাধনে সম্পূর্ণ অশক্ত করিয়াছে। আমার বিবেচনায় তাঁহাদের ধর্ম্মে কোন পরিবর্ত্তন উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। অন্ততঃ তাঁহাদের রাজনৈতিক সুবিধা ও সামাজিক সুখসচ্ছন্দতার জন্যও ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন আবশ্যক।"

অতঃপর রাজার গ্রন্থাবলী হইতে তাঁহার দুইটি প্রার্থনা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। রাজা কঠোপনিষদের ভূমিকায় প্রার্থনা করিতেছেন,—"হে অন্তর্য্যামিন্ পরমেশ্বর, আমাদিগ্যে আত্মার অন্বেষণ হইতে বহির্মুখ না রাখিয়া যাহাতে তোমাকে এক অদ্বিতীয় অতীন্দ্রিয় সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বনিয়ন্তা করিয়া দৃঢ়রূপে আমরণান্ত জানি এমং অনুগ্রহ কর। ওঁ তৎসৎ।"

ঈশোপনিষদে প্রার্থনা—"হে পরমাত্মন্, আমাদিগ্যে দ্বেষ মৎসরতা অসূয়া এবং পক্ষপাত, এ সকল পীড়া হইতে মুক্ত করিয়া যথার্থ জ্ঞানে প্রেরণ কর। ওঁ তৎসৎ। ১৮১৬, ১৩ই জুলাই।"

দুইটি প্রশ্ন।

ব্রাহ্মসাধারণের সমক্ষে দুইটি প্রশ্ন উপস্থিত করা যাইতেছে। প্রণিধানের সহিত অতি সাবহিতচিত্তে ব্রাহ্মগণ প্রশ্ন দুটির সমীচীন মীমাংসায় উপনীত হইতে চেষ্টা করুন। তাঁহাদের সুমীমাংসার উপরেই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্বের রক্ষা অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। এ জন্য তাঁহাদিগকে এই প্রয়োজনীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে একান্ত বিনীতভাবে ও অতি আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিতেছি। এ বিষয়ে উদাসীন হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্বের অতিশয় হানি হইবে।

১ম প্রশ্ন—বেদান্ত অবলম্বনে এ দেশে বৈদান্তিকগণের মধ্যে অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদ প্রভৃতি নানা মতের উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম উপরোক্ত মতাবলম্বী শাখা সকলের কোন্‌টির অন্তর্ভুক্ত? বিশেষ ভাবে বৈদান্তিক সম্প্রদায়সকলের কোন্‌টির সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ ঐক্য

আছে? বৈদান্তিক শাখা সমূহের অবলম্বিত মতসমূহের মধ্যে কোন্‌টির উপরে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত? অথবা উহার কোনটির সহিতই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ একতা নাই বা উহার কোনটির উপরেই এ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহাই জিজ্ঞাস্য।

উক্ত প্রশ্নটি যে অকারণে বা হঠাৎ উপস্থিত হইতেছে, তাহা নহে। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এক শ্রেণীর দার্শনিক কিছুদিন হইতে তাঁহাদের বিশেষ দার্শনিক মত দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া আসিতেছেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মকে তাঁহাদের মতসাপেক্ষ বা তাঁহাদের মতের অন্তর্ভুক্ত রূপেই ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইলে, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব রক্ষা পাইবে কি না, তাহার মীমাংসার জন্যই প্রশ্নটি উপস্থিত হইতেছে। মনে রাখিতে হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্ম উপাসনামূলক ধর্ম্ম। এ ধর্ম্মে উপাসনাই বিশেষ লক্ষ্য ও সাধনের বিষয়। ব্রহ্মোপাসনাতেই ইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। আদিব্রাহ্মসমাজপ্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ বা মূল সত্যের উল্লেখে লিখিত হইয়াছে,—"একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিক মৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

একমাত্র তাঁহার উপাসনাদ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। সাধারণব্রাহ্মসমাজও ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্যের প্রচারে উপরোক্ত তত্ত্বেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের উক্ত প্রকারের মূলসত্য বৈদান্তিকগণের কোন্ শাখার উপরে প্রতিষ্ঠিত, তাহারই মীমাংসা করিতে হইবে। কারণ এ বিষয়ের সুমীমাংসার উপরেই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্ব নির্ভর করিতেছে।

২য় প্রশ্ন—ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশেষ ভাবে কোন শাস্ত্র সাপেক্ষ কি না? ভারতীয় বা অন্য দেশীয় কোন শাস্ত্র বিশেষের উপরে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল প্রতিষ্ঠিত কি না? ব্রাহ্মধর্ম্মকে বুঝিতে হইলে শাস্ত্রবিশেষের অথবা অনেক শাস্ত্রের বিশেষ ব্যাখ্যার উপরে নির্ভর করিতে হয় কি না।

উক্ত বিষয়ের মীমাংসার সাহায্য হইবে বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারকগণের দুই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির লিপি হইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। রাজর্ষি মহাশয় "অনুষ্ঠান" নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থে (যে গ্রন্থকে তাঁহার বিশেষ মত প্রচারের গ্রন্থরূপে গণনা করা যাইতে পারে) তাঁহার ধর্ম্মের বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে প্রশ্নোত্তর দ্বারা লিখিত হইয়াছে?—

"১ শিষ্যের প্রশ্ন—কাহাকে উপাসনা কহেন?

১ আচার্য্যের উত্তর। তুষ্টির উদ্দেশে যত্নকে উপাসনা কহা যায়। কিন্তু পরব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞানের আবৃত্তিকে উপাসনা কহি।

২ প্রশ্ন। কে উপাস্য?

২ উত্তর। অনন্ত প্রকার বস্তু ও ব্যক্তিসম্বলিত অচিন্তনীয় রচনা-বিশিষ্ট যে এই জগৎ......ইহার কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা যিনি তিনি উপাস্য হন।

৩ প্রশ্ন। তিনি কি প্রকার?

৩ উত্তর। তোমাকে পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে যিনি এই জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা তিনি উপাস্য হন, ইহার অতিরিক্ত তাঁহার নির্দ্ধারণ করিতে কি শ্রুতি কি যুক্তি সমর্থ হন না। ইত্যাদি

রাজর্ষি মহাশয়ের উক্ত প্রকারের উপদেশ হইতে অবশ্যই প্রশ্নটির মীমাংসায় যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যাইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচারক মহর্ষি মহাশয় তাঁহার আত্মচরিতে যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতেও নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল। তাহা দ্বারা স্পষ্টরূপেই জানা যাইবে, তিনি ব্রহ্মধর্ম্মকে কোন শাস্ত্র বিশেষে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তন ভূমি কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি লিখিয়াছেন "ব্রাহ্মধর্ম্মকে এখন কোথায় আশ্রয় দিব? বেদে তাহার পত্তন-ভূমি হইল না। উপনিষদেও তাহার পত্তন-ভূমি হইল না। কোথায় তাহার পত্তন দিব? দেখিলাম যে আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই তাহার পত্তন-ভূমি। পবিত্র হৃদয়েতেই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান, পবিত্র হৃদয়ই ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তন-ভূমি।" মহর্ষি মহাশয়ের এই লিপি এবং রাজর্ষি মহাশয়ের লিপি উভয়ই উক্ত প্রশ্ন মীমাংসার সাহায্য করিবে। ব্রাহ্মগণ উক্ত লিপিদ্বয় এবং স্ব স্ব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাদ্বারা উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা করুন। তাঁহাদিগকে পুনরায় এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা শেষ করিতেছি।

এ প্রশ্নটিও অকারণ উপস্থিত হইতেছে না। কারণ কিছুদিন হইতে—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ের বেদী হইতে, ব্রাহ্মধর্ম্মকে বুঝিতে হইলে বিশেষ বিশেষ শাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ ব্যাখ্যার উপরেই নির্ভর করিতে হইবে, এরূপ বাণী কেহ কেহ প্রচার করিতেছেন।

আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শ্রাদ্ধবাসরে আচার্য্যের উক্তি।

হে ঈশ্বরের প্রিয়সন্তানগণ, তোমরা এই শ্রাদ্ধবাসরে কি বিশ্বাস লইয়া আসিয়াছ? ইহা কি একটি লৌকিক অনুষ্ঠান বা সামাজিক ক্রিয়ামাত্র? যদি এই ভাবে আসিয়া থাক, তোমাদের সমাজের প্রণালীকে প্রশংসা করিতে পারি; কিন্তু ইহা ইহ জগতের একটি সুন্দর লৌকিক ক্রিয়া, ইহা ভিন্ন ইহার দ্বারা আর কোন কল্যাণের আশা করিতে পারি না। আর যদি তোমরা বিশ্বাস কর, অমর আত্মা আছেন, এখনই এখানে তাঁহার সত্তা ব্রহ্মসত্তার মধ্যে অনুভব করিতে পারিব—পরিষ্কার দেখিতে পাইব; এবং তোমরা যে তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিবে ঈশ্বর তাহা গ্রহণ করিবেন এবং পূর্ণ করিবেন; তাহা হইলে এ ক্রিয়া ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণপ্রদ হইবে, তোমাদেরও কল্যাণ হইবে, অমর-আত্মারও কল্যাণ হইবে। ঈশ্বর প্রেমময়, আত্মা অমর, একজনের প্রার্থনায় অন্যের কল্যাণ হয়, এই তিনটি বিশ্বাস উজ্জ্বল থাকা চাই।

প্রাণাধিক পুত্রকন্যাগণ, তোমরা কি যথার্থই মাতৃ-পিতৃহীন হইয়াছ? অবশ্য তোমরা এখন অনুভব করিতেছ মাতৃ-পিতৃহীন বলিয়া, কিন্তু ইহা কখনই বিশ্বাস কর না যে, তোমাদের মাতা পিতা নাই; বরং দেহে থাকিতে যাহা অনুভব করিতে পার নাই, এখন তাহা অনুভব কর—মাতাপিতা আছেন; তাই মাতৃপিতৃ এবং মাতৃপিতৃ লোকের এবং মাতৃপিতৃ পুরুষদের তর্পণ করিতে আসিয়াছ।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক বিবৃত।

এখন সে অমর আত্মার জল বা তণ্ডুলের প্রয়োজন নাই, মধু বা ক্ষীরের প্রয়োজন নাই। এখন যে তর্পণ তাহা অমৃতময় প্রেমভক্তির তর্পণ। অমর আত্মা তোমাদের তর্পণে তৃপ্ত হইবেন, শান্তি পাইবেন, ইহাই বিশ্বাস কর। তাহা হইলে সকলকে যে ডাকিয়া ব্রহ্মোপাসনার আয়োজন করিয়াছ, তাহা সফল হউক—মাতাপিতার এই পবিত্র কার্য্যে যেমন পৃথিবীর আত্মীয়দিগকে ডাকিয়াছ, তেমনই পরলোকস্থ পিতৃপুরুষদিগকে, মাতৃপিতৃবন্ধুদিগকে এই কার্য্যে আহ্বান কর; আজ ইহ পরলোকের সম্মিলন তোমাদের গৃহে হউক।

পিতাকে মাতাকে ঋষিরা মহাগুরু, পরম গুরু, পৃথিবী হইতেও গুরু বলিয়াছেন। ঈশ্বরকে বলিয়াছেন পিতার ন্যায় জ্ঞানশিক্ষা দাও। পৃথিবীতে সেই মাতার, সেই মহাগুরুর নিপাত হইয়াছে। এখন ঈশ্বর মাতাপিতা হইয়া এই ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন। প্রাণসমা সহধর্ম্মিণী (পতি) আপনি (তুমি) কি বিশ্বাস করেন, তিনি যে এই পৃথিবীতে আপনাদিগকে (তোমাদিগকে) মিলাইয়াছিলেন, তাহা শুধু এই পৃথিবীর কয় দিনের জন্য নয়, তাহা অনন্ত কালের জন্য? তাহা হইলে বিচ্ছেদের ক্লেশ ক্ষণিক। এখনও মিলনের আশা আছে—দেহের মিলন আর নাই, আত্মার মিলন তাহা কি সম্ভবপর? "তোমার হৃদয় আমার হউক, আমার হৃদয় তোমার হউক", এই কথা বলিয়া দুজন মিলিয়াছিলে। তোমাদের হিন্দুপদ্ধতিতে বিবাহ হইয়াছিল. তোমার স্বামীই এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন। আজ তুমি প্রাণে প্রাণে এই মন্ত্র উচ্চারণ কর এবং এই সাধনে নিযুক্ত থাক—পরকালে উন্নত আত্মার সঙ্গে যাহাতে মিলিতে পার—আজই যথার্থ আত্মায় আত্মায় মিলন হবে। এমন ভাবে আত্মাকে ভাবিবার সুযোগ আর ঘটে নাই; বিচ্ছেদের মধ্যে মহামিলন রাখিয়াছেন, তাহা অনুভব কর। পত্নী, তোমার স্বামী তোমার নিত্য সঙ্গী, তিনি ছাড়েন নাই, ছাড়িবেন না—ছাড়িতে পারেন না. ইহা অনুভব করিয়া অদ্যকার পবিত্র কার্য্যে মন দাও। দৈহিক স্বামী নাই, নিত্যস্বামী অমর আত্মা আছেন। ঈশ্বরে পুনরায় মিলন হবে, এই বিশ্বাস ধারণ কর।

অগ্নি দেহকে পুত করে এবং ভস্মীভূত করে; কিন্তু স্বর্গীয় পাবক আত্মাকে শুদ্ধ করে এবং উজ্জ্বল করে।

দেহবিমুক্ত আত্মা এখন উজ্জ্বল এবং নির্ম্মল। এই আত্মাকে অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না, অস্ত্র ছিন্ন করিতে পারে না।

আত্মা কিছু দিনের জন্য দেহকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পূর্ণ করে।

আত্মার আবাসস্থান দেহও নয়, এ পৃথিবীও নয়। আত্মার আশ্রয় চির-আশ্রয় ব্রহ্ম—সে দেহে থাকুক বা বিদেহী হউক।

আত্মা সেই নিত্য আশ্রয়ের জীবন্তসঙ্গ পাইলেই কৃতার্থ হয়।

অমর আত্মা অমৃত পুরুষের আশ্রয়ের জন্য লালায়িত। সে তাহা পাইয়াই ধন্য।

নিরাকার অজর সূক্ষ্ম আত্মা নিরাকার নির্ম্মল ব্রহ্মের সঙ্গে যোগপ্রার্থী; এই আত্মা পরমাত্মাতে যোগ সম্ভবপর। তাই আত্মাতে মানুষে মানুষে যোগ সম্ভবপর। আত্মার কাম্য বস্তু এ ধন জন বিষয় বিভব কিছুই নয়—বিষয়ভোগ বা ইন্দ্রিয়সুখও আত্মার কামনার বিষয় নয়। আত্মার কাম্যবস্তু ব্রহ্ম, তাই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইলে আত্মার তখন আর কোন লালসা থাকে না।

আত্মার জন্ম আছে, কিন্তু মৃত্যু নাই। কিন্তু আত্মার যে কখন জন্ম হইয়াছে, কেহ বলিতে পারে না।

শরীরের প্রতি একটি প্রীতি ও শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু আত্মার প্রতিই যথার্থ প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্পিত হইতে পারে। দেহবিমুক্ত আত্মারই শ্রাদ্ধ হয়।

আত্মা কোথায় কি অবস্থায় থাকে, কেহ বলিতে পারে না।

আত্মা আছে এবং থাকিবে, ইহা উজ্জ্বল জ্ঞানপ্রেমপূর্ণ বিশ্বাসই কেবল প্রকাশ করে।

পরলোকস্থ আত্মা যে ভাবেই থাকুক না কেন, তাহার অস্তিত্ব চিন্তা করিয়া পৃথিবীস্থ আত্মা সুখ শান্তি অনুভব করে।

আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস না করিয়া ব্রহ্মোপাসনার আবশ্যকতা আছে,—ব্রহ্মোপাসনা আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস আনয়ন করে।

অমৃত পুরুষে বিশ্বাসই আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসের মূল। মৃত্যুকে ইচ্ছাও করিবে না, মৃত্যুকে দেখিয়া ভয়ও করিবে না। 'মৃত্যু অমৃতের সোপান।'

মৃত ব্যক্তি বা শবদেহ দেখিলেই অমর আত্মার জন্য প্রার্থনা করিবে।

আত্মাতে আপন পর নাই; শিশু যেমন সকলের আপনার, আত্মাও তেমনই সকলের আপনার।

আত্মার জাতি নাই, কোন বিশেষ ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়াও আত্মার জাতি নাই।

আত্মার স্ত্রী পুরুষ নাই। শিক্ষার প্রণালী ভিন্ন; তাহাও পর-জগতে কি প্রকার, তাহা কে বলিবে?

আত্মার বয়সও পৃথিবীর বয়সের মত নয়; ব্রহ্মে স্থিতি দ্বারা বয়স গণনা হয়, সে বয়স শুধু ব্রহ্মই জানেন। আত্মা কি অপূর্ব্ব বস্তু, তাহা শুধু আত্মাই অনুভব করিতে পারেন।

আত্মার বয়সের পার্থক্য থাকিলেও আত্মা নমস্য ও শ্রদ্ধার পাত্র।

আত্মাই পরমাত্মার গৃহ, আত্মাতেই পরমাত্মা বাস করেন।

আত্মার কল্যাণকামী হইয়া পৃথিবীতে বাস কর। আজ শুধু আত্মারই কল্যাণ প্রার্থনা কর। আত্মা আমাদের প্রিয় হউক। ঈশ্বর আমাদের প্রিয় হউন।

প্রাপ্ত।

বিশ্বাসে অবিশ্বাস।

(৪)

সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রভেদ আমি মানুষের জন্মের ইতিহাসেই দেখিতে পাই। ঈশ্বর দেশকালের অতীত অনাদি অনন্ত। কিন্তু মানবমন তো অন্ততঃ অনাদিত্বের দাবী কোন ক্রমেই করিতে পারে না। তাহাও আবার জড় হইতে না হইলেও সর্ব্বনিম্নস্থ জৈব পদার্থের (proto-plasm এর) অভিব্যক্তি হইতেই ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া উহার বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ইহাই বিজ্ঞানের শিক্ষা। অদ্বৈতবাদ এই শিক্ষাটা যদি অস্বীকার

করিতে না পারে, এবং তাহা পারে নাই বলিয়াই আমার ধারণা, তাহা হইলে উহা দেশকালের অতীত অনাদি অনন্ত মনেরই আংশিক পুনর্জ্জাত সত্তা, ইহা বলা চলে কৈ? ঐ পুনর্জ্জন্মের কার্য্যটা বহুকাল ব্যাপিয়া আস্তে আস্তে ক্রমে ক্রমে অনাত্মা হইতে আত্মাকে গঠন করিয়া মানবাত্মা রূপে ফল প্রসব করিয়াছে, —ইহা কি অধ্যাত্মবাদ আপনার অবলম্বিত মতটার সমর্থনে বলিতে পারে?

এই প্রকারের জন্মও কি পুনর্জ্জন্মের ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে? অনাদি অনন্ত মনের জন্মও এই অভিব্যক্তির নিয়মানুসারেই হইয়াছিল, ইহা যদি স্বীকার করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে তাহার আংশিক পুনর্জ্জন্ম গ্রহণটা তদ্বিধ ভাবে ঘটিতে পারে কি? আর মানবত্মাকে তো সেদিনকার আত্মা বলিলেই চলে। অন্যান্য গ্রহাদির সৃষ্টির কত পরে পৃথিবীটা সৃষ্ট হইয়াছে; এবং তাহাও কিন্তু দুই চার বৎসরের মধ্যেই জীবগণের বাসের উপযোগী হইতে পারে নাই। আবার জীবগণের মধ্যেও মানুষের অভ্যুদয় সকলের শেষেই হইয়াছে, ইহাও বিজ্ঞান প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। সেই অনাদি অনন্ত মন বিশ্বসৃষ্টির এত দীর্ঘকাল পরে জীবসৃষ্টির সাধারণ নিয়মকে বাতিল করিয়া, একদিন মানবাত্মা রূপে আংশিক পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিবার সংকল্প স্থির করিলেন, ইহাও কেমনতর কথা। তাঁহার পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করাটার সংকল্প তাঁহার সমসাময়িক চিন্তার অন্তর্ভুক্ত রহিয়া থাকিলে, কেবলমাত্র সে দিন—তাহাও আবার সৃষ্টিপ্রকরণের সাধারণ নিয়মকে বাতিল করিয়া—করিলেন, ইহা হজম করা সাধারণ জ্ঞানের পক্ষে অসম্ভব নয় কি?

বিজ্ঞানের তদ্বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাত্মবাদ যে একটা উত্তর দিয়াছে, তাহাকে তো সদুত্তর বলা যাইতে পারে না। মনে হয় সেটা যেন প্রশ্নটাকে এড়াইয়া যাওয়ার একটা চেষ্টা-মাত্র। উত্তর টা এই,—"As for the objection of the evolutionist, the answer is that the mind implied in the existence of the universe is not any finite mind, as has been already shown. The inorganic matter which has evolved into consciousness in the course of innumerable years is only as related to the universal mind. The theory of evolution therefore does in no way affect Absolute idealism"— উত্তরটা এই—'বিশ্বের অস্তিত্বে যে আত্মার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা কোন সীমাবদ্ধ আত্মা নয়, যেমন পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। অগণিত কালব্যাপী জড়ের বিবর্ত্তনের ফলে যে চৈতন্যের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র বিশ্বাত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়াই সত্য। ক্রমবিকাশের মতটা সেই জন্যই একান্ত আধ্যাত্মবাদের বিরোধী বলিয়া কোন রূপেই গণ্য হইতে পারে না।" আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, বিজ্ঞানের প্রশ্নটা ছিল মানবাত্মা সম্বন্ধীয়, —অন্ততঃ আমার প্রশ্নটা যে তাহাই—ইহা বলাই বাহুল্য। আধ্যাত্মবাদের উত্তরে মানবাত্মার উল্লেখই দৃষ্ট হয় না। এই জন্যই এই উত্তরটাকে অন্ততঃ আমার উত্থাপিত আপত্তির সদুত্তর বলা যাইতে পারে না।

এই সমস্ত কথা চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, অধ্যাত্মবাদের মানবাত্মাসম্বন্ধীয় মতটা আমাদের ধর্ম্মজীবন লাভের পক্ষে অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। ইহাতে পূজা অর্চনার স্থান—ধর্ম্মসাধনের স্থান থাকে না বলিলেই চলে; ভক্তির অনুশীলনের বিষয়ই থাকে না এবং উহার গতি শঙ্করোক্ত আত্মপূজাভিমুখীন্ হইতেই বাধ্য।

অপর পক্ষে ইহা যদি বলা হয়, যেমন নবযুগের ধর্ম্মসমাজ বলিয়া থাকেন যে, ইচ্ছাময় পরমেশ্বর ইচ্ছা করিয়াই কিয়ৎপরিমাণে আপনার প্রকৃতিবিশিষ্ট করিয়া মানবাত্মাকে সৃজন করিয়াছেন (Man is made by God after his own reflection), তাহাতে আধ্যাত্মবাদ ন্যায়তঃ কোন আপত্তি উত্থাপন করিতে পারে কি? মানবেতর জীবসমূহের আত্মাকে তিনি যদি কেবল-মাত্র আপনার চিন্তার উপকরণেই গঠিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঠিক্ সেই প্রণালীতেই মানবাত্মাকেও সৃজন করিতে পারেন না কি? ইহা কি প্রকৃত প্রস্তাবেই আধ্যাত্মবাদের মতাপেক্ষা অধিকতর সম্ভবপর ও সন্তোষকর নয়? এবং ধর্ম্মসাধনের পক্ষে অধিকতর অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য নয়?

ডাঃ হালদার বলেন,—"If it is asked why the Eternal consciousness should reproduce itself as the self-of man, the answer must be, there is no answer."—অর্থাৎ, সেই অনাদি অনন্ত চৈতন্য কি জন্য মানবাত্মা রূপে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে যাইবেন, ইহা যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহার উত্তর ইহাই অবশ্য হইবে যে, উত্তর নাই। উত্তরদানে আধ্যাত্মবাদের এই অক্ষমতা-টা আমার উত্থাপিত আপত্তিটাকেই সমর্থন করে না কি? এবং ইহাই প্রদর্শন করে না কি যে, আধ্যাত্মিক বিষয়ে সকল সমস্যার সমাধান করিবার যোগ্যতা দার্শনিক জ্ঞানের নাই? এই বিষয়ে ধর্ম্মবিশ্বাস বলে, 'প্রেমময় পরমেশ্বর তাঁহার আনন্দময় স্বরূপ হইতেই এই বিশ্বকে রচনা করিয়াছেন এবং মানবসন্তানের সহিত "প্রেমের লীলা, প্রেমের আদানপ্রদান করিবার উদ্দেশ্যেই, সম্পূর্ণরূপে না হইলেও, তাঁহাকে জানিবার, বুঝিবার, চিনিবার ও ভালবাসিবার শক্তি দান করিয়া তাহাকে সৃজন করিয়াছেন।"

এই উত্তরটা অধ্যাত্মবাদের মনঃপূত হইবে না, ইহা জানি—কেননা, সে বিশ্বাসকে মানবাত্মার স্বতন্ত্র একটা বৃত্তি বলিয়াই স্বীকার করে না। সৃষ্টির কার্য্যটাকেও সে অনন্ত আত্মার পরবর্ত্তী ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিতে চায় না, যদিও মানবাত্মার অভ্যুদয়ের বিষয়ে তদ্বিপরীত একটা ব্যবস্থাই করিতে চায়। সে ইহাই বলে বলিয়া মনে হয় যে, ঈশ্বর তাঁহার কার্য্যকারিণী স্বপ্রকৃতি দ্বারাই সৃজন কার্য্য করিতে বাধ্য এবং তদ্দ্বারাই তিনি আপনাকে আপনি উপলব্ধি করেন (realises Himself) আনন্দের জন্য তিনি তাঁহার আনন্দময় স্বরূপ হইতে বিশ্বকে সৃজন করেন না,—মানবাত্মাকেও না।

কিন্তু ইহার (শেষোক্ত মতটার) বিরুদ্ধে সে কোন যুক্তি দেখাইতে পারে কি? আমার ধারণা, সে তাহা পারে না। তবু যদি দার্শনিক জ্ঞান ইহার ভিতর খুঁত ধরিতে যায়, তাহা হইলে

ধর্ম্মসমাজ তাহাকে বলিতে পারে না কি যে, সেরূপ কার্য্যকরা তাহার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারেনা? বাস্তবিক বিশ্বাসের রাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকারই তাহার নাই।

অবশ্য বিশ্বাই যে আমাদের ধর্ম্মজীবনের সকল সমস্যার মীমাংসা সুচারুরূপে করিতে পারিয়াছে, ইহা আমি বলিতেছিনা; কেবলমাত্র বলিতে চাই যে, আমাদের ধর্ম্মজীবন লাভের পক্ষে জ্ঞান ও বিশ্বাসের মধ্যে বিশ্বাসই আমাদের অধিকতর সাহায্যকারী। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ধর্ম্মাবহ ঈশ্বরের স্বরূপ লক্ষণ গুলির বিষয়ে একটুকুন্ চিন্তা করিয়া দেখিলেই আমার এই কথাটার সত্যতা অনুভূত হইবে।

দার্শনিক জ্ঞান জোড় তাঁহাকে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ও একমেবাদ্বিতীয়ং রূপে ধরিতে পারে। কিন্তু সে তাঁহার আনন্দরূপমমৃতং শান্তং শিবং শুদ্ধং ও অপাপবিদ্ধং স্বরূপের কোন খবর আমাদিগকে দিতে পারে কি? তৎসম্বন্ধীয় তত্ত্ব কি ব্রহ্মবাদী ঋষিরা একমাত্র বিশ্বাসের সাহায্যেই লাভ করিয়াছিলেন না?

অধ্যাত্মবাদ যে জ্ঞানপ্রণালীর সাহায্যে নিখিল বিশ্বে ঈশ্বরের সর্ব্বময়ত্ব দেখিতে পাইয়াছে, উহা অতিশয় জটিল ও সূক্ষ্ম, সুতরাংই সাধারণের বোধাতীত। তাহা অধ্যাত্মবাদীর নিকট খুবই সন্তোষকর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু বিশ্বাসীর পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। আরো বলা যাইতে পারে যে, বৈদান্তিক ঋষিরা ঐ প্রণালী অবলম্বন না করিয়াও তো সেইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন। এরূপাবস্থায় আমরা ধর্ম্মবোধের মৌলিক বিশ্বাসকে উপেক্ষা করিয়া অধ্যাত্মবাদের দার্শনিক জ্ঞানের জয় ঘোষণা করিতে যাইব কেন?

অতুলচন্দ্র রায়।

ব্রাহ্মসমাজ।

পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসম্মিলনী—আগামী ১লা, ২রা ও ৩রা অক্টোবর শ্রীহট্ট-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসম্মিলনীর ঊনত্রিংশত্তম বার্ষিক অধিবেশনোৎসব সম্পন্ন হইবে। প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। সম্মিলনীর উৎসব সুসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত শ্রীহট্টের ব্রাহ্মগণ এক অভ্যর্থনা-কমিটির গঠন করিয়া উৎসাহের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র চৌধুরী অভ্যর্থনা-কমিটির সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত জানকীনাথ সেন সম্পাদক। এ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্যতীত সম্মিলনীর বার্ষিক অধিবেশন অন্য কোন স্থানে হয় নাই। পূর্ব্ববাঙ্গলার বাহিরে এই প্রথম বার সম্মিলনীর অধিবেশন হইবে। আশা করা যায়, এইবার শ্রীহট্টে আসাম ও সমগ্র বাঙ্গলা দেশের ব্রাহ্মগণ এবং ব্রাহ্মসমাজের শুভাকাঙ্ক্ষিগণ ব্রহ্মোৎসবে সমবেত হইবেন। বিদেশ হইতে যাঁহারা এই উৎসবে শ্রীহট্টে গমন করিবেন তাঁহারা ২৭এ সেপ্টেম্বর মধ্যে অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদককে পত্র লিখিয়া জানাইবেন। তাঁহাদের বাসস্থান ও আহারাদির বন্দোবস্ত, অভ্যর্থনা-কমিটি হইতে করা হইবে। বিছানা সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে। সম্মিলনীর অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইবে। যদি কেহ এই সকল বিষয়ে কোন প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠান তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। আলোচ্য বিষয়:—

(১) পরিবারে ও ব্যক্তিগত জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন। (২) পূর্ব্ববঙ্গে, বিশেষ ভাবে আসামপ্রদেশে, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার। (৩) ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নত আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখা। (৪) ব্রাহ্মসমাজের উপাসকমণ্ডলী ও আচার্য্য এবং তাঁহাদের মধ্যে সম্পর্ক। (৫) 'সেবক' পত্রিকা সম্পাদন। (৬) অনাথ ব্রাহ্মপরিবার সংস্থান ধনভাণ্ডার। ভাণ্ডারের ট্রাষ্টি পুনর্নির্ব্বাচন। (৭) "আসামপ্রদেশ সম্মিলনীর কার্য্যক্ষেত্রের অন্তর্গত" এই প্রস্তাব বিধিমত নির্দ্ধারণ। (৮) ১৯২১ সালের লোকসংখ্যাগণনা (Census) সম্বন্ধে ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য। (৯) বিবিধ।

মহিলাদিগের ও যুবকদিগের ভিন্ন ভিন্ন সম্মিলন হইবে।

প্রচার—"শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বিগত ৩১শে আগষ্ট হীরাপুর গ্রামে নিজ বাটীতে গমন করিয়া ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া অনেকেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। নগেন্দ্রনাথের চেহারার ও স্বভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন যে, উহা ব্রহ্মোপাসনার প্রত্যক্ষ ফল। ইহাতে তাঁহার উপর বিরক্তিপ্রকাশ ও ঘৃণা না করিয়া বরং সকলে সন্তুষ্ট হইলেন।"

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভাপদ পরিত্যাগ করাতে শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীনাথ দত্ত তাঁহার স্থলে নিযুক্ত হইয়াছেন। রায় বাহাদুর শশিভূষণ মজুমদার প্রচারকদিগের প্রতিনিধির পদ পরিত্যাগ করাতে শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল তাঁহার স্থলে প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন।

দান—বালেশ্বর ব্রাহ্মসমাজভুক্ত পরলোকগত ফকীরমোহন সেনাপতির সহধর্ম্মিণী কৃষ্ণকুমারী সেনাপতির সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ফকির বাবুর উইল অনুসারে তাঁহার গচ্ছিত সম্পত্তির সুদ হইতে ৯০্ টাকা ব্যয়ে ১৫০ জন দরিদ্রকে ৭।৷৹ মণ চাউল বিতরিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর তাঁহার নিজের ও তাঁহার স্ত্রীর শ্রাদ্ধে দুইবার এইরূপ অনুষ্ঠান ও ব্যয় হইয়া থাকে।

রাধানগর অনাথাশ্রম—রাধানগরে একটি অনাথাশ্রম স্থাপনের উদ্দেশ্যে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ পাল ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। তিনি এখন হইতেই কয়েকটি অনাথকে আপন গৃহে আশ্রয় দান করিয়াছেন। এই টাকা হইতেই আশ্রমের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে। এই দানের জন্য দ্বিজেন্দ্র বাবু সকলেরই বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

পটুয়াখালি ব্রাহ্মসমাজ—নিম্নলিখিত ভাবে পটুয়াখালি ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে:—

১৪ই ভাদ্র প্রাতে উপাসনা ও সঙ্গীত হয়, বাবু অম্বিকাচরণ সেন উপাসনার কার্য্য করেন। রাত্রিতে উদ্বোধনসূচক উপাসনায় শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। ১৫ই ভাদ্র প্রাতে সঙ্কীর্ত্তনান্তে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। রাত্রিতে স্থানীয় পাব্লিক্ লাইব্রেরী হলে মনোমোহন বাবু "জীবনের তিন ঘর" বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন। ১৬ই ভাদ্র প্রাতে মনোমোহন বাবু উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে উপাসক বন্ধুগণকে লইয়া ধর্ম্মজীবনের মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে আলোচনা হয়। রাত্রিতে "মহাজন প্রসঙ্গ"

বিষয়ে লাইব্রেরী হলে মনোমোহন বাবু দ্বিতীয় আর একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার আদি অন্তে সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতার পরে উপাসনাগৃহে উপাসকগণ মিলিত হইলে মনোমোহন বাবু সঙ্গীত প্রার্থনা করিয়া উৎসব শেষ করেন।

এই উৎসবে মনোমোহন বাবু বরিশাল হইতে পটুয়াখালি গমন করিলে সম্পাদক বাবু অম্বিকাচরণ সেন, উকীল বাবু যতীন্দ্রমোহন পোদ্দার প্রভৃতি উৎসাহের সহিত উৎসবের সমস্ত আয়োজন করেন। বক্তৃতা ও সঙ্গীতে সহরের শিক্ষিত ও পদস্থ জনগণ উপস্থিত হইয়া বিশেষ আনন্দলাভ ও সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। সাবডিভিসনাল অফিসার শ্রীযুক্ত কালীমোহন সেন সমাজের কার্য্যে বিশেষ সাহায্য ও সুহানুভূতি করিতেছেন।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ—বিগত ১৩ই ভাদ্র শনিবার সায়ংকালে ছাত্রসমাজের বিশেষ অধিবেশনে ব্রহ্মমন্দিরে স্বর্গীয় মহাত্মা আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের জীবন সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস সভাপতির কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্, এ, বি, এল্, শ্রীযুক্ত নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায় এম্, এ, শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এবং সভাপতি বক্তৃতা করেন।

বিগত ২০শে ভাদ্র শনিবার অপরাহ্নে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত হরকিশোর বিশ্বাসের গৃহে ব্রাহ্মবন্ধু সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া প্রার্থনা করেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস 'খৃষ্টীয় সাধনা' পুস্তক হইতে কিছু পাঠ করেন। এবং তৎপরে অধীত বিষয় হইতে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী চিন্তা, কার্য্য এবং জীবন, এই তিনের আদর্শ ও সামঞ্জস্য বিষয়ে আলোচনা উপস্থিত করেন। বন্ধুগণ এই আলোচনা করিলে মনোমোহন বাবু প্রার্থনা এবং সঙ্গীত করেন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ৫ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র মুক্তিদাপ্রসাদ ১৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। এই অল্প বয়সেই ইঁহার মধ্যে অনেক সদ্‌গুণ ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

বিগত আগষ্ট মাসে চট্টগ্রাম নগরীতে পরলোকগত ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগিরির পত্নী দীর্ঘকাল বার্দ্ধক্যজনিত রোগে ভুগিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন।

বিগত ৩১ আগষ্ট শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। পূর্ণবাবু এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ফণ্ডে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বাঁকিপুরের শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ঘোষের জ্যেষ্ঠপুত্র বিজন বিহারী দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া গত ১৮ই আগষ্ট সোমবার পরলোক গমন করিয়াছেন। শ্রাদ্ধক্রিয়া গত ৩১শে আগষ্ট বাঁকিপুরে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। এই উপলক্ষে বিনোদবাবু নিম্নলিখিতরূপ দান করিয়াছেন:—কলিকাতা সাঃ ব্রাহ্মসমাজ ৪৲, কলিকাতা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ৪৲, বাঁকিপুর সাঃ ব্রাহ্মসমাজ ৪৲, বাঁকিপুর নববিধান সমাজ ৪৲, কলিকাতা সাঃ ব্রাহ্মসমাজের দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারে ২৲, বাঁকিপুর রামমোহন রায় সেমিনারীতে পরলোকগত পুত্রের নামে একটি পদক দিবার নিমিত্ত ১৫৲, মোট ৩৩৲।

বিগত ১৭ই আগষ্ট রেঙ্গুন ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত কুলদাচরণ নিয়োগীর চতুর্থ পুত্র কান্তিচরণের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। এই উপলক্ষে কুলদাচরণ বাবু রেঙ্গুন ব্রাহ্মসমাজের দাতব্য বিভাগে ১৲ ও প্রচার বিভাগে ১৲ এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগে ৩৲, সাধনাশ্রমে ১৲, দাতব্য বিভাগে ১৲ ও দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে ১৲ দান করিয়াছেন।

বিগত ১৭ই আগষ্ট মান্দ্রাজ সাধনাশ্রমের পরিচারক বেণুগোপাল ২০ বৎসর বয়সে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি উৎসাহের সহিত নানাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে মান্দ্রাজ সাধনাশ্রম বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

গত ৭ই সেপ্টেম্বর প্রাতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগীর পরলোকগমন উপলক্ষে ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে উপাসনা হইয়াছে।

বিগত ১৪ই ভাদ্র রবিবার প্রাতে পরলোকগত কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত রাহাপাড়া গ্রামে তদীয় বাসভবনে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত কলিকাতা হইতে গমন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মোপাসনার পরে দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ বিমলভূষণ তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত পাঠ করেন এবং তৎপরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত উমাচরণ ঘোষ পদ্যে লিখিত তাঁহার গুণকাহিনী বর্ণনা করেন। তাঁহাকে এই গ্রামের লোকসমূহ এত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন যে, গ্রামস্থ প্রায় সকল গণ্য মান্য ব্যক্তিই এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তাঁহার আত্মীয়গণ ও বন্ধুগণ নিম্নলিখিতরূপে দান করিয়াছেন:—কালীমোহন বাবুর নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মমন্দিরের সংস্কার ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য—তাঁহার পত্নী ২০০৲, তাঁহার পুত্রদ্বয় শ্রীমান্ বিনোদবিহারী ঘোষ ৫০৲, বিমলভূষণ ঘোষ ১০০৲, কন্যাগণ—কুমারী সরলা ঘোষ, কুমারী গিরিবালা ঘোষ ও কুমারী লীলা ঘোষ ৫০৲ টাকা, তাঁহার ভাগিনেয় কৃষ্ণকুমার বসু ১০৲, তাঁহার কর্ম্মচারী ব্রজেন্দ্রকিশোর দত্ত ২৫৲, মোট ৪৩৫৲ টাকা। এতদ্ব্যতীত তাঁহার পত্নী ও কন্যাগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৫৲, ও ঢাকা পূর্ব্ববাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজে ২০৲ দান করিয়াছেন। কালীমোহন বাবুর জীবনের শেষকীর্ত্তি ও তাঁহার প্রিয়তম 'শান্তিভবন' নামক নূতন ব্রহ্মমন্দিরকে জাগ্রত রাখিবার জন্য যাহাতে প্রচারকগণ অন্ততঃ বৎসরে একবার সেখানে যাইতে পারেন, তাহার জন্য তদীয় পত্নী ও পুত্রকন্যাগণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে একটি ফণ্ড স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

গত ৩১শে আগষ্ট প্রাতে শ্রীমতী বিনোদিনী মিত্র তাঁহার বড়জুলীস্থ ভবনে তাঁহার পিতা পরলোকগত কালীমোহন ঘোষের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে তেজপুর এবং চারিদিকের বাগান হইতে তাঁহাদের অনেক বন্ধুবান্ধব সমাগত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত বরকাকতি আচার্য্যের কার্য্য করেন, জামাতা শ্রীযুক্ত প্যারীকান্ত মিত্র জীবনী পাঠ এবং কন্যা সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করেন। কন্যা নিম্নলিখিত দান করিয়াছেন:—তেজপুর ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, রাহাপাড়া শান্তিভবন ব্রহ্মমন্দির ৪৫৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মিসন্ ফণ্ড ৫৲, পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ মিসন্ ফণ্ড, ঢাকা ৫৲ মোট ৬০৲ টাকা।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে তাঁহার চির-শান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের প্রাণে সান্ত্বনা বিধান করুন।

ভ্রম সংশোধন।

গত ১৬ই ভাদ্রের তত্ত্বকৌমুদীতে "বিশ্বাস" নামক প্রবন্ধে ১১৮ পৃষ্ঠার ফুটনোটে "সঙ্কল্প" স্থলে "সংকলন" এবং প্রবন্ধের শেষ ছত্রে বিশ্বাস "বিশুদ্ধ" স্থলে বিশ্বাস "বিরুদ্ধ" হইবে।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

Registered No C. 65

অসতোমা সদগময়,
তমসোমা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—
১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৪শ ভাগ।	১৬ই আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩২৬, ১৮৪১ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯০	অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲
১২শ সংখ্যা।	3rd October, 1919.	প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে পবিত্রস্বরূপ, তুমি পূর্ণ পবিত্রতার আকর, তোমার সম্মুখে আমাদের পাপ অভাব, ত্রুটি দুর্ব্বলতা কত অধিক! আমরা যতই তোমাকে জানিতে ও বুঝিতে পারি ততই আমাদের ক্ষুদ্রতা ও মলিনতা অনুভব করিয়া থাকি, তোমা হইতে যে আমরা কত দূরে পড়িয়া রহিয়াছি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকি। আমরা অধিকাংশ সময় তোমাকে ভুলিয়া থাকি বলিয়াই, তোমাকে উজ্জ্বলরূপে দেখিতে পাই না বলিয়াই, আমাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া নিজেদের মলিন জীবন লইয়াই সন্তুষ্ট থাকি, আনন্দ-আরামেই কাল কাটাই। আমরা যখন কোনও গুরুতর পাপে লিপ্ত হই না, আমরা যখন সাধারণভাবে সাধুজীবনই যাপন করি, ধর্ম্মকর্ম্মও কিছু করি, তখন আর আমাদের ক্ষোভ করিবার কিছু নাই, এরূপ মনে করি। ইহাতে যে প্রকৃতপক্ষে আমাদের শোচনীয় অবস্থাই প্রকাশ পাইতেছে, তাহা আমরা একেবারেই বুঝিতে পারি না। ইহাদ্বারা যে আমাদের উন্নতির পথই রুদ্ধ হইতেছে, তাহাও একবার চিন্তা করিয়া দেখি না। এরূপ আত্মতৃপ্তি ও চিন্তাহীনতা মৃত্যুরই লক্ষণ। আমরা মৃতের ন্যায়ই জীবন যাপন করিতেছি। হে জীবনদেবতা, তুমি ভিন্ন আর কে আমাদের এই মৃত নিস্পন্দভাব দূর করিবে? আমাদের পাপ মলিনতা আমাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করাইবে? আমাদের ত্রুটি দুর্ব্বলতা আমাদিগকে যথার্থরূপে বুঝিতে সমর্থ করিবে? তুমি কৃপা কর, আমাদিগকে আপনাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে দেও, হৃদয় হইতে আমাদের দুরবস্থার জন্য, পাপ মলিনতার জন্য, ব্যাকুল ক্রন্দন ও প্রার্থনা উত্থিত কর। তোমার পবিত্র মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের সকলের মধ্যে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

নিবেদন।

নিরুদ্বেগ—শিশু ত ছুটাছুটি করে, কতবার পড়ে, কতবার উঠে; এক একবার ক্রন্দন করে; কিন্তু তার ভয় নাই, ভাবনা নাই। তার জননীর দৃষ্টি সর্ব্বদা তার উপর রয়েছে, মা তার সঙ্গে রয়েছেন; তার চিন্তা কি, উদ্বেগ কি? তোমার এত চিন্তা কেন, এত উদ্বেগ কেন? জান না, তাঁর দৃষ্টি নিয়ত তোমার উপর রয়েছে? তুমি যখন ছুটাছুটি কর, তখন কি মায়ের পানে তাকাইয়া নিরুদ্বেগ হইতে পার না? একবার পড়িলে, দুইবার পড়িলে, তাতেই বা ভয় কি? মা ত তোমারই পশ্চাতে ছুটিতেছেন, তিনি তোমাকে ত বিপদে পড়িতে দেবেন না। তাঁতে নির্ভর করিতে পার না? অন্যের জন্য তোমার ভাবনা হয়? অন্যে বিপথে গেল, প্রিয়জন সুপথে চলে না ব'লে উদ্বেগ হয়? জান না, তিনি তোমার প্রিয়জনকে কত স্নেহ করেন? জান না, তিনি তাঁরও সঙ্গে নিয়ত রয়েছেন? তাঁর প্রেম যে অসীম! তাঁর স্নেহে আস্থা স্থাপন ক'রে নিরুদ্বেগ হ'তে পার না? তিনি যে সঙ্গেই রয়েছেন।

তুমি কি চাও?—তুমি প্রভু, আমি তোমার ক্রীতদাস; আমার যাহা, তাহা ত কিছুই নিজের বলিয়া রাখিতে পারি না; তাই আমি সকলই ত তোমাকে দিয়াছি। তবে আর কি চাও? ঐ যে হৃদয়ের কোণে যে টুকু লুকিয়ে রেখেছি সে টুকুও তুমি নিবে? আমার প্রাণের গ্রন্থি ছিন্ন ক'রে লুকান ধনও নিয়ে যাবে? আমার প্রিয়জন যে, তাকেও তুমি নিবে? আমার আশা আকাঙ্ক্ষা, তাও তুমি নিবে? আমাকে কাঁদাইয়া সকলই তুমি নিবে? একটুও আমার রাখিতে পারিব না? দুঃখ বেদনায় একটুও কাঁদিতে পারিব না? যদি তাই প্রভু, তোমার ইচ্ছা

হয়, তবে সবই লও; আমি ত পথের ভিখারী হইতে বসিয়াছি। আমার কি আছে? কত আশা ছিল কত আকাঙ্ক্ষা ছিল, কত সুখবাসনা ছিল; সবই তুমি নিয়েছ। তাই এখন অতি গোপনে, অতি যতনে যাহা লুকিয়ে রেখেছিলাম, তাও নিতে এসেছ? হে কঠোর, হে নিঠুর, দাসের এ টুকুও তোমার সহিল না? তবে এ টুকুও নিয়ে যাও; তোমার মুখখানি দে'খে যেন সকল দুঃখের মধ্যেও আনন্দ লাভ করি।

স্মৃতি—আজ আমি কত দীন হ'য়ে পড়েছি; আমার প্রাণে আশা নাই, মনে শান্তি নাই। এ আমার কি হলো? যাঁর আভাস পেয়েছিলাম, যে রূপ দে'খে ছুটে এসেছিলাম, তা আমার কোথায় গেল? আজ কত স্থানের কত স্মৃতি রয়ে গেছে! কোন্ সঙ্গীতের স্বরে কি সুধাধারা প্রাণে ঢালিয়া দিয়াছিল, কোন্ বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরধ্বনিতে কি আকুল আহ্বান শুনেছিলাম, কোন্ বৃক্ষপত্রের আড়ালে কাহার উঁকি দে'খে মুগ্ধ হয়েছিলাম, কোন্ অন্ধকার রজনীতে ঝড় ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে কাহার গম্ভীর ভাবে স্তব্ধ হয়েছিলাম, কোন্ স্রোতস্বিনীর কুলকুল্ ধ্বনিতে, কোন্ পাখীর সুকণ্ঠে প্রাণ উদাস ক'রে দিয়েছিল; কোন্ প্রিয়জনের সমাগমে, কোন্ আপনার জনের বিচ্ছেদ-বেদনার মধ্যে কার সুমধুর বাণী শু'নে, মধুর স্পর্শ পেয়ে পাগল হয়েছিলাম—আজ সে স্মৃতিতে কত সুখ, কত আনন্দ! আজ তবে আমার এ দশা কেন হলো? জানি না, তাঁর কি লীলা; কাকে কি ভাবে তিনি ধরেন, কাকে কি ভাবে তিনি রাখেন, জানি না। আমার যে প্রাণ যায়; তিনি কি তা দেখেন না? তবে আয় স্মৃতি—ঐ স্মৃতি ল'য়েই তাঁর দয়ার প্রতীক্ষায় থাকি।

গোপনে—বাহিরে আমাকে বিপদে ফেলিলে, গোপনে এসে আমার হাতখানি ধ'রে তুলিলে! বাহিরে লোকে কত অপমান করিল, কত বেদনা দিল, ভিতরে গোপনে এসে তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিতেছ! আমি বাহিরে যাই, লোকে আমাকে কত কি বলে, আমাকে কত বিদ্রূপ করে; কিন্তু ভিতরে গোপনে তোমার প্রসন্ন মুখ দে'খে আমি সকল দুঃখ ভুলে যাই। তুমি যদি বল 'বেশ হয়েছে' তবে আমি আর ভয় করি না। আমার আপনার জন যারা তারাও ত বিমুখ হয়, তারাও ত আমার প্রাণের কথা শোনে না, মনের ব্যথা বোঝে না। তাদের কাছে যেয়েও ত সমবেদনা পাই না; আমাকে পাগল বলে; তাই তারাও উপেক্ষা ক'রে চলে যায়। কিন্তু তুমি যখন আদর কর, প্রসন্নমুখে কথা বল, মিষ্ট কথা শুনাও, তখন আমার আর দুঃখ থাকে না; সকলের অপমান, বিদ্রূপ, উপেক্ষা সহ্য করিতে পারি। তাই তোমার দিকেই আমি চেয়ে রহিলাম।

সম্পাদকীয়।

ক্ষুধাই প্রয়োজনীয়—কাহারও যদি গৃহে অন্নের সংস্থান থাকে, আর তাহার সন্তানাদির ক্ষুধা অতিশয় প্রবল হইয়া, তাহাদিগকে অস্থির করিয়া তোলে, তাহা হইলে সেই গৃহস্থের মনের অবস্থা যে অতিশয় উদ্বেগপূর্ণ হইতে থাকে, অতি ক্লেশে অতি উৎকণ্ঠার সহিতই যে তাহাকে সময় অতিবাহিত করিতে হয়, তাহা ত সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। গৃহে অন্নের সংস্থান নাই, আর ক্ষুধা আছে, এ যে অতি বিষম কষ্টকর ব্যাপার। কিন্তু কাহারও গৃহে যদি অন্নের সংস্থান থাকে, নানা উপাদেয় খাদ্যে তাহার ভাণ্ডার পূর্ণ থাকে, আর তাহার বা তাহার পরিবারস্থ জনগণের ক্ষুধার অভাব হয়—সেই পরিবারের লোকদিগকে যদি নানা প্রকারের প্রবর্ত্তনা দিয়া আহারে প্রবৃত্তি জন্মাইতে হয়; যদি তাহাদিগকে বলিতে হয় এ বস্তু অমুক বিখ্যাত স্থানে উৎপন্ন—ইহা অতি প্রসিদ্ধ সুপকারের প্রস্তুত করা উপাদেয় খাদ্য। ইত্যাদি নানা প্রকারের অনুরোধ, উপরোধ-দ্বারা যদি তাহাদিগের আহারে প্রবৃত্তি জন্মাইতে হয়, তাহা হইলে বলিতেই হইবে যে, ঐ ক্ষুধাকাতর অন্নের সংস্থানহীন গৃহস্থের অবস্থাই বাঞ্ছনীয়; কারণ, তাহার পরিবারের লোকের স্বাস্থ্য আছে; তাহারা সুস্থ—যখনই তাহাদের জন্য অন্নের সংস্থান হইবে, তখনই তাহারা অতি তৃপ্তির সহিত সে অন্ন গ্রহণ করিয়া সবল ও সুন্দর হইয়া উঠিবে। তাহারা কার্য্যক্ষেত্রে গমন করিয়া কার্য্যে সুপারগ হইয়া উঠিবে, এবং তদ্দ্বারা তাহারা পরিশেষে কৃতী হইয়া সুখী হইতে পারিবে। কিন্তু ক্ষুধাহীনদিগের গৃহ নানা অন্নব্যঞ্জনে পূর্ণ থাকিলেও, এক ক্ষুধার অভাবে তাহাদের সকল আয়োজনই নিষ্ফল। ক্ষুধা যার নাই, সে হয় রুগ্ন, না হয় সে আসন্ন রোগের আক্রমণে আক্রান্ত হইবার অবস্থায় উপস্থিত। ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকাই একান্ত আবশ্যক, তাহার অভাবে সমস্ত উপাদেয় উপকরণে গৃহ পূর্ণ হইলেও বিশেষ লাভ নাই।

শরীর সম্বন্ধে উক্ত কথা যেমন সত্য, আত্মার সম্বন্ধে উক্ত কথাটি আরও অধিক পরিমাণে সত্য এজন্য যে, এ স্থলে ক্ষুধিত ব্যক্তির খাদ্যের অভাব একেবারেই হয় না। যিনি আত্মার ক্ষুধার শান্তিকারী, তাঁহার ভাণ্ডার নানা উপাদেয় খাদ্যে সর্ব্বদাই পূর্ণ। তাহাতে অভাব বলিয়া কথা একেবারেই নাই। এ ক্ষেত্রে দাতা দান করিয়া ক্লান্ত হন না, গৃহীতাই গ্রহণ করিয়া করিয়া পরিশ্রান্ত হয়। এ স্থলে প্রয়োজন কেবলই ক্ষুধার। ক্ষুধা থাকিলেই সে পাইবে। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন "ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত ব্যক্তিরা ধন্য, কারণ তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে।" অন্নহীন গৃহস্থ ক্ষুধাকে ভয় করিতে পারে—কিন্তু আত্মার দিক্ দিয়া ক্ষুধিতের কোনই ভয় নাই—ক্ষুধা না থাকাটাই ভয়ের হেতু। কারণ ক্ষুধা না থাকাটাই একটা ব্যাধি। ব্যাধিগ্রস্তকেই ত উদ্বেগ ও ভয়ে ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া কাল কাটাইতে হয়। এ পথে বিচরণ-কারীর প্রধান সম্বলই—ক্ষুধা বা ব্যাকুলতা। ব্যাকুলতা যাহার আছে—তাহার জন্য সবই আছে। আর যাহার ব্যাকুলতা নাই, তাহার পক্ষে মহেশ্বরের অসীম প্রেমপুণ্যের ভাণ্ডার সদা পূর্ণ থাকিলেও না থাকারই মধ্যে গণ্য।

শরীরের পক্ষে যখন ক্ষুধার অভাব হয়—রুচির অভাব হয়, তখন লোকে ভীত হইতে থাকে এজন্য যে, অতি ত্বরায় তাহাকে রোগে আক্রমণ করিবে। তাই সে ভয়াকুল হইয়া শরীর চালনা—ব্যায়াম প্রভৃতিতে রত হয়। ঔষধ সেবনও করিতে থাকে। আত্মার ক্ষুধাহীনতা হইলেও তাহাই করিতে হইবে। তখন

আরও ব্যগ্রতার সঙ্গে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ, সৎসঙ্গ প্রভৃতির অনুষ্ঠানদ্বারা আত্মার চালনা করিতে হইবে। যদিও তখন পূজা অর্চ্চনাদি ভাল লাগে না, তথাপি বলপূর্ব্বকই সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, অধিকতর আকুলতার সহিত প্রার্থনাদি করিতে হইবে। ব্যাধিকে প্রশ্রয় দেওয়া বা বর্দ্ধিত হইতে দেওয়া কোন ক্রমেই উচিত্ নহে। তাহা একেবারেই সুবুদ্ধির কাজ নহে।

পাপবোধ—সে দিন কোনও বন্ধু গভীর দুঃখের সহিত বলিতেছিলেন,—"আজকাল আর ব্রাহ্মসমাজে পূর্ব্বের ন্যায় পাপের জন্য আকুল ক্রন্দন, ত্রুটি দুর্ব্বলতার জন্য প্রবল অশ্রুপাত, পরম লভনীয়কে লাভ না করিবার দুঃখে কাতরতাজনিত ব্যাকুল প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ সকলের জীবন দেখিয়া এরূপও মনে হয় না যে, যাহা পাইবার তাহা তাঁহারা পূর্ণভাবেই পাইয়াছেন, তাঁহাদের আর কোনও ত্রুটিদুর্ব্বলতা নাই, অভাব নাই, চাহিবার ও পাইবার কিছু নাই, দুঃখ পরিতাপের কোনও হেতু নাই।" কথাটার মধ্যে অনেক ভাবিবার ও চিন্তা করিবার বিষয় আছে। ইহার মধ্যে যে সত্য আছে, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য পাপ বলিতে চুরি ডাকাতি প্রভৃতি কয়েকটা বড় বড় পাপই বুঝায় না, না পাওয়ার অর্থও কোনও সময়ে কোনও একটু আভাসও না পাওয়া নহে। একদিকে যেমন যাহা কিছু জীবনদেবতার ইচ্ছাবিরুদ্ধ, যাহা কিছু আমাদের উন্নতি ও বিকাশের প্রতিবন্ধক, আমাদের পক্ষে অনিষ্টকারী ও অকর্ত্তব্য তাহাই পাপ, অন্য দিকে যাহা কিছু কর্ত্তব্য ও কল্যাণের জন্য একান্ত করণীয় তাহাতে অবহেলা বা ত্রুটিও পাপ। এই জন্য ইংরাজীতে পাপের দুইপ্রকার শ্রেণীবিভাগ করা হইয়া থাকে—Sins of omission and sins of commission (কর্ত্তব্য না করা এবং অকর্ত্তব্য করা)। পাওয়া বলিতেও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষভাবে স্বামীরূপে পাওয়া, নিত্যযোগে যুক্ত হওয়া, সকল সংশয়, সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বিগতভীঃ হওয়াই বুঝায়। এই অর্থে যে, আমাদের যথেষ্ট পাপ রহিয়াছে, অভাব রহিয়াছে, তাঁহাকে যথার্থরূপে পাওয়া হয় নাই, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে আমাদের সে বোধ নাই কেন? সে জন্য পূর্ব্বের ন্যায় আকুল প্রার্থনা নাই কেন? ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন, পাপবোধ ও এরূপ প্রার্থনা খৃষ্টীয় ভাব—সে সময় সমাজমধ্যে খৃষ্টীয় ভাব প্রবল ছিল, এখন হিন্দুভাব প্রবল হইয়াছে। ইহার মধ্যে কিছু সত্য থাকিতে পারে, কিন্তু এখানে সে বিচারে প্রবৃত্ত হইবার কোনও আবশ্যকতা নাই। ইহা কল্যাণকর কি না, ধর্ম্মজীবনের উন্নতি ও বিকাশের পক্ষে ইহার কোনও প্রয়োজন আছে কি না, তাহার আলোচনা করাই অধিকতর আবশ্যক বলিয়া অনুমিত হয়। হিন্দু ও খৃষ্টীয় ভাবের পরস্পরের তুলনা না করিয়া যদি সাধারণ ভাবে এই কথা বলা যায় যে, তাহার কোনটিই পূর্ণ নয়, উভয়ের মধ্যেই কিছু অপূর্ণতা আছে, তাহাদের উভয়ের সম্মিলনেই প্রকৃত পূর্ণতা ও কল্যাণ, তাহা হইলে বোধ হয় কিছুমাত্র সত্যের অপলাপ করা হইবে না, কাহারও প্রতি অন্যায় অসম্মানও প্রদর্শন করা হইবে না।

সে যাহা হউক, প্রশ্নটির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হইবে। কেহ কেহ বলেন, অভাবের দিক্ দেখিবার প্রয়োজন নাই, শুধু ভাবের দিক্ই দেখিতে হইবে, যাহা আছে, যাহা পাইতেছি, শুধু তাহাই দেখিতে হইবে—আমি যে ক্ষুদ্র, আমি যে দীন মলিন ইহা কখনও ভাবিতে হইবে না; আমি যে বড়, আমি যে অনন্তেরই অংশ, আমি যে অতুল সম্পদের অধিকারী, অক্ষয় আনন্দ শান্তিভোগের জন্যই সৃষ্ট, শুধু তাহাই ভাবিতে হইবে। ইহাতেই আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় হৃদয় পূর্ণ হইবে, প্রেমভক্তিতে প্রাণমন প্লাবিত হইবে, জীবন উন্নত হইবে। আবার কেহ কেহ বলেন, পবিত্রস্বরূপের রাজ্যে পাপ বলিয়া কিছু নাই, কিছু থাকিতে পারে না, বিকৃত মনের মিথ্যা কুসংস্কার হইতেই উক্ত প্রকারের ভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে যাহাই ভাবুক, যাহাই করুক, যে পথেই চলুক, ভালই ভাবে, ভালই করে, কল্যাণের পথেই চলে। লৌকিক বিচারে যে ত্রুটি লক্ষিত হয়, তাহা ভ্রান্তিমূলক, সমাজ যে তাহার স্বাধীনতায় বাধা দিতে যায়, তাহা অনিষ্টকর। ইহা ব্যতীত আরও এক শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা পাপ পুণ্যের প্রভেদ, মানবাত্মার ক্ষুদ্রতা ও অপূর্ণতা স্বীকার করিয়াও বলিতে চাহেন যে, সাধারণ অবস্থায় এ বোধটা থাকিলেও জীবাত্মা ও পরমাত্মার মৌলিক একত্বহেতু, (ভেদের মধ্যেও যে অভেদ আছে) গভীর ধ্যানের অবস্থায় ডুবিয়া জীবাত্মা যখন কেবল পরমাত্মাকেই দেখিতে পায়, তাঁহার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে, তখন আর এ বোধ থাকে না। এ সকল কথার মধ্যে অতি সূক্ষ্মভাবেও কোনও গুরুতর ভ্রান্তি লুক্কায়িত আছে কি না, একটু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক; কেন না, এই সকল মতের দ্বারা যে গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং আমরা আজ সে অনিষ্টকারিতা প্রমাণ করিবার কোনও চেষ্টা না করিয়া, উহার মধ্যে গূঢ়ভাবে যে ভ্রম রহিয়াছে—তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেছি। যাঁহারা একান্ত অদ্বৈতবাদী, জীবাত্মা ও পরমাত্মায় কোন প্রভেদ স্বীকার করেন না, যাঁহারা জীবের কোন প্রকার স্বাধীনতা আছে স্বীকার করেন না, তাঁহাদের বিষয়েও কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাঁহারা যতদূর ইচ্ছা মৌলিক একতা স্বীকার করিয়াও বিন্দুপরিমাণ মৌলিক ভেদ স্বীকার করেন, জীবাত্মাকে যতদূর ইচ্ছা অনন্তের আশ্রিত মানিয়াও সান্ত বলিয়া—জ্ঞানে, প্রেমে, শক্তিতে অনন্তের সমতুল্য না হইয়া সীমাবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন, যত ক্ষুদ্র পরিসরেই আবদ্ধ হউক, যত অল্প পরিমাণেই হউক, ইচ্ছার স্বাধীনতা আছে স্বীকার করেন, তাঁহারা কোনও প্রকারেই উক্তরূপ কথা বলিতে পারেন না। তাঁহাদের উক্ত প্রকারের কথার মধ্যে কিছু সত্য থাকিলেও অনন্তের মহত্ত্বে মুগ্ধ হইলে আর অপর দিকে দৃষ্টি থাকে না, ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও, উহা যে সম্পূর্ণ সত্য নয়, উহা যে অন্ততঃ একদেশদর্শী, সুতরাং ভ্রমপরিপূর্ণ, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ধ্যান যতই গভীর হউক না কেন, ধ্যানের অবস্থায় আপনাকে যতই ভুলিয়া যাই না কেন, দার্শনিক বিশ্লেষণের নিকট যে পার্থক্যটা থাকিয়া যাইবেই, আপনার ক্ষুদ্রতাটা স্পষ্ট হইবেই, তাহা অবশ্য

কোনও দার্শনিককে বুঝাইতে হইবে না। আর, গভীর ধ্যান ও জ্ঞানের অবস্থায় যদি অভেদটা, পরমাত্মার অনন্তত্ব ও মহত্ত্বের ভাবটাই উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভেদটা, আপনার ক্ষুদ্রতার, অভাব ও ত্রুটির জ্ঞানটাও উজ্জ্বল হওয়াই কি স্বাভাবিক নহে? সেরূপ না হইলে ইহাই মনে করা কি যুক্তিসঙ্গত নহে যে, কোনও ভ্রান্ত সংস্কারে বা দীর্ঘকালের অভ্যাস বশতঃই ওরূপ ঘটিতেছে? ধর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতা এবং ধর্ম্মজীবনে উন্নত সাধু মহাত্মাদিগের ইতিহাসও এই সাক্ষ্যই দিবে। মহাপুরুষদের জীবনে যেরূপ উজ্জ্বল পাপবোধ, আপনার ত্রুটিদুর্ব্বলতার তীব্র অনুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়, আর কোথাও তাহা দৃষ্ট হয় না। আমাদের প্রত্যেক জীবনের অভিজ্ঞতায়ও দেখিতে পাই, পূর্ব্বে যে সকল পাপ ত্রুটি অভাবের বোধ ছিল না, ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহা স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে, কত নূতন সূক্ষ্ম পাপ, ত্রুটি-দুর্ব্বলতা দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে, কত আকুল প্রার্থনা হৃদয়ে জাগিয়াছে। আর যখন তাঁহাকে ভুলিয়া রহিয়াছি, যে একটু উচ্চ অবস্থা তাঁহার কৃপায় কোনও সময় পাইয়াছি তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়াছি, তখনই দেখিয়াছি পাপবোধ ম্লান হইয়াছে, নিজের অবস্থায় তৃপ্তি জন্মিয়াছে। দার্শনিক বিচার অথবা সর্ব্ব দেশের সর্ব্ব কালের মানবজাতির অভিজ্ঞতা, ইহার কোনটাই আমাদের অভাবটাকে, পাপ-মলিনতাটাকে অপ্রমাণিত করিতে পারে না—মানবজীবনের মধ্যে যে একটা দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম আছে, একটা অতৃপ্তিবোধ আছে, তাহাকে মিথ্যা কল্পনা বলিয়া প্রমাণ করিতে পারে না। বরং ইহার বিপরীতটা বলিতে গেলেই কল্পনার আশ্রয় লইতে হইবে, যুক্তি বিচার, অভিজ্ঞতাকে অগ্রাহ্য করিতে হইবে। আর আমরা না দেখিলেই অথবা তারস্বরে অস্বীকার করিলেই যে উহাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তাহাও নহে। মঙ্গল বিধাতা আমাদের সকল অপূর্ণতা দোষ ত্রুটি দুর্ব্বলতার মধ্য দিয়া যে আমাদিগকে পূর্ণতার দিকে, উন্নতি ও বিকাশের পথে লইয়া যাইতেছেন, তাহার জন্য প্রেমে ও কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইতে হইলেও তাঁহার দয়া ও করুণা স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে আপনার হীনতা ও অযোগ্যতা হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। তাহা না হইলে কোনও প্রকারেই যথাযোগ্য প্রেম ও কৃতজ্ঞতা জন্মিতে পারে না। যেদিক দিয়াই বিচার করি না কেন, দেখিতে পাইব, পাপ ও অভাববোধ বিদূরিত করা সম্ভবপরও নয়, কল্যাণকরও নয়। সুতরাং আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা যে কোনও প্রকারেই স্বাভাবিক নহে, নিতান্তই অস্বাভাবিক, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা আমাদের চিন্তাশীলতা ও ধর্ম্মজীবনের গভীরতার অভাব, এবং সাধন বিষয়ে কিছু অস্বাভাবিকতাই প্রমাণ করিতেছে। এ দিকে আমাদের সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক। আমরা প্রকৃত জীবন লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হই। আমাদের মধ্যে আবার পূর্ব্বের ন্যায় পাপ বোধ ও ব্যাকুল প্রার্থনা জাগিয়া উঠুক। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

উপাসনার অন্তরায়।

ইতঃপূর্ব্বে উপাসনার সম্ভবপরতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা গিয়াছে। সম্প্রতি উপাসনার অন্তরায় সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল। উপাসনার অন্তরায় বহু। সে সম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা করিবার সাধ্য নাই। এতদ্বিষয়ক অভিজ্ঞতার অভাব সর্ব্বদাই অনুভবে আসিতেছে। সুতরাং সম্যক্ বা সমীচীন আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার আশা না থাকিলেও, কথঞ্চিৎ রূপেই সে কার্য্য সমাধা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

উপাসনার পথে চলিতে প্রবৃত্ত হইবার পক্ষে সর্ব্বপ্রধান এবং প্রথম অন্তরায় মানবের আত্মবোধের অভাব—আপনার অবস্থার সম্বন্ধে অজ্ঞতা। সে যে অতি দীন; অতি দুঃখী; সে সম্বন্ধেই তাহার অজ্ঞতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আপনার দৈন্যের বোধ যার নাই, আত্মদুঃখের বোধ যার নাই, তাহার অবস্থা যে অতিশয় শোচনীয় তাহাতে ত কোনই সন্দেহ নাই। কারণ, দৈন্য বা দুঃখ যদি অনুভবে না আসে, তবে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সে ত কোন উপায়ই অবলম্বন করে না। দীন হইয়াও যে আপনাকে অদীন বলিয়া মনে করে, দুঃখী হইয়াও যে আপনাকে দুঃখহীন বলিয়া মনে করে, তাহার পক্ষে এই অজ্ঞতারূপ মহাব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার ত কোনই সম্ভাবনা দেখা যায় না। সে যে অস্বাস্থ্যকেই স্বাস্থ্য মনে করিয়া মোহাভিভূত হইয়া আছে! সে যে দুর্গতি হইতে মুক্ত হইবার জন্য কোন চেষ্টাই করে না! মহর্ষি ঈশা যে বলিয়াছিলেন,—"দীনাত্মারা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই"—এ উক্তির মহিমা বা গৌরব এজন্য নহে যে, দীন—যাহার কিছুই নাই—তাহার সেই না থাকার জন্যই তাহাকে তিনি ধন্যবাদ দিয়াছেন বা তাহাকে ধন্য মনে করিয়াছেন। দীন ত সকলেই—দীন হইবার জন্য ত কাহাকেও কোনরূপ চেষ্টা করিতে হয় না। তবে দীনজনকে আর ধন্যবাদ দিবার প্রয়োজনীয়তা কি আছে? ঈশার ঐ বাক্যের ইহাই তাৎপর্য্য যে, যে ব্যক্তি আপনাকে দীন বলিয়া জানে—যে আপনার দৈন্য অনুভব করে, সে-ই ধন্য, কারণ, তাহার দীনতার দূরের সম্ভাবনা হইয়াছে। সে উপায় অন্বেষণে ব্যস্ত হইবে। যে বুঝিয়াছে যে, আমি দীন, আমি দুঃখী, সেই ত দীনতা হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিবে, তাহারই প্রাণ হইতে দীনতা-মুক্ত হইবার জন্য আকুল প্রার্থনা উঠিবে—ব্যাকুল চেষ্টাতে প্রবৃত্ত হওয়া ত তাহার পক্ষেই সম্ভবপর হইবে। এজন্যই দীনাত্মাকে ধন্য বলা হইয়াছে। দীনতার জন্য নহে, কিন্তু দীনতার অনুভবেরই জন্য।

আত্মার ব্যাধি, যাহা অনুভব করিতে জ্ঞানের অত্যাবশ্যক—উৎকৃষ্ট আচার্য্যের উপদেশের আবশ্যক, মানুষ যে শুধু তাহাই অনুভব করে না, এমনও নহে। শারীরিক ব্যাধিও এমন আছে, যাহার প্রবল আক্রমণেও মানুষ মনে করে সে বেশ আছে; শীঘ্রই সে সুস্থ হইবে। অতি সাংঘাতিক যক্ষ্মা-রোগগ্রস্ত রোগীকেও এই অবস্থায় উপস্থিত হইতে দেখা গিয়াছে। রোগীর মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী, তাহার দেহ হইতে জীবনীশক্তির অবসান হইতেছে, সেই অবস্থাতেও রোগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাওয়া গিয়াছে, সে ভাল আছে, সে শীঘ্রই সুস্থ হইবে।

শরীরের পক্ষে এ ব্যাধি যেমন, সাংঘাতিক আত্মার পক্ষেও মোহাচ্ছন্ন হইয়া, দীন হইয়াও আপনাকে অদীন বলিয়া ভাবা দুঃখী হইয়াও আপনাকে দুঃখহীন বলিয়া মনে করা, অতি সাংঘাতিক ব্যাধি। এই শ্রেণীর রোগগ্রস্তকেই ডাকিয়া আচার্য্য বলিয়াছেন,—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

হে জীবসকল, উত্থান কর, অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগ্রত হও এবং উৎকৃষ্ট আচার্য্যের নিকট যাইয়া জ্ঞান লাভ কর। পণ্ডিতেরা এই পথকে শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া বলিয়াছেন।

আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশের পক্ষে জ্ঞানের প্রয়োজনীয়ত কত, তাহা ইহাতেই বুঝা যায়। জ্ঞানই বলিয়া দেয়—মানবের দীনতা কত, এবং সে দীনতা হইতে তাহার কত দুঃখ সমুপস্থিত হইয়া থাকে। জ্ঞানই জানায় তাহাকে অদীন হইতে হইবে, পরম সম্পদ্ লাভ করিতে হইবে। সে যে অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে, সে অবস্থাতে অবস্থিতি করা তাহার পক্ষে কোন মতেই শোভন নহে—প্রার্থনীয় নহে। তাহাকে মহাসম্পদ্‌বান্ হইতে হইবে; সকল ভয় ভাবনার অতীত হইতে হইবে এ জন্যই জ্ঞানের এত মহিমা। গীতায় জ্ঞানের মহিমা নিম্নোক্ত বাক্যে ব্যক্ত হইয়াছে,—"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।" ইহ সংসারে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্রকর বস্তু আর কিছুই নাই।

লোকে সম্পদ্‌হীন হইয়াও যে সংসারে হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়—সুস্থ সবলের যেরূপে এ রাজ্যে বিচরণ করা উচিত, সেই ভাবেই যে দীনহীনেরাও এ দেশে কাল কাটায়, তাহাতে তাহাদের অজ্ঞানতার আতিশয্য যেমন অভিব্যক্ত হয়, তেমনি তাহাদের রোগও যে কত প্রবল, কত কঠিন, তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। বিকারগ্রস্ত যাহারা তাহারাই অসুস্থ হইয়াও আপনাকে সুস্থের মত দেখাইয়া থাকে। রুগ্ন হইয়াও লোকে যে আপনাকে সুস্থের মত দেখায়, তাহা ত তাহার পক্ষে অতি শোচনীয় বিনাশের পূর্ব্বাবস্থা।

জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ সক্রেটিশ বলিয়াছিলেন, "লোকে আমাকে কেন যে জ্ঞানী বলিয়া মনে করে, তাহা ত বুঝা যায় না; কারণ, আমি জানি আমার জ্ঞান সামান্য। তবে, এ কথা সত্য যে, লোকে জ্ঞানী না হইয়াও আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া মনে করে। কিন্তু আমি জানি যে আমি অল্পজ্ঞান। অন্যলোকের সহিত আমার এই প্রভেদ।" জ্ঞানীতে আর অজ্ঞানে এই প্রভেদ। জ্ঞানী আপনার অবস্থা বুঝিতে সমর্থ। তাঁহার জ্ঞানের পরিমাণ যে অতি অল্প, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন, অপরেরা সেরূপ নহে। তাহারা অল্পজ্ঞান হইয়াও আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া ভাবে। সুতরাং তাহারা অল্পে অথবা কিছু না পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকে। পাইবার জন্য—রোগমুক্ত হইবার জন্য, তাহাদের কোন চেষ্টাই হয় না। তাহাদের রোগ-পরিমাণ অত্যধিক।

উক্ত কারণেই লোকের প্রাণে জিজ্ঞাসারও উদয় হয় না। জ্ঞানপ্রসাদে যে বুঝিয়াছে যে, তাহার ঈশ্বরকে জানিতে হইবে এবং তাঁহাকে জানিয়া তাঁহার অনুগত হইতে হইবে ও তাঁহারই হইতে হইবে—ঈশ্বরকে জানিয়া তাঁহাতেই অনুরক্ত হইতে হইবে, তাঁহাতে অনুরক্ত হইয়া আপনার হীনতা ও মলিনতা হইতে মুক্ত হইতে হইবে এবং অদীন হইয়া কৃতার্থ হইতে হইবে,—তাহার পক্ষেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হওয়া সম্ভবপর হয়; ব্রহ্মজিজ্ঞাসা তাহার প্রাণেই উপস্থিত হয়। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় না হইলে যেমন তাঁহাকে পাইবার ইচ্ছা হয় না, তেমনি তাঁহাকে জানিবার, পাইবার উপায় যে তাঁহার উপাসনা তাহার চেষ্টাও তাহাতে আসে না। উপাসনাই পরমেশ্বরকে জানিবার, পাইবার এবং তাঁহার হইবার পক্ষে শ্রেষ্ঠতম উপায়। আত্মবোধের অভাবে মানুষ সেই পরম উপায় অবলম্বনেই বিমুখ হইয়া বাস করে।

আত্মবোধের অভাব উপাসনার পথে অগ্রসর হইবার যেমন এক বিশেষ অন্তরায়, তেমনি আত্মবিস্মৃতিও পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে আর এক প্রবল অন্তরায়। আত্মবিস্মৃতি তাহারই নাম যাহা মানুষকে আপন ভাবনা হইতে বিমুখ করে। মানুষের কি পাইতে হইবে, তাহার কোন্ অবস্থায় যাইতে হইবে, তাহাকে কিরূপ সুস্থ সুন্দর হইতে হইবে, সে সকল চিন্তায় যে পরিশ্রম আছে, সে চিন্তায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে যে তাহাকে সংযমের মধ্য দিয়া, সংযত হইয়া, চলিতে হইবে, সে সব ঝঞ্ঝাট হইতে আত্মবিস্মৃতি তাহাকে মুক্তি দান করে। ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং সাধু সজ্জনের গৃহে জাত হইয়াও কেহ যদি ঘটনাক্রমে আত্মপরিচয় না জানে, সে যদি গরিব ও সাধারণ লোকদিগের মধ্যে বাস করিতে ও পরিবর্দ্ধিত হইতে বাধ্য হয়, তাহার পক্ষে যেমন ঘটে,—সে দরিদ্রের এবং সাধারণ লোকের মতই চলা ফিরা করে—দুঃখেই দিন কাটায়, পরমাত্মাজাত মানবের পক্ষেও আত্মবিস্মৃতিদ্বারা সেই অবস্থা উপস্থিত হয়। সে আপনাকে ভুলিয়া সামান্য ভাবে জীবন যাপন করিয়াই তুষ্ট হয়, তাহার প্রাণে কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষাও আসে না, উচ্চ হইবার চেষ্টাও তাহার হয় না; এ কারণেও সে উপাসনারূপ কল্যাণকর ব্রত হইতে দূরে থাকে। তাহার প্রাণে ব্যাকুলতারও উদয় হয় না। অব্যাকুলপ্রাণ যে, সে ত উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে পারে না—ব্যাকুলতার অভাবও এ পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে প্রবল অন্তরায়।

আমাদের মণ্ডলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সাধারণ ভাবে এই সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হইতে হয় যে, মণ্ডলীস্থ অধিকাংশ লোক এই আত্মবোধবিহীন, আত্মবিস্মৃতিতে নিমগ্ন। মণ্ডলীতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অভাবও বিশেষরূপে বিদ্যমান। এ মণ্ডলীতে উপাসনার প্রতি বীতরাগ ব্যক্তির সংখ্যাও সেই কারণেই এত অধিক।

আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পরিবারে ধর্ম্মসাধন ও সন্তানদের ধর্ম্মশিক্ষা।

(১৩)

আধ্যাত্মিক সাধন।

গৃহস্থের গৃহ-ধর্ম্ম যদি ঈশ্বরের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেই সুখ ও শান্তির আলয় হয়, এইজন্য ধর্ম্মাবহ যিনি তাঁহার সিংহাসন সে গৃহে সর্ব্বাগ্রে পাতিবে।"

শিবনাথ শাস্ত্রী।

এস হে গৃহদেবতা, এ ভবন পুণ্যপ্রভাবে কর পবিত্র।
বিরাজ জননী, সবার জীবনতরি, দেখাও আদর্শ
মহান্ চরিত্র॥

ধর্ম্মসাধন।

বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগতের সংস্পর্শে—স্থান কাল ও বস্তুর সঙ্গে শরীর মন ও হৃদয়ের সংযোগে, এবং মানবীয় আত্মীয়তার প্রভাবে, জীবনে শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্য, জ্ঞানবুদ্ধি এবং শ্রদ্ধাপ্রীতি যে পরিমাণে সুনিয়মিত ও বিকশিত হয়, সেই পরিমাণে সত্যের সঙ্গে মানুষের পরিচয় হয় ও ব্রহ্মানুভূতির পথ পরিষ্কার হয়। জীবনের কাজ, জ্ঞান ও প্রেম, সবই ধর্ম্মসাধনের ভিত্তি, অঙ্গ ও সঙ্গ; কিন্তু ধর্ম্ম-সাধন এ সব ছাড়া, এ সবের উপর আরও কিছু গভীরতর, অন্তরতর, উচ্চতর, মধুরতর, পবিত্রতর। একজন কর্ম্মী, জ্ঞানী ও প্রেমিক হ'য়েও, সেই অন্তরতর অমৃতময় জীবনের বাহিরে বাস করতে পারে, ব্রহ্মানন্দ হ'তে বঞ্চিত থাকতে পারে। সুতরাং, বিষয়-ব্যবস্থা, কাজকর্ম্ম, ও জ্ঞান-প্রেমের উন্নতিবিধানের সঙ্গে সঙ্গে, আধ্যাত্মিক বৃত্তির বিকাশের জন্য স্বতন্ত্র আয়োজন আবশ্যক। এই আয়োজনের নাম ধর্ম্মসাধন।

ধর্ম্মসাধনের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান ও কাল, পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল বস্তুসমাবেশ, গ্লানিবিহীন শরীর, শান্ত একাগ্র মন, শ্রদ্ধাবনত ও সরস হৃদয়, সাধুভক্তের সঙ্গ বা স্মৃতি, প্রিয়জনে প্রীতি, মণ্ডলীর সান্নিধ্য, আত্মপরীক্ষা, শাস্ত্র, শ্লোক, সঙ্গীত, সৌরভ ও সজ্জা, মটো ফটো, ফুলপাতা প্রভৃতি বহু উপকরণ আবশ্যক।

স্থান—উপাসনা গৃহ।

গৃহে ধর্ম্মসাধন প্রতিষ্ঠিত ও জীবন্ত রাখ্‌তে হলে, প্রতি পরিবারে উপাসনাদির জন্য একটি স্বতন্ত্র গৃহ বা গৃহের অংশ নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত, যেখানে গিয়ে একটু আড়ালে শান্তভাবে বসা যায়। শান্তভাবে চিন্তা, পাঠ, ধ্যান, প্রার্থনা প্রভৃতির জন্য প্রত্যেকেরই একটু নির্জ্জন স্থান আবশ্যক। গৃহের যে কোন স্থানে একটা কিছু পেতে, তাড়াতাড়ি উপাসনা সেরে ফেলায় নিয়ম রক্ষা হয়, প্রকৃত ধর্ম্মসাধন হয় না; বরং গুরুতর বিষয় নিয়ে লঘুতা করার অপরাধ হয়।

স্বতন্ত্র উপাসনা গৃহের অনেক সার্থকতা আছে।

প্রথমতঃ—স্বতন্ত্র ও সুসজ্জিত উপাসনা-গৃহে, নির্দ্দিষ্ট আসনে ব'সে, নিত্য উপাসনা, প্রার্থনা, প্রসঙ্গ ও আত্মপরীক্ষা করিলে, সেই গৃহের বস্তুসকল ও বায়ুমণ্ডল সাধকের সহায়স্বরূপ হ'য়ে যায়, এবং সেই গৃহের একটা প্রভাব সাধককে সংযত ও একাগ্র হ'তে বিশেষ সাহায্য করে। নির্দ্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র উপাসনার স্থান, সকলের শান্ত হ'য়ে বস্‌বার স্থান, জুড়োবার স্থান। এক গৃহে প্রতিদিন সুখে দুঃখে, শোকে আনন্দে,—একলক্ষ্য, ও জীবনের ব্রত নিয়ে,—কখনও একাকী, কখনও সপরিবারে, কখনও ধর্ম্মবন্ধুগণ সঙ্গে ব'সে,—নানা ভাবে ভগবানের পানে চেয়ে, তাঁতে আত্মসমাধান করবার চেষ্টা ক'রে,—তাঁকে খুঁজতে, বুঝ্‌তে ও ধরতে চেষ্টা ক'রে—কখনও হেসে, কখনও কেঁদে তাঁর কাছে আত্ম-নিবেদন, কৃতজ্ঞতা অর্পণ ও প্রার্থনা ক'রে, জীবনে যে একটি আভ্যন্তরীন ও ঈশ্বরমুখী প্রবাহ উৎপন্ন হয়, সেই প্রবাহের উৎস সেই গৃহের মধ্যে অতি সহজে পাওয়া যায়। ধর্ম্মজীবন অন্তরে, কিন্তু যতদিন আমরা শরীরী জীব, ততদিন আমাদের পক্ষে বাহ্যিক আয়োজন অপরিহার্য্য।

দ্বিতীয়তঃ—এরূপ একটি স্বতন্ত্র স্থান না থাকলে, ব্যক্তিগত সাধনের বিশেষ বিঘ্ন হয়। পরিবারের সকলে দিনের মধ্যে একবার কি দুইবার উপাসনায় বস্‌তে পারে। কিন্তু অবস্থা বিশেষে এক একজনের দিনের মধ্যে বহুবার উপাসনা, প্রার্থনা, ধ্যান, ধারণার জন্য একটু নির্জ্জন স্থানে যাওয়া আবশ্যক হ'তে পারে। যখন গৃহের কয়েক জন নানাকাজে রত, তখন একজন বা দুইজনের একটু শান্তভাবে বসা আবশ্যক হ'তে পারে। স্থান সম্বন্ধে এই সুযোগ না থাকায়, অনেকের কত শুভ আকাঙ্ক্ষা, মনের উন্মুখ অবস্থা, কত সুযোগ ও সুসময় বৃথা যায়, এবং জীবনে ও পরিবারে ধর্ম্ম বস্‌তে পায় না। ধর্ম্মসাধন অতি কোমল ও গভীর বিষয়। অতি সামান্য কারণে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। সন্তানগণ যখন প্রথম ধর্ম্মসাধনে ব্রতী হবে, জীবনের সংগ্রামের কথা মা বাবার সঙ্গে বল্‌বে, সে সময় যদি একটু নির্জ্জন স্বতন্ত্র ও আড়াল জায়গা না পায়, তা হ'লে, তাদের পক্ষে ধর্ম্ম-সাধন প্রায় অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়ায়। সমবেত পারিবারিক উপাসনার সময় ব্যতীত অন্য সময়, যার যখন সুবিধা, ব্যক্তিগত সাধনের জন্য উপাসনাগৃহে গিয়া বস্‌লে, সে স্থানটি হয় সাধনের অগ্নিকুণ্ড। তদ্দ্বারা গৃহের বায়ু পবিত্র থাকে।

তৃতীয়তঃ—সন্তানগণকে ধর্ম্মশিক্ষাদানের পক্ষে উপাসনাগৃহ পরম সহায়। ধর্ম্মশিক্ষার মূল শ্রদ্ধাভক্তি। সন্তানদের অন্তরে শ্রদ্ধাভক্তি জাগ্রত করা প্রথম কাজ। স্বতন্ত্র, সুসজ্জিত, নিত্য পরিমার্জ্জিত ও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্যবহৃত উপাসনাগৃহে গুরুজনদিগকে বিধিপূর্ব্বক উপাসনা প্রার্থনা প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মসাধন করতে দে'খে, সন্তানদের অন্তরে ধর্ম্মসাধনের প্রতি স্থায়ী ও ধারাবাহিক শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়। উপাসনার গৃহ সংমার্জ্জন, ধূনো দেওয়া, পত্রপুষ্প যথাস্থানে সাজিয়ে রাখা, আসন পাতা, সঙ্গীতাদি যথাস্থানে রাখা, ঘণ্টা বাজানো প্রভৃতি কাজের ভিতর দিয়ে শিশুদের জীবনে ধর্ম্মের প্রথম সোপান রচিত হয়—ধর্ম্মসাধনের পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। তাদের অজ্ঞাতসারে তাদের অন্তরে ধর্ম্মভাবের বীজ উপ্ত হয়। বয়স্কদের কর্ত্তৃত্বাধীনে ছেলেমেয়েদের দ্বারা বিধিপূর্ব্বক এই সকল কাজ করানো এবং অর্চ্চনা বন্দনা প্রভৃতির সময় বয়স্কদের শুদ্ধশান্তভাব, ও ছেলেমেয়েদের নীরব থাকা প্রভৃতি ব্যাপারের ভিতর দিয়ে গৃহে ধর্ম্মসাধন ব্যাপক আকার ধারণ করে।

চতুর্থতঃ—স্বতন্ত্র গৃহ ও স্বতন্ত্র আয়োজন ব্যতীত গৃহে একটি অখণ্ড পূর্ণ ধর্ম্মভাব বজায় রাখা সম্ভবপর নয়। ধর্ম্মসাধন কত পবিত্র ও সূক্ষ্ম ব্যাপার, কি ক'রে ধর্ম্মসাধন করতে হয়, ধর্ম্ম কত মনোহর—তার সমষ্টিময় প্রতিমূর্ত্তিরূপে উপাসনাগৃহ সকলের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

এ কথা বলাই বাহুল্য যে, উপাসনার নামে একটি স্বতন্ত্র গৃহ রাখ্‌লেই, সব আপনা আপনি হবে না। নিজেদের ব্যক্তিগত ও সমবেত ব্যাকুলতা ও সাধননিষ্ঠার দ্বারা নির্জীব গৃহকে জীবনে পূর্ণ ক'রে তুলতে হয়। গৃহের নিজস্ব কোন শক্তি নাই। পরিবারে স্বতন্ত্র উপাসনাগৃহের অভাব, সাধনকেন্দ্রের অভাব।

আশ্রয়হীন ধর্ম্ম-সাধন গভীরতা ও মধুরতা হ'তে বঞ্চিত থাকে অন্ততঃ সেরূপ সাধনে পরিবারে ধর্ম্ম বসে না, সন্তানগণ ধর্ম্ম ধ'র্‌তে পারে না।

কাল।

তার পর সাধন-কাল।—পরিবারে ধর্ম্মসাধনের সুব্যবস্থা কর্‌তে হ'লে, সাধনের সময় নির্দ্দিষ্ট ক'রে 'রুটিন্' করা আবশ্যক। (১) প্রত্যহ নির্জ্জন সাধন ও পারিবারিক সাধন; (২) সপ্তাহের বিশেষ বিশেষ দিনে বিশেষ ব্যক্তিগত ব্রতসাধন, পারিবারিক অনুষ্ঠান, পরিবারের অন্তর্গত ব্যক্তিদের সঙ্গে ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে স্বতন্ত্র ভাবে ধর্ম্মসাধন, ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গ; (৩) মাসের বিশেষ বিশেষ তারিখে উৎসব অনুষ্ঠান, ইত্যাদি; (৪) সমাজে বা অন্য পরিবারে উপাসনা, প্রসঙ্গ প্রভৃতি।

ধর্ম্ম-সাধনের জন্য প্রত্যহ কত সময় যাপন করা উচিত, তা স্থির করা কর্ত্তব্য। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে, সমস্ত দিনের বিবিধ উপাসনা, প্রার্থনা, আত্মচিন্তা প্রভৃতির জন্য কমপক্ষে ২ঘণ্টা ব্যয় করা আবশ্যক। সাধনের প্রধান সময় প্রাতঃকাল,—সে সময় কমপক্ষে একঘণ্টা ধর্ম্মসাধনে যাপন করা উচিত। রবিবার, ছুটির দিন, উৎসবের দিন আরও বেশীসময় দিয়ে নির্জ্জন ও সজনসাধন করা কর্ত্তব্য।

সাধনসংক্রান্ত বস্তু।

ধর্ম্মসাধন সংক্রান্ত বস্তুসকলের সুশৃঙ্খল সমাবেশ ব্যতীত সাধন সুসম্পন্ন হয় না। বস্‌বার আসন, শাস্ত্র গ্রন্থাদি, বাদ্যযন্ত্র, ফুলের তোড়া, ধূনো, ঘণ্টা প্রভৃতি যথাসময়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ক'রে যথাস্থানে রাখা আবশ্যক,—কার্য্যকালে যেন বস্তুর অভাব বা পারিপাট্যের অভাব বোধ না হয়। উপাসনা অনুষ্ঠান প্রভৃতির আরম্ভ হওয়ার অন্ততঃ আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে এই সব গোছগাছ সম্পূর্ণ হওয়া উচিত।

ব্যক্তিগত সাধনের স্তর।

এই সকল বাহ্য উপকরণকে সাধনের সহায় ও অনুকূল ক'রে নিয়ে, তার পর সাধনে মনোনিবেশ করা উচিত। এই গেল সাধনের প্রথম স্তর।

সাধনের দ্বিতীয় স্তর—নিয়মিত স্নান আহার প্রভৃতির দ্বারা সতেজ শরীর, ও তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়-গ্রাম। প্রতিদিন ধর্ম্মসাধনের পূর্ব্বে অঙ্গমার্জ্জন ইত্যাদির দ্বারা শরীর পবিত্র ও স্নিগ্ধ সতেজ করা আবশ্যক।

সাধনের তৃতীয় স্তর—শাস্ত্র, সাধুজীবনী ইত্যাদি পাঠ, আত্মপরীক্ষা ও সঙ্গীত সংকীর্ত্তন।

সাধনের চতুর্থ স্তর—ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে বিশ্বব্যাপার পর্য্যালোচনা,—আকাশে জলে স্থলে, বর্ণে গন্ধে শব্দে ব্রহ্মের শক্তি, জ্ঞান ও প্রেম অনুভব করা। আরাধনা আরম্ভ।

সাধনের পঞ্চম স্তর—একাগ্রমনে জনসমাজে, পরিবারে, সাধক মণ্ডলীতে; সাধুভক্তজীবনে এবং আত্মজীবনে ব্রহ্মের মঙ্গলবিধি ও লীলা দর্শন।

সাধনের ষষ্ঠ স্তর--জীবনের গভীরতম জ্ঞান প্রেম ও দিব্য অনুভূতির মধ্যে, বিশেষ কল্যাণকর ঘটনার মধ্যে, অন্তর রাজ্যে ব্রহ্মের লীলা দর্শন। আরাধনা শেষ।

সাধনের সপ্তম স্তর—এই সকলের একত্র সমাবেশে এবং এ সকল ছাড়িয়ে এক "অনন্ত ভূমা মহান্" "সচ্চিদানন্দ" সাগরের অন্বেষণ ও তাতে অবগাহন। ধ্যান।

সাধনের অষ্টম স্তর—প্রার্থনা ও আত্মসমর্পণ,—অনুগত হওয়ার সংকল্প ও ব্রত-গ্রহণ। ও বন্দনা।

এই সাধন একবারে নির্জ্জন ও নীরব হ'তে পারে, অথবা সপরিবারে অথবা ধর্ম্মবন্ধুগণের সঙ্গেও হ'তে পারে। প্রথম প্রথম এইরূপ প্রণালী ও স্তর অনুসারে সাধন করাতে কিছু সময় লাগে, কিন্তু এ পথে গতিবিধি হ'লে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে শান্ত সংযত ব্যাকুলহৃদয় মন এই আটটি স্তর অতিক্রম ক'রে নবজীবন লাভ কর্‌তে পারে। ব্যক্তিগত দৈনিক সাধনের এ একটা আভাসমাত্র। সাধন ব্যাপারটিকে এমনি ক'রে গুছিয়ে নিতে হয়।

প্রত্যক্ষ যোগ।

সবই বৃথা, যদি সত্যস্বরূপের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ও যোগ না হয়। প্রথমতঃ, জ্ঞানগত পরোক্ষ বিশ্বাসকেই ধর্‌তে হয়, কিন্তু তাতেই ক্ষান্ত হ'তে হয় না; গভীর স্পষ্ট অন্তরের অনুভূতি-জাত প্রত্যক্ষ বিশ্বাসে সুপ্রতিষ্ঠিত না হ'লে, ধর্ম্মের বিমল শান্তি, ভূমা আনন্দ এবং অমোঘ শক্তি লাভ হয় না।

প্রস্তুত হওয়ার উপায়।

মনকে শান্ত ও একাগ্র করবার জন্য আত্মপরীক্ষা ও সদ্গ্রন্থ পাঠ করা আবশ্যক; হৃদয়কে সরস ও বিনীত কর্‌বার জন্য ভক্ত জীবনের কাহিনী চিন্তা করা আবশ্যক, এবং অন্তরে ভগবানের করুণা গভীর রূপে অনুভব ক'রে কৃতজ্ঞ হওয়ার জন্য, আত্ম-জীবনের ঘটনাবলী, ধর্ম্মবন্ধু লাভ, সাধুসঙ্গ, মণ্ডলীর প্রভাব, প্রিয় জনদের স্নেহ প্রীতি, কল্যাণকর স্মৃতি প্রভৃতির পর্য্যালোচনা করতে হয়।

(ক্রমশঃ)

সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত।

প্রাপ্ত।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ।

(প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর)

আমি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর দিতে গিয়া 'সম্বন্ধবাদ' প্রবন্ধে দেখাইয়াছিলাম যে, ব্রহ্মবাদ দ্বৈতাদ্বৈতসম্বন্ধবিশিষ্ট এবং এই দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্ব হিগেল দর্শনে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। রায় মহাশয় এখন হিগেল দর্শনের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। গোটা দর্শনের প্রতিবাদ নহে, কেবল সেই মতেরই প্রতিবাদ, "যে মতের সহিত ধর্ম্মবিজ্ঞানের সম্বন্ধ আছে।" হিগেল জার্ম্মন্ দার্শনিক, তাঁহার মূলগ্রন্থ জার্ম্মন্ ভাষায় লিখিত। ইংরাজি ভাষায় তাহার অনুবাদ হইয়াছে। হিগেল ধার্ম্মিক, প্রাণবান খ্রীষ্টান ছিলেন। রায় মহাশয় যদি পরিশ্রম স্বীকার করিয়া ইংরাজিভাষায় হিগেল দর্শন পাঠ করিতেন, তবে তাঁহার লেখনী হইতে হিগেল দর্শনের ধর্ম্মবিজ্ঞানের প্রতিবাদ তত্ত্বকৌমুদীর স্তম্ভে বাহির হইত কি না সন্দেহ। যদিই বা প্রতিবাদ করিতেন, তবে তাঁহার লিখনপ্রণালী অন্যরূপ হইত; যে ভাবে—যেরূপ যুক্তিদ্বারা প্রতিবাদ করিয়াছেন, এ ভাবে করিতেন না। ব্রাহ্মসমাজে

গিগেলের ব্রহ্মবাদ অবলম্বন করিয়া দুই ব্যক্তি দুইখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন; পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ লিখিয়াছেন বঙ্গভাষায় 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' এবং ডাঃ হীরালাল হালদার লিখিয়াছেন 'Rational Basis of Theism' ইংরাজি ভাষায়। পণ্ডিত তত্ত্বভূষণ লিখিয়াছেন, সর্ব্বসাধারণকে বুঝাইবার জন্য, ডাঃ হালদার লিখিয়াছেন দার্শনিক এবং চিন্তাশীল পাঠকদিগের জন্য। রায় মহাশয় ডাঃ হালদারের ইংরাজি গ্রন্থের কোন কোন স্থান হইতে দু'এক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া হিগেলের ব্রহ্মবাদের প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কোন্ জ্ঞান লইয়া? সাধারণ জ্ঞান লইয়া। তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন —"এখানে সাধারণ জ্ঞান জিজ্ঞাসা করিতে পারে কি না যে"—ইত্যাদি। এই সাধারণ জ্ঞান লইয়া দার্শনিকদিগের জন্য লিখিত সূক্ষ্ম বিচারপূর্ণ ডাঃ হালদারের ইংরাজি গ্রন্থ হইতে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উপস্থিত করিয়া হিগেল দর্শনের প্রতিবাদ করিতে রায় মহাশয় সাহসী হইলেন, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় বিস্তৃত ও সরল ভাবে উক্ত দর্শনের ব্রহ্মবাদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে; তাহা পাঠ করিলে রায় মহাশয় হিগেল মতের মূর্ত্তিটি দেখিতে পাইতেন এবং ইংরাজির অনুবাদ করিতে গিয়া 'কিঞ্চিৎ গোলযোগে পড়িয়াছি' বলিয়া তাঁহাকে দুঃখ প্রকাশ করিতেও হইত না। বাস্তবিকই তিনি অনুবাদ করিতে গিয়া বিপন্ন হইয়াছেন। দর্শনশাস্ত্রের ইংরাজি বিশেষ শব্দসমূহ বঙ্গভাষায় যে ভাবে ব্যক্ত হয়, তাহা জানা থাকিলে রায় মহাশয় ভাষা-সঙ্কটে পড়িতেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি। রায় মহাশয় ইংরাজির অনুবাদ এইরূপ করিয়াছেন,—"মানবাত্মা সেই অনাদি অনন্ত আত্মারই আংশিক পুনর্জ্জাত সত্তা বা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।" ইহা খৃষ্টানী বাঙ্গলা। ব্রাহ্মসাহিত্যে ঐ কথাটি এইরূপে ব্যক্ত হয়,—"মানবাত্মা পরব্রহ্মের অনুপ্রকাশ।"

ডাঃ হালদারের ইংরাজি গ্রন্থ হইতে কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিয়া 'সাধারণ বুদ্ধিতে' বিচার করিতে যাওয়া কি যুক্তিযুক্ত হইয়াছে? তিনি হিগেলের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রতিবাদ করিতে দণ্ডায়মান হইয়া প্রশ্ন করিয়াছেন—"মানবেতর জীবসমূহের কোন প্রকারের আত্মা ও আমিত্ববোধ আছে কি না?"—"একটা কুকুর আপনাকে অন্য একটা কুকুর হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া কি জানিতে পারে না?"—"কুকুর তাহার প্রভুকে জানে ও চিনে, সেই প্রভুকে অতিক্রম করাও তাহার পক্ষে অনিবার্য্য হয় কি না?" ইত্যাদি যুক্তির সাহায্যে হিগেলের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করা আর মাটির ঢেলার দ্বারা প্রস্তরের প্রাচীর ভগ্ন করিতে যাওয়া কি এক কথা নহে? এজন্য রায় মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দুঃখিত হইয়াছি। রায় মহাশয় যদি 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' ও 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসার' ভাব আত্মস্থ করিয়া প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইতেন তবে নিশ্চয় বলিতে পারি, তাঁহার যুক্তিপ্রণালী এইরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিত না। ভূমিকাস্বরূপ এই কয়টি কথা নিবেদন করিয়া এখন মূল বিষয়ে প্রবেশের চেষ্টা করি।

দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্বের অন্য নাম জ্ঞানবাদ। জ্ঞানবাদের ভূমিতে উপনীত হইবার পূর্ব্বে আর দুইটি ধাপ আছে, তাহা অতিক্রম করিতে হয়। জগতের সমুদয় মূল দর্শনতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিলে চারিটি ভাগে তাহা বিভক্ত হইতে পারে। সেই চারিটি ভাগের নাম এই;—(১) কার্য্যকারণবাদ (২) শক্তি বা অভিপ্রায়বাদ (৩) জ্ঞানবাদ (৪) নীতি বা প্রেমবাদ।

(১) কারণবাদ—কার্য্য দেখিলেই কারণের দিকে মন যায়, ইহা মানবের অনতিক্রমণীয় বিশ্বাস। জগতের কার্য্যকারণ-শৃঙ্খল দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ হইতে কার্য্য, আবার সেই কার্য্যই অপর কার্য্যের কারণ। এই কার্য্যকারণ অসীম হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু একই কারণ হইতে যে জগতে সমুদয় কার্য্য বীচিমালার ন্যায় উদ্ভূত হইতেছে, তাহার প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ প্রমাণ কারণবাদ দেখাইতে পারে না। (২) শক্তি বা অভিপ্রায়বাদ—বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, বৃষ্টি পতিত হইতেছে, অগ্নি জ্বলিতেছে, মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, এই সকল প্রাকৃতিক ব্যাপারে শক্তি প্রকাশিত হইতেছে। যেখানে মরুভূমি ছিল, সেখানে পর্ব্বত দেখা দিতেছে, পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া সাগর হইতেছে, ইহা শক্তির লীলা। কারণবাদে যিনি কারণ ছিলেন, এখানে তাঁহাকে শক্তিরূপে দেখা হইল। শক্তি আর কিছুই নয়—ইচ্ছা। ইচ্ছারই প্রকাশ—শক্তিরূপে। শক্তি এবং ইচ্ছা একই বস্তু। শক্তিতে ইচ্ছারই প্রকাশ, সৃষ্টি-কৌশলে অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে। অভিপ্রায় ভিন্ন কৌশল হইতে পারে না। কিন্তু এখানেও ঐ কথা, সকল অভিপ্রায়ই যে এক হইতে সম্ভূত, ইহার সাক্ষাৎ প্রমাণ অভিপ্রায়বাদও দেখাইতে পারে না।

(৩) জ্ঞানবাদ। মানবের আত্মপ্রত্যয় বা আত্মজ্ঞান বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, নিখিল বিশ্ব এবং বিশ্বমানব এক অখণ্ড জ্ঞানেরই অনুপ্রকাশ। জ্ঞানস্বরূপ অনন্তস্বরূপ অদ্বৈত পরব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের পথ জ্ঞানবাদ যেরূপ বলিয়া দেয়, সেরূপ কারণবাদ ও অভিপ্রায়বাদ বলিয়া দিতে পারে না। তাঁহাদের প্রদর্শিত প্রমাণকে ত অনুমান বলা যাইতে পারে। জ্ঞানবাদ আত্মজ্ঞানের মূলে প্রবেশ করিয়া এক অখণ্ড অনন্ত জ্ঞানের সন্ধান পান। অদ্বৈত অনন্ত জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ করেন। এই অখণ্ড জ্ঞান পূর্ণ অপূর্ণ, অনন্ত সান্ত সম্বন্ধ যুক্ত এবং সম্বন্ধের অতীতও তিনি। ইনিই পরব্রহ্ম। ইনি সর্ব্বময়, সর্ব্বাতীত এবং সর্ব্বজ্ঞ। নিখিল বিশ্ব তাঁহার অনুপ্রকাশ, বিশ্বমানব তাঁহার অনুপ্রকাশ। 'পুত্র পিতার সহিত একাত্ম, পিতা পুত্রের সহিত একাত্ম।' ইহা দ্বৈতাদ্বৈত দর্শনের বাণী। ইহা নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ নহে, 'সোঽহংবাদ' নহে।

রায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—"অধ্যাত্মবাদ পরমাত্মা ও মানবাত্মার মধ্যে অভেদ ভাব দেখাইবার জন্য যেমন ব্যস্ত, ভেদ ভাব দেখাইতে সেরূপ যত্ন ও চেষ্টা করে নাই।" রায় মহাশয় ভুল বুঝিয়াছেন, অভেদের মধ্যে ভেদ এবং ভেদের মধ্যে অভেদ দেখাইবার জন্যই জ্ঞানবাদের সৃষ্টি। জ্ঞানবাদের অদ্বৈত তত্ত্ব 'নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত' নহে, সোঽহংবাদ' নহে; এই জন্যই ইহাকে পাকা রকম দাঁড় করাইবার জন্য বিশেষ আয়োজন হইয়াছে। ইহা যখন 'দ্বৈতাদ্বৈত' নামে অভিহিত, তখন ইহাকে নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদ বা সোঽহংবাদের কোঠায় ফেলিলে কি অবিচার হয় না? সাধারণ জ্ঞান বলে এই যে, রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শময় জড়জগৎ, ইহা জ্ঞানের বাহিরে—আত্মার বাহিরে।

জ্ঞানবাদ বলে—"যাহাকে আমরা জড়জগৎ বলি, তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে গিয়া প্রকৃত পক্ষে আমরা আত্মার বাহিরে যাই না, অধ্যাত্ম জগতের বাহিরে যাই না, আমরা আত্মা ও আত্মার আশ্রিত বিষয়সমূহকেই প্রত্যক্ষ করি।" *

রায় মহাশয় হিগেল-শিষ্য গ্রীণের গ্রন্থ হইতে একটু স্থান অনুবাদ করিয়া 'অতিক্রম' শব্দটি কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বুঝিতে না পারিয়া সসীম অসীমের প্রতিবাদ করিয়াছেন; এজন্য কুকুরের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। কুকুরের পরে ঋষিদিগকেও আকর্ষণ করিয়াছেন,—"তদ্রূপ উপনিষদের যে ঋষি বলিয়াছেন,—'হে অমৃতের পুত্রগণ, তোমরা শোন, আমি অমৃতময় পুরুষকে জানিয়াছি', সেই ঋষির পক্ষেও ঈশ্বরকে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল না কি?" রায় মহাশয় হিগেল-ব্যাখ্যাত সসীম অসীমের সম্বন্ধ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিলে 'অতিক্রম' শব্দটি লইয়া বিপদাপন্ন হইতেন না,—তর্কে প্রবৃত্ত হইতেন না। সসীম-অসীম সম্বন্ধ বিষয়ে 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়' সরল ও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা আছে। রায় মহাশয় গ্রীণের যে কথা লিখিয়াছেন ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কয়েকটি অধ্যায়ে সেই তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সসীম-অসীম সম্বন্ধে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বলিতেছে, "আমারই মধ্যে ক্ষুদ্র ও মহতের, সসীম ও অসীমের, ব্যক্তিগত ভাব ও বিশ্বজনীনত্বের আশ্চর্য্য সম্মিলন রহিয়াছে। আমি একদিকে ক্ষুদ্র, সসীম, ব্যক্তিগত; কিন্তু আমারই মধ্যে এমন কিছু রহিয়াছে, যাহা মূলে অতি মহান্, অসীম ও বিশ্বজনীন। সেই অসীম বস্তু আমার "উচ্চতর আমি" (higher self) রূপে, আমার পরম-আত্মারূপে বর্ত্তমান থাকাতেই আমি আমার ব্যক্তিগত ভাবকে অতিক্রম করিতে পারিতেছি। আমার ব্যক্তিগত জীবনের বহিরিস্থ তত্ত্ব-সমুদয় অবগত হইতে পারিতেছি, অনতিক্রমণীয় বিশ্বজনীন সত্যের অধিকারী হইতে পারিতেছি, ক্ষুদ্র হইয়াও অনন্তের সহিত সংযুক্ত হইতে পারিতেছি। যে কেবল সসীম, কেবল ব্যক্তিগত, সে আর কিছু উচ্চতর তত্ত্ব জানা দূরে থাক্, সে তাহার নিজের সসীমত্ব ও ব্যক্তিগত ভাব,—সে যে সসীম ও ব্যক্তিগত ইহাই—জানিতে পারে না। কিন্তু যে আপনাকে সসীম ও ব্যক্তিগত বলিয়া জানিয়াছে, সে এই জ্ঞানেই নিজের সসীমত্ব ও ব্যক্তিগত ভাব অতিক্রম করিয়াছে। সে আপনার বাহিরে যাইতে পারে, সে আপনার ব্যক্তিগত জীবনের অতিরিক্ত তত্ত্ব জানিতে পারে, সে কেবল সসীম নহে, কেবলমাত্র ব্যক্তিগত নহে; তাহার মধ্যে সসীম ও অসীম, ব্যক্তিগত ভাব ও বিশ্বজনীনত্ব অচ্ছেদ্য ভাবে বর্ত্তমান। আমরা একদিকে সসীম ও ব্যক্তিগত, ইহা যতদূর সত্য, অপর দিকে ইহাও ততদূর সত্য যে, আমাদের সসীম ও ব্যক্তিগত জীবনের আধার, কারণ ও আলোক-রূপে অসীম ও বিশ্বজনীন জ্ঞানময় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ বর্ত্তমান। জ্ঞান মাত্রেরই এই চিরন্তন দ্বৈতাদ্বৈত ভাব। প্রত্যেক জীবাত্মাই সেই অনন্ত জ্যোতির প্রকাশে জ্যোতিষ্মান।" *

আমরা যে সসীমকে—ব্যক্তিগত ভাবকে অতিক্রম করিতে পারি, তাহার কারণ আমাদের মধ্যে অসীম আছেন। যদি আমরা অসীমের সহিত যুক্ত না থাকিতাম, তবে কোন প্রকারের সসীমকেই আমরা অতিক্রম করিতে পারিতাম না। এই 'অতিক্রম' শব্দটি সসীম অসীমের মূল কথা। এই অতিক্রম অসীমকে অতিক্রম নহে—সসীমকে। দুঃখের বিষয় রায় মহাশয় 'অতিক্রম' বলিতে বুঝিয়াছেন, অসীমকে অতিক্রম করা! সেই জন্যই তিনি লিখিয়াছেন,—"সেই ঋষির পক্ষেও ঈশ্বরকে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল নাকি?" এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া তিনি জ্ঞানবাদের—দ্বৈতাদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন!! তিনি যে গ্রীণের অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট তাঁহার নিজের লেখায় এ কথাটি ব্যক্ত আছে,—"একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তিকে আমার জানিতে হইলে তাহা আমি আমার নিজকে অতিক্রম না করিয়া জানিতে পারি না।" এই অতিক্রম কি 'ঈশ্বরকে অতিক্রম?' এই তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া এবং এই তত্ত্বকে অত্যন্ত ভুল বুঝিয়া রায় মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, আশা করি স্বীয় ভ্রম দর্শন করিয়া যুক্তিগুলি প্রত্যাহার করিবেন।

প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর দিতে গিয়া নীতি ও প্রেমবাদের সম্বন্ধে লিখিবার প্রয়োজন নাই। জ্ঞানবাদ বুঝিতে হইলে কারণ-তত্ত্ব, শক্তি-তত্ত্ব, অভিপ্রায়-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার, এইজন্য সে কথার উল্লেখ করিয়াছি। একটি কথা এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা অতীব প্রয়োজন মনে করিতেছি। দার্শনিকগণ দৃষ্টান্তকে যুক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। কোন কোন দার্শনিক গুহ্য কথা বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন বটে; কিন্তু তাহা যুক্তি নহে। রায় মহাশয় যে দার্শনিকদিগের মত খণ্ডনের জন্য দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেন, ইহা দর্শনশাস্ত্র বিরুদ্ধ নয় কি?

কাশীচন্দ্র ঘোষাল।

বিশ্বাসে-অবিশ্বাস।

(৫)

এ বার পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের নব দ্বৈতাদ্বৈতবাদটার বিষয়ে আমার যাহা বলিবার বাকী আছে তাহা বলিয়া আরব্ধ আলোচনাটার উপসংহার করিতে চেষ্টা করিব।

এই বিষয়ক দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রবন্ধে বোধ হয় দেখাইতে পারিয়াছি যে, কথিত দ্বৈতাদ্বৈতবাদটা যে দু'টি দার্শনিক মতবাদের সংমিশ্রণ-জাত,—রামানুজ সম্প্রদায়ের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও নিউ-কাণ্টিও-হেগেলিয়ান অধ্যাত্মবাদ—তাহাদের কোনটিই ধর্ম্মজীবন-লাভের পক্ষে ব্রাহ্মসমাজের সহায় হইতে পারে না; বরঞ্চ উহাদের কোনটিকে যথাযথ ভাবে ব্রাহ্মসমাজে গ্রহণ করা হইলে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার হইবারই সম্ভাবনা।

আরো দেখাইতে পারিয়াছি যে, এই দ্বৈতাদ্বৈতবাদটার সমর্থনের জন্য তত্ত্বভূষণ মহাশয় তাঁহার পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্ম সম্মিলনীতে প্রদত্ত অভিভাষণে যে সমস্ত অবান্তর কথার অবতারণা করিয়াছিলেন, যথা—প্রাচীন বৈদান্তিক ঋষিদের একটা জ্ঞান-প্রণালী থাকিবার সম্ভাবনার কথা ও ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বনেতাদের শিষ্টাদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে অজ্ঞতার কথা—তাহা সম্পূর্ণরূপেই অলীক ও ভিত্তিহীন।

---

* 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' ১৫৯।১৬০ পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত।

এখন উহার (নব দ্বৈতাদ্বৈতবাদের) ভিতরকার বস্তুটাকে একবার তলাইয়া দেখিতে চাই এবং তদর্থে তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থকেই অবলম্বন করিয়া সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ঐ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়েই দেখা যায় যে, গ্রন্থকার বলেন—

(ক) "আত্মা আপনার আলোকে আপনি প্রকাশিত।"

(খ) "জ্ঞানই আত্মার প্রাণ, আত্মা জ্ঞানরূপী, আত্মা জ্ঞান-বস্তু।" "আত্মার আরো লক্ষণ আছে, কিন্তু অন্যান্য লক্ষণ এই জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করে, এই জ্ঞানের আলোকেই প্রকাশিত।"

(গ) "এই যে আত্মার মূল লক্ষণ জ্ঞান, ইহার ভিতর আবার মূল ও শাখার প্রভেদ আছে, একটু আশ্রয় আশ্রিতের প্রভেদ আছে। ইহার যে আত্মজ্ঞান ইহাই মূল জ্ঞান, অন্ধকার জ্ঞান (বিষয়জ্ঞান) ইহার আশ্রিত.........বিষয়জ্ঞান ছাড়া আত্মজ্ঞান থাকিতে পারে না।"

(ঘ) "যাহাদিগকে আমরা জড় বলি, তাহা জ্ঞানরূপী আত্মা হইতে বিযুক্ত, অসংযুক্ত, স্বতন্ত্র বলিয়া আমরা জানিও না, ভাবিতেও পারি না। জ্ঞান হইতে বিষয়কে প্রভেদ করিতে পারি বটে, কিন্তু পৃথক্ করিতে পারি না। প্রভেদটা জ্ঞানের ভিতর, বাহিরে নয়। জড়জ্ঞান একটা সম্বন্ধ, এই সম্বন্ধটার একদিকে জ্ঞানরূপী আত্মা, আর এক দিকে বিষয়রূপী আত্মা। আত্মা বিষয়ী, জড় বিষয়............জ্ঞান জড়ের অপরিহার্য্য আশ্রয়।"

এই ক'টি তথাকথিত মূলতত্ত্বকে নাড়িয়া চাড়িয়া, ব্যাখ্যা করিয়া ও উহাদের যোগ, বিয়োগ, পূরণ ও হরণ করিয়া তিনি (তত্ত্বভূষণ মহাশয়) নব দ্বৈতাদ্বৈতবাদরূপিণী একটি মানসীমূর্ত্তির গঠন করিয়াছেন এবং সেই মূর্ত্তিটির চরণে মস্তক অবনত করিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজকে আহ্বান করিয়াছেন।

তা ভাল, তবে দেখা আবশ্যক যে, এই নবমতটার এমন কোন গুণগৌরব আছে কি না, যাহার বলে সে ব্রাহ্মসমাজের দ্বৈত-ভাবাপন্ন প্রচলিত ধর্ম্মমতটাকে কৃপাপাত্র বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে এবং তাহাকে দূরে সরাইয়া তাহার স্থান অধিকার করিতে পারে।

কথিত মূলতত্ত্বগুলিকে একত্রিত করা হইলে যে ভাবার্থ দাঁড়ায় তাহা এই :—

জ্ঞানই আত্মার মূল লক্ষণ, এমন কি, আত্মাকে জ্ঞানবস্তুই বলিতে হয়। ঐ জ্ঞানবস্তু আবার ভেদাভেদভাববিশিষ্ট, উহাতে মূল ও শাখার প্রভেদ—বিষয় বিষয়ীর প্রভেদ বিদ্যমান আছে। মূল আত্মজ্ঞান এবং শাখা বিষয়জ্ঞান; আত্মজ্ঞান জ্ঞাতা বা বিষয়ী ও বিষয়জ্ঞান জ্ঞেয় বা বিষয়। কিন্তু 'ইহারা উভয়ে পরস্পরের সহিত এরূপ ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ও অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ যে, একে অন্যকে ছাড়িয়া জীবিত থাকিতে পারে না। বিষয়জ্ঞান যেমন আত্মজ্ঞান সাপেক্ষ, আত্মজ্ঞানও ঠিক্ তেমনই বিষয়জ্ঞান সাপেক্ষ—বিষয়জ্ঞান ছাড়া আত্মজ্ঞান থাকিতে পারে না —অর্থাৎ জানিবার বিষয় বিদ্যমান না থাকিলে আত্মজ্ঞানের উন্মেষ বা আত্মোপলব্ধিই ঘটিতে পারে না। পরন্তু বিষয় জ্ঞানেরই আশ্রিত ও অভ্যন্তরস্থ বস্তু বিধায় জ্ঞান হইতে বিষয়কে প্রভেদ করা যায় বটে, পৃথক্ করা যায় না। আবার জড় ও জড়জগতই যখন প্রধানতঃ জ্ঞানের বিষয়, তখন কথাটা ইহাই দাঁড়ায় যে, জড় ও জড় জগৎকে জ্ঞানরূপী আত্মা হইতে প্রভেদ করা গেলেও ঐ আত্মা হইতে সে সমস্তকে পৃথক্ করা যায় না। ইহাই তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের ভেদাভেদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদের একটা নমুনা। উহার পূর্ণাঙ্গ অবয়বটা এক টুকুন্ পরে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হইবে। ইতিমধ্যে প্রাগুক্ত মূলতত্ত্বগুলির সম্বন্ধে আমার মনে যে সকল প্রশ্ন উদিত হইতেছে, সেগুলিকেই ব্রাহ্মসাধারণের নিকট উপস্থিত করিতেছি :—

"আত্মা আপনার আলোকে আপনি প্রকাশিত"—ইহার তাৎপর্য্য কি? আত্মার আলোক কি? জ্ঞানই যদি আত্মার আলোক হয় এবং আত্মা নিজেই যদি জ্ঞানবস্তু হয়, তাহা হইলে কথাটা এরূপই দাঁড়ায় না কি যে, আত্মারূপী জ্ঞানবস্তু জ্ঞানের আলোকে জ্ঞানেরই নিকটে প্রকাশিত? কথাটা কেমনতর হইল? আর এই আত্মা কোন্ আত্মা? মানবাত্মা, না পরমাত্মা? যদি ইহা মানবাত্মাই হয়, তাহা হইলে উহাকে কেবলমাত্র জ্ঞানবস্তু বলা চলে কি করিয়া? উহাতে অজ্ঞানতা প্রচুর পরিমাণেই এবং অবশ্যম্ভাবীরূপেই বিদ্যমান নাই কি? মানবের উচ্চতর আত্মা (higher self) এবং নিম্নতর আত্মা (lower self) যে আছে, ইহাতো তত্ত্বভূষণ মহাশয়ও অন্যত্র স্বীকার করিয়াছেন। সেই নিম্নতর আত্মাটাকে উচ্চতর আত্মা হইতে বিযুক্ত ও পৃথক্ করা সম্ভবপর কি? যদি সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে মানবাত্মার প্রকৃতিগত অজ্ঞানতার ভাগটাকে তিনি ন্যায়তঃ উপেক্ষা করিতে পারেন না তো। আর যে সোঽহংবাদী শঙ্করের নিকটেই সম্ভবতঃ তিনি বিশ্বরাজ্যে জ্ঞানের একাধিপত্যের কাহিনী শুনিতে পাইয়াছেন, সেই শঙ্করও মানবাত্মার অজ্ঞানতাটাকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিতে না পারিয়াই কল্পিত মায়াবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন না কি? এরূপ স্থলে মানবাত্মাকে কেবলমাত্র 'জ্ঞানবস্তু' বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে কি? আবার জ্ঞানের কার্য্য যদি কেবলমাত্র, অন্ততঃ প্রধানতঃ, জানাই হয়, তাহা হইলে মানবেতর জীবসমূহের জ্ঞানকে, সুতরাং তাহাদের জ্ঞানরূপী আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যাইতে পারে কি? পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণীরা কিছুই জানে না বা জানিতে পারে না, এরূপ কথা তত্ত্বভূষণ মহাশয় কহিতে পারেন কি? যদি না পারেন, তাহা হইলে তাহাদেরও জ্ঞানরূপী আত্মাকে তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য নন কি? কিন্তু এই বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নীরব থাকাই তিনি পছন্দ করিয়াছেন। অধ্যাত্মবাদ বরঞ্চ জড়বাদের প্রশ্নের উত্তরে পশু-মনেরও অস্তিত্বকে স্বীকার করিতে বাধ্যতা অনুভব করিয়াছে। কিন্তু নব দ্বৈতাদ্বৈতবাদ সে বিষয়ে সম্পূর্ণরূপেই নীরব। আরো দেখিতে পাওয়া যায় যে, পণ্ডিত তত্ত্বভূষণ মহাশয় তাঁহার ব্রহ্মজিজ্ঞাসার' লেখায় বৈদান্তিক জীবাত্মা শব্দটাকে গ্রহণ করিয়াও তদ্দ্বারা কেবলমাত্র মানবাত্মাকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যদিও বৈদান্তিক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ উহাকে কেবলমাত্র মানবাত্মার সীমাবদ্ধ না রাখিয়া মানবেতর জীব-সমূহের আত্মায়ও এই শব্দটাকে প্রয়োগ করিয়াছে। এরূপ

অবস্থায় তাঁহার অভঙ্গ নীরবতাকে ইচ্ছাকৃত না বলিয়া গত্যন্তর আছে কি? এই নীরবতা হইতে ইহাই মনে হয় নাকি যে, পশু-মনের বা আত্মার অস্তিত্বটাকে স্বীকার করিতে গেলে মানব মন বা মানবাত্মাকে যথেচ্ছরূপে ব্যাখ্যা করা যায় না এবং তাহাতে আলোচ্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠার পক্ষে বাধা উপস্থিত হয়, ইহা দেখিতে পাইয়াই তিনি সেদিকে ফিরিয়াও তাকান নাই?

আর তিনি যদি ইহা বলিতে চান যে, মানবের উচ্চতর আত্মাই তাহার প্রকৃত আত্মা, নিম্নতর আত্মাটা একটা জৈবিক মন ব্যতীত আর কিছুই নয়, তাহা হইলেও আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ জৈবিক মনটাকে কেবলমাত্র বৈদান্তিক দর্শনে নয়, নিউক্যাণ্টিও হেগেলিয়ান্ দর্শনেও আত্ম (Self) নামে অভিহিত করা হইয়াছে কেন? আর মানবের কি দুইটা জ্ঞানবিশিষ্ট মন—জৈবিক মন ও আত্মিক মন—আছে, যাহার একটাকে অন্যটা হইতে বিযুক্ত ও পৃথক করা যাইতে পারে? তাহা করিতে যদি না পারা যায়, তাহা হইলে এই প্রকারের দেবভাব ও পশুভাব মিশ্রিত সসীম মানবাত্মাটার মাপকাঠী দিয়া তিনি পবিত্রস্বরূপ পূর্ণ পরমাত্মার স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয় করিতে চাহিয়াছেন কি করিয়া? তিনি যে তাহাই করিতে চাহিয়াছেন, তাহা একটুকুন্ পরে দেখাইব।

তত্ত্বভূষণ মহাশয় আরো বলেন, "এই যে মানবাত্মার মূল লক্ষণ জ্ঞান, ইহার ভিতর মূল ও শাখার প্রভেদ আছে" ইত্যাদি। যদি তর্কস্থলে মানিয়াই লওয়া যায় যে, মানবজ্ঞানে প্রভেদ সত্যই বিদ্যমান আছে, তাহা হইলেও পূর্ণজ্ঞান পরমাত্মার জ্ঞানের পক্ষেও সেইরূপ প্রভেদ থাকা অবশ্যম্ভাবী কি? যদি বল মানবজ্ঞান অপূর্ণ ও সীমাবদ্ধ হইলেও যখন উহা শেষোক্ত অসীম ও পূর্ণজ্ঞানেরই অংশ, তখন সেই অসীমজ্ঞান ভেদাভেদবিশিষ্ট না হইলে মানব-জ্ঞানে ঐ প্রভেদ থাকিতে পারিত না; তাহা হইলে এখানেও আমি জিজ্ঞাসা করিতে পারি না কি যে, তুমি কেমন করিয়া জানিলে তোমার সীমাবদ্ধ অজ্ঞানতাবহুল জ্ঞান সেই অসীম পূর্ণজ্ঞানেরই স্বরূপাংশ? ইহা কি একটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য ও সর্ব্ববাদিসম্মত দার্শনিক তত্ত্ব? আবার ইহাই দেখা যায় যে, পণ্ডিত তত্ত্বভূষণ মহাশয় যে যুক্তিপ্রণালী অবলম্বন করিয়া তাঁহার দ্বৈতাদ্বৈতবাদটাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন, তাহার গতি পরমাত্মা হইতে মানবাত্মামুখী নয়, মানবাত্মার দিক হইতেই পরমাত্মার দিকে ধাবিত। এমতা-বস্থায় পূর্ব্বোক্ত যুক্তিটা এই ক্ষেত্রে খাটিতেই তো পারে না। তিনি বলেন, "আমরা যে বলিয়াছি যে জড়জগৎ জ্ঞাননিরপেক্ষ হইয়া থাকিতে পারে না, ইহার অবশ্য কিছু এই অর্থ নয় যে, ইহা ব্যক্তিগতজ্ঞাননিরপেক্ষ হইয়া থাকিতে পারে না। আমরা কিছু এই কথা বলি না যে আমরা যখন জগৎকে না জানি, তখন ইহা বিলুপ্ত হয়। আমরা কেবল এই কথাই বলি যে, যখন আমরা ইহাকে না জানি, তখনও ইহা জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া থাকে।"

"যাহাকে আমরা ব্যক্তিগত জ্ঞান বলি, তাহা কেবল ব্যক্তিগত নহে, ব্যক্তিগত জীবনে তাহার প্রকাশ সীমাবদ্ধ হইলেও মূলে তাহা সীমাবদ্ধ নহে।"

এই উক্তি দুইটি হইতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি মানবজ্ঞানকে কেলমাত্র মানবেই সীমাবদ্ধ রাখিতে চাহেন নাই, পরমাত্মনের পূর্ণজ্ঞানেও সে অপূর্ণজ্ঞানকে প্রসারিত করিতে চাহিয়াছেন।

আমি ইহাই কেবলমাত্র জানিতে চাহিয়াছি যে, তিনি কি করিয়া জানেন যে ব্যক্তিগত জীবনে তাহার (জ্ঞানের) প্রকাশ সীমাবদ্ধ হইলেও মূলে তাহা সীমাবদ্ধ নহে? অবশ্য আমাদের মধ্যে যে সম্মুখের দিকে অসীমত্বের বীজ নিহিত রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিতেছি না। কিন্তু তাহা (সেই অসীমত্বের বীজ) পশ্চাদাভি-মুখেও আছে বলিতে পারা যায় কি? আমাদের জ্ঞানের যে একটা আদি—প্রারম্ভ—আছে, তাহা কি তিনি অস্বীকার করিতে পারেন? পশ্চাতের দিকের কিছুই তো আমরা জানি না, বা জানিতে পারি না। সম্মুখের দিকেও এই জীবনে যাহা জানি বা জানিতে পারি, তাহাও পরম জ্ঞানের জানার তুলনায় খুবই সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর নয় কি? এমতাবস্থায় কেমন করিয়া বলা চলিতে পারে যে, আমাদের জ্ঞান সেই অনাদি অনন্ত জ্ঞানেরই স্বরূপাংশ ও সর্ব্বপ্রকারে তাহারই প্রকৃতিবিশিষ্ট? দেশের অনন্তত্বের ও অসীমত্বের জ্ঞান যে আমাদের পক্ষে একান্তই স্বাভাবিক এবং দেশের সীমা যে আমরা কল্পনায়ও আনিতে পারি না, ইহা প্রদর্শন করিতে যাইয়া তিনি বলেন, "এই এক অখণ্ড অনন্ত মহা-দেশকে জানিতে গিয়া আমরা ইহার আধাররূপে এক অনন্ত জ্ঞানকে—অর্থাৎ যাঁহাকে নিজ জ্ঞান, নিজ আত্মবস্তু বলি, সেই জ্ঞানকেই—অবগত হই।"

এখানে "অর্থাৎ যাঁহাকে নিজজ্ঞান, নিজ আত্মবস্তু বলি" অবশ্যম্ভাবীরূপে আসিয়া পড়ে কি? সেই "অনন্তজ্ঞানকে" আমাদের "নিজজ্ঞান" ও "আত্মবস্তু" বলিবার অধিকার আমাদের কি আছে? তাহা তো তিনি দেখান নাই, তাহা না দেখাইয়াই, কেবলমাত্র একটা "অর্থাৎ" শব্দের সাহায্যে অতবড় গুরুতর একটা সমস্যার মীমাংসা করিয়া ফেলা দর্শনশাস্ত্রের অনুমোদিত কি?

আবার কালের অনন্তত্বসম্বন্ধেও আমাদের যে জ্ঞান রহিয়াছে তাহাও নাকি "জন্ম-মরণহীন নিত্যবস্তু"—উহার নাকি "আরম্ভ নাই, শেষ নাই"। অবশ্য আমাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানকে অনাদি অনন্ত পরম জ্ঞানের সহিত একীভূত করিয়াই তত্ত্বভূষণ মহাশয় এইরূপ লম্বা-চৌড়া একটা উক্তি করিয়াছেন, কিন্তু এই প্রকারের একীভূত করিবার অধিকার আমাদের কি আছে, তাহা তিনি প্রদর্শন করা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। "সোঽহং" বলিলেই "অহং" যে "সঃ" হইয়া যাইতে পারে না, তদ্রূপ কথা প্রতিপন্ন করিতে গেলে অকাট্য প্রমাণের প্রয়োজন, তাহা তাঁহার ন্যায় দর্শনতত্ত্বজ্ঞ একজন ব্যক্তি জানেন না, এরূপ সন্দেহকে কেহ মনেও স্থান দিতে পারে কি? কিন্তু সেরূপ প্রামণ তো তাঁহার 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসার' কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

এখানে যদি আত্মপ্রত্যয়ের কথা তোলা হয়, তাহা হইলেও আমি এই আপত্তি করিতে পারি না কি যে, আত্মপ্রত্যয়ের উপর নির্ভরশীল আত্মজ্ঞানকে আত্মার মূল লক্ষণ বলা যায় কি? সেই জ্ঞানের মৌলিকত্ব থাকিতে পারে কি? যদি না পারে, তবে জ্ঞান জ্ঞান করিয়া এত বাড়াবাড়ি করা কেন, এবং জ্ঞানকে ধর্ম্মের মৌলিক বিশ্বাসের স্থানে সংস্থাপন করিবার চেষ্টা করা হইল কেন? যদি তর্কস্থলে মানিয়াই লওয়া যায়

যে, মানবাত্মা পরমাত্মারই অংশ বিশেষ বা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ, তাহা হইলেও কি মানবাত্মার ভেদাভেদবিশিষ্ট, বিষয়াবদ্ধ, অজ্ঞানতামিশ্রিত জ্ঞানটাকে দীর্ঘীকৃত করিয়া সেই আনন্দস্বরূপ পূর্ণ পরমাত্মনের মুক্ত অবাধ ও অবস্থানিরপেক্ষ (unconditioned) জ্ঞানের সহিত একীভূত করা যাইতে পারে? তাহা যদি করা যাইতে পারিত, তাহা হইলে তাঁহার (পরমাত্মনের) পূর্ণতা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারিত কি?

আরো একটা কথা এই যে, মানবজ্ঞানের ন্যায় পরমজ্ঞানও যদি আত্মোপলব্ধির জন্য বিষয়সাপেক্ষ হইত এবং সেই বিষয় যদি প্রধানতঃ জড় বা জড় জগৎই হইত, তাহা হইলে জড় ও জড় জগতের বিদ্যমানতা পরম জ্ঞানের বিদ্যমানতার (কালে অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্যও) পূর্ব্ববর্ত্তী না হইলে এই জ্ঞানের প্রথম আত্মোপলব্ধি হইতে পারিত কি করিয়া? অনাদি জ্ঞানের পূর্ব্ববর্ত্তীকাল কল্পনায়ও আনা যাইতে পারে কি? জড় ও জড় জগৎকে পরম জ্ঞানের সমসাময়িক বলিলেও ত উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে না। আর তদবস্থায় জড় ও জড় জগৎ নিত্য ও অসৃষ্ট পদার্থ হয় না কি?

ক্রমশঃ

অতুলচন্দ্র রায়।

ব্রাহ্মসমাজ।

প্রচার—বিগত ২৮শে ভাদ্র শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায়, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ গুহ, শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ শীল ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্রাহ্মবন্ধুগণকে লইয়া হাওড়া জেলার অন্তর্গত হীরাপুর গ্রামে গমন করিয়া "ব্রাহ্মধর্ম্ম কি?" এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন, তৎপর নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যতা বিষয়ে সাক্ষ্য দান করেন। ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বাবু পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ গুহ সভার প্রারম্ভে ও শেষে সঙ্গীত করিয়াছিলেন। তৎপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাটীতে সমবেত মহিলাদিগের আগ্রহে বরদাবাবু কিছু ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করেন এবং সঙ্গীতাদি হয়; পরদিবস প্রত্যুষে নগেনবাবুর বাটীতে উপাসনা ও সঙ্গীতাদি হয়।

বিবাহ—বিগত ৮ই আশ্বিন চট্টগ্রাম নগরীতে শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন সেনের চতুর্থা কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরার ও বরিশাল নিবাসী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্তের পুত্র শ্রীমান হিমাংশুকুমারের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। প্রেমময় পিতা নবদম্পতীকে তাঁহার প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

নূতন মহিলা এম-এ—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম শ্রীমতী মৃণ্ময়ী সেন উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

রামমোহন স্মৃতিসভা—রাজর্ষি রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষ্যে বিগত ২৭এ সেপ্টেম্বর প্রাতে ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে সিটিস্কুল গৃহে স্মরণার্থ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত ডাক্তার স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীমতী কুমুদিনী বসু, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস বক্তৃতা করেন।

রামমোহনরায় লাইব্রেরীগৃহেও আর একটি সভার অধিবেশন হয়। সেখানে শ্রীযুক্ত ডাক্তার স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও অনেকে বক্তৃতা করেন।

কুমারখালী ব্রহ্মমন্দিরে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ প্রামাণিক বিশেষ ভাবে উপাসনা করিয়া রাজার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত পাঠ করেন।

নানা স্থলেই ঐ দিবস এরূপ সভা হইয়াছে। তাহাদের বিবরণ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে বিগত ২৭শে ভাদ্র বালীনগরীতে শ্রীযুক্ত মথুরামোহন গাঙ্গুলীর মাতা দীনতারিণী দেবী পরলোকগমন করেন। তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহে ও সেবাতে সকলেই মুগ্ধ ছিলেন। মাঘোৎসবের সময় আনন্দ-বাজারে তিনি যেরূপ ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন, তাহা ভুলিবার নহে। বিগত ৬ই আশ্বিন তাঁহার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী আচার্য্যের কার্য্য করেন। মথুর বাবু মাতার জীবনী পাঠ ও প্রার্থনা করেন। শ্রীযুক্ত কালীনাথ ঘোষও একটি প্রার্থনা করেন।

বিগত ৪ঠা আশ্বিন মন্দির প্রাঙ্গণে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র প্রসাদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন, বোলপুর শান্তিনিকেতনের একটী ছাত্র প্রসাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন ও রামানন্দ বাবু একটি প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে রামানন্দ বাবু অনুন্নত শ্রেণীর জন্য বোলপুরে প্রসাদকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত নৈশ-বিদ্যালয়ের কার্য্যপরিচালনার্থ এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। উক্ত দিবস বোলপুরেও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন ও সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন।

শ্রীমতী সুবালা ঘোষ গত ১১ই সেপ্টেম্বর গিরিডিতে তাঁহার শ্বশুর পরলোকগত কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রাদ্ধকর্ত্রী এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে ২৲, অনাথ ধনভাণ্ডারে ২৲ এবং কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকণ্ডে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

গত ১১ই সেপ্টেম্বর গোয়ালপাড়া নিবাসী শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রভা বড়ার মাতৃদেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রভা বড়া এই উপলক্ষে ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের প্রাণে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

Registered No. C. 65.

তত্ত্ব-কৌমুদী

প্রাণ ব্রহ্মপদে হস্ত কার্য্যে তাঁর,
এই ভাবে দিন কাটুক আমার।
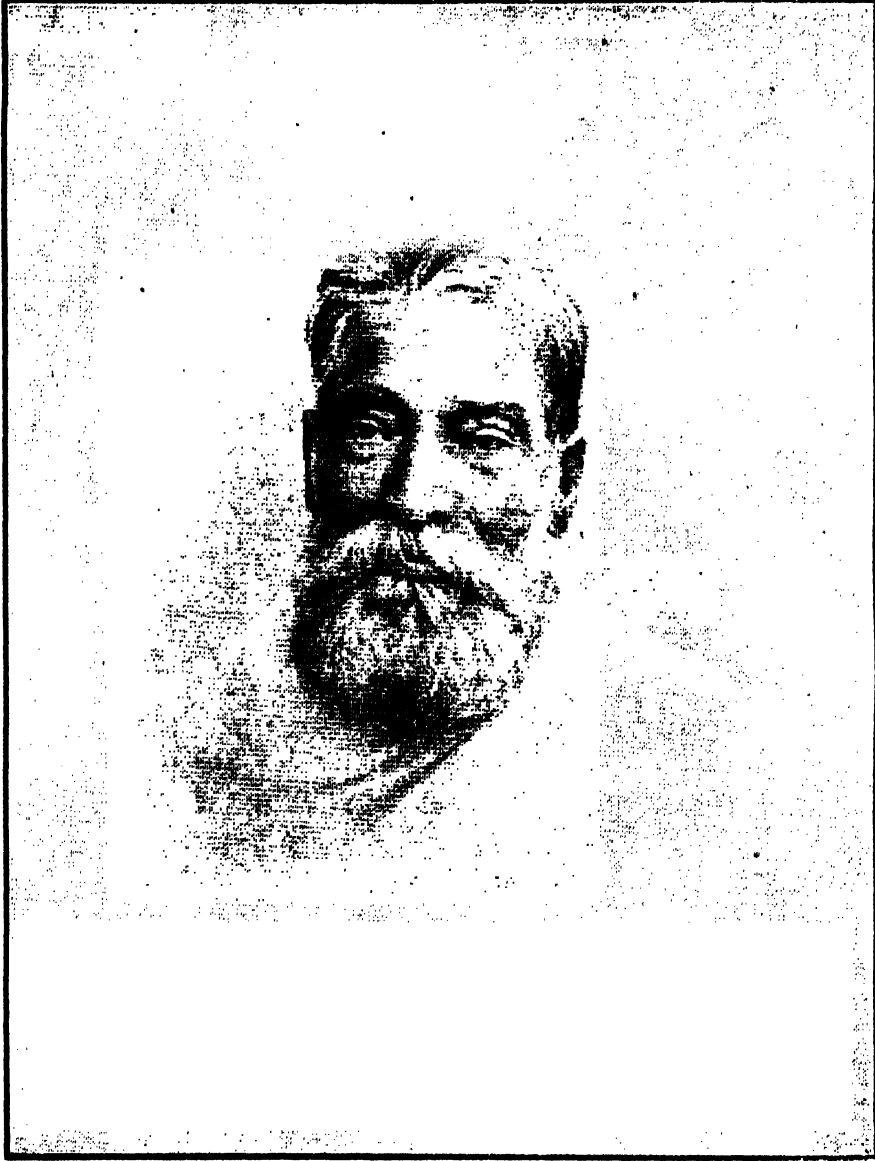
পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

জন্ম—৩১শে জানুয়ারী, ১৮৪৭। দীক্ষা—৭ই ভাদ্র, ১৮৬৯। প্রয়াণ—৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৯।

চাইনা সভ্যতা চাষা হয়ে থাকি,
দেও ধর্ম্ম ধন প্রাণে পূরে রাখি।

ইন্দ্রিয়ের দাস, যেবা বারমাস
দেশের উদ্ধার তার কর্ম্ম নয়।

আমি বড় দুঃখী তাতে দুঃখ নাই,
পরে সুখী করে সুখী হতে চাই;
নিজেত কাঁদিব, কিন্তু মুছাইব,
অপরের আঁখি, এই ভিক্ষা চাই।

Registered No C. 65

অসতোমা সদগময়,
তমসোমা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—
১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৪শ ভাগ।	১লা কার্ত্তিক, শনিবার, ১৩২৬, ১৮৪১ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯০	অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲
১৩শ সংখ্যা।	18th October, 1919.	প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে মঙ্গলময় দেবতা, আজ শোকসন্তপ্ত, ব্যথিত হৃদয়েও তোমাকে মঙ্গলময়, প্রেমময় দেবতা বলিয়া বরণ করিয়া লইতেছি; তুমি দেখিতেছ, আজ আমরা কি শোকভারে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি; আজ কত নরনারীর বক্ষ অশ্রুতে প্লাবিত হইতেছে; কত প্রাণ হইতে ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইতেছে। যিনি আমাদের সকলের পিতা ও গুরু ছিলেন, যাঁহার জীবনের সুশীতল ছায়াতলে আমরা বিশ্রাম লাভ করিয়াছি, যাঁহার পবিত্র চরিত্রের সুগন্ধে আমাদের গৃহ আমোদিত হইত, যাঁহার ভক্তিময় জীবন, যাঁহার বিশ্বাস, বৈরাগ্য ও সেবা, যাঁহার প্রেমানুপ্রাণিত কর্ম্ম দেখিয়া আমরা দুঃখে শান্তি, নিরাশায় আশা, সংগ্রামে বল পাইয়াছি, যাঁহার উদ্দীপনাময় উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া আমরা নব বল লাভ করিয়াছি, যাঁহার পুণ্যময় জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া আমরা নূতন তেজ, নূতন ভক্তি নূতন সেবার আকাঙ্ক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি, আজ তাঁহাকে তুমি ইহ জগৎ হইতে লইয়া গিয়াছ; সেই বীরপুরুষ আপনার জীবন দিয়া, সুখস্বার্থ তোমার প্রেমে আহুতি দিয়া, বিলাসবাসনা দেশের ও দশের কাছে বলি দিয়া তোমার কাজ করিয়া গিয়াছেন। আজ তিনি তোমারই স্নেহময় ক্রোড়ে বিরাম লাভ করিতেছেন। আজ তিনি সেই দেশে গিয়াছেন, যেখানে জরা নাই, মরণ নাই; যে দেশে পাপ নাই, তাপ নাই, অপ্রেম নাই, দ্বেষ নাই, হিংসা নাই; যেখানে সদা আনন্দ, নিত্য উৎসব। যেখানে সকল দেশের সকল কালের সাধু সাধ্বীগণ তোমারই জয়ধ্বনি করিতেছেন। আজ তিনি সেই ভক্তদলের সঙ্গে মিলিত হইয়া তোমারই যশোগাথা গান করিতেছেন। আজ তিনি রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হইয়া তোমারই মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। সেই মহাপুরুষকে আজ তুমি আমাদের স্থূলচক্ষুর অন্তরালে লইয়া গিয়াছ। আজ আমরা তাঁহার অভাবে হাহাকার করিতেছি। চেয়ে দেখ, প্রভু, আমরা আজ কিরূপ দীন হইয়া পড়িয়াছি; কে আমাদিগকে উৎসাহ দিবে, কে প্রাণে অনুপ্রাণনা জাগাইবে, কে নব উৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে লইয়া যাইবে? আমরা যে আজ কত কাঙ্গাল হয়ে পড়েছি। হে প্রভু, তিনি ত শেষজীবনে এক পা পরকালে, এক পা ইহকালে দিয়া জীবিত ছিলেন; আজ তিনি আনন্দে তোমার অমৃতধামে চলিয়া গেলেন। তিনি সকল দুঃখ বেদনা সহিয়া, সকল অত্যাচার উৎপীড়নের বেদনা বহিয়া, কঠোর দারিদ্র্য ও সংগ্রামের মধ্যে যে পতাকা বহন করিয়াছিলেন, আজ সে পতাকা কে গ্রহণ করিবে? সে ভক্তি আমাদের কই? সে আত্মবিলোপকারী সেবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের কই? সে ত্যাগ ও বৈরাগ্য আমাদের কই? সে একপ্রাণতা আমাদের কই? হে জীবনদাতা, আজ এই দুর্দ্দিনেও তোমার মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি ধ্যান করি; তোমাকে জীবনদেবতা বলিয়া বরণ করি; তুমি এসে আমাদের অশ্রু মুছাও; তুমি এসে আমাদিগকে জড়তা হইতে তুলে ধর; অপ্রেম হইতে প্রেমে, বিলাসবাসনা হইতে ত্যাগে, শুষ্কতা হইতে ভক্তিতে উদ্বুদ্ধ কর। আমরা এই ঘোর দুর্দ্দিনে পড়িয়া তোমারই আলোকে পরস্পরকে চিনিয়া লই। আমরা আমাদের আদর্শ উজ্জ্বলরূপে দেখি; তাঁহার ত্যক্ত পতাকা আমরা বহন করিতে অগ্রসর হই। আমাদের প্রাণে তোমাতে পরাভক্তি আসুক; আমরা তোমার প্রেমে জাগিয়া উঠি; আমরা তোমারই নামে ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হই। ক্ষুদ্র আমিত্ব ভুলিয়া যাই; আমরা প্রেমে এক হই; আমাদিগকে জাগ্রত কর; আমাদিগের জীবন পুণ্যময় কর, প্রেমে পূর্ণ কর; আমাদের মধ্যে ত্যাগ ও সেবা আনিয়া দাও। আমাদিগকে এক কর, এক কর, এক

কর। হে আমাদের পিতা, তোমারই পতাকাতলে আমরা এক হই; যিনি চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারই আদর্শে আমরা প্রেম ও ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সেবাব্রতে ব্রতী হই। প্রভু, তুমি এই দুর্ব্বলদিগকে বল দাও, আশা দাও, নবজীবন দাও। এই মৃত্যু আমাদিগকে অমৃতের পথে লইয়া যাউক; এই বিচ্ছেদ আমাদিগকে মিলনের পথে আহ্বান করুক; এই শোক আমাদিগকে প্রেমে উদ্বুদ্ধ করুক। আমরা এই পুত পবিত্র দিনে নূতন ভাবে তোমাকে দেখি ও তোমার পতাকা গ্রহণ করি। হে মঙ্গলময়, সকলের কল্যাণ হউক, সকলের মধ্যে পুণ্য শান্তি ও প্রেম বিস্তৃত হউক।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

আজ আমাদের সকলের প্রাণ শোকভারে অবনত; এ শোকের কাহিনী, এ তীব্র বেদনার কথা কোন্ প্রাণে, কোন্ ভাষাতে বর্ণনা করিব? যিনি আমাদের সমাজের নেতা ছিলেন, যিনি আমাদের সকলের গুরু ও উপদেষ্টা ছিলেন, যাঁহার জীবনের উজ্জ্বল ধর্ম্মভাবে সহস্র সহস্র লোক অনুপ্রাণিত হইত, যাঁহার জীবন্ত উপদেশে সহস্র লোকের প্রাণে নবজীবনের সঞ্চার করিত, নিদ্রিত প্রাণকে জাগ্রত করিত, আজ তিনি জগজ্জননীর আহ্বানে তাঁহারই শান্তিক্রোড়ে অনন্ত বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। ইহ সংসারে আমরা আর তাঁহাকে দেখিতে পাইব না; তাঁহার অমৃতময়ী বাণী আর শুনিতে পাইব না; ১১ই মাঘের প্রাতঃকালের উৎসবে ব্যাকুলচিত্ত নরনারী রাত্রি ২টা বাজিতে না বাজিতেই আর তাঁর প্রাণপ্রদ উপাসনা ও উপদেশ শুনিবার জন্ত ঊর্দ্ধশ্বাসে মন্দির অভিমুখে ছুটিবে না। আজ তাঁহার বিয়োগে আমাদের প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আজ তাঁহার একমাত্র পুত্র পিতার দেহাবসানে শোকচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি ত কেবল তাঁহার পিতা ছিলেন না। তাঁহার মৃত্যুতে আজ যে গৃহে গৃহে পিতৃশোক উছলিয়া উঠিয়াছে। আজ যে সকলের মুখে শোকের বিষাদময়ী ছায়া পড়িয়াছে! সকলে বাহিরের শোকচিহ্ন ধারণ করেন নাই; কিন্তু প্রাণ যে সকলেরই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তিনি কে ছিলেন, আমাদের সমাজে কোন্ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজের কোন্ স্থানটি আজ শূন্য হইল, তিনি এ দেশের জন্ত কি করিয়াছেন, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের উপর তাঁহার কি প্রভাব ছিল, আজও আমরা তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। তিনি ত বহুদিন ধরিয়া সাধারণের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন; মন ঈশ্বরের ও মানবের সেবা করিতে চাহিত কিন্তু শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তবুও তাঁহার ইহলোকে অবস্থিতি আমাদিগকে কত অনুপ্রাণনা প্রদান করিত; তাঁহার দিকে তাকাইয়া আমরা কত বল, আশা ও আনন্দ প্রাপ্ত হইতাম। যাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন; আজ তাঁহার শোকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের প্রাণে কি দারুণ আঘাত লাগিয়াছে! তিনি বীর-পুরুষের ন্যায় কর্ম্মক্ষেত্রে সংগ্রাম করিয়া এক্ষণে জননীর ক্রোড়ে বিশ্রামলাভ করিয়াছেন। তিনি ভক্ত, তিনি জ্ঞানী, তিনি কর্ম্মী পুরুষ ছিলেন। তিনি আনন্দ করিতে করিতে আনন্দময়ের শান্তিধামে যাইয়া অমরাত্মাগণের সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন। কিন্তু আজ তাঁহার জন্ত আমাদের প্রাণ যে শোকে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আর কে আমাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ উজ্জ্বল ভাবে দেখাইয়া দিবে? কে আপনার জীবন দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিয়া লোকদিগকে ঐ দিকে আহ্বান করিবে? কে আর বলিবে

> আমি বড় দুঃখী, তাহে ক্ষতি নাই,
> পরে সুখী করি, সুখী হতে চাই।
> নিজে ত কাঁদিব, কিন্তু মুছাইব
> অপরের আঁখি, এই ভিক্ষা চাই।

কে আর চৈতন্যের মত বলিবে

> প্রিয় হরিনাম ঘুষিব বিদেশে
> দ্বারে দ্বারে যাব ভিখারীর বেশে;
> নিজে পায়ে ধরি, ভজাইব হরি,
> হরিনামে পাপী ঘুচাইবে ক্লেশে।

আজ তাঁহার কণ্ঠ নীরব; আজ তিনি মহাসিন্ধুর পরপারে অমৃতময় জীবন লাভ করিয়া আনন্দধামে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি সকল অপমান, সকল দুঃখ দৈন্য সহ্য করিয়া, সকল পরীক্ষার ভিতরে যে পতাকা ধারণ করিয়াছিলেন, সে পতাকা আজ কে গ্রহণ করিবে? তিনি যে পরাভক্তি লাভ করিয়া প্রাণ দিয়া দেশের ও ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া গিয়াছেন, সে সেবাব্রত কে গ্রহণ করিবে? তিনি যে "বিশ্বাস, বৈরাগ্য ও সেবা"র আদর্শ জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন, কে তাহার অনুসরণ করিবে? তিনি আশা করিয়াছিলেন—কঠোর সংগ্রামের মধ্যেও আশা করিয়াছিলেন যে, তাঁর দৃষ্টান্তে শত শত লোক ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পতাকা গ্রহণ করিয়া দেশের ও মানবের কল্যাণ সাধনে অগ্রসর হইবে—

> তবে মুছি অশ্রু উঠিয়া দাঁড়াই—
> যা'হ'বার হলো, এ জনম গেল
> জীবনসংগ্রামে তাতে দুঃখ নাই।
> রক্তবিন্দু হতে শুনি এ জগতে
> শত রক্তবীজ জন্মে যে প্রকার,
> জীবন সংগ্রামে ভারতের নামে
> যত রক্তবিন্দু পড়িল এবার
> শত পুত্র হবে বীর অবতার।
> ভারত আঁধার, ভারতের ভার
> ঘুচাইবে তারা;—ভেবে মরে যাই।

তিনি এ দেশের সর্ব্বাঙ্গীন্ উন্নতির জন্ত প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন; বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়া এ দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার যাহা ছিল, বিদ্যা বুদ্ধি, ধন মান, শরীরের শক্তি, হৃদয়ের ভক্তি, সমস্তই ব্রাহ্মসমাজের ও জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে বলিয়াছেন

> "সত্য!—ধনবান্ চাহে না এ প্রাণ,
> যদি কাজে আসি তবে বেঁচে যাই।

বহুকষ্টে পূর্ণ আমার অন্তর,
এই আশীর্ব্বাদ কর হে ঈশ্বর,
খাটিতে বাঁচিব, খাটিয়া মরিব,
এই বড় আশা, পূর্ণ কর তাই।

তিনি খাটিতে এসেছিলেন, নিজের সুখস্বার্থের জন্য আসেন নাই; নিজের সুখস্বার্থ, আরাম কামনা পায় ঠেলিয়া সেই মহান্ যোগী পুরুষ, "প্রাণ ব্রহ্মপদে, হস্ত কার্য্যে তাঁর" রাখিয়া দেশের জন্য, মানবের জন্য খাটিতে খাটিতে জীবন পাত করিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহার কি উজ্জ্বল মূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে! যেন তিনি আহ্বান করিতেছেন—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত!"—

দেশের সেবায় তাঁর যত রক্তবিন্দু পাত হইল; শত শত বীর কি তাঁহার বাহিত পতাকা গ্রহণ করিতে উঠিয়া দাঁড়াইবে না? আজ ব্রহ্মের পতাকাতলে কি সহস্র সহস্র নরনারী আসিয়া একপ্রাণে দাঁড়াইবে না? আজ কি শত শত লোক "বিশ্বাস বৈরাগ্য ও সেবা"র মন্ত্রে দীক্ষিত হইবে না? তাঁহার পরাভক্তি, জীবন্ত বিশ্বাস, অকপট বৈরাগ্য, গভীর প্রেমে কি আমরা উদ্বুদ্ধ হইব না, ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে অগ্রসর হইব না? আজ শিবনাথ ইহজগতে নাই; আজ তাঁহার অমর আত্মা ঐ সুরলোক হইতে আমাদিগকে যেন ডাকিয়া বলিতেছে—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আযে ধামানি দিব্যানি তস্থু;
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত
মাদিত্যবর্ণং তমসঃপরস্তাদ্,
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি,
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

"তারা দেখা" লোক।

"ওই গেল চলে পাগলের প্রায়,
জান না ত মাতা কে তারে লওয়ায়।
উন্নত আকাশে ধধূপ প্রকাশে,
আপনার বেগে সে কি সেথা যায়?"

"প্রবল আগুন জ্বলেছে ভিতরে,
আর তারে হেথা কেবা রাখে ধরে?
তাই মহাবেগে, যায় অনুরাগে,
পাপী জগতের পরিত্রাণ তরে।"

সংসারে সহস্র সহস্র নরনারী আসে আর যায়; তাহাদের দৃষ্টি নিম্নভূমিতে আবদ্ধ, তাহারা সংসারের সুখ, সংসারের ধন ঐশ্বর্য্য, সংসারের পদমান লইয়া ব্যস্ত; কিসে আরাম হবে, কিসে মান প্রতিপত্তি হবে, ইহার উপর যে কিছু আছে, তাহা তাহারা জানে না; তাহারা আপনার গা বাঁচাইয়া চলে। তাদের স্নেহ প্রীতি আপনার ঘরের লোক, স্ত্রীপুত্র আত্মীয় স্বজনের মধ্যেই নিবদ্ধ। তাহারা ঊর্দ্ধদিকে তাকায় না, দৃষ্টের পশ্চাতে যে অদৃষ্ট জগৎ আছে তাহার সন্ধান লয় না; তাহারা গতানুগতিকের পথে চলে। কিন্তু সংসারে এক একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ দেখা যায়। তাঁহাদের দৃষ্টি ঊর্দ্ধদিকে, তাঁহারা আকাশ পানে চাহিয়াই চলেন; তাঁহারা "তারা দেখা" লোক—ঐ সুদূর আকাশে নক্ষত্রলোক হইতে কি এক আলোকরশ্মি আসিতেছে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, সেই রশ্মির আলোক দেখিয়া, এ দিক ও দিক্ না তাকাইয়া ক্রমাগত চলিতে থাকেন; তাঁহারা কোন বাধা মানেন না; ঝড় ঝঞ্ঝাবাত তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিতে পারে না; চারিদিকের বন উপবন তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না; ফুল ফলের শোভা তাঁহাদিগকে গন্তব্য পথ হইতে বিচলিত করিতে পারে না; সুমধুর সঙ্গীত তাঁহাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া পথভ্রষ্ট করিতে পারে না; বৃক্ষলতা, পাহাড় পর্ব্বত, নদী প্রস্রবণ তাঁহাদের গতিরোধ করিতে পারে না; কণ্টকাকীর্ণ পথ দেখিয়া তাঁহারা সঙ্কুচিত হন না। ঐ যে উপরে অনন্ত আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখিয়াছেন, ঐ যে আলোকরেখা তাঁহাদের চক্ষে আসিয়া পড়িয়াছে, ঐ নক্ষত্র দেখিয়া, ঐ আলোকের সন্ধানে তাঁহারা ছুটিতে থাকেন। লোকে ইঁহাদিগকে পাগল বলে, একগুঁয়ে বলে, কতরূপ লাঞ্ছনা করে, অপমান করে, নিন্দা করে, কিন্তু তাঁহারা ভয়ে কিম্বা প্রলোভনে, নির্য্যাতনে কিম্বা অপমানে ভীত হন না, পথভ্রষ্ট হন না; ঐ তারা দেখিয়া তাঁহারা চলেন, আলোকরশ্মি দেখিয়া অকুতোভয়ে অগ্রসর হন।

জীবনের ঊষাকালে অধ্যয়ন-নিরত শিবনাথ আকাশে কি এক উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখিলেন, কি এক আলোকরশ্মি তাঁহার নয়নে উদ্ভাসিত হইল, কি এক আদর্শের মোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিলেন, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; ঐ তারা দেখিয়া, ঐ আলোকের পশ্চাতে, ঐ আদর্শের সন্ধানে তিনি ছুটিলেন। সে আদর্শ যে কত উচ্চ, কত গভীর, সে আলোক যে কত দূরে, তাহার সন্ধানে যে কত দূর যেতে হবে, কত ত্যাগ স্বীকার করিতে হবে, কত প্রেমলাভ করিতে হবে, তখন তাহাও ভাল করিয়া অনুভূত হয় নাই। কিন্তু আদর্শের কি মোহিনী মূর্ত্তি, ঈশ্বরের আহ্বানের কি মধুর সঙ্গীত, তাহাতে একেবারে উন্মত্ত হইয়া ছুটিলেন। দৃঢ়ব্রত পিতার কঠোর শাসন, স্নেহময়ী জননীর করুণ ক্রন্দন, সমাজের তীব্র ব্যবহার, দারিদ্র্যের কঠিন কশাঘাত, কিছুতেই তাঁহাকে সে পথ হইতে বিচলিত করিতে পারিল না। "তারা দেখা" লোক তারার দিকে চাহিয়া, আদর্শের সন্ধানে, ঈশ্বরের আহ্বানে ছুটিতে লাগিলেন; জীবন যৌবন, পদমান, ধন ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা বুদ্ধি সমস্ত ঐ ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করিলেন।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ঋষির ন্যায় দিব্যদৃষ্টিতে ভারতের ও জগতের কল্যাণ ও মুক্তির এক মহামন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন; তিনি দেখিয়াছিলেন যে, এক অদ্বিতীয়, নিরাকার, জ্ঞান প্রেম ও পুণ্যের আধার পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ ও আধ্যাত্মিক পূজা ও তাঁহার প্রীতি কামনায় মানবের কল্যাণ সাধনই ধর্ম্ম; ইহাই মুক্তিপিপাসু নরনারীর একমাত্র অবলম্বনীয়, এবং ইহাই ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন্ কল্যাণ সাধন করিবে। তিনি যে উদার সার্ব্বভৌমিক মুক্তিপ্রদ প্রেমের ধর্ম্মের আদর্শ দিয়া গিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী আচার্য্য ও প্রচারকগণ, দেবেন্দ্রনাথ ও

কেশবচন্দ্রপ্রমুখ মনীষিগণ তাঁহাকেই ক্রমে অভিব্যক্ত করিয়া মানবের চক্ষের সম্মুখে জীবন্ত ভাবে উপস্থিত করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের প্রীতি ও তাঁহার প্রীতিপ্রেরণায় নরনারীর সর্ব্বাঙ্গীন্ কল্যাণ সাধন,—ইহাই ত ধর্ম্ম; এ ধর্ম্ম বাহিরের নয়—ইহা অন্তরের ধর্ম্ম, প্রেমের ধর্ম্ম; এই ধর্ম্ম সাধন সংসার ত্যাগে নয়, সংসারেই ঈশ্বরের লীলা দেখিয়া মানবে প্রেম ও মানবের সেবা; একদিকে ঈশ্বরে ভক্তি ও অপর দিকে সেই ভক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া মানবের সেবা, ইহাই ত ধর্ম্ম। সমুদ্র নদী তড়াগ হইতে যে বাষ্প উঠে, সে বাষ্পের সার্থকতা ঐ মেঘে নহে; বাষ্প হইতে মেঘ হয়; আবার সেই বাষ্পই যখন মেঘ হইতে বারিধারারূপে জগতে পতিত হইয়া মানবের কল্যাণ সাধন করে, তখনই ত বাষ্পের সার্থকতা। সেইরূপ মানবের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে যে প্রেমধারা উর্দ্ধদিকে উত্থিত হইবে, তাহাই ঈশ্বর চরণ স্পর্শ করিয়া আবার কল্যাণ ও শান্তিরূপে যখন মানবের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবে, তখনই প্রেমের সার্থকতা। ইহাই ধর্ম্ম, ইহাই বর্ত্তমান যুগের আদর্শ। শিবনাথ ছাত্র অবস্থাতেই এই উদার, আধ্যাত্মিক, সার্ব্বভৌমিক ও সর্ব্বাঙ্গীন্ ধর্ম্মের আদর্শ প্রাণে প্রাপ্ত হইলেন এবং সেই আদর্শের অভিমুখে যাত্রা করিলেন; তিনি বুঝিলেন, ইহাতেই তাঁহার নিজের কল্যাণ, ইহাতেই ভারতের কল্যাণ, ইহাতেই জগতের কল্যাণ; কোন বাধাবিঘ্ন তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিল না। তিনি দেখিতে পাইলেন, সেই প্রভু পরমেশ্বরে ভক্তি লাভ করিতে না পারিলে জীবন অসার; পরমেশ্বর এক নিরাকার ব্রহ্ম, সাক্ষাৎ ভাবে প্রেমভক্তি দ্বারাই তাঁহার অর্চ্চনা করিতে হয়। যখনই এই সত্য বুঝিতে পারিলেন তখনই প্রাণ দিয়া সাধন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নিকট কাতরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রার্থনাই তাঁহার জীবনের অন্ন ছিল; শেষ জীবনেও এই প্রার্থনা হইতেই তিনি আশা, বল ও আনন্দ লাভ করিতেন; কঠোর সমস্যার সময়, ঘোর বিপদের সময় প্রার্থনাই তাঁর সম্বল ছিল। প্রার্থনাই তাঁর সকল অভাব পূর্ণ করিয়া দিত। তাঁর প্রচারযাত্রার সময় প্রার্থনায় নির্ভর করিয়াই আর্থিক ও আধ্যাত্মিক সকল অভাব পূর্ণ করিতেন। তিনি যখন পরব্রহ্মের আধ্যাত্মিক উপাসনা আরম্ভ করিলেন, তখনই বুঝিলেন, আর পৌত্তলিক আচরণ করা চলে না; উহা যে কপটতা। ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক পূজা ও কল্পিত দেবতার বাহ্যপূজা, ইহার মধ্যে সন্ধি চলে না। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র সকলেই ব্রহ্মের আহ্বানে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পৌত্তলিক আচরণ হইতে ব্রহ্মপূজায় দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তাই তিনি বাড়ী যেয়ে ঠাকুর পূজা করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তাঁহার পিতার কিরূপ কঠোর শাসন ছিল, তাহা তিনি জানিতেন; সময়ে সময়ে তিনি কিরূপ নির্ম্মমভাবে প্রহার করিতেন, তাহাও জানিতেন; বৈদিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে ঠাকুর পূজা করিবে না, এ কি কথা! পিতা ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন, জননী পুত্রের বিপদাশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হইলেন। শিবনাথ অটল অচল! যে শিবনাথ পিতার মুখের দিকে সাহস করিয়া তাকাইতে পারিতেন না, ভাল হউক মন্দ হউক, তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহস করিতেন না, আজ ব্রহ্মের আদেশে সেই পিতার আদেশ শুনিলেন না। তিনি সেই যে পৌত্তলিক পূজা পরিত্যাগ করিয়া এক ব্রহ্মের চরণে মস্তক রাখিলেন, সে মস্তক আর উঠাইলেন না। ক্রমে বিশ্বাস, নির্ভর, ভক্তি লাভ করিলেন; জীবনদেবতাকে প্রাণে পাইয়া কৃতার্থ হইলেন।

তিনি যে ধর্ম্মের আদর্শ পাইলেন, তাহা ত একদেশদর্শী নহে। তাহা সর্ব্বাঙ্গীন্ ও সর্ব্বতোমুখীন্। ঈশ্বরকে যখন পিতা বলিয়া জানিলেন, তখন মানবকে ত ভ্রাতা বলিয়াই স্বীকার করিলেন। যিনি ঈশ্বরকে পিতা সম্বোধন করিবেন, তিনি মানুষে মানুষে জন্মগত পার্থক্য ত স্বীকার করিতে পারেন না। অথচ জাতিভেদ-সূচক যজ্ঞোপবীত তাঁহার গলায় দুলিতেছে; তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি নিজে বলিয়াছেন,—পৈতা তাঁহার গলায় সর্পের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি আর গলায় পৈতা রাখিতে পারিলেন না; যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিলেন। জননী আর ত সহ্য করিতে পারিলেন না; এত সাধের পুত্র, কত বড় পরিবারের ছেলে, কত বিদ্যা অর্জ্জন করিতেছে; তার উপর যে দুঃখিনী জননীর কত আশা! আজ সেই পুত্র ঘরের বাহির হইয়া যাইতেছে, পর হইয়া যাইতেছে, অস্পৃশ্য হইয়া যাইতেছে; জননীর ক্রন্দনে ব্যথিত হইলেন; কিন্তু কি করেন, ঈশ্বরের বাণী শুনিতেই হইবে, তারা দেখিয়া চলিতেই হইবে? তাঁহারই ভাষায় তাঁর জননীকে বলিতে ইচ্ছা হয়—

> ধরেছ জঠরে তাই বলে তারে
> পার কি রাখিতে আপন আগারে?
> যে কাজ সাধিতে আসা অবনীতে
> মিলেন ঈশ্বর, সে কাজে তাহারে।

ঈশ্বর তাঁহাকে তাঁহার কাজে ডেকেছিলেন, ক্ষুদ্র গৃহে, ক্ষুদ্র গ্রামে, ক্ষুদ্র গণ্ডীতে তিনি কি আবদ্ধ থাকিতে পারেন? জননীর ক্রন্দন তাঁর প্রাণে কত ব্যথা দিল, তবুও সেই তারা দেখিয়া, আলোক লক্ষ্য করিয়া আদর্শের পানে ছুটিলেন।

এই জাতিভেদের প্রতি তাঁহার এত বিরাগ ছিল যে, উত্তর কালে তিনি এমনই তেজে জাতিভেদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে, তখনই অনেকে যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করিয়া তাঁহার গায়ে ফেলিয়া গিয়াছিল। তিনি আপনার সন্তানদিগের অসবর্ণে বিবাহ দিয়াছিলেন। যাহা তিনি মনে বুঝিতেন, কাজে তাহা করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না।

যাহাতে নিম্নশ্রেণীর উন্নতি হয়, যাহাতে দেশের কোটি কোটি লোক যাহারা সমাজের নিম্নস্তরে পতিত রহিয়াছে, তাহাদের উন্নতি হয়, তজ্জন্য কত চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের জন্য তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদাই কাঁদিয়াছে।

একদিকে নিম্নশ্রেণীর উন্নতি যেমন সমাজের কল্যাণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, অপর দিকে নারীজাতির উন্নতি, বাল্যবিবাহ নিবারণ, বহুবিবাহ নিবারণ, বিধবাবিবাহ প্রচলন, ইহাও দেশের কল্যাণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এই সকল বিষয়েই তিনি অগ্রণী ছিলেন। নারীজাতির প্রতি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অকপট প্রীতি ছিল। তিনি বাল্যজীবনে, যৌবন কালে এবং বৃদ্ধ বয়সে নারীজাতির নিকট হইতে যেরূপ স্নেহ ও প্রীতি-

লাভ করিয়াছিলেন, তিনিও তাঁহাদিগকে সেইরূপ শ্রদ্ধা ও প্রীতি করিতেন। তিনি নিজে ত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া চির-দারিদ্র্য-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু এই দরিদ্রতার মধ্যেও যখনই যে নারী অসহায় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি অর্থ দিয়া, পরিশ্রম দিয়া, সেবা দিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন। তিনি জানিতেন, নারীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনতা না হইলে এ দেশ জাগিবে না। মানুষকে এরূপ হীন করিয়া রাখা মহাপাপ। তাই তিনি ও তাঁহার বন্ধুগণ নারীজাতির স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এই ব্রাহ্মসমাজেও তাঁহারা অনেক বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে বাধা তাঁহারা গ্রাহ্য করেন নাই। তাঁহারা অনেক লাঞ্ছনা, নিগ্রহ নিন্দা গ্লানি সহ্য করিয়া নারীর উচ্চশিক্ষা ও স্বাধীনতার দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, নারীকে ধর্ম্মে ও কর্ম্মে, সর্ব্ব বিষয়ে পুরুষের সমান অধিকার প্রদান করিয়াছেন; বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ব্রাহ্মসমাজে রহিত করিয়াছেন, বিধবাবিবাহ প্রচলন করিয়াছেন। আজ হিন্দু-সমাজও তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতেছেন। নারীজাতির শিক্ষার জন্য ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় যাঁহারা স্থাপন করেন, তিনিই তাঁহাদের একজন অগ্রণী। নারীজাতি আজ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট অশেষ রকমে ঋণী।

যাহাতে সাধারণ শিক্ষার প্রসার বর্দ্ধিত হয়, উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া মানবের মন উন্নত হয়, তাহারই জন্য তিনি স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু প্রভৃতির সহযোগিতাতে কলিকাতাতে সিটি-কলেজ ও পরে সাধনাশ্রমের সংস্রবে বাঁকীপুরে 'রামমোহন রায় সেমিনেরি' স্থাপিত করেন। এই সকল বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে যাহাতে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা হয়, তৎপ্রতিই তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। কিন্তু বিশেষ ভাবে ধর্ম্ম, সমাজ ও নীতি সম্বন্ধে যুবকদিগের মধ্যে উদার ভাব প্রচার করা ও যুবকদিগের ধর্ম্ম-জীবন গঠন করার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংস্রবে তিনি ছাত্রসমাজ স্থাপিত করেন; এবং যে পর্য্যন্ত তাঁহার শরীরে শক্তি ছিল, এই ছাত্রসমাজের তিনিই কর্ণধার হইয়াছিলেন। তাঁহার কত উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া শত শত যুবক নূতন আদর্শ—নূতন আলোক প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছে।

তিনি যে ধর্ম্মের আদর্শ পাইয়াছিলেন, তাহা কেবল সমাজ-সংস্কার ও ধর্ম্মসংস্কারেই আবদ্ধ ছিল না। মানবের সর্ব্বাঙ্গীন্ উন্নতিই ধর্ম্মের লক্ষ্য। তাই তিনি এ দেশের রাজনৈতিক দুর্গতি দূর করিবার জন্যও আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন; যে সময় স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া দেশের সেবা করিতে প্রবৃত্ত হন, অপর দিকে দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ দেশসেবার কর্ম্মে ব্রতী হন, তখন শিবনাথ তাঁহাদেরই সহিত একযোগে ভারত সভা (Indian Association) স্থাপন করেন এবং নানা প্রকারে তিনি দেশের রাজনীতিক উন্নতির চেষ্টা করেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্য্যে বিশেষ ভাবে ব্রতী হইলে সকল সময় রাজনীতিক আন্দোলনে সম্পূর্ণরূপে যোগ দিতে পারিতেন না; কিন্তু সর্ব্বদাই রাজনীতির চর্চ্চা করিতেন, এবং সর্ব্বপ্রকার আন্দোলনের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। বঙ্গবিভাগ-জনিত আন্দোলনের সময় যখন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্তপ্রমুখ বঙ্গের ৯ জন সুসন্তানকে গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করেন, তখন বঙ্গে কি এক বিষাদের ছায়া পাত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় সেই সময় বঙ্গবাসী এত নিরুৎসাহ ও ভীত হইয়া পড়িয়া ছিল যে, উঁহাদের জন্য একটা সভা করিতে যাইয়া সভাপতির কার্য্য করিবার উপযুক্ত লোক পাওয়া যাইতেছিল না। তখন অক্লান্তকর্ম্মা অকুতোভয় শিবনাথই সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়া সুরেন্দ্রনাথের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যেখানে কেহ যায় না, সেখানে তিনি আছেন; ভয় নাই, চিন্তা নাই, বিপদ্‌কে গ্রাহ্য নাই, গবর্ণমেণ্টের রোষকে ভয় নাই, ঐ তারা দেখিয়া চলিয়াছেন, আলোক দেখিয়া চলিয়াছেন, জীবনদ্বারা বাক্যদ্বারা দেখাইয়াছেন

কর্ত্তব্য বুঝিব যাহা
নির্ভয়ে করিব তাহা,
যায় যাক্, থাকে থাক্ ধন প্রাণ মান রে
পিতাকে ধরিয়া রব পর্ব্বত সমান রে।

এইরূপে দেশের সর্ব্বাঙ্গীন্ কল্যাণ সাধনই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল; এই কল্যাণ সাধন করিতে যাইয়া, দেশের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতে যাইয়া, সকল কুসংস্কারের জাল ছিন্ন করিতে যাইয়া কি কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, কিরূপ স্বার্থত্যাগ করিতে হইয়াছে, কিরূপ সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, তাহা অনেকেই অবগত নহেন; কিন্তু সকল দুর্দ্দিনে সকল পরীক্ষায়, সকল সংগ্রামে ঈশ্বরে ভক্তি, প্রার্থনায় বিশ্বাসই তাঁহাকে স্থির রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। সকল প্রকার সেবা ও সংস্কার কার্য্য তাঁহার ধর্ম্মের আদর্শের অঙ্গীভূত হইলেও, ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। তিনি জানিতেন, বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত না হইলে, মানুষ কাষ্ঠ লোষ্ট্র পুতুলের বাহ্য পূজা পরিত্যাগ করিয়া এক চিন্ময় দেবতার সাক্ষাৎ ভাবে প্রেম ভক্তি দ্বারা পূজা করিতে না শিখিলে, এ দেশের কল্যাণ নাই। রামমোহন রায় তাহা দেখিয়াছিলেন; দেবেন্দ্র-নাথ, কেশবচন্দ্র তাহা দেখিয়াছিলেন। তাই শিবনাথ বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বরের পূজায় জীবন মন উৎসর্গ করিলেন। কিরূপে তাঁহাতে প্রাণমন অর্পণ করিব, তাঁহাকে প্রাণে লাভ করিব, তাঁহার প্রেমযোগে যুক্ত হইব, পরাভক্তি লাভ করিব, ইহাই তাঁহার জীবনের সাধন ছিল। চলিতে ফিরিতে, শুইতে বসিতে, ঐ একই ধ্যান। লোকে তাঁকে আনমনা বলিত; কিন্তু তাঁহার মন যে সর্ব্বদাই সেই প্রভুর চিন্তায় মগ্ন থাকিত। প্রার্থনা তাঁর জীবনের অন্ন ছিল; প্রার্থনা হইতেই বল লাভ করিতেন; তাঁহার ধ্যান ও আরাধনাতেই তাঁহার আনন্দ ছিল। এই কর্ম্মময় জীবনের সঙ্গে কিরূপ ভক্তি ও যোগের জীবন সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছিল ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন! ইচ্ছা করিলে তিনি কত বড় উচ্চপদ লাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু "তারা দেখা" লোক যাঁরা, তাঁরা আপনার পদমানের দিকে তাকান না; তাঁরা ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া অগ্রসর হন। শিবনাথ কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু কর্ম্ম তাঁহার বন্ধনরজ্জু বোধ হইতে লাগিল, তিনি এই

বন্ধু স্থির করিবার জন্ত ব্যস্ত হইলেন। সংসারে তাঁর দারিদ্র্য কত; কত লোকের ভার তাঁর উপর ন্যস্ত; কত বন্ধুর ভারও তিনি গ্রহণ করিয়াছেন! কিরূপে সংসার চলিবে, তিনি সে দিকে দৃষ্টি দিলেন না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যখন স্থাপিত হইল, ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্ত শিবনাথপ্রমুখ ব্রাহ্মগণ কাঁদিতে কাঁদিতে যখন ধর্ম্মজীবনের গুরু ও বন্ধুগণের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিলেন, তখন আর তিনি প্রচারব্রত গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না; তিনি সংসারের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, জীবনের সুখ দুঃখ পায়ে ঠেলিয়া তারা দেখিয়া ছুটিলেন, কর্ম্ম ত্যাগ করিলেন, চিরদারিদ্র্য-ব্রত বরণ করিয়া লইলেন। অর্থের প্রতি কোন দিন দৃষ্টিপাত করেন নাই; তিনি আজীবন বৈরাগী; নানা প্রকারে সময় সময় তাঁহার অর্থ আসিত, তাহারও অধিকাংশ ভাগ বন্ধুদের জন্য ব্যয়িত হইত। এরূপ নিষ্কাম ব্রতধারী পুরুষ সংসারে অতি বিরল।

তিনি ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত হইলেন; ভারতের নানা দেশে তিনি ওজস্বিনী ভাষাতে বক্তৃতা করিয়া, উদ্দীপনাময়ী ভাষাতে উপদেশ দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন; ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য বিন্দুবিন্দু করিয়া রক্তপাত করিয়াছেন। এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে তিনি যখন উপাসনা করিতেন শত শত লোক মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহা শ্রবণ করিত। ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে তাঁহার মুখনিঃসৃত উপাসনা ও উপদেশ শুনিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য গভীর রাত্রিতে ব্যাকুল ভাবে কত লোক আসিত। তিনি সুলেখক ছিলেন, সুবক্তা ছিলেন, তাঁহার কবিতা এখনও কত উদ্দীপনা আনিয়া দেয়; তাঁহার উপদেশ ও বক্তৃতা কত প্রাণে নবজীবনের সঞ্চার করে। তাঁহার প্রণীত ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস, ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য (Mission of the Brahmo Samaj) অতি উপাদেয় গ্রন্থ।

কিন্তু তিনি কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াই নিবৃত্ত থাকিলেন না। একদল লোক চাই, যাঁহারা ত্যাগী পুরুষ হইবেন; ঈশ্বরের নামে জীবন যৌবন অর্পণ করিবেন; ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, ব্রাহ্মসমাজ ও জনসমাজের সেবা যাঁহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইবে, এই উদ্দেশ্য লইয়া তিনি সাধনাশ্রম স্থাপন করেন। এই সাধনাশ্রমের সংস্রবে আসিয়া অনেকে প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, ইহার সেবা-বিভাগ হইতে বিধবাশ্রম, সেবাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে; অবনত শ্রেণীর উন্নতির জন্য স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় এই আশ্রমের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন।

আজ তাঁহার ধর্ম্ম ও কর্ম্মময় জীবনের ইহলোকের লীলা শেষ হইয়াছে; তিনি একটি আদর্শ চরিত্রের চিত্র বর্ণনা করিতেন —"জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, কর্ত্তব্যসাধনে দৃঢ়তা, চরিত্রে সংযম, ঈশ্বরে ভক্তি, মানবে প্রেম ও সেবা,"—তিনিই এই আদর্শের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। একদিন একজন বিখ্যাত লোক বলিয়াছিলেন, চেহারা কুৎসিৎ হইলেও ধর্ম্ম প্রাণে থাকিলে মানুষ কিরূপ সুন্দর হয়, তাহার দৃষ্টান্ত শিবনাথ শাস্ত্রী। ধর্ম্ম তাঁহাকে সুন্দর করিয়াছিল, মধুর করিয়াছিল, তেজস্বী করিয়াছিল; তাঁহার প্রাণে আশা, আনন্দ ও বল বিধান করিয়াছিল। তিনিই আবার তাঁহার পরলোকগমনের সংবাদ পেয়ে লিখিয়াছেন— "শাস্ত্রী মহাশয়ের মৃত্যুতে মনে হইল দেশের কপাল বড়ই মন্দ। তা তিনিও উপযুক্ত সময়েই গেলেন, তবে তাঁর মতন আর পাই কই? * * * তাঁহার উচ্চ স্তরের ভাবের বিষয়ে কি বা বলিতে পারি? কিন্তু সেদিন প্রাচীনের নবীনতা দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলাম। কি ফূর্ত্তি? বাহবা! বাহবা! তিনি ত আনন্দময়ের ক্রোড়ে আনন্দে স্থান পাইয়াছেন। আমরা হতভাগ্য!"

আজ তাঁহার নশ্বর দেহের অবসান হইয়াছে; ঐ শ্মশানের চিতায় তাঁহার দেহ আমরা ভস্মীভূত করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু তাঁহার অমর আত্মা এখনও আমাদিগের মধ্যে বাস করিয়া আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতেছে। আমরা এখনও বুঝিতে পারি নাই, তিনি আমাদের কি ছিলেন, কি বিরাট পুরুষকে আমরা হারাইয়াছি! তাঁহার ভক্তিধারা, তাঁহার কর্ম্মের ধারা, ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্ব বিভাগে রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে। "তারা দেখা" লোক, আমাদেরই জন্য তারার দিকে—আলোকের দিকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার জীবনে কতকগুলি বাসনা ছিল; তাহার শেষ বাসনা এই—

বড় আশা সেই দিন, যবে হবে তনু ক্ষীণ,
প্রাণ-দীপ হইবে নির্ব্বাণ;
ঈশ্বরের ভক্তগণে, দেখি যেন এ নয়নে,
থাকি যেন থাকিয়ে সজ্ঞান।
এক পদ পরকালে, এক পদ ইহকালে,
গিয়া যবে দাঁড়াইব দ্বারে;
প্রভু যেন সেই কালে, অধম তনয় বলে,
পদছায়া দেন হে আমারে।
সে দিন পশ্চাতে চেয়ে, যেন না ব্যাকুল হয়ে,
কাঁদি আমি দুষ্কৃতি স্মরিয়া,—
শত্রু মিত্র কারু কাছে, অপরাধ ঋণ আছে,
ভেবে যেন না মরি কাঁদিয়া।
সবার মার্জ্জনা চেয়ে, স্নেহ আশীর্ব্বাদ পেয়ে,
ভক্তগণ মাঝে যেন মরি,
শুনিতে শুনিতে আঁখি, মুদে যেন তাঁরে দেখি,
এ বাসনা পূরান্ আমারি।

তাঁহার এই বাসনা ভগবান্ পূর্ণ করিয়াছেন।

মহাপ্রস্থান।

ধ্যানমগ্ন হে তাপস! তব চির আকিঞ্চন
(ওঁ) ব্রহ্ম-নাম-ধ্বনি প্রতিশ্বাসে করি উচ্চারণ,
জীবনের যবনিকা আজি নিপতিত ধীরে
আকুল স্বজনগণ শুধু ভাসে অশ্রুনীরে।
ওগো, কর্ম্মী তুমি, যোগী তুমি, ধ্যানপরায়ণ,
আজি লভি সিদ্ধি ব্রহ্মধামে করিছ গমন।
এ'ত মহা মহোৎসব, সাধি কার্য্য বীরবেশে,
চলেছ অমর আত্মা আনন্দময়ের দেশে।

বয়বপু সুসজ্জিত কুসুম-পল্লব-হারে,
বঙ্গের গৌরব-রবি শয়ান জাহ্নবী তীরে।
জ্ঞানে, গুণে, ধর্মধনে বিকশিত হিয়াখানি,
নয়নে করুণাধারা শুনিলে দুঃখের বাণী।
দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে নাহি দৈন্য নাহি ক্লেশ,
হাসিমুখ রোগে, শোকে, বিজয়ী বীরের বেশ।
শিশু সম সরলতা, নারীসম সুকোমল,
প্রেমপূর্ণ হিয়াখানি করুণায় ঢলঢল।
কৌস্তুভ রতন তুমি দুঃখী বঙ্গ-জননীর
তোমা তরে আজি দেব, উচ্ছ্বসিত আঁখিনীর।
অপ্রমত্ত জয়ী তুমি, বিজয়ী বীরের বেশে
সাধিয়া কর্ত্তব্য নিজ চলি গেছ নিজদেশে।
এ মহাপ্রস্থান হ'ক আকুল বিষাদহীন
এ নহে দীনের যাত্রা যাপিয়া আঁধারে দিন।

—সরলা

শেষমুহূর্ত্ত ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

শাস্ত্রীমহাশয় অনেক দিন হইতেই—বোধ হয় দুইমাস—একবারে শয্যাগত ছিলেন। ধরিয়া না উঠাইলে এবং বালিশ ঠেশান না দিলে বসিতে পারিতেন না। কিন্তু কেহ সাক্ষাৎ করিতে গেলে তাঁহার সহিত বেশ কথা কহিতে পারিতেন। সময়ে সময়ে সংবাদপত্রাদিও পড়িতেন। মধ্যে মধ্যে অবস্থা খারাপ হইত, আবার ২।৩ দিনের মধ্যেই সেই অবস্থা চলিয়া যাইত। গত ২৯এ সেপ্টেম্বর এরূপ একটা অবস্থা আসিল। রোগীর শ্বাসকষ্ট হইতে লাগিল। তিনি পার্শ্ববর্ত্তীদিগকে বলিলেন "এবার আমি যাব।" নিজের অবস্থা ঠিকই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মঙ্গলবার যতই বেলা হইতে লাগিল ততই অবস্থা মন্দতর হইতে লাগিল। যাঁরা সেই সংবাদ পাইলেন তাঁরা ছুটিয়া গেলেন। মৃদু হাস্যের সহিত নির্ব্বাক্ভাবে সকলকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্নে বোধ হইল আর অধিক বিলম্ব নাই। চারি দিকে সংবাদ প্রেরিত হইল। ক্রমশঃ বন্ধুবান্ধবে বাড়ী পরিপূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার নিজের রচিত নগরসংকীর্ত্তনের কতিপয় প্রসিদ্ধ হৃদয়-উন্মাদক কলি গীত হইতে লাগিল। চারি দিকে শোকভারাক্রান্ত ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা ঘেরিয়া আছেন, অশ্রুধারা বহিতেছে, কিন্তু ক্রন্দনের কোলাহল নাই। ব্রাহ্মসমাজে মৃত্যুর দৃশ্য সর্ব্বত্রই এরূপ গম্ভীর। বালকবালিকার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বেও অবিশ্বাস ও নৈরাশ্যসূচক উন্মত্ত শোকোচ্ছ্বাস দেখা যায় না। "আনন্দে গাহিয়ে চল আর কিবা ভয় রে" এই কলি গীত হইবার পরেই পুণ্যাত্মা শেষ নিশ্বাস ফেলিয়া আনন্দধামে চলিয়া গেলেন। শাস্ত্রী-গৃহিণী একবারমাত্র কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন, পরক্ষণেই সেই শোকোচ্ছ্বাস নীরব ক্রন্দন ও প্রার্থনায় বিলীন হইল। সঙ্গীত ও প্রার্থনা চলিতে লাগিল। গৃহ, গৃহের পার্শ্ববর্ত্তী ছাদ, বারাণ্ডা, এমন কি বাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী রাজপথ পর্য্যন্ত লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র ঘোষাল সংক্ষেপে পূর্ণাঙ্গ উপাসনা করিলেন। অপর দিকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন চলিতে লাগিল। গোধূলী অবসানে মৃতদেহকে কার্পাস ও পট্টবস্ত্র পরাইয়া, ফুল ও চন্দনে সজ্জিত করিয়া আলোকমালার সমুজ্জল রাজপথে আনা হইল এবং এক খানা সুন্দর পালঙ্কে শোওয়ান হইল। সেই সময়কার শোকোচ্ছ্বাস কে বর্ণনা করিবে? সুখের গৃহ ছাড়িয়া, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ, বন্ধুবান্ধব সকলের সেবাযত্নের অতীত হইয়া সেই প্রিয় দেহ কোথায় চলিল! রাশি রাশি শ্বেতপদ্মে দেহ আবৃত হইল, কেবল মুখখানি অনাবৃত রহিল। যুবক প্রৌঢ় অনেকে খাট বহন করিয়া চলিলেন। গায়কদল ভাই ত্রৈলোক্যনাথ-রচিত প্রসিদ্ধ কীর্ত্তন "জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে" এবং গুপ্ত মহাশয়ের রচিত "বল রে বল রে বল রে সবে ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্' গাহিতে গাহিতে অগ্রসর হইলেন। পশ্চাতে লোকারণ্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিডন ষ্ট্রীট, আপার সারকিউলার রোড, সুকিয়া ষ্ট্রীট, এম্‌হার্ষ্ট ষ্ট্রীট, সিটিকলেজের নূতন বাড়ীর সম্মুখ দিয়া, বেচু চাটুর্য্যার ষ্ট্রীটের ভিতর দিয়া কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে বাহির হইয়া এই লোকারণ্য প্রায় ৭ টার সময় মন্দিরপ্রাঙ্গনে উপস্থিত হইল। সেখানে পূর্ব্ব হইতেই বেঞ্চ ও শতরঞ্চ দিয়া উপাসনার স্থান প্রস্তুত করা হইয়াছিল। দেহ পঁহুছিবার পূর্ব্বেই সেখানে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। বিজ্ঞাপন ছাপান ও বিলির অধিক সময় পাওয়া যায় নাই। কিন্তু অল্প সময়েই বৃহৎ সমারোহ হইয়াছিল। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য সংক্ষিপ্ত ভাবে পূর্ণাঙ্গ উপাসনা ও মহিলাগণ সঙ্গীত করিলে পর শ্মশানযাত্রা পুনরারম্ভ হইল। গায়কদল শাস্ত্রীমহাশয়ের রচিত নগর-সঙ্কীর্ত্তনের উৎকৃষ্ট অংশগুলি অতি উৎসাহের সহিত গাহিয়া চলিলেন। সমস্ত রাস্তায় এই উৎসাহের লাঘব হয় নাই। এই ভাবপূর্ণ সঙ্কীর্ত্তনে অন্ত্যেষ্টিযাত্রা অতি গম্ভীর ও পবিত্র আকার ধারণ করিয়াছিল। স্থানে স্থানে পথিকগণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন "কে যাচ্ছেন?" এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের নাম শুনিবামাত্রই প্রণাম করিতে লাগিলেন। এক স্থানে একটি লোক রাজপথে পতিত হইয়া "গুরুদেব!" এই কথা বলিয়া প্রণাম করিলেন। বলা বাহুল্য যে, সকলেই পদব্রজে গিয়াছিলেন। কোন কোন মোটর-আরোহী দেহ দেখামাত্রই অবরোহণ করিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন। লোকারণ্যের মধ্যে আমরা নয় জন ব্রাহ্মমহিলাকে লক্ষ্য করিলাম। তাঁহারাও সমস্ত পথ পদব্রজেই গিয়াছিলেন। এই রূপে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ধীর ও গম্ভীর গতিতে যাত্রীদল প্রায় ৯ টার সময় শ্মশানভূমিতে পঁহুছিলেন। দাহের আয়োজনে বিলম্ব হওয়াতে কেহ কেহ চলিয়া আসিলেন, কিন্তু বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মিকাগণ সকলেই শেষ উপাসনা পর্য্যন্ত রহিলেন। প্রায় ১০৷৷ টার সময় চিতা প্রস্তুত হইল এবং তদুপরি দেহ স্থাপিত হইল। সেই মুহূর্ত্তের দারুণ ক্লেশ কেবল অন্তর্দর্শীই জানেন। মহিলারা সঙ্গীত করিলে পর শ্রীমান্ সুকুমার রায় একটি প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা করিলেন এবং তৎপরে আর একটি সঙ্গীত হইল। পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস সেদিন একটি বিবাহ উপলক্ষে বালীবনে ছিলেন। তিনি সেখানে এই শোক-সংবাদ শুনিয়া বিবাহান্তে কলিকাতায় যাত্রা করিয়াছিলেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দ্বিতীয় সঙ্গীতের পর তিনি শ্মশানভূমিতে উপস্থিত হইলেন এবং চিতার নিকটবর্ত্তী হইয়া অতি গম্ভীর ভাবে একটি

সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে আর একটি সঙ্গীত হইল। শেষকার্য্য অগ্নিসংস্পর্শ। যখন শ্রীমান প্রিয়নাথ ও অময়নাথ পাট-কাঠি লইয়া চিতায় অগ্নিদান করিলেন, তখন বোধ হয় অনেকেই দারুণ মনোবেদনায় সেই দৃশ্য হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইয়াছিলেন। আমরা সেই দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া শ্মশানের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তৎপর ক্রমশঃ অনেকেই চলিয়া আসিলেন, অল্প কয়েক জন শেষপর্য্যন্ত রহিলেন। দেহ যতই উচ্চ কার্য্যে লাগুক না কেন, তার শেষ পরিণাম এই! কিন্তু দেহের জন্য শোক করিয়া কি হইবে? সেই দেহবাসী অমরাত্মা স্বর্গে অমরসভায় আসীন—অমরাত্মাদিগের আশ্রয় প্রেমময়ের প্রেমালিঙ্গনে বেষ্টিত। আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনেও তিনি চিরজীবিত। এই চল্লিশ বৎসরের অধিক কাল আমরা যে সকল আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়াছি, উচ্চ চেষ্টায় চেষ্টান্বিত হইয়াছি, সমুদয়ের মধ্যেই তাঁহার জীবন্ত অনু-প্রাণন বর্ত্তমান। ঈশ্বর করুন্ যেন পরলোকগত মহাত্মার সহিত আমাদের এই আধ্যাত্মিক যোগ উত্তরোত্তর গাঢ়তর হয়—যেন জীবন অপেক্ষাও মরণে—পুনরুত্থানে—তাঁহার ভাব আমাদের মধ্যে সজীবতর, পূর্ণতর হয়!

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

শ্রদ্ধেয় বন্ধু পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বিষয় তাঁহার ঘনিষ্ঠ নিকটস্থ সহকর্ম্মী রূপে আমার মনের ভাব ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা থাকিলেও শক্তিতে কুলায় না; তবু তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদক মহাশয়কে জানাইতেছি শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রীর অসাধারণ বাগ্মীতা—বাঙ্গালা ভাষায় অদ্বিতীয় বাগ্মী ছিলেন, আমি এরূপ ওজস্বী বাঙ্গালা ভাষার বক্তৃতা আর কাহারও মুখে শুনি নাই. বক্তৃতা শুনে মানুষ ক্ষেপিয়া উঠে এরূপ দেখি নাই; তাই ধর্ম্মপথে মানুষের মুখকে ফিরাইতে শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। শক্তির কথা আর কিছু না বলিয়া এত বড় ক্ষমতাশালী ব্যক্তি এত বড় পদস্থ ব্যক্তি কিরূপ অমায়িক এবং সরল ছিলেন তাহারই দু'একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমার শ্রদ্ধা প্রীতি অর্পণ করিতেছি;—পণ্ডিত শাস্ত্রী সাধনাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহার মধ্যে আমার কি ছিল না ছিল তাহা তিনি বলিলেই ভাল হইত; কিন্তু সাধনা-শ্রম যখন সমাজের অঙ্গীভূত অনুষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইল, তখন ইহার তত্ত্বাবধায়ক সমাজের প্রচারক ভিন্ন অন্য লোক হইতে পারিবে না এই নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল এবং আমাকে অন্যতম পরিচারক রূপে সমাজ আশ্রমে পাঠাইলেন। আমি কিছুদিন মধ্যেই শাস্ত্রী মহাশয় প্রচারকার্য্যে দূরদেশে যাওয়া উপলক্ষে তত্ত্বাবধায়ক হইলাম। এ সময় তাঁহার কোন বন্ধু বলিলেন, 'তুমি প্রচার কার্য্যে এখন যাবে? নবদ্বীপ বাবু ত ব্রাহ্মসমাজের পক্ষের লোক, শেষে বা তোমার আশ্রমের ক্ষতি হয়।' অতি সরল ভাবে সব কথা আমাকে বলিলেন। আমি বলিলাম আমি কোন কাযে অগ্রণী না হইলেও সাধুকার্য্যের পৃষ্ঠপোষক ইহাই জানিবেন। আপনি নিশ্চিন্ত প্রাণে প্রভুর কার্য্যে যান, ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন আশ্রম ক্রমে ভালই হইতেছে। সব কথা সকল সময় না বলিলেও যাহা অন্যকে বলিতেন না সে বিষয় আমাকেই জিজ্ঞাসা করিতেন। জীবনে এমন সরল ধর্ম্মবন্ধু কখনই পাই নাই। কর্ম্মের ভার পারত পক্ষে অন্যকে দিতেন না, নিজেই সব করিতেন। প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য সাধনে ব্রহ্মলাভের জন্য যে ব্যাকুলতা ছিল, ঈশ্বর এখন তাহার সুফল প্রদান করুন। তাঁহাতে এবং আমা-দিগেতে তাঁহার পবিত্র কার্য্য সফলতা লাভ করুক। তাঁহার কথায় ত প্রাণ উৎসাহে পূর্ণ হইতই, রোগশয্যায় শায়িত দেখিয়াও প্রাণে নব উৎসাহ আসিত। এখন তাঁহার সেই জীবন ভাবিয়া উৎসাহিত থাকি, উৎসাহদাতা ঈশ্বর এই আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস।

পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয়।

পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয় আর ইহলোকে নাই। সেই পুণ্যশীল মহাত্মা জীবনের মহাব্রত সমাপন করিয়া অনন্ত লোকে গমন করিয়াছেন। আমরা আজ তাঁহার অন্তর্ধানে আপনাদিগকে অতি দীন বলিয়া অনুভব করিতেছি। কিন্তু সেই পুণ্যপ্রদীপ কি নিবিল? আর কি আমরা তাঁহার বিমল জ্যোতিঃ দর্শন করিব না? যদি আমরা আমাদের অধ্যাত্মচক্ষু উন্মীলিত রাখি, যদি বিষয়াসক্তি-তিমিরে অন্তশ্চক্ষু আচ্ছন্ন না হয়, তাহা হইলে সে জ্যোতিঃ অবশ্যই দর্শন করিব, সেই পুণ্যজীবনের অসামান্য প্রভাব অনুভব করিবই করিব। যাঁহার পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া সংসারকে ভুলিতাম, যাঁহার সাধুতার প্রভাবে তৎকালের জন্য হৃদয় মন পবিত্র হইত, শাস্ত্রী মহাশয়ের জড়দেহের অন্তর্ধানের সঙ্গে সে প্রভাব কখনই অপহৃত হইবে না। অধ্যাত্ম জগতের এক অত্যদ্ভুত রহস্য এই যে, কোন সাধু ব্যক্তির অন্তর্ধানের পর তাহার পুণ্যময়ী শক্তি পরবর্ত্তিগণের জীবনে প্রবলতররূপে কার্য্য করে। এই স্থলেই আমাদের আশা। যদি সেই পুণ্যাত্মার পুণ্যজীবনের প্রভাব না হারাই, যদি তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় অধ্যাত্ম দেহ আমাদের মনশ্চক্ষুর সমীপে বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে আর তাঁহার জড়-দেহের অন্তর্ধানে অধিক দুঃখিত হইবার কারণ থাকিবে না। যদি তাঁহার পুণ্যজীবনের পুণ্যস্মৃতি আমাদিগের সুখাসক্তির হ্রাস করিয়া তাঁহার ন্যায় আমাদিগকে সত্যের সেবায় নিযুক্ত করিতে পারে, তাহা হইলে আর তাদৃক দুঃখের কারণ থাকিবে না। যদি তাঁহার নিঃস্বার্থ সেবার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়া আমরা কিয়ৎ-পরিমাণেও নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ বিস্মৃত হইতে পারি, তাহা হইলে আর তাদৃক দুঃখের কারণ থাকিবে না। যদি সেই অসামান্য আত্মোৎসর্গের পুণ্যকাহিনী স্মরণ করিয়া আমরাও সত্যের সেবায়, ব্রাহ্মসমাজের সেবায় কিয়ৎ পরিমাণেও আপনাদিগকে উৎসর্গ করিতে পারি, তাহা হইলে আর তাদৃক্ দুঃখের কারণ থাকিবে না। যদি আমরা সেই সত্যসাধনে ও প্রচারে অনন্যসাধারণ অদম্য উৎসাহ স্মরণ করিয়া, কিয়ৎ পরিমাণেও উৎসাহিত হইতে পারি, তাহা হইলে আর তাদৃক্ দুঃখের কারণ থাকিবে না। আমরা যদি তাঁহার সেই অতুলনীয় সংযম ও নিষ্ঠার কাহিনী স্মরণ করিয়া কিয়ৎ পরিমাণেও সংযমী ও নিষ্ঠাবান্ হইতে পারি, তাহা হইলে আর তাদৃক্ দুঃখের কারণ থাকিবে না। উত্তুঙ্গ হিমা-লয়কে চূর্ণ করিয়া ভারতক্ষেত্রে বিস্তারিত করিলে ভারতের ভূমি

যেমন পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হয়; সেইরূপ সেই পুণ্যজীবনের রেণু রেণু গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের পুণ্যভূমি যদি কিঞ্চিৎ উন্নত হয়, তাহা হইলে আর তাদৃক্ দুঃখের কারণ থাকিবে না।

অদ্য তাঁহার শ্রাদ্ধবাসর। তাঁহার সুশীল পুত্র আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব সমভিব্যাহারে তাঁহাকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা অর্পণ করিতেছেন। কিন্তু কি উপায়ে যে আমরা প্রকৃতরূপে তাঁহার তর্পণ করিতে পারি, আজ তাহা চিন্তা করিবার দিন। তাঁহার শোকার্ত্ত আত্মীয়গণের সহিত মিলিত হইয়া একবিন্দু অশ্রুপাত করিলেই কি তাঁহার তর্পণ হইবে? হৃদয়ে কিছুকাল শোকভার বহন করিলেই কি তাঁহার তর্পণ হইবে? পত্রিকাতে কিছুদিন তাঁহার পুণ্যচরিত কীর্ত্তন করিলেই কি তাঁহার তর্পণ হইবে? স্মৃতিসভায় সমবেত হইয়া উচ্চকণ্ঠে সুললিত ভাষায় তাঁহার গুণবর্ণনা করিলেই কি তাঁহার তর্পণ হইবে? আমরা সকলেই জানি যে, তিনি নিজ প্রশংসা শ্রবণ করিলে আপনাকে অপরাধী বোধ করিতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিলেও যাঁহার মুখ হইতে 'আমি' শব্দ উচ্চারিত হইত না, এবং যখনই হইত, তখনই স্বীয় অক্ষমতা ও অধমতার কথাই বলিতেন, এবং নিজের অকৃতার্থতা স্মরণ করিয়া কতই দুঃখ করিতেন, সময়ে সময়ে শিরে করাঘাত করিতেন; তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া আমরা কখনই তাঁহার তর্পণ করিতে পারিব না। পরন্তু যদি আমরা তাঁহার হৃদয়ের চিরাকাঙ্ক্ষিত ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার এবং ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে দেহমনের শক্তি নিয়োগ করি, তাহা হইলেই তাঁহার আত্মা তৃপ্ত হইবে, এবং তিনি স্বর্গলোক হইতে আমাদের মস্তকোপরি আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবেন। ভগবান্ আমাদিগকে কৃপা করুন, আমরা যেন পুণ্যশ্লোক শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রকৃত শিষ্য ও অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহার ন্যায় জীবনকে ধন্য করিতে পারি।

জীবনের মহাব্রত করি' উদ্‌যাপন,
গিয়াছ অমরলোকে, হে দেব! শোকার্ত্ত
সবাই মোরা তোমার বিরহে। আশীস্
করহ আজি আমা সবাকারে—অর্পিয়া
সর্ব্বস্ব যেন পূজি ইষ্টদেবে তোমা হেন;
স্বার্থ সুখ বিসর্জ্জিয়া ভকতি অনলে
লভি যেন পুণ্যের বসন; দীপশিখা
সম যেন উজলি সবায়; দহি যেন
আপনারে, বর্ত্তিকা যথা দহি আপনারে
বিতরে বিমল জ্যোতি আঁধার কুটীরে।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাঁচিসহরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতিসভায় সভাপতি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনার সারাংশ:—

আমার প্রিয়সুহৃৎ পরম ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, যিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মেরুদণ্ড ছিলেন—যাঁর উপদেশ ও দৃষ্টান্তে কত শত যুবক ধর্ম্মপ্রাণে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই সমাজের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—হায়! তিনি আর নেই! আমি যেন তাঁকে সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে সে দিন তাঁর প্রেমোজ্জ্বল সহাস্য বদন দেখেছি—তাঁর সরল সরস মধুরালাপে মুগ্ধ হয়েছি; আর এর মধ্যে তিনি কোথায় চলে গেলেন—আমাদের সকলকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া তিনি সেই পুণ্যধামে প্রস্থান করেছেন, যেখান থেকে পথিক আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না। আমরা তাঁর অকাল মৃত্যুতে মর্ম্মাহত হইয়া তাঁর আত্মার কল্যাণ ও শান্তি কামনা করে ভগবান্‌কে ডাক্‌ছি—বিনীত ভাবে তাঁর নিকট প্রার্থনা কর্‌ছি যে, হে বিশ্ববিধাতা জগৎপিতা, তুমি সেই পুণ্যাত্মার সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ বিধান কর—তাঁর বিয়োগে যাঁরা শোকসন্তপ্ত তোমার মধুর সান্ত্বনা-বাক্যে তাঁদের শোকতাপ হরণ কর; তাঁর পবিত্র চরিত্রের উচ্চ আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধারণ কর—তাঁর সেই অসাম ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়, তাঁর অটল কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, তাঁর আত্মত্যাগ ও পরার্থপরতা, স্বদেশপ্রেম, ধর্ম্মভীরুতা ও ভগবদ্ভক্তি এই সমস্ত দৈবসম্পদ্ যেন আমাদের জীবনপথের পাথেয় হয়। হে দেব, হে পিতা, যিনি তোমার চরণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন—তোমার কার্য্যে সমুদয় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন—যিনি কার্য্য সাধনে কোন কষ্টকে কষ্ট বোধ করেন নি, কোন ক্ষতিকে ক্ষতি বলে গ্রহণ করেন নি, লোকের গ্লানি, নিন্দা, উৎপীড়ন অকাতরে সহ্য করেছেন, যিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়া দেশবিদেশে তোমার নাম প্রচার করে ধন্য হইয়াছেন, তিনি এক্ষণে ভয় হতে অভয় দ্বারে, মৃত্যু হতে অমৃত নিকেতনে গিয়ে তোমার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, তাঁকে তোমার ক্রোড়ে আশ্রয় দিয়ে তাঁর দুঃখ তাপ দূর কর—তাঁর আত্মার শান্তি রক্ষা কর এই আমাদের প্রার্থনা।

হে মঙ্গলময় পরমেশ্বর, এই সকল সাধু পুরুষদের দৃষ্টান্তে আমরা যেন দিন দিন তোমার নিকটবর্ত্তী হ'তে পারি, তোমার মঙ্গল স্বরূপে বিশ্বাস যেন কখনই শিথিল না হয়। তুমি আমাদিগকে সংসারের সম্পদ্ প্রেরণ কর আর বিপদেই আবৃত কর, তোমার দাক্ষিণ মুখ—তোমার প্রেমদৃষ্টি যেন সকল সময়ে আমাদের হৃদয়কে প্রফুল্ল ও উন্নত করিয়া রাখে। দেখ বলিতে বলিতে এই বিশ্বেশ্বরের হস্ত হ'তে অমৃত বর্ষণ হচ্ছে!—

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে
মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ
মধু নক্তমুতোষসো
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধু দ্যৌ রস্তুনঃ পিতা
মধু মান্নো বনস্পতিঃ
মধু মানস্তু সূর্য্যঃ
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

বায়ু মধু বহন করিতেছে, সমুদ্র মধুক্ষরণ করিতেছে—ওষধি বনস্পতি সকল মধুমান্ হউক—গো সকল সুমধুর দুগ্ধ দান করুক; রাত্রি মধু হউক—উষা মধু হউক—দ্যুলোক ভূলোক ও সূর্য্য মধুময় হউক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ

আমাদের সেই প্রেমাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার জীবনের কার্য্য সমাপন করিয়া নূতন অজানার দেশে প্রস্থান করিয়াছেন যেখান হইতে সকল পাপাত্মা প্রতিনিবৃত্ত হয়—অন্ধ যে সে অনন্ধ হয়, যে বিদ্ধ সে অবিদ্ধ হয়, যে উপতাপী সে অনুপতাপী হয়—রাত্রি দিবসের ন্যায় আলোকিত, দেহ সকৃদ্বিভাসিত ব্রহ্মলোক।

নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ
ন জরা ন মৃত্যুর্ণ শোকঃ ন সুকৃতং ন দুষ্কৃতং
সর্ব্বে পাপ্মানো ইতো নিবর্ত্তন্তে
অপহত পাপমা হ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ
তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্ত্বা

* * *

অন্ধঃ সন্ননন্ধো ভবতি—বিদ্ধঃ সন্নবিদ্ধো ভবতি
উপতাপী সন্ননুপতাপী ভবতি

* * *

তস্মাদ্বা এতং সেতুং তীর্ত্ত্বা নক্তমহরেবাভি নিষ্পদ্যতে
সকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ।

ইহাই সকৃৎ বিভাসিত ব্রহ্মলোক—হে বন্ধুগণ, ভক্তেরা যাহার জন্য ব্যাকুলচিত্তে প্রতীক্ষা করিতেছেন এই সেই ব্রহ্মলোক! আমরা কেনই বা শোক করিব—যাঁহার বিচ্ছেদে আমরা বিলাপ করছি তিনি সেই পুণ্যলোকে প্রস্থান করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের তিরোধানে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আবালবৃদ্ধবনিতা দীর্ঘকাল ধরিয়া যে আশঙ্কায় অশনিপাত ভয়ে শঙ্কিত এবং সন্ত্রস্ত ছিলেন, বিগত ১৩ই আশ্বিন মঙ্গলবার, কলিকাতা মহানগরীতে সেই অশনিপাত ঘটিয়াছে। ধর্ম্মবীর পরম পূজ্যপাদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয় আর এই মরজগতে নাই। তিনি এ দেশের কোন্ স্থান অধিকার করিয়া কি মহামঙ্গল সাধন করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বলিবার বিষয় নহে। তাঁহার মহাপ্রস্থানে ভারতের আকাশ হইতে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের স্খলন হইয়াছে—নব্যবঙ্গগঠনকারীদলের শ্রেষ্ঠতম পুরুষের তিরোধান ঘটিয়াছে। বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মবীরের আসন শূন্য হইয়াছে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়-তরু ভূপতিত হইয়াছে। সংক্ষেপে ইহার অধিক আর বলিতে পারি না।

ক্ষণজন্মা বিজয়ী বীর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের তিরোধানে সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তিভূমিতে যে ভীষণ আঘাত লাগিয়াছিল, তাহার পরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর তিরোধানের আঘাতের মত আঘাত আর ঘটে নাই। এই আঘাতের প্রকম্পন সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের চিন্তাশীল নরনারীর চিত্তকে আলোড়িত করিয়া দিয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজস্থ সভ্যমাত্রকে ভীত ও নিরাশ্রয় করিয়া ফেলিয়াছে। এই ধর্ম্মবীর প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল ভারতক্ষেত্রের অজ্ঞানতা, অনীতি, অসত্য, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, দেশাচার, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও অপ্রেমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া, আজ বিজয়ী বেশে সত্য-প্রেমাঙ্কিত পতাকা রাখিয়া বিশ্বরাজের নিভৃত শাশ্বত মন্দিরে চিরবিশ্রাম লাভ করিলেন। আজ তাঁহার সেই নিশান কে স্কন্ধে করিয়া সংগ্রামক্ষেত্রে সেনাপতি হইয়া অগ্রে চলিবে—ইহাই তো আজ ব্রাহ্মসমাজের প্রধানতম প্রশ্ন ও প্রার্থনা।

ব্রাহ্মসমাজের শত শত সভ্য আজ একপ্রাণে গভীর প্রার্থনার ধ্বনিতে ব্রাহ্মসমাজের আকাশ পূর্ণ করুন। প্রতি ব্রাহ্মপরিবার এই মহাপুরুষের পুণ্যপূত জীবনপ্রসঙ্গে দিন যাপন করিয়া পিতৃঋণ মুক্ত হউন। ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণীদল প্রাণযোগে শক্তিসংবদ্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হউন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক-দল আজ আর বিচ্ছিন্ন না থাকিয়া এক নিশানতলে একের আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হউন। "মরণের মাঝে জীবনের বীজ লুকান" আছে, এই বিশ্বাস লইয়া সকলে এই দিনে নবজীবন লাভের জন্য এক নবজাগরণের সৃষ্টি করুন্।

নবাবঙ্গের শ্রেষ্ঠতম পুরুষদলের ভিতরে একাধারে এমন বিবিধ বিষয়িণী শক্তির সমাবেশ আর তো দেখিতে পাই নাই। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতীমান্ এম্-এ উপাধিধারী খ্যাতনামা পুরুষ। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার সম্মুখে সংসারের কত আশা ভরসা! ভবিষ্যৎ কত উজ্জ্বল! কিন্তু ধর্ম্মরাজ স্বয়ং তাঁহার সম্মুখের এই আলোক নির্ব্বাণ করিয়া দিয়া সত্যপ্রেমাঙ্কিত স্বাধীনতার নিশান হাতে দিয়া স্বর্গের পথ দেখাইয়া দিলেন। ধর্ম্মের নিশানই স্কন্ধে রাখিয়া, এই বীরপুরুষ সাহিত্য রচনার ভিতর দিয়া বঙ্গীয় সমাজকে উত্থানের পথে ধরিয়া তুলিলেন। জ্ঞানশিক্ষাকেই বড় শক্তি জ্ঞান করিয়া যুবকদল এবং বিশেষ ভাবে অন্ধতমসাচ্ছন্ন অশিক্ষিতা নারীজাতির শিক্ষাবিধানে শক্তিনিয়োগ করিলেন। দেশের পাপ, কুসংস্কার, অসত্য, অনীতি ও অধর্ম্ম দেখিয়া অগ্নিময়ী বক্তৃতায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে দুর্ব্বল ও পাপনিরত নরনারীকে সজাগ ও সবল করিয়া তুলিলেন। সে বক্তৃতা কি অগ্নিময়ী! কি আবেগময়ী! কিবা অমৃতবর্ষিণী! বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া এই বাগ্মীকুলতিলক পুরুষসিংহ শত শত শ্রোতাকে আপনার করতলগত করিয়া কি এক ইন্দ্রজাল-প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় এমন বক্তৃতা আর বুঝি হবে না। এমন মধুবর্ষিণী চিত্তরঞ্জিনী বাণী আর কে শুনাইবে? এমন স্বর্গের হাসি কাহার মুখে ফুটিয়া উঠিবে? তাঁহার বিরাট দেহের যে বিরাট আত্মা তাহা যে এক অমৃতের খনি ছিল। সাহিত্যে, সঙ্গীত রচনায়, কবিতায়, অসাধারণ বাগ্মীতায়, প্রাঞ্জল ওজস্বী উপদেশে এবং দেশের ও দশের বিবিধ কর্ম্মসূত্রে তাঁহার অফুরন্ত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস আর শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবন একই অবিচ্ছিন্ন বস্তু বলিলে আজ অসঙ্গত হইবেনা। তাই তাঁহার লিখিত History of the Brahmo Samaj ব্রাহ্মসমাজের সম্পত্তিরূপে বর্ত্তমান রহিল। তাঁহার 'আত্মচরিত' সরল, স্বচ্ছ, পবিত্র মন্দাকিনীর ধারার মত বঙ্গের নরনারীকে শীতল ও স্নিগ্ধ করিয়া তুলিবে।

অমিত তেজোদীপ্ত ব্রাহ্মসমাজের শ্রেষ্ঠতমপুরুষ কেশবচন্দ্রের দুশ্ছেদ্য আলিঙ্গন হইতে কঠোর কর্ত্তব্যের প্রেরণায় এই বীর-পুরুষ বিচ্ছিন্ন হইয়া সুহৃদ্বয় স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু ও দুর্গা-মোহন দাস মহাশয় প্রভৃতির সহযোগিতায় দুরন্ত সংগ্রামে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাকল্পে সৌধসম বিশাল উপাসনামন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিলেন। বর্ত্তমান ব্রাহ্মসাধনাশ্রমও তাঁহারই চিন্তা এবং প্রেমাঙ্কিত প্রতিষ্ঠান—শাস্ত্রীর দেবোপম অমৃতসম জীবনত্যাগের

অপূর্ব্ব নিদর্শন। আজ পর্য্যন্ত এমন ত্যাগমহিমা ব্রাহ্মসমাজে কেহ দেখাইয়াছেন বলিয়া জানি না। এমন করিয়া 'ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ' করিয়া পাগল হইতে 'আর তো কাউকে দেখিলাম না। ঋষিকথিত অমৃতত্ব লাভের উপায় একমাত্র ত্যাগেই সম্ভবিত। আহা! তাহাও তো সত্যরূপে এই জীবনেই দর্শন করিলাম। শাস্ত্রীর সন্তানগণের আজ মাথা রাখিবার স্থান নাই! কন্যাকার অন্নের সংস্থান নাই! এমন আত্মত্যাগ ও আত্মবিলোপসাধন আর কে করিবে? এই ত্যাগের মূল উপাদান সংযমেই সংগৃহীত হইয়াছিল। শাস্ত্রীর জীবনসংযমের দুর্ভেদ্য পাষাণ ভিত্তিতে স্থাপিত। এমন সংযমব্রত উদ্‌যাপন করিতে অতি অল্পই শুনা গিয়াছে। এই সংযম হইতে যে অগ্নিময় জীবন সম্ভবিত হইল, তাহা হইতে ব্রাহ্মসমাজ যে সম্পদের অধিকারী হইয়াছে, তাহা অমুল্য। ব্রাহ্মসমাজ, আজ যে তুমি দুর্ব্বল, তোমার উপরে যে দেশের লক্ষ লক্ষ চক্ষের কটাক্ষ! ধর্ম্মজগতে আজ কত যে জটিল সমস্যা! এই সকল সমস্যার সমাধান হইবে এই ধর্ম্মবীরের সংযমশক্তি, ত্যাগমাহাত্ম্য, আত্মবিলোপ-সাধন, অনুকরণ ও অনুধ্যান কর।

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী।

আমার পিতৃদেব।*

১৯১৯ সালের ৩০এ সেপ্টেম্বর আমাদের পক্ষে কি বিষম দিন! সে দিন জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা আপনার—সর্ব্বাগ্রে প্রণম্য পিতৃদেবকে হারাইয়াছি। এই বিষম ক্ষতি—এই বিষম আঘাতের সহিত কি গভীর মনস্তাপ! আমি এই দূরদেশ হইতে ছুটিয়া গিয়া পিতৃদেবের সেই প্রেমোজ্জ্বল পবিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিতে পারিলাম না। যে দিন হইতে হিমাদ্রিশিখরে এই দারজিলিং সহরে বাস করিতেছি, তখন হইতে প্রাণে আমার এই ভয় ছিল যে, পিতার সেবা শেষ জীবনে করিতে পারিলাম না, হয় ত বা পিতৃচরণ দর্শনের যে তৃপ্তি তাহা হইতে বঞ্চিত হইব, তাহাই হইল। আজন্মের প্রার্থনা আমার প্রভুর নিকট অগ্রাহ্য হইল। হইয়াছে—নিশ্চয়ই তাহার কোন গূঢ় কারণ আছে। বিধাতার বিধান অন্যথা করে সাধ্য কার? আমি পিতার মহাযাত্রার পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে মুদ্রিত করিবার সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইয়াছি। পিতার মৃত্যু কি সুন্দর! কি স্বাভাবিক! তিনি কবি ছিলেন, কবিতার ভাষায় কত স্থানে আপনার মৃত্যুদিনের বর্ণনা করিয়াছেন। ভগবান প্রতি অক্ষরে তাঁর সে সাধ পূর্ণ করিয়াছেন। বাবা 'হিমাদ্রিকুসুমে'র এক স্থানে লিখিয়াছেন;—

আর কি শুনিবে? দিন হয় অবসান,
দিন দিন ভাঁটা পড়ে তাহার জীবন।
প্রভু হে! এমনি ভাবে দেহ মন প্রাণ,
এমনি সেবাতে দিয়ে এমনি সাধনে,
রত থাকি; এইরূপে প্রেমসুধা পান,
করি তব, অবসানে বিশ্বাস নয়নে,
ওই! সত্যজ্যোতি হেরি সন্ধ্যা কি আসিবে
জীবন তোমারি ক্রোড়ে অস্তে লুকাইবে।

আবার আর এক কবিতায় লিখিয়াছেন,—

কবে আমি অবিরত খাটিতে রহিব রত,
ভুলে যাব বিশ্রামের সুখ;
তাঁর প্রিয়কার্য্য করি, সার্থক জীবন ধরি
না দেখাব কভু ম্লানমুখ।
তাঁর সেবা যেই করে, ধন্য মানি সেই নরে
ধন্য তাঁর দেহ বুদ্ধি ধন;
নরজন্মে কিবা আর, আছে সুখ এ প্রকার,
অধিকার কি আছে এমন?
দীন দুঃখী যেই ঘরে, গিয়া তথা সমাদরে
দেহ মন সেবাতে লাগাব;
ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে, বাঁচাইব সে সবারে
প্রেমদানে হৃদয় জুড়াব।
খাটিয়া পরাণ পাব, তাঁহারি করুণা গাব
দাস তাঁর হইবে উদ্ধার;
তাঁর কাজে সব দিব, নিজে কিছু না রাখিব
এ বাসনা পূরান্ আমার।
বড় আশা সেই দিন, যবে তনু হবে ক্ষীণ,
প্রাণদীপ হইবে নির্ব্বাণ;
ঈশ্বরের ভক্তগণে, দেখি যেন এ নয়নে
ডাকি যেন থাকিয়ে সজ্ঞান।
এক পদ পরকালে এক পদ ইহকালে
দিয়া যবে দাঁড়াইব দ্বারে,
প্রভু যেন সেই কালে, অধম তনয় বলে
পদছায়া দেন হে আমারে।
সে দিন পশ্চাতে চেয়ে, যেন না ব্যাকুল হয়ে,
কাঁদি আমি দুষ্কৃতি স্মরিয়া;
শত্রু মিত্র কারো কাছে, অপরাধ ঋণ আছে
ভেবে যেন না মরি কাঁদিয়া।
সবার মার্জ্জনা চেয়ে স্নেহ আশীর্ব্বাদ পেয়ে
ভক্তগণ মাঝে যেন মরি;
শুনিতে শুনিতে আঁখি মুদে যেন তাঁকে দেখি
এ বাসনা পূরান্ আমারি।

এই যে শেষের দিনের জন্য তাঁর প্রার্থনা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছে। তিনি ভগবানের দাস ছিলেন, খাটিতে খাটিতে শরীরের প্রত্যেক অণু পাত করিয়াছেন। ভগবানের সেবায় তাঁর যথাসর্ব্বস্ব, নিজের জন্য এক রেণু না রাখিয়া দান করিয়াছেন। ভক্তের প্রার্থনা ভক্তবৎসল পূর্ণ করিয়াছেন। তনু তাঁর দিন দিন ক্ষীণ হইয়া সহসা জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল। তাঁর আজন্মের সাধ ছিল সজ্ঞানে ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া, প্রশান্ত ও প্রসন্নচিত্তে আঁখি মুদ্রিত করিবেন। তাহাই হইল, স্বর্গের হাসি হেসে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করে, ধীরে ধীরে চক্ষুদুটি মুদ্রিত করিলেন—শেষ নিশ্বাসের সহিত ওঙ্কার জপ করিলেন, তখন সকলে মিলিয়া ভগবানের নাম গান করিতেছে,—এক জন-

* কন্যা শ্রীমতী হেমলতা সরকার কর্ত্তৃক লিখিত ও কলিকাতায় ব্রাহ্মবাসরে শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারী চৌধুরী কর্ত্তৃক পঠিত।

সমাগম, যেন গৃহে কোন মহোৎসব! ভগবানের সেবক মহাযাত্রা করিতেছেন, সকলে পলকবিহীন চক্ষে তাঁর শেষ নিশ্বাস পতন দেখিতেছে, সহসা ওঁ ব্রহ্ম! ওঁ ব্রহ্ম! নিশ্বাসের সহিত ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিতে করিতে সব স্থির হইয়া গেল—তখনও ভক্তকণ্ঠে ব্রহ্মনাম ধ্বনিত হইতেছে। ভক্তের সাধ পূর্ণ হইল। যাঁরা এই দৃশ্য দেখেছেন, তাঁদের জীবন সার্থক হইয়াছে আর শত ব্যক্তি সেই দেহ বহন করিয়া শ্মশানে গেল—কত নারী পদব্রজে সঙ্গে গেলেন। এমন দৃশ্য কেহ কি দেখিয়াছে?

নারীজাতির চিরবন্ধু-পরমাত্মীয় তিনি ছিলেন। এ জগতে যে মহীয়সী নারীর কোলে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই তাঁর রত্নগর্ভা জননীকে তিনি আশৈশব একান্তহৃদয়ে অর্চ্চনা করিয়াছেন। মা বলিতে তিনি আত্মহারা হইতেন। ভগিনীগুলিকে কি ভালই বাসিতেন, তার বৃত্তান্ত নিজের আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন? আর এই অধম কন্যাকে, কি স্নেহে, কি আদরে প্রতিপালন করিয়াছেন তাহা সকলের বিদিত। তাঁর মত কর্ত্তব্যপরায়ণ পতিই বা কে দেখিয়াছে? তাঁর নারীজাতির প্রতি প্রীতি, কেবল কবিত্বের ভাষা নহে, এ তাঁর প্রাণের কথা—জীবনের পরীক্ষায় তাহার উজ্জ্বল সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। তাঁর 'হিমাদ্রিকুসুমে' নারীজাতি সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে প্রত্যেক নারীর প্রাণ শ্লাঘায় পূর্ণ হয়।

ওই যা অখ্যাতি রাষ্ট্র হলো যে জগতে,
'রমণীপূজক' বলি দিবে টিট্‌কারী—
দিক্, দিক্, ওগো নারী ঈশ্বর কৃপা'তে,
সে সত্য পুরুষে যদি পরাণ আমারি
নাহি পেত নাহি কিছু সংশয় ইহাতে.
এ কবি পূজিত বসে চরণে তোমারি।
প্রকৃতির শোভা তুমি-স্বর্গের সুঘ্রাণ,
নাথের জ্যোৎস্না তুমি জুড়াইতে প্রাণ।

পিতৃদেব মুক্তকণ্ঠে আপনাকে 'রমণীপূজক' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আর একবার বলিয়াছেন যে, ভগবানের সন্ধান যদি না পাইতেন, তবে নারীজাতিকে 'দেবী' বলিয়া পূজা করিতেন। এই নারী কি গৃহে, কি বাহিরে, কি মাতৃরূপে, কি কন্যারূপে, কি ভগিনীরূপে চিরসমাদরের পাত্রী ছিলেন। পথে ঘাটে, যেখানে নারী দেখিতেন, তাঁর প্রতি তাঁর সৌজন্য ও প্রীতি প্রকাশ পাইত।

বাবার কথা কত বলিব, তাঁর যে গুণের সীমা ছিল না। আজ আমি কেবল তাঁর প্রকৃতি ও চরিত্রের বিশেষত্বের কিঞ্চিৎ আভাস দিতে চেষ্টা করিব। জ্ঞান, প্রেম, উদ্যোগ এই তিনটি গুণের সমষ্টিতে মনুষ্যত্বের বিকাশ,—এই তিনটি গুণের একটি গুণ প্রবল হইলে, মানবচরিত্রে দুর্জ্জয় বলের আবির্ভাব হয়। যেখানে এই ত্রিধারা একত্র মিলিত হয়, সেখানে কি প্রচণ্ড তেজের উদ্ভব হইয়া থাকে। আমার পিতৃদেবের চরিত্রে এই ত্রিধারা সঙ্গত হইয়াছিল। তিনি যে বংশে, যে পিতা মাতার সন্তান হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে মেধাবী, সহৃদয় এবং উদ্যোগী হওয়া তাঁর পক্ষে কিছুই অসঙ্গত ছিল না। আমরা সৌভাগ্য-ক্রমে আমার পিতার পিতামহীকে তাঁর বৃদ্ধাবস্থায় দর্শন করিয়াছি—তাঁদের ভিতর যে বুদ্ধির উজ্জ্বলতা, যে বাক্‌পটুতা, যে উদ্যোগ দেখিয়াছি তাহা আর বর্ণনীয় নহে—আমার পিসীমাতারা এখনও যখন কথা বলেন, তাঁহাদের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা, তাঁদের সুমিষ্ট-ভাষা, বর্ণনার ক্ষমতা দেখি, আর আমি বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া থাকি। এ কথা যথার্থ, ঠাকুরমা সে কালের শিক্ষিতা নারী। তিনি বাঙ্গালা ভাষায় অনেক কাব্য ও শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন—তিনি যথার্থই বুদ্ধিমতী নারী ছিলেন। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ভগিনী,—তিনি সম্পন্ন ঘরের কন্যা, তাঁরা ধনে, মানে, জ্ঞানে, কুলে, শীলে সমৃদ্ধ; ঠাকুরমার প্রত্যেক পাদক্ষেপে একটা গাম্ভীর্য্য, এবং গর্ব্বের ভাব প্রকাশ পাইত। আর ঠাকুরদাদা দরিদ্র ব্রাহ্মণ হইলেও পূর্ণ ব্রহ্মতেজ তাঁর বিশেষত্ব। উদারতা তেজস্বিতা এই তিন ভাব একত্র হইয়া তাঁহাকে প্রচণ্ড কোপন প্রকৃতি সম্পন্ন করিয়াছিল। প্রচণ্ড রাগকে তিনি দুর্ব্বলতা বলিয়া ভাবিতেন না, সেটা তাঁর পৌরুষের বিষয় তিনি মনে করিতেন। পুরাকালে আমাদের দেশে ব্রাহ্মণের যে আদর্শ ছিল, তিনি সেই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তেজ, দম্ভ, স্পর্দ্ধার পরিচয় দিতে পারিলে তিনি যেমন সন্তুষ্ট হইতেন এমন আর কিছুতেই নয়, 'শম্মা কার বশ নয়' এই তাঁর গর্ব্বের বচন ছিল। দুনিয়ার কাহাকেও তিনি ভয় করিতেন না। গ্রামের প্রচণ্ড প্রতাপশালী জমিদার মহাশয়কেও দুই কথা শুনাইয়া দিতে পারিলে তিনি বড়ই তৃপ্ত হইতেন। তিনি বিদ্যাসাগরের বন্ধু, বিদ্যাসাগরের গুণগ্রাহী ছিলেন—তাঁর ভিতরে বিদ্যাসাগরের প্রভাব প্রচুর পরিমাণে ছিল, ঐ তেজ! ঐ স্পর্দ্ধা! ঐ হৃদয়! ঐ জনহিতৈষণা; আমার পিতামহ সর্ব্বতোভাবে বিদ্যাসাগরের ছাঁচে গড়া মানুষ।

বাবা তাঁহার একমাত্র পুত্র। বাবাকে উচ্চশিক্ষা দিবার জন্য তাঁর কি আজীবনের প্রয়াস ছিল। তিনি বাবা ভূমিষ্ট হওয়া অবধি বলিতেন, 'ভিটামাটি বিক্রয় করেও আমার ছেলেকে চূড়ান্ত শিক্ষা দিব"—তিনি নিজের দারিদ্র্যকে কখনও ভয় করিতেন না। ভয় ভাবনা কাকে বলে আমার পিতামহ জানিতেন না। নির্ভীক, বীর, তেজস্বী দরিদ্র গ্রাম্য পণ্ডিত। এমন পিতা মাতার সন্তান কখন কি নির্বীর্য্য, দুর্ব্বল, হীন হওয়া সম্ভব? পিতা মাতার নিকট হইতে তিনি হৃদয় মনের বল ও বীর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। বাবার মধ্যে যাহা প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল—তাঁর অধিকাংশ ভাবই—তাঁর জনক জননীর ভিতর ছিল। বাবা ছিলেন কবি, সুলেখক, সুরসিক; এ সকল শক্তি তিনি পিতৃমাতৃকুল হইতে লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা রসগ্রাহী কাব্যানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বাগ্মী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন না বটে, কিন্তু অতিশয় সুরসিক এবং সদালাপী ছিলেন; তাঁর সেই প্রচ্ছন্ন শক্তি পুত্রের ভিতর এক মহাশক্তিরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। আমার পিতা যে উচ্চ অঙ্গের কবি ছিলেন তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ব্বাচনানুসারে যদি বিচার করিতে হয়, তাহা হইলেও কাব্যজগতে আমার পিতার আসন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—কিন্তু তাঁর আসন যে হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্রের অনেক উপরে, সে কথা বলিলে আমার পিতৃশ্লাঘী অপরাধে অপরাধিনী হইতে হইবে না। আমার পিতার কবিতা সকল

কয়জন পাঠ করিয়াছেন? যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা আমার কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন; যাহারা পাঠ করেন নাই, তাঁহারা অপরের মুখে ঝাল খাইয়া রসাস্বাদন করেন, তাঁহাদের বক্তব্যের কোন মূল্য নাই। যে সৌন্দর্য্য এবং সদাচার সৃষ্টি করিতে পারে, সেই সুকবি। আমার পিতার কবিতায় যেমন উদ্দীপনা, তেমনি সৌন্দর্য্য, তেমনি সদ্ভাব। যাহা আর বঙ্গদেশের দ্বিতীয় কবির ভিতর দেখা কঠিন, তাহা, বাবার জীবন এবং কবিতার অক্ষরে অক্ষরে মিল। কবিতা তাঁহার হৃদয়ের প্রতিধ্বনি, এ পুষ্পিত, অলীক বচন নয়; এ চয়ন-করা গাঁথা ফুলের মালা নয়; এ হৃদয়ের রক্ত হইতে সদ্যঃপ্রস্ফুটিত বিকচকুসুম, এ সত্যবস্তু, এ চিরআনন্দধারা। কি অধ্যাত্মতত্ত্ব, কি স্বদেশপ্রেম, কি জনহিতৈষণায়, কি প্রেমের কবিতায়, এমন কি সামান্য সামান্য বিষয়ে তিনি উচ্চঅঙ্গের কবিতা সকল লিখিয়া গিয়াছেন। এমন কি বিষয় আছে, যে সম্বন্ধে তিনি প্রাণস্পর্শী কবিতা সকল লিখিয়া যান নাই? "জাতিতে কৈবর্ত্ত নাম মহেশ সর্দ্দার" এবং "বিধবার ছেলে" ইহার ভিতর কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য! ঘটনা অতি তুচ্ছ, বলিবার কিছু নাই, কিন্তু কি মনোমুগ্ধকর!

এই সকল কবিতার লেখক যদি কবিশ্রেষ্ঠ না হন, তবে আর বাঙ্গালায় কবি কয়জন আছেন? নিঃসন্দেহ পিতৃদেব বাঙ্গালা দেশের একজন উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন। তিনি ত চলিয়া গেলেন; ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ভাব, হিংসা দ্বেষ আর তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না। তাঁর কবিতা সকল বাঙ্গালা ভাষার অক্ষয় রত্নভাণ্ডারে সমাদরে স্থান প্রাপ্ত হইবে। উৎসাহী ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকের উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা বলিয়া এ দেশের ছাত্রবৃন্দের পাঠ্যপুস্তকের তালিকায় এক "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" বই আর কোন কবিতা পুস্তকে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই; কিন্তু সে খানিই হইল তাঁহার কাঁচা হাতের— ১৬।১৭ বৎসরের বালকের রচনা—সেইখানি আই,এ পরীক্ষার পাঠ্য।

পিতৃদেব যে বঙ্গভাষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বক্তা ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহার তিন ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছি—চারি সহস্র লোক নিস্পন্দ ভাবে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছে; তিনি শ্রোতার চিত্ত কখন উৎসাহে পূর্ণ করিতেছেন, কখন তাহাদিগকে কাঁদাইতেছেন, কখন হাসাইতেছেন; এ কি অভিনয়! তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃস্তল হইতে প্রাণের কথা—তাঁহার ভাষা, সরল সুন্দর, তাঁহার বাণী সজীব সত্য। এ সকল বক্তৃতার প্রভাব কি প্রকার হইত তাহা বর্ণনা করা সেই আড়ম্বরশূন্য মহাপুরুষের শ্রাদ্ধবাসরে উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। প্রাণের প্রবল আবেগ ও উদ্দীপনা-তাঁহার বক্তৃতার উৎস ছিল।

লেখকরূপে গদ্য-সাহিত্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। তিনি উপন্যাস, প্রবন্ধ, ধর্ম্মোপদেশ বিস্তর রাখিয়া গিয়াছেন। সে সকলের মূল্য নিরূপণ করিবার ভার পাঠকসাধারণের উপর। তাঁহার রচনা সারগর্ভ, সরস, সরল, প্রাণস্পর্শী। তিনি জীবনচরিত লিখিয়াছেন, উপন্যাস লিখিয়াছেন; সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কি গদ্য-সাহিত্যে, কি কাব্যজগতে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে।

কিন্তু এ সকল শক্তি তাঁহার জন্মগত অধিকার—তাঁহার যে সকল গুণ নিজস্ব ছিল, তাহার উল্লেখ করিব। কবি হিসাবে পিতা অদ্বিতীয় কবি নন। ঔপন্যাসিক হিসাবে তিনি অদ্বিতীয় নহেন, অদ্বিতীয় বক্তা নাও হইতে পারেন; কিন্তু হৃদয়ের বিশালতায়, ঐকান্তিকতায় তিনি কোন মহাপুরুষ অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। এমন কি যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয়ের বিশালতার কথা বলিতে গিয়া পিতা আমার তন্ময় হইয়া যাইতেন, সেই বিদ্যাসাগরের মতই তাঁর হৃদয়টা বিশাল ছিল। পরকে তেমনি করিয়াই ভালবাসিতেন, তেমনি অর্থব্যয়ে মুক্তহস্ত, তেমনি নির্লোভ, তেমনি নির্ভীক, তেমনি সাহসী, তেমনি পরহিতৈষী;—উপরন্তু এমন বিনয়, এমন করিয়া গুণীর চরণে মস্তক লুণ্ঠিত করা কেহ কি দেখিয়াছে? জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার মুখের ভাষাই ছিল—"এই অধম, এই অপদার্থ লোককে কেন মানুষ এত ভালবাসে?" আমার মাতা তাঁর মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বেও তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছেন যে, "তুমি বালক বৃদ্ধ যুবা সকলের কাছে কেবল বল,—'এই অধম! এই হতভাগা!' সকলে এতে মনে কর্‌বে না জানি তুমি কি মহাপাপী! এমন করে বলা আমার সহ্য হয় না।" তিরস্কৃত হয়ে দীন ভাবে বল্‌লেন,—"তুমি রাগ কর্‌ছ? আচ্ছা, তবে আমি আর বল্‌ব না।" সে দিন বাবার বিলাতের ডায়েরি পড়্‌তে পড়্‌তে এক জায়গায় দেখেছি—বিলাত যাবার সময় জাহাজে একদিন দুর্গামোহন বাবু তাঁকে বলেছেন,—"ওহে, তুমি রাত দিন নিজেকে 'আমি পাপী! আমি অধম!' বল কেন? কই, আমরা ত কখনও শুনি নাই যে, তুমি চুরি বাট্‌পাড়ি করেছ—ও রকম কথা বল কেন?"—বাবার আজীবন এই বুলি ছিল। এ তাঁর মুখের বুলি নয়, তাঁর অন্তরের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি আদর্শের অনেক নীচে; যা হওয়া উচিত ছিল, তা হইতে পারেন নাই। এই গুণটি সম্পূর্ণ আমার বাবার বিশেষত্ব; তাঁর পিতা মাতার ঠিক ইহার বিপরীত ভাব ছিল। বাবার মস্তক গুণীর চরণে লুণ্ঠিত; তাঁহারা সহজে কাহারও প্রশংসা করিতে চাহিতেন না। বাবা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করাতে তাঁহাদের কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। ঠাকুরদাদা ছেলের প্রাণ সংহার করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছিলেন। ঠাকুরমা কখন কখন অজস্র গালাগালি দিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর ঠাকুরদাদা এজীবনে আর পুত্রের নাম মুখে উচ্চারণ করেন নাই;—"সে পাজিটা!" "সে হতভাগাটা!" ইহাই ছিল বাবার আদরের নাম; বাবা সেই ডাকেই কৃতার্থ হইতেন। কিন্তু অপরে বাবার নামে কিছুমাত্র শ্লেষোক্তি করিলে আর অব্যাহতি ছিল না। তিনি নিজে তাঁহার পুত্রকে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতেন, আর কাহারো কিছু বলিবার অধিকার ছিল না।

বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্; না, প্রকৃত ধর্ম্মভাব বিনয় দেয়। ধর্ম্মই বাবাকে বিনয়ে ভূষিত করিয়াছিল। বাবার বিনয়ের চরম দৃষ্টান্ত দিব? আমরা তিনটি বোন ছিলাম, কিন্তু একমাত্র ভাই। বাবা চিরদিন মেয়ে তিনটিকে আদর দিয়া আসিয়াছেন, এবং পুত্র পুরুষ জাতীয় জীব, এই অপরাধে বোধ হয় কোন

দিনই বাবার আদর পায় নাই। বাবা মৃত্যুশয্যার সে ক্ষোভও আর রাখিয়া যান নাই। পুত্রের বিবিধ সদ্গুণ ও তাঁর নীরব সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া, একদিন কাছে ডেকে বলেন,—"বাবা, তুমি আমার সবই কর্‌ছ, কত সেবা কর্‌ছ; তোমার এত গুণ আমি তা কখনও স্বীকার করি নাই, দেখি নাই, অবজ্ঞা করে'ছি; আমি চিরদিন তোমায় খর্ব্ব করে রেখেছি,—আমার এই অপরাধ বাবা, তুমি ক্ষমা কর।" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমার মা তিরস্কার করে বল্লেন,—"বাপ হয়ে ছেলের কাছে ক্ষমা চেয়ে ওর অকল্যাণ কর্‌ছ কেন? ওর সর্ব্বনাশ কর্‌ছ কেন? ও কথা মুখে আন্‌তে আছে?" বাবার কাছে হীন কেহ ছিল না, হেয় কেউ নয়।

আর কি দেখেছি?—বাবার দুর্জ্জয় মনের বল! বাবা বিলাত গমনের পূর্ব্বে বড় এলোমেলো ছিলেন, শৃঙ্খলা পারিপাট্যের প্রতি একেবারে দৃষ্টি ছিল না। ইংলণ্ডে গিয়া ইংরাজজাতির নিয়ম নিষ্ঠা এবং পারিবারিক ব্যবস্থা তাঁর অত্যন্ত ভাল লাগে। তাঁর দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে, ইংরাজজাতি এই গুণেই এত বড় এবং এরূপ কর্ম্মকুশল। তখনই সংকল্প করিলেন এই গুণটি আয়ত্ত করিতে হইবে। অমনি পরিচ্ছন্ন নিয়ম নিষ্ঠা সময়জ্ঞান গঠন করিয়া লইলেন। আর এক তিল ব্যত্যয় নাই, কোন কাজে ভুল নাই, জীবন যন্ত্রের মত নিয়মাধীন করিয়া লইলেন। ঘড়ীর ভুল হইত কিন্তু বাবার এক মিনিট ভুল হইত না। যে কথা সেই কাজ—চিঠি যে লিখিবে সেই ঠিক্ সময়ে উত্তর পাইবে। বাবা ছয় মাস মাত্র বিলাতে ছিলেন তাহার প্রভাব ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত—জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত জীবনে স্থায়ী হইয়াছিল। লোকে দশ বৎসর বিলাত বাস করিয়াও ইংরাজ জাতির নিয়মনিষ্ঠা, কার্য্য-তৎপরতা শিক্ষা করিতে পারে না। বাবা যেন সিদ্ধ পুরুষ! যে বাবার উপর নির্ভর করিত তারই আশা পূর্ণ করিতেন। মনের উপর তাঁর অসীম কর্ত্তৃত্ব ছিল। তিনি ভাবিতেন মনকে যা বলি মন তাহা করিবে না? তিনি কথায় কথায় মনের কাণ মলিয়া দিবার কথা বলিতেন। তাঁর দুর্জ্জয় প্রতিভা, দুর্দ্দম সাহস। মিন্‌মিনে কথা—ভিজে ভিজে কাজ এ সকল তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ছিল; তিনি অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা লইয়া একেবারে অগ্নিময় হইয়াছিলেন।

কি দুরন্ত শ্রমই তিনি করিয়াছেন! তাহা অবর্ণনীয়, মানুষের রক্ত মাংসের দেহে তাহা সহ্য হয় না। আমি নিজে তাঁহার কার্য্য এখন স্মরণ করিলে শিহরিয়া উঠি। এ কি মানুষের বল! না ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির প্রচেষ্টা; আমি দেখেছি, তিনি সমস্ত রাত্রি একমনে খস্‌খস্ করিয়া লিখিয়া চলিয়াছেন। ঘুমাইতে ঘুমাইতে রাত ১২টার সময় চাহিয়া দেখি বাবার কলম রেলগাড়ীর মত ছুটিয়াছে—কেবল খস্‌খস্ খস্ শব্দ, আর মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বামহস্তে কাগজ সরাইতেছেন। রাত ২টার চাহিয়া দেখি, তখনও কলম দৌড়িতেছে, ৪টায় লেখা শেষ ও শয়ন। আবার ৫॥০ উঠিয়া স্নান উপাসনা করিয়া বাহিরের কাজে ছুটিলেন। এমন ত সর্ব্বদাই হইত—প্রাতে উপাসনা, দ্বিপ্রহরে আলোচনা, সন্ধ্যায় হয় ত ২।৩ ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতা। তাহাতে এত পরিশ্রম হইত যে, স্বর ভঙ্গ হইত, গলা বসিয়া যাইত, পায়ে বেদনা হইত; আমার প্রাণে যে কে সেই! আমরা যদি এত পরিশ্রম করিতে বারণ করিতাম—বলিতেন, দুই খানি কাগজ বাহির করিতে হইবে, লেখক নাই। ছাপাখানায় যাইতে হইবে, প্রুফ দেখিতে হইবে, তাড়া দিয়া কাগজ বাহির করিতে হইবে; যত বক্তৃতা আলোচনা সবই করিতে হইবে মানুষ একজন, তাঁহার না আছে আহার, না আছে নিদ্রা। দেশে দেশে প্রচার করিবেন, তা হয়, তৃতীয় শ্রেণী, না হয় মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীতে গমন। ভিড়ের মধ্যে বসিয়া থাকা, না শয়ন, না আহার, না বিশ্রাম; ট্রেণ হইতে নামিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া হয় উপাসনা করা, না হয় বক্তৃতা করা। বিচিত্র আর কি, যে তিনি সর্ব্বদাই কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হইবেন। মানুষের দেহে এত অত্যাচার, কত আর সয়? কিন্তু এ যে তাঁর জীবনের ব্রত। যৌবনের প্রারম্ভে লিখিয়াছিলেন,—

আমি বড় দুঃখী তাতে দুঃখ নাই,
পরে সুখী করে সুখী হতে চাই;
নিজে ত কাঁদিব—কিন্তু মুছাইব
অপরের আঁখি এই ভিক্ষা চাই।
সত্য—ধন মান চাহে না এ প্রাণ,
যদি কাজে আসি তবে বেঁচে যাই,

* * *

খাটিতে বাঁচিব, খাটিয়া মরিব—
এই বড় আশা পূর্ণ কর তাই।

খাটিবার জন্য বেঁচে ছিলেন, খাটিয়াই মারা গেলেন, তাতে তাঁর প্রাণের আশা পূর্ণ হইয়াছে। বাবা যখন যে কাজে হাত দিতেন, দেহ মনঃপ্রাণ দিয়া লাগিয়া যাইতেন। যেন সেই কাজটি ছাড়া পৃথিবীতে তাঁর আর কিছু করিবার নাই। সিটি কলেজ যখন বসে, তখন মৃগের মত তাঁর দৌড়াদৌড়ির কথা মনে আছে—ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয় যখন প্রতিষ্ঠা করেন, তখন আহার নিদ্রার সময় ছিল না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠান সকল বাবার কীর্ত্তিস্তম্ভের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। আজ একবার ভাবিয়া দেখি ক্ষীণদেহ, অনাহারক্লিষ্ট মানুষের এই উদ্যোগ!!

বিগত কয়েক বৎসর রোগশয্যায় বাবার চূড়ান্ত সেবা, চূড়ান্ত যত্ন হইয়াছে। যখন খাটিতেন, তখন উদরে অন্ন ছিল না, শয্যা ছিল না, চক্ষে নিদ্রা ছিল না, বিশ্রাম ছিল না, ক্লান্তি ছিল না, এত শ্রমের শক্তি বিধাতা তাঁহাকে দিয়াছিলেন!—আর প্রাণের অফুরন্ত প্রেম তাঁহাকে শ্রমের ভিতর পরমানন্দ আনিয়া দিয়াছিল। প্রেমিক ভিন্ন যথার্থ কর্ম্মী কে হইতে পারে? এমন করিয়া ভালবাসিতে কয়জন পারে? মৃত্যুর দিনও সে প্রেমে ভাঁটা পড়ে নাই—কর্ম্মশক্তি বহুদিন পূর্ব্বে গিয়াছিল, মস্তিষ্কের শক্তি হ্রাস হইয়া গিয়াছিল, কিছু করিতে পারেন নাই; কেবল পড়িয়া পড়িয়া ভালবাসিয়াছেন, চক্ষের জল ফেলিয়াছেন, সকলকে বুকে ধরিয়াছেন; কোন response (সংজ্ঞা) যখন ছিল না, প্রেমের ডাকে মুমূর্ষু কর্ণ সাড়া দিয়াছে, যতক্ষণ হৃৎপিণ্ড আপনার কাজ করিয়াছে, বাবার প্রেমিক হৃদয় প্রেমের ডাকে সাড়া দিয়াছে। সন্তানমাত্রই পিতার আদরের—কিন্তু এই অধম কন্যা তাঁর কি

আদর সম্ভোগ করিয়াছে, তাহা কস্মিন্ কালে এ দুর্ভাগ্য দেশের কোন কন্যার ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। শৈশবে একটি প্রার্থনা আমার অপূর্ণ থাকে নাই, একটিও সম্ভাবের প্রকাশ আমার উপেক্ষিত হয় নাই। নারীর কত বড় গৌরব বাবাই তাহা শিখাইয়াছেন; নারীর অধিকার কি অসীম পিতাই তাহা দেখাইয়াছেন। কিসে আমার মন বড় হবে, কিসে আমার চিন্তাশক্তি বাড়িবে, এই বাবার নিত্য চেষ্টা ছিল। "মন বাড়্তে দাও, মন বাড়্তে দাও", এই তাঁর কথাই ছিল।

বাবা গো! আজ তুমি কোন্ লোকে? বাড়্তে দিয়াছিলে তুমি আমার মনকে, আর আমার জ্ঞান বুদ্ধিকে। বাবা, তোমার মনের মত বাড়িল কই? এত বাড়াইতে আমাকে যে, আমি দু লাইন লিখিলে তুমি দশ হাত বুক করিয়া বলিতে "মেয়ে বাপের চেয়ে লেখে ভাল!" বাবা, তুমি কোথায় আর তোমার সন্তানেরা কত নীচে! আজ বেদের ঐ মন্ত্রের মত বলি,—

"তোমার যে আত্মা দূরে দূরতম দেশে আজ চলিয়া গিয়াছে, আমরা তাহাকে পুনরাহ্বান করিতেছি, তাহা আমাদিগের মধ্যে বাস করুক ও জীবিত থাকুক।"

পিতঃ, তুমি যে লোকেই গিয়া থাক, এসো, আমাদের ভিতর আবার জীবিত হও; এস বাবা, আমাদের মনের ভিতর, আমাদের জীবনের ভিতর, তুমি আমাদের ভিতর ফুটে উঠ, যেন আমাদের তোমার মত একটু দেখায়!! তুমি যে লোকেই থাক তোমার অপার স্বর্গ নিশ্চিত! —"তোমার দুঃখিনী হেম।"

(শ্রাদ্ধবাসরে পুত্র শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক পঠিত)

আজ পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমপিতা পরমেশ্বরের চরণে ভক্তি ভরে বারবার প্রণত হই। তিনিই কৃপা করিয়া আজ এই শুভদিন আনয়ন করিয়াছেন—আজ ইহলোকবাসী পরলোকবাসী সকল সাধু সাধ্বী অমর আত্মাগণের সহিত অধ্যাত্ম-যোগে মিলিত হইয়া, অভিনব এই পুণ্য-তীর্থে আমরা সমাগত। আজ সকলের অন্তর আত্মা আনন্দে উদ্ভাসিত—শোক দুঃখ বিলাপের ধ্বনি আর শ্রুত হইতেছে না—কেবলি আনন্দ—প্রেম, পুণ্য, শান্তির বারি উৎসারিত। আজ শত শত নরনারী এই পুণ্য-নীরে স্নাত হইয়া ধন্য কৃতার্থমনা হইবেন; এই আশা লইয়া আমরা প্রভুর দ্বারে দণ্ডায়মান। আজ সত্য সত্য তাঁর শান্তিবারি সকলের মস্তকে বর্ষিত হইতেছে, আজ বিশ্বাস নয়নে তাঁহার কৃপা অবলোকন করিতেছি। আজ আমরা ধন্য হই, বিধাতা এই আশীর্ব্বাদ করুন।

আজ দিব্যচক্ষে দেখিতেছি পিতৃদেব সত্যই ভাগবতী তনু লাভ করিয়া, বিজয় গৌরবে সাধু ভক্ত দলে, যাঁহাদের প্রতি তিনি কত না ভক্তি অর্পণ করিতেন, তাঁহাদের সহিত সমাসীন। তাঁহারা তাঁর গলে জয়মাল্যে বিভূষিত করিয়া কত না সাধুবাদ করিতেছেন।

"ধন্য জন্ম বঙ্গভূমে হ'লে ভক্ত বীর,
তোমার সাধনা সত্য দেখালে সুধীর!"

ভক্ত আজ বিশ্ব-বিজয়ী, এমন স্বার্থত্যাগী, আত্মবিলোপকারী, পরোপকারী প্রকৃত ধর্ম্মপ্রাণ আর কয়জন আছেন? তাঁহার বাহিরে দেখান ত কিছুই ছিল না, সরল সাদা প্রাণে সকলের কাছে নিজের দোষ ক্রটি স্বীকার করিয়া—শিশুর মত আপনার প্রকৃত স্বরূপ তিনি দেহে থাকিতে প্রকাশ করিতেন। আজ বিদেহী হয়েও সেই সরলতা সেই অকিঞ্চন ভাব, তাই ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে লয়ে অভিনন্দিত করিতেছেন, তাঁহাকে লয়ে আজ ভক্তরা ব্রহ্মানন্দে মাতোয়ারা হইয়াছেন। ব্রহ্মের মহিমা গান করিয়া আজ সত্যই সকলে ধন্য হইতেছেন। সকলেই বলিতেছেন—'গাও'রে আনন্দে সবে জয় ব্রহ্ম জয়।" তবে আমরাও আজ এস সেই ভক্তদলের সহিত মিলিত হই, এর চাইতে মানব জীবনের পরম সৌভাগ্য আর কি আছে; ব্রহ্মের জয় ঘোষণা বিনা আমরাও আর কি করিতে পারি?

পিতৃদেব যৌবনের প্রাক্কালে ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, দেশের দুর্দ্দশা ও জাতীয় দুর্গতি দেখিয়া যৌবনেই তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, এবং নবীন বয়সেই স্বীয় আত্মাকে দেশের সেবায় উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন, আজীবন একই ভাবে, প্রাণের সেই ঐকান্তিক নিষ্ঠা ভক্তির সহিত জনসমাজের সেবা নানা ভাবে করিয়াছেন, তিনি সুকবি ও সুলেখক ছিলেন, তাঁহার লিখিত বাক্যের মধ্যে কতখানি মহাপ্রাণের পরিচয় পাওয়া যাইত, এখন আমরা তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে অসমর্থ। তিনি সত্য ন্যায় ও পবিত্রতার একনিষ্ঠ পূজক ছিলেন, যেখানে অসত্যের গন্ধ তাহার ত্রিসীমায় যাইতে পারিতেন না, জীবনে কখন অন্যায়ের প্রশ্রয় দেন নাই, পবিত্রতার ত কথাই নাই, প্রকৃতই তাঁহার কাছে গেলে পুণ্যের সুগন্ধ পাওয়া যাইত। তিনি এই জন্য শত নরনারীকে মন্ত্র মুগ্ধ করিতেন। আজ তাঁহার দেহের অবসান হইয়া গিয়াছে, চিতানলে তাঁহার পূতদেহ ভস্মীভূত হইয়াছে কিন্তু তাহার পুণ্যময় জীবনের প্রভাব এখন ও যায় নাই। প্রতিদিন নূতন করে তাঁহার অমর আত্মার প্রভাব লাভ করিতেছি। কে বলে তিনি মৃত হইয়াছেন? আজ যে তিনি নূতন করে মনোমোহন মূর্ত্তিতে আমাদের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছেন, এখন তাঁহার আশা ও আনন্দের পরিসীমা নাই, তিনি আমাদের সকলকে সেই লক্ষ্য উদ্দেশ্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "সন্তান! লক্ষ্যভ্রষ্ট হইও না, ব্রহ্মের শরণাপন্ন হও, তাঁকে জীবনে লাভ কর; তোমরা ধন্য ও কৃতার্থ হইবে।"

আমরা বার্দ্ধক্যেও তাঁহার যে উৎসাহ ও উদ্যম দেখিয়াছি, তাহা অবর্ণনীয়, জ্বলন্ত গোলার ন্যায় তিনি যে সকল ভাবা উদগীরণ করিতেন, তাহা তাঁহার শত শত উপদেশমালার মধ্যে জীবন্তরূপে প্রতিফলিত রহিয়াছে! তখনও শত শত নরনারীর প্রাণকে অনুপ্রাণিত করিত, এখন চিরদিন করিবে, তাহা ধর্ম্মজগতে অক্ষয় সম্পত্তি। তাঁহার পুণ্যময় জীবনের প্রতিধ্বনী—প্রতি কবিতায়, প্রতি গদ্য রচনায় উছলিত হইয়া রহিয়াছে, সকল লেখাই, তাঁহার

অপূর্ব্ব জীবনকাহিনী। তাহারি মধ্যে তাঁহাকে আমরা শ্রেষ্ঠ পুরুষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি; তাঁহার হৃদয়ের বিশালতা অনুভব করিয়া আমরা এখন অবাক্ হইতেছি, তিনি ধনী দরিদ্র, পাপী পুণ্যবান, জ্ঞানী মূর্খ সকলের মধ্যে মানুষের গুণটিকে ধরিতে পারিতেন। আমরা তাঁহার মুখে কখন পরনিন্দা করিতে শ্রবণ করি নাই; এজন্য তিনি সকলকেই সমভাবে আপনাকে ভুলিয়া আলিঙ্গন করিতে পারিতেন। তাঁহার স্বার্থনাশ ও বৈরাগ্যের ভাব প্রতি ব্রাহ্মসেবকের স্পৃহনীয়।

তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ কিরূপ উচ্চ ও মহৎ ছিল, তাহা তিনি ব্রাহ্মসাধনাশ্রমের উদ্দেশ্যের মধ্যে এক জায়গায় লিখিয়া গিয়াছেন—তাহা এই:—"ব্রাহ্ম-সমাজের আদর্শ অতি উচ্চ; ইহা উদার, আধ্যাত্মিক ও বিশ্বজনীন; ইহা জ্ঞান ও প্রেমকে, প্রীতি ও প্রিয়কার্য্যকে, স্বাধীনতা ও সাধুভক্তিকে, বৈরাগ্য ও গৃহধর্ম্মকে, নরপ্রেম ও পবিত্রতাকে একত্রে সন্নিবিষ্ট করিবে।" এ কি উচ্চ ও মহৎ ভাব তাই ত স্বীয় জীবনে সত্যই ত তাহার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন। কি তাঁহার উদার বিশ্বজনীন ভাব, কি অন্তরে দিব্য জ্ঞান প্রেমের সমাবেশ; পরমেশ্বরকে কত না প্রীতি করিতেন, এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য কত না প্রাণ ব্যাকুল হইয়া নানা কাজের সূচনা করিতে! কি স্বাধীনতা-প্রিয় মানুষ, কিবা প্রাণে সাধুভক্তি, সাধু ভক্তদের স্মরণ না করে যেন জল গ্রহণ করিতেন না। আপাদমস্তক সাধুতাতে মণ্ডিত ছিল, কে এমন বৈরাগ্য ত্যাগী-পুরুষ দেখিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে প্রভূত যশঃ প্রতিপত্তি ও খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারিতেন, বহু অর্থশালীও হইতেন; কিন্তু আজ যে গুণ গরিমায় তিনি সকলের কাছে পূজ্য তাহা আর কি কেহ দেখিতে পাইতেন? তাঁহার গৃহধর্ম এক তপস্যার ক্ষেত্র ছিল, এই গৃহের পবিত্রতা রক্ষার জন্য তিনি আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন। সকলের মধুস্বরূপ ধর্ম্মকে প্রাণে দেখাইয়া দিয়াছেন। তাহার "গৃহধর্ম্ম" গ্রন্থখানি প্রত্যেক ব্রাহ্মের প্রাণের সামগ্রী; এখন সময় আসিয়াছে এই গৃহধর্ম্ম আমাদের সকলকে সাধনের সহায়রূপে অবলম্বন করিতে হইবে, এই ভক্তের আদেশ ও উপদেশ।

পিতৃদেব তাঁহার আত্মচরিতে বলিয়াছেন। তাঁহার জীবনে বড়ই সংগ্রাম ছিল, নানা প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে তাঁহাকে উঠিয়া পড়িয়া খাটিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছিল, শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এক মাত্র প্রার্থনার বলে, তিনি জগতের কাছে দুর্জ্জয় বলের সঙ্গে দাঁড়াইয়াছিলেন, দেবতা সত্যই তাঁহাকে বরণ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার পরম ভক্ত সেবক ছিলেন। এমন কর্ম্মযোগী কি আর দেখিব? পিতার সুদীর্ঘ জীবনে কি কার্য্যকুশলতা, কি কর্ত্তব্য কর্ম্মে দৃঢ়তা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। তিনি যে কার্য্যটি করিতেন, সমগ্র প্রাণ মনের সহিত করিতেন, কাহার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেন না। এক সময় দিবারাত্রি সমভাবে খাটিতে পারিতেন, যেন বিশ্রামের সুখ কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না। ব্রাহ্মসমাজের চিন্তা করিতে করিতে দেখিয়াছি, সুখশয্যা তাঁর কণ্টক শয্যায় পরিণত হইত। এমন প্রেমিক হৃদয় কি দেখিব? তিনি যে কত পরিবারের অভিভাবক স্বরূপ ছিলেন, কাহারও দুঃখের কথা শুনিলে ঝর ঝর ধারে অশ্রু বিগলিত হইত। এমন ব্যথার ব্যথী, দুখের দুঃখী আর কি আমরা দেখিব? তিনি ত সত্যই বলিয়াছিলেন।

"আমি বড় দুঃখী তাহে দুঃখ নাই,
পরে সুখী করে সুখী হতে চাই;
নিজে ত কাঁদিব কিন্তু মুছাইব,
অপরের আঁখি এই ভিক্ষা চাই।
সত্য।—ধন মান, চাহে না এ প্রাণ
যদি কাজে আসি তবে বেঁচে যাই;
বহুকষ্টে পূর্ণ আমার অন্তর,
এই আশীর্ব্বাদ করহে ঈশ্বর!
খাটিতে বাঁচিব খাটিয়া মরিব,
এই বড় আশা, পূর্ণ কর তাই।"

বিধাতা তাঁহার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। সত্যসত্যই খাটিতে খাটিতে সে জীবনের অবসান হইয়াছে। যে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, সে ব্যাধিতেও বহুদিন ধরিয়া জনসমাজের ও ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছেন, শেষ জীবনে যে দুবৎসর একেবারে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাও "কিছুই করিতে পারিতেছি না", বলিয়া অনেক সময় দুঃখ প্রকাশ করিতেন এবং প্রভুর চরণে পড়িয়া দিবানিশি প্রার্থনা করিতেন, "যদি হতভাগাকে এখানে রাখিতে চাও তবে শক্তি দাও, বল দাও যেন তোমার কাজ করিতে পারি, তোমার নাম করতে করতে ভবপারে যেতে পারি।" তাইত হইল; অনেক দিন হইতে, এই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, তাঁহার মস্তিষ্কের অনেক দিন হইতে দুর্ব্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাঁহার ভুল ভ্রান্তি খুবই বাড়িয়া চলিয়াছিল; সকল কাজ কর্ম্ম হইতে অবসর নিয়াও দীর্ঘকাল রোগে পড়িয়া পড়িয়া মাথার মধ্যে কি এক প্রকার যন্ত্রণা অনুভব করিতেন। পরে কবিরাজী এক তৈল ব্যবহার করিয়া ইদানীং মাথার অবস্থা একটু ভাল হইয়াছিল, দেহের অপূর্ব্ব কান্তি, সদানন্দ ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, সদা শিশুর মত প্রফুল্লমুখে থাকিতেন দেখিয়া আমরা সকলেই আশা করিতেছিলাম, এখনও তিনি আর কিছুকাল আমাদের মধ্যে থাকিবেন। সত্যই তাঁহার বধূমাতাকে বলিতেন, "আমি তোমার কোলের শিশু হইয়াছি," আত্মীয় স্বজন সকলেই এই সাধু পুরুষের যেরূপ অক্লান্ত সেবা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রসংশনীয়। এত ঘন ঘন কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াও যে এতদিন জীবিত ছিলেন, এ কেবল অবিশ্রান্ত সেবার গুণে, এটুকু সত্যের অনুরোধে না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না।

অবশেষে গত সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম হইতে তিনি ক্রমশঃ অত্যন্ত দুর্ব্বল ও ক্ষীণ হইয়া পড়িতে লাগিলেন, সেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা, সকল কাজেই ব্যস্ততা,—পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে একটি কাজের পর আর একটি কাজের যোজনা করা, যাহা তাঁহার অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল, তাহা সব চলিয়া গিয়াছিল; স্থির শান্ত দান্ত

হয়ে শেষের দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। একদিন মাত্র ব'লয়াছিলেন, "আমি আর কি করিব, এখন তাঁহার নাম করা ভিন্ন আর ত কোন উপায় নাই," এই নাম সাধনকে প্রাণে ধারণ করিয়াছিলেন, সংসারের সকল কথা একে একে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর হঠাৎ তাঁহার শ্বাস হয়। তিনি বেশ বুঝিলেন, এই শেষ উপসর্গ—গৃহের সকলকে বলিলেন—"এবার আমি বুঝি আর বাঁচি না।" আপনার স্নেহের নাতনীকে, সঙ্গীত করিতে বলিলেন, তখন শ্বাসের কষ্ট বেশ হইতেছিল, দুই তিনটি সঙ্গীতের পর বলিলেন, "এখন একটু ভাল বোধ হচ্ছে।" সেদিনকার রাত এক প্রকার কাটিল। পরদিন রবিবার বৈকালে আবার একটু একটু শ্বাসের ভাব দেখা দিল, সন্ধ্যার সময় পূজনীয় জ্যাঠামহাশয় (নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়) ও পূজনীয় হেরম্ববাবু প্রভৃতি কেহ কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, হাস্যমুখে তাঁহাদের সকলকেই প্রীতি সম্ভাষণ ও কনিষ্ঠদের কত স্নেহ আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, সেদিন রাত্রে অস্থিরতা বৃদ্ধি হইল; "বুক ব্যথা করচে", বলিলেন, তাঁহার রোগের শান্তির জন্য ছোট মাতাঠাকুরাণী কত না চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বিশেষ কিছুই উপশম হইল না। প্রাতে ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয় আসিলেন, তিনি ঔষধও দিলেন, কিন্তু বিশেষ কিছু হইল না। সোমবার বৈকাল হইতে শ্বাসের কষ্ট অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল, কিন্তু তখন তাঁহার অস্থিরতা বিশেষ কিছুই নাই। বাড়ীর মেয়েরা ডাক্তার আনিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। রাত্রি ৯টার সময় নিকটে ডাক্তার তুলসীচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ছিলেন, খবর দেওয়াতে আসিলেন, তখন নাড়ীর অবস্থা ভালই বলিলেন; কিন্তু ১১টার সময় আবার আসিয়া দেখিয়া বলিলেন, "হাঁ, এখন অবস্থা ভাল বোধ হচ্চে না"। তিনি তেজস্কর ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। ক্রমেই অবস্থা খারাপ বোধ হইতে লাগিল; বামহস্ত দিয়া আমার ছোটমাতার হস্ত ও ডাইন হস্ত দিয়া আমার স্ত্রীর হস্ত ধরিয়া উভয় হস্ত মিলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন আমার জননী ও স্ত্রী ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন; সেই রাত্রে বাড়ী শুদ্ধ সকলে তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিলাম, তাঁহার সেই প্রশান্ত ভাব কিছুতেই বিচলিত হলনা। রাত্রি ১½ ঘটিকার সময় আবার তুলসী ডাক্তার আসিলেন, তখন অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতেছে বলিলেন, তবে রাত্রি কাটিয়া যাবে বলিয়া চলিয়া গেলেন। সেই শেষ রাত্রেই কাশীবাবুকে খবর দিবার জন্য লোক পাঠাইলাম, প্রত্যুষেই শ্রদ্ধেয় কাশীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় সস্ত্রীক আসিলেন, তখনও দেখিয়া হাসিতেছেন; প্রাতে উপাসনা হবে কি না বলাতে আমার দিকে অঙ্গুলি দিয়া বলিয়া দিলেন, করিতে বল, কাশী বাবুই সংক্ষেপে ব্রহ্মোপাসনা করিলেন ভক্তের মুখে আনন্দের রেখা প্রকাশ পাইল, তখন প্রতি মুহূর্ত্তে শ্বাস চলিতেছে; ৯টা ১০টা অবধি মঙ্গলবার মহাযাত্রার দিনে হাসি মুখে সকলকে বিদায় দিয়াছেন। আমাদের প্রিয় ভাই হেমচন্দ্র অনেকদিন হইতে শয্যাগত ছিলেন, সেই দিন অশুভ সংবাদ পাইয়া অতি কষ্টে তাঁহাকে দর্শন করিতে এখানে আসিলেন। তিনি তাঁহার ধর্ম্ম পিতার মহাপ্রয়াণের ক্ষণ নিকটবর্ত্তী দেখিয়া আকুল ভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পূজ্যপাদ পিতৃদেব যেন মহাধ্যানে সমাধিস্থ হইয়াছেন; কিছুতেই মুখে কোন ভাবের পরিবর্ত্তন হইল না। তিনি স্থির অবিচলিত থাকিয়া মস্তকে হস্ত দিয়া স্নেহাশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন সকলের প্রাণে কি স্বর্গীয় ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা ভাষায় লিখিতে অসমর্থ। সেই সাধুপুরুষ অন্তরে 'ওঁ ব্রহ্ম' নাম জপ করিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে ১২টার মধ্যে গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া গেল, আমি আকুল প্রাণে তাঁহার স্বরচিত ব্রহ্ম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলাম। আর তিনি গভীর হইতে গভীরতম ভাবে নাম সাগরে নিমগ্ন হইলেন; ডাকিলে চক্ষু খুলিবার চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না; বেদানার রস, কখন বা সুশীতল জল একটু একটু ভিজা নেকড়ার দ্বারা মুখের মধ্যে দেওয়া হইতেছিল; কেবল তিনি ধীরে ধীরে পান করিতে ছিলেন। অসংখ্য নরনারীর মধ্যে এইরূপ ধ্যান স্তিমিত লোচনে থাকিবার পর ক্রমেই বেলা পড়িয়া যাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ-দীপ ও নির্ব্বাণ হইয়া আসিতে লাগিল, সকলে বলিয়া উঠিলেন, "এবার শেষ হয়ে এল"; তখন প্রায় ২টা ৩৭ মিনিট হইবে। আমি চরণ পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলাম; ঘন ঘন ব্রহ্মনাম বন্ধুরা করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য, তিনি 'ও ওঁব্রহ্ম' বলিয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। যাঁহারা খুব নিকটে বসিয়া ছিলেন, তাঁহারাই কেবল সে নামের ধ্বনি শুনিয়া ধন্য হইলেন, আমিও কেবল মুখ নড়িতে দেখিলাম। তখন তিনিও সঙ্গে সঙ্গে ভাগবতী তনু লাভ করিলেন; এই গৃহ উজ্জ্বল করিয়া প্রেম-পুণ্য-শান্তির অপূর্ব্ব প্রতিমূর্ত্তি হয়ে আমাদের সম্মুখে পবিত্রতার আলোক বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন। আমরা শোক করিবার আর অবসর পাইলাম না। এই তো তাঁহার মহাপ্রস্থানের বিবরণ, তাঁহার জীবনের কথা এখন বন্ধুরা কতভাবে কত বলিতেছেন। আর কত বলিবেন, এখন তো সে সকল বলিবার সময় নয়! কেবল একটি মাত্র কথা বলিয়া পিতৃদেবের তিরোধানের কথা শেষ করি।

আজ সকলে আসুন এই পিতৃপূজার মহাযজ্ঞে আমরা যে সকলেই সমাগত, আমি তো আজ একাকী পিতার গৌরবে গৌরবান্বিত নই; আজ যে দেখিতেছি, তাঁহার শত শত পুত্র কন্যা তাঁহার পুণ্যস্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাঁরই উদ্দেশে প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতেছেন। আজ পিতার সেই অমোঘবাণী সকলের অন্তরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

"প্রাণ ব্রহ্মপদে হস্তে কার্য্য তাঁর,
এই ভাবে দিন কাটুক আমার।"

ব্রহ্মে আত্ম-সমর্পণ এই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র; সেই মন্ত্রে আজকে আমরা সকলে দীক্ষিত হই। পিতা যে আমাদের মধ্যে সঞ্জীবিত থাকিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে আজ সেই ইহ পরলোকের দেবতার মধ্য দিয়া তাঁহার অমর আত্মাকে দর্শন করি, এই তো সত্য রাজ্য, এই তো নিত্য রাজ্য, আত্মার কৈবল্যধাম, নিত্য প্রাণারাম চিদানন্দঘন দেবতাকে সত্য ভাবে সকলে বরণ করি; সত্য সনাতন পরব্রহ্মকে ভক্তিভরে বার বার প্রণাম করি, জগৎপিতা পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই; তিনি আমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ওঁ ব্রহ্মকৃপাহিকেবলম্।

ব্রাহ্মসমাজ।

শ্রাদ্ধ—গত ১৮ই আশ্বিন রবিবার প্রাতঃকালে, সাধনাশ্রমের মাসিক উৎসবের দিনে, শাস্ত্রীমহাশয়ের শ্রাদ্ধ-কার্য্য সাধনাশ্রমের পরিচারকগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। ভোর ৬॥ টার সময় আশ্রমের উপাসনালয়ে পরিচারকগণ মিলিত হইয়া কীর্ত্তন করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় সাধনাশ্রমের ও ব্রাহ্মসমাজের পরলোকগত সেবকগণের নাম স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করেন এবং শাস্ত্রীমহাশয়ের রচিত 'প্রাণভরে আজি গান কর ভবে ত্রাণ পাবে আর নাহি ভয়', এই কীর্ত্তন গাহিয়া মন্দির প্রদক্ষিণের পর সকলে মন্দিরে প্রবেশ করিলে, ৭॥ টার সময় উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস বেদী গ্রহণ করেন। সমবেত প্রার্থনার পর শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল লিখিত প্রার্থনা পাঠ করেন। সেই প্রার্থনাটি এই ;—

"হে প্রভু পরমেশ্বর, বিশ্বাস বৈরাগ্য সেবা যাঁহার সাধনার 'মটো' ছিল, সত্যনিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা, সরলতা, সংযম, ত্যাগ, প্রতিজ্ঞার বল, দৃঢ়তা, যাঁহার চরিত্রের প্রভাব ছিল, যিনি আচার্য্যরূপে—প্রচারক রূপে—কর্ম্মীরূপে নরনারীর চিত্ত মুগ্ধ করিতেন, সেই ব্রাহ্মসমাজ-প্রাণ, সাধনাশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা, আমার প্রচারক জীবনের পিতৃদেব, পূজনীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের তিরোধানে আজ শোকসন্তপ্ত চিত্তে তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। তুমি আমাদের মধ্যে বল, আশা ও শান্তি দান কর। সেই দেবাত্মার প্রিয় সাধনাশ্রমকে আশীর্ব্বাদ কর—এখানে বিশ্বাসী, ত্যাগী, প্রেমিক সেবকগণ আসিয়া আমাদিগকে সতেজ ও বলশালী করুন। "আনন্দে গাইয়ে চল, আর কিবা ভয় রে", এই কীর্ত্তন-ধ্বনির মধ্যে সেই দেবজীবন চলিয়া গিয়াছেন। হে প্রভো, তোমার অমরধামে—আনন্দলোকে তাঁহাকে মিলাইয়া রাখো। হে অন্তর্য্যামীন্, তোমার অগোচর কিছুই নাই ; ইহ সংসারে সেই দেবাত্মার একমাত্র বেদনা ছিল—তিনি ব্রাহ্মসমাজকে যে ভাবে দেখিবার জন্য উদ্গ্রীব ছিলেন, সে ভাবে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। ব্রাহ্মসমাজকে তুমি তুলিয়া ধর—ব্রাহ্মসমাজে তুমি নবজীবন আনয়ন কর। আনন্দিত হোক পরলোকবাসিগণ, ধন্য ও কৃতার্থ হই আমরা। তোমার ইচ্ছা ইহ পরলোকে পূর্ণ হউক।"

তৎপর আশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক বাবু হেমচন্দ্র সরকার এবং সেবক বাবু মথুরানাথ নন্দী প্রার্থনা করিলে, আচার্য্য প্রার্থনা করিয়া অনুষ্ঠান শেষ করেন। উদ্বোধনের পূর্ব্বে শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত "প্রভুপদ-সেবা সম আর কি সুখ আছে রে" এই কীর্ত্তনটি হয় এবং উপাসনার শেষ তাঁহার রচিত অমর কীর্ত্তন—"আনন্দে গাইয়ে চল আর কিবা ভয় রে" এই কীর্ত্তন গীত হয়।

গত ১২ অক্টোবর রবিবার, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য তাঁহার বিডনষ্ট্রীটস্থ গৃহে পূজনীয় পিতৃদেবের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন। প্রত্যূষে সাধনাশ্রম হইতে কীর্ত্তন করিতে করিতে অনেক ব্রাহ্ম শাস্ত্রীমহাশয়ের গৃহে সমাগত হন ; তৎপরে ৮ ঘটিকার সময় উপাসনা হয় ; পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনান্তে শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারী চৌধুরী, শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকারের লিখিত পিতার জীবনস্মৃতি পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রার্থনা করেন। মধ্যাহ্নে পাঠ ও ব্যাখ্যা হয় ; শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় পাঠ করেন। সায়াহ্নে শ্রীযুক্ত সুকুমার রায় চৌধুরী উপাসনা করেন।

আচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোক গমনোপলক্ষে ২৪শে আশ্বিন ১১ই অক্টোবর গিরিডি বারগাণ্ডায় শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র হোমের গৃহে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত উপাসনাতে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। গিরিডিস্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত প্রবীণ ব্রাহ্মদের প্রায় সকলেই উপাসনাতে যোগদান করিয়াছিলেন। গগণবাবু শাস্ত্রীমহাশয়ের পরলোকগত আত্মার নিকট তাঁহার প্রতি বিশেষ স্নেহ ও ভালবাসার জন্য ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে অমৃতবাবুর উপাসনা, উপদেশ ও প্রার্থনা বড়ই গভীর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

বিগত ২০এ আশ্বিন মঙ্গলবার প্রাতে বরিশালস্থ কল্যাণ-কুটিরে—শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর গৃহে, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোক গমন উপলক্ষে বিশেষ ভাবে উপাসনা হয় ; মনোমোহন বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং উপাসনায় শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত সঙ্গীত সকল গীত হয়। তাঁহার 'ধর্ম্মজীবন' হইতে "জ্ঞান ও ভক্তি" উপদেশ পাঠ করা হয়, ও তাঁহার রচিত "নমো নমস্তে ভগবান্" এই স্তোত্র সমবেত কণ্ঠে পঠিত হয়। ব্রাহ্মসমাজস্থ প্রায় ৪০ জন নরনারী এই উপাসনায় যোগদান করিয়াছিলেন।

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

আগামী ২রা নভেম্বর পূর্ব্বাহ্নে—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে। ১লা নভেম্বর অপরাহ্নে নগর সঙ্কীর্ত্তন এবং তৎপরে মন্দিরে উপাসনা হইবে। রবিবার প্রাতে ৬-৩০ ঘটিকা হইতে ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন ও তৎপরে উপাসনা ; অপরাহ্নে ৩ ঘটিকার সময় শাস্ত্রীমহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা ও ৫॥০ ঘটিকায় কীর্ত্তন এবং ৬॥০ ঘটিকায় উপাসনা হইবে। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সর্ব্বসাধারণকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজ সমূহে ও একইসময়ে পারলৌকিক উপাসনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :— শাস্ত্রীমহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে অনেক লেখা আমাদের হস্তগত হইয়াছে ; এবং আরও লেখা পাইবার আশা আছে ; সকল লেখাই ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। তঃ সঃ

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত

অসতোমা সদ্গময়,
তমসোমা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মামৃতং গময়।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪২শ ভাগ।	১৬ই কার্ত্তিক, রবিবার, ১৩২৬, ১৮৪১ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯০	অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩
১৪শ সংখ্যা।	2nd November, 1919.	প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে হৃদয়দেবতা, আজ তোমাকে কি ভাবে দেখিব? আজ তোমাকে কোন্ রূপে বরণ করিয়া লইব? আজ তুমি আমাদিগের প্রাণে ব্যথা দিয়া, আমাদিগকে কাঁদাইয়া আমাদিগকে জাগ্রত করিয়াছ; আমাদিগের অবস্থা বুঝিতে দিয়াছ; যিনি আমাদের পিতা, গুরু ও আচার্য্য ছিলেন, তিনি যখন ইহলোকে ছিলেন, তখন আমরা আপনাদের দৈন্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই; তখন তাঁহারই ধর্ম্ম ও কর্ম্মময় জীবনের সুশীতল ছায়াতলে থাকিয়া আমরা নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ ছিলাম। আজ তুমি তাঁহাকে আমাদের স্থূলচক্ষুর দৃষ্টি হইতে অপসারিত করিয়াছ; আজ তিনি আর ইহলোকে নাই; আমরা যে কত দীন, তাহা আজ বুঝিতে পারিয়াছি। তুমি দুঃখ, বেদনা ও শোকের মধ্যে আমাদিগের আত্মবোধ জাগ্রত করিয়াছ; যিনি গেলেন, তাঁহার জন্য আর শোক করিব না; তিনি তোমার আনন্দলোকে গমন করিয়াছেন; সেখানে নূতন জগতে তোমার সকল দেশের সকল কালের ভক্ত, জ্ঞানী ও কর্ম্মী নরনারীদের সঙ্গে মিলিত হইয়া তোমারই মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন; আমরা তাঁহার পুণ্যময় জীবনের পবিত্র স্মৃতি লইয়া তোমারই প্রেমে আজ জাগ্রত হইয়া উঠিব। আমাদের প্রাণ ত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, আমাদের চক্ষু হইতে ত জলধারা প্রবাহিত হইতেছে; কিন্তু তোমার মঙ্গলস্বরূপ স্মরণ করিয়া সব শোক তাপ ভুলিয়া যাই; তোমার দিকে চাহিয়া আমরা আজ জাগ্রত হই; "তবে মুছি অশ্রু উঠিয়া দাঁড়াই"—তোমার নামে আমরা উঠিয়া দাঁড়াই; এই শোক আমাদিগের প্রাণ গলাইয়া দিক্; আমাদের কঠিন প্রাণগুলি গলিয়া এক হউক; এই শোক আমাদিগকে অমৃতের সন্তান বলিয়া দিক্; এই শোক তোমাকে নিকটে আনিয়া দিক্; এই শোক আমাদের বিচ্ছিন্ন পরিবারকে এক করুক; এই শোক-অশ্রু আমাদিগকে ধৌত করিয়া বিশুদ্ধ করুক; এই শোকাগ্নি আমাদিগকে দগ্ধ করিয়া উজ্জ্বল ও পবিত্র করুক। হে আমাদের প্রভু, তুমি আমাদের শূন্য হৃদয়গুলি এসে পূর্ণ কর; তোমার আলোকে আমাদের কর্ত্তব্য চিনিয়া লই; আমাদিগকে অসত্য হইতে সত্যে, অন্ধকার হইতে আলোকে, মৃত্যু হইতে অমৃতে জাগ্রত কর; দূরে যাঁহারা তাঁহাদিগকে নিকটে আন। আজ তোমার প্রেমে গলিয়া আমরা এক হই, আমরা জাগ্রত হই; আমরা তোমার পতাকাতলে এসে সকলে সম্মিলিত হই। তুমি শোকের বেশে এসেছ; তোমাকে ভয় করিব না; আমরা তোমাকে হৃদয়ে বরণ করিয়া লই; হে প্রেমময়, হে মঙ্গলময়, হে আমাদের দেবতা, অসহায় আমরা, দীন আমরা, কাঙ্গাল আমরা, মলিন আমরা, তোমার চরণে লুণ্ঠিত হইতেছি, তুমি হাত ধরে তোল; তোমার প্রেমে ও পুণ্যে আমাদিগকে ভূষিত কর; তোমার চরণে আশ্রয় দাও।

নিবেদন।

শোকের বেশ—আজ তিনি শোকের বেশে এসেছেন ব'লে ভয় করিও না; দেখিতেছ না, তিনি কেমন করে তোমার প্রাণটাকে স্পর্শ করিতেছেন; তুমি এতদিন শুকাইয়া কঠিন হয়ে গিয়েছিলে; তুমি বড় বন্ধুর হয়েছিলে; তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলে; ভাইএর প্রাণে আঘাত করিতেছিলে; আজ শোকের অশ্রুতে প্রাণটা ভিজিয়া গেল; আজ শক্ত কঠিন প্রাণ তরল হইল; আজ একটি প্রাণ, দুইটি প্রাণ, দশটি প্রাণ গলিয়া

তরল হইল; আজ যে প্রাণে প্রাণে মিশিয়া গেল। শোক তবে আসুক; শোককে তবে বরণ করিয়া লও। তিনিই ত শোকের বেশে এসেছেন; তিনিই প্রাণগুলি গলাইয়া দিয়াছেন; তিনিই ত চোখের জলে তোমাকে দ্রব করিয়াছেন; শোক তবে কত আদরের; শোক তবে যে স্পর্শমণি। শোক যে লোহাকে সোনা করে দিল, শোককে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গ্রহণ কর; শোকের দেবতাকে প্রাণের দেবতা করিয়া লও। শোকের মধ্যে প্রিয়জনকে চিনিয়া লও; শোক অমৃতের সন্ধান বহন করুক, শোক নূতন দৃষ্টি খুলিয়া দিক্।

সুখের দিন—কোন্ দিন আমার সুখের তা কি তোমরা জান? যে দিন আমি জীবনের কার্য্যে কৃতকার্য্যতা লাভ করেছি, সেই দিনই আমার সুখের নয়; যে দিন প্রিয়জনের সঙ্গে মিলনের আনন্দ সম্ভোগ করেছি, সেই দিনই যে আমার সুখের, তা নয়। যে দিন দশজনের প্রশংসাভাজন হয়েছি, সেই দিনই যে আমার সুখের, তা নয়। যে দিন প্রাণে তাঁর একটু সাড়া পেয়েছি, যে দিনের সঙ্গে তাঁর স্মৃতি জড়িত রয়েছে, সেই ত আমার সুখের দিন। সে দিন মিলনের আনন্দ ছিল, কি বিচ্ছেদের বেদনা ছিল, জানি না; সে দিন কৃতকার্য্যতা আমাকে বরণ করিয়াছিল, না, ব্যর্থতাকে আমি বরণ করিয়াছিলাম, জানি না। সে দিন দশজনে আমার প্রশংসা করিয়াছিল, কি নিন্দা করিয়াছিল, জানি না। সে সকল স্মৃতি লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তাঁর যে একটু প্রিয়সম্ভাষণ পেয়েছিলাম, তিনি যে একটু উঁকি দিয়েছিলেন, তিনি যে একটু ছুঁয়েছিলেন, সেই স্মৃতিতেই আমার সুখ, সেই স্মৃতি লয়েই আমি বেঁচে আছি। সেই দিনই আমার সুখের দিন।

পরলোকগত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বঙ্গের সাহিত্য-আকাশ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী-কাল আলোকিত রাখিয়াছিল, তাহা অনন্তগগনে চিরতরে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা অবধি যিনি ইহার ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রচারক, ধর্ম্মপিতা ও আচার্য্যরূপে তাঁহার অনুগত শিষ্যগণ ও উপাসকমণ্ডলীর প্রাণে উৎসাহ ও শক্তিসঞ্চার করিতেন, সেই পূজ্যপাদ আচার্য্যদেব শিবনাথ কালপ্রাপ্তে বিগত ১৩ই আশ্বিন বেলা ২টা ৩৭ মিনিটের সময় উচ্চতর লোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। পরিবার পরিজন ও অনুরক্ত শিষ্যমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া অবিরলবাহী অশ্রুধারায় মলিন শিষ্য ও পরিবারের মুখে তাঁহার প্রিয় পবিত্র ব্রহ্মনাম শ্রবণ করিতে করিতে ক্ষণজন্মা মহা-পুরুষ পূর্ণজ্ঞানে স্বর্গে প্রবেশ করিয়াছেন। ব্রহ্ম যাঁহার পুত্র হইতে প্রিয় ছিলেন, বিত্ত হইতে প্রিয় ছিলেন, জগতের আর সকল বস্তু হইতে প্রিয় ছিলেন, তিনি আজ পরলোকে ব্রহ্মের সত্তায় নিমগ্ন হইয়া ভূমানন্দ উপভোগ করিতেছেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু এই একচত্বারিংশ বর্ষ ধরিয়া যিনি তাঁহার উপাসকমণ্ডলীর পার্শ্বে শোকে ও উৎসবে সমভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন, আমরা তাঁহার সেই উৎসাহদীপ্ত মুখ আর দেখিব না, তাঁহার সৌম্য আনন্দমূর্ত্তি দেখিয়া আর নেত্র তৃপ্ত করিব না, আর তাঁহার প্রাণস্পর্শী সুমিষ্ট বাণী আমাদের অন্তরের নিভৃত প্রদেশ আলোড়িত করিবে না। আজ তাঁহাকে হারাইয়া মনে কত কথাই উদিত হইতেছে। কতদিনের কত কথা বিদ্যুৎস্ফুরণের মত মনের উপর দিয়া উজ্জ্বল দীপ্তি বিকাশ করিয়া যাইতেছে। তাঁহার মত আমাদের অকৃত্রিম সুহৃৎ আর কে? ব্রাহ্মসমাজের সেই বিষম দুর্দ্দিনে যখন বহুসংখ্যক নরনারী গভীর নিশীথে সহসা গৃহদাহে বিপন্ন সুপ্তোত্থিত গৃহস্থের ন্যায় ভীত, সন্ত্রস্ত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তিনি সেই ক্ষিপ্তবৎ উত্তেজিত জনসংঘের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদিগকে আশার অভয়বাণী শুনাইয়াছিলেন। তাঁহার স্থির, ধীর ও সবল কণ্ঠস্বরে আমরা তখন অন্তরে সান্ত্বনা ও আশ্বাস পাইয়াছিলাম। সেই তুমুল সংগ্রামের দিনে যখন উভয় পক্ষ পরস্পরকে অজস্র শরজাল বর্ষণ করিতেছিলেন, তখন সেই অশ্রান্ত কার্য্যের আবর্ত্তের মধ্যে পতিত হইয়াও তিনি আমাদের জন্য জীবনের সেই পথের সন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন, যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ। আমরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই পথে আসিয়া এখন বুঝিতেছি, কি আলোকময় রাজ্যের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া নানা প্রতিকূলতা ও উত্থান পতনের মধ্য দিয়া তিনি আমাদিগকে লইয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। বিধাতা তাঁহাকে যে অনন্যসাধারণ প্রতিভা, যে অদ্ভুত শ্রমের শক্তি, হৃদয় মনের যে প্রচুর ভাব সম্পদ্ এবং অবাধ প্রযুক্ত আত্মার যে স্ফুরিত মাধুর্য্য মুক্তহস্তে দান করিয়াছিলেন, তাঁহার উপাসকমণ্ডলীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও কল্যাণকল্পে তিনি চিরজীবন তাহা নিঃশেষে ব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা, তাঁহার প্রাণস্পর্শী উপাসনা, তাঁহার উচ্চ উপদেশ এতদিন ধরিয়া আমাদের জীবনে যে শক্তির সঞ্চার করিয়াছে, তাহার মূল্য অপরিমেয়। আমরা তাঁহার শক্তিতে সংশয়-অন্ধকারে আলোক দেখিতে পাইয়াছি, দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে প্রাণে বল পাইয়াছি, জীবনের প্রলোভন ও পরীক্ষার দিনে সংগ্রাম করিবার শক্তি সংগ্রহ করিয়াছি, মৃত্যুর কঠিন প্রহারে ভূলুণ্ঠিত হইয়া শোকদগ্ধ হৃদয়ে অমৃতের অবলেপ অনুভব করিয়াছি এবং সকল অবস্থাতেই আমাদের জীবন সর্ব্বমঙ্গলময় বিধাতার কল্যাণহস্ত দ্বারা অনুক্ষণ বিধৃত রহিয়াছে, ইহা নিঃসংশয়ে জানিয়া নির্ভর ও আনন্দের অমৃতরসে পূর্ণ প্রাণে জীবনের পথে অগ্রসর হইয়াছি। বিষ্ণুর চরণ নিঃসৃত ভাগীরথী যে পথ দিয়া সাগর উদ্দেশে ধাবিত হইতেছে, তাহার উভয় কূল যেমন উর্ব্বরতায় শস্যশ্যামল হইয়া উঠিতেছে, সেইরূপ ভগবৎ সত্তার উৎস মুখ হইতে নিঃসৃত তাঁহার পবিত্র জীবনের মধুর রসধারায় আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন পুষ্টিলাভ করিয়াছে। গৃহপরিবার মধ্যে থাকিয়াই যে ব্রহ্মের সাধনা করিতে হয়, গৃহধর্ম্মপালন যে ব্রাহ্মের জীবনব্যাপী কঠিন তপস্যা, স্বার্থচিন্তা ও সর্ব্বপ্রকার কামনাকে বশে রাখিয়া পরিবারের সকলের প্রতি কর্ত্তব্য পালন যে অমৃতলাভের সোপান, বিমল আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর নরনারীর সকল প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে যে পুরুষের উচ্চতম পৌরুষ ও নারীর মধুরতম নারীত্ব সম্যক্ বিকশিত হইয়া উঠে এবং তাহা হইতেই যে মানবের শ্রেষ্ঠ সুখ ও সামাজিক শক্তি বর্দ্ধিত হয়, তিনি চিরদিন আমাদিগকে এই উচ্চশিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

সর্ব্বোপরি এই সকল মহৎ শিক্ষার অন্তরালে আমরা চিরদিন সত্য ও সকল প্রকার মহত্ত্বের চরণে তাঁহারা অকুন্ঠ আত্মসমর্পণ এবং সেই অটল, দৃপ্ত, প্রাচীন ব্রাহ্মণোচিত পৌরুষ দেখিয়াছি, যাহা যৌবনের প্রারম্ভ অবধি অন্তরের বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করিতে সর্ব্বপ্রকার প্রতিকূলতা, লোকনিন্দা, দারিদ্র্য ও অভাবের দুর্ব্বহ ক্লেশ সানন্দে শিরঃ পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই পার্থিব সুখ ও সুবিধার নিকট মস্তক অবনত করে নাই। তাঁহার এই পৌরুষে অটল, স্নেহ ও প্রেমে কোমল ও ভগবদ্ভক্তিতে কমনীয় চরিত্রের মহিমা চিরদিন তাঁহার শিষ্যগণের মুগ্ধদৃষ্টি তাঁহার দিকে আকৃষ্ট রাখিয়াছিল। ত্যাগ তাঁহার সমগ্র জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। বিগত একচল্লিশ বৎসর ধরিয়া আমরা ইহা সর্ব্বদা দেখিয়াছি যে, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে কখনও পরাঙ্মুখ হন নাই। এই মহৎ জীবন, যাহা আমাদের চক্ষুর সম্মুখে অমর লোকের শুভ্র আলোক প্রকাশ করিয়া চির অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল, তাহা আমাদের প্রতি বিধাতার মহৎ দান ও শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ; তাহা পাইয়াছিলাম বলিয়া আমরা সসম্ভ্রমে তাঁহার চরণে আমাদের প্রাণের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি; আর প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণের অমর ভাষায় আমাদের পূজ্যপাদ আচার্য্য দেবের আত্মাকে উদ্দেশ করিয়া বিনম্রচিত্তে নতমস্তকে বলি,—

যাও, যাও, সেই সকল পথ দিয়া যাও, যে সকল পথে পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্ব পিতৃগণ গমন করিয়াছেন। যে পথে আমাদের পূর্ব্বপিতৃগণ গমন করিয়াছেন, ও যে পথে জন্মপ্রাপ্ত সকলব্যক্তিই স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম অনুসারে গমন করে।

তোমার যে আত্মা দূরে পরলোকের দেবতার নিকট গিয়াছে, আমরা তাহাকে পুনরায় আহ্বান করিতেছি, তাহা আমাদিগের মধ্যে বাস করুক ও জীবিত থাকুক।

তোমার যে আত্মা দূরে ঐ প্রসারিত কিরণমালার পথে গিয়াছে, আমরা তাহাকে পুনরায় আহ্বান করিতেছি, তাহা আমাদিগের মধ্যে বাস করুক ও জীবিত থাকুক।

তোমার যে আত্মা দূরে দূরতম দেশে চলিয়া গিয়াছে, আমরা তাহাকে পুনরায় আহ্বান করিতেছি, তাহা আমাদিগের মধ্যে বাস করুক ও জীবিত থাকুক।

তোমার যে আত্মা আজ এই নিখিল বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে, আমরা তাহাকে পুনরায় আহ্বান করিতেছি, তাহা আমাদিগের মধ্যে বাস করুক ও জীবিত থাকুক।

তোমার যে আত্মা সুদূর অতীতের বা সুদূর ভবিষ্যতের পথে গিয়াছে, আমরা তাহাকে পুনরায় আহ্বান করিতেছি, তাহা আমাদিগের মধ্যে বাস করুক ও জীবিত থাকুক।

পূর্ব্বপিতৃগণের সহিত মিলিত হও; পরলোকের দেবতার সহিত মিলিত হও, উন্নত স্বর্গলোকে গিয়া তোমার সকল আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতার সহিত মিলিত হও যাহা কিছু মলিন, সে সকল পরিহার করিয়া পুনরায় স্বগৃহে গমন কর, নূতন তেজোময় দেহের সহিত মিলিত হও।

স্বর্গের দেবতাগণ তোমাকে রক্ষা করুন; যে পথে তুমি অগ্রে চলিলে সে পথে তোমাকে রক্ষা করুন। সুকৃতগণ যেখানে থাকেন, তাঁহারা যেখানে গমন করেন, জগৎপ্রসবিতা তোমাকে সেই স্থানে স্থাপন করুন।

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।

আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই জীব সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম কর্ত্তৃক জীবিত রহে, এবং প্রলয়কালে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি গমন করে ও তাঁহাতে প্রবেশ করে।

এষাস্য পরমাগতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দঃ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।

ইনি এই জীবের পরম গতি, ইনি এই জীবের পরম সম্পদ, ইনি ইহার পরম লোক, ইনি ইহার পরম আনন্দ। এই পরমানন্দের কণামাত্র আনন্দ অন্য অন্য জীব উপভোগ করে।

হে প্রভু, তোমার আবির্ভাবের পবিত্র সন্নিধানে ইঁহাকে রক্ষা কর। তোমার জ্যোতিঃ ইঁহার আত্মাকে উজ্জ্বল করুক। তুমি ইঁহাকে সত্য দাও, আলোক দাও, অমৃত দাও।

অসত্য হইতে ইঁহাকে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে ইঁহাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে ইঁহাকে অমৃতেতে লইয়া যাও; হে স্বপ্রকাশ, তুমি ইঁহার নিকট প্রকাশিত হও; হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহার দ্বারা ইঁহাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

ঐ ব্রহ্ম।

শ্রীলাবণ্যপ্রভা সরকার।

আমাদের শাস্ত্রী মহাশয়।

শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বন্ধে কিছু লেখা আমার ধৃষ্টতা মনে হয়। তিনি যে স্তরের লোক আমি সে স্তরের খবর কি জানি? তবে এইমাত্র বলিতে পারি তাঁহাকে দেখিলেই আনন্দ হইত, তাঁহার চরণ ছুঁইতে পারিলেই ভাবিতাম ধন্য হইলাম, কৃতার্থ হইলাম। অমন প্রাণস্পর্শী ধর্ম্মোপদেশ আর কি শুনিতে পাইব? তাঁহার স্থান কে পূরণ করিবে? বিশ্ববিদ্যালয়ে অত গৌরব অর্জ্জন করিয়া ধনৈষণাহীন হইয়া তদ্রূপ ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কে দেখাইবে?

বাল্যবয়সে একদিন একটি ব্রাহ্মসভায় উপস্থিত হই। সেই সভায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রস্তাব করেন ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে reserved seatএর ব্যবস্থা হউক। অমনি একটি যুবক নির্ভীক ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তারস্বরে বলিলেন "ব্রহ্মমন্দিরে এরূপ বিভেদের ব্যবস্থা নিতান্তই অযৌক্তিক, যেখানে ছোট বড় সকলে গলাগলি হইয়া বসিবেন সেখানে এ পার্থক্য সহ্য করিবার নহে।" আমরা তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। কেশব বাবুর কোন কথার কেহ প্রতিবাদ করিতে পারেন ইহা আমাদিগের বিশ্বাস ছিল না। যুবকটি কে জানিবার জন্য সকলেই উদ্গ্রীব হইলেন। শুনিলাম, ইঁহার নাম শিবনাথ ভট্টাচার্য্য, তখন তক তিনি বোধ হয় এম্-এ ও পাশ করেন নাই। সেই দিনই বুঝিলাম

এই যুবক একদিন আমাদিগের মনোরাজ্যের রাজা হইবেন। সাম্য, মৈত্রী স্বাধীনতা—যদি কাহারও প্রাণে ফুটিয়া থাকে তাহা আমার মনে হয় শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রাণে যেরূপ ফুটিয়াছে সেরূপ আর প্রায় কোথাও দেখা যায় না। তাঁহার প্রাণের স্বাধীনতার উপরে কেহই হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। সকলকে সমান তিনি যেমন দেখিয়াছেন এমন ক'জনে দেখিয়া থাকেন? মৈত্রীর ত কথাই নাই। তিনি কাহাকে না ভাল বাসিয়াছেন? আর কেই বা তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিয়াছে?

ভগবদ্ভক্তের প্রাণে কি আনন্দ থাকে, তাহা তাঁহাতেই দেখিয়াছি। প্রাচীন বয়সে তাঁহার প্রাণে যে নবীনত্ব দেখিয়াছি তাহা ঋষি রাজনারায়ণ বসু ও আর দুই একটিমাত্র ব্যক্তির মধ্যে দেখিয়াছি। ইং ১৯১৬ সনের অক্টোবর মাসে যখন আমি স্থার্ নীলরতন সরকার মহাশয়ের গৃহে রোগশয্যায় শায়িত, তখন একদিন প্রাতঃকালে শাস্ত্রী মহাশয় আমার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত। তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনমাত্রেই আমার জীর্ণ শরীরে নববলের সঞ্চার হইল। তিনি তখন যুবকোচিত উৎসাহের সহিত প্রত্যহ কিরূপ গড়ের মাঠে চংক্রমণ করিয়া থাকেন তাহার বর্ণনা করিলেন এবং তিনি যে তাঁহার বার্দ্ধক্যে এখনও নবীন আছেন তাহা হাসিতে হাসিতে বলিয়া কিঞ্চিৎ গর্ব্ব প্রকাশ করিলেন। তাঁহার ফূর্ত্তি দেখিয়া আমার যে কি আনন্দ হইল বলিতে পারি না। চির-নবীনের সহিত সৌহার্দ্য থাকিলে মানুষ এইরূপ নবীনই থাকে মনে হইল। যিনি ভগবৎ তাঁহার হৃদয়ে চিরযৌবন, চতুর্দ্দিকে চিরবসন্ত—ইহা কথঞ্চিৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিলাম।

শাস্ত্রী মহাশয়ের স্থান সত্যই পূর্ণ হইবার নহে—ইহাই ত মনে হয়, তবে কর্ত্তা জানেন।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।*

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর দেশের মুখোজ্জ্বলকারী বঙ্গমাতার সুসন্তান পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আমাদিগকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া অমর ধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার পবিত্র স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য আমরা অদ্য এই সভাগৃহে সমবেত হইয়াছি।

অতি নিকট আত্মীয়ের বিয়োগে হৃদয় যেরূপ ব্যথিত ও অবসাদগ্রস্ত হয়, শাস্ত্রী মহাশয়ের তিরোভাবে বঙ্গের শিক্ষিত সমাজের হৃদয় সেইরূপ ব্যথিত হইয়াছে। ২২শে সেপ্টেম্বর যখন আমি রাঁচি আসিবার জন্য কলিকাতা পরিত্যাগ করি, তখন তাঁহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন জানিয়া আসিয়াছিলাম; কিন্তু তখন মনে হয় নাই যে, তিনি এত শীঘ্র আমাদিগের স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া চিরশান্তি উপভোগ করিবার জন্য দিব্যধামে মহাযাত্রা করিবেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমাদের দেশ একজন একনিষ্ঠ-সেবকের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পিতৃহীন হইয়াছেন এবং বঙ্গদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় একজন আদর্শ শিক্ষক ও প্রকৃত বন্ধু হারাইলেন। এ অভাব সহজে ও শীঘ্র পূর্ণ হইবার নহে।

লৌকিক ভাবে শোক প্রকাশ করিলেও আধ্যাত্মিক হিসাবে তাঁহার মত মহাপুরুষের জন্য শোক প্রকাশ করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে। মঙ্গলময় জগদীশ্বর যে মহৎকার্য্যের ভার তাঁহার উপর অর্পণ করিয়া তাঁহাকে এই ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি হাসিমুখে, কায়মনোবাক্যে সেই কার্য্য পূর্ণভাবে সম্পাদন করিয়া পিতার ভবনে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। আজি অমর-ধামে শতকণ্ঠে তাঁহার জয়গীতি উচ্চারিত হইতেছে। জগজ্জননী স্বয়ং তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া স্মিতমুখে বলিতেছেন—"বৎস, তোমার কার্য্যে আমি প্রীত হইয়াছি।" তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী সাধু মহাজনদিগের সহিত একত্র মিলিত হইয়া নিত্যানন্দ উপভোগ করিতেছেন। তাঁহার এই উন্নত অবস্থার জন্য শোক প্রকাশ না করিয়া আনন্দ প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য।

তবে আমরা যে দুঃখ প্রকাশ করিতেছি, তাহা তাঁহার জন্য নহে, আমাদের নিজেদের জন্য। আমরা যেমন মানুষটি হারাই, তেমনটি আর ফিরিয়া পাই না। আমাদের দেশের বড়ই দুর্ভাগ্য যে, যে সকল মহাত্মা মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিয়া কালে বা অকালে মায়ের ক্রোড় শূন্য করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের স্থান যথাবিধি পূরণ করিতে পারে, এমন দ্বিতীয় লোক আর দৃষ্টি-গোচর হয় না। কি ধর্ম্মজগতে, কি কর্ম্মজগতে এই সকল মহাত্মাদিগের স্থান বহুদিন পর্য্যন্ত শূন্য পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব, স্বামী বিবেকানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ধর্ম্ম ও কর্ম্মবীরগণের স্থান আজি পর্য্যন্ত পূর্ণ হইল না। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর অভাবও সেইরূপ বহুদিন পর্য্যন্ত অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। দেশের এই বিষম ক্ষতির জন্য, এই সকল মহাপুরুষের অভাবে জাতীয় জীবনে যে দৈন্য উপস্থিত হয় তাঁহার জন্য, হৃদয় দুঃখে অভিভূত হয়, মন নিরাশা-সাগরে মগ্ন হইয়া অবসন্ন ও কাতর হইয়া পড়ে।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবন বহুল বিচিত্র ঘটনাদ্বারা পূর্ণ ছিল; সে গুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনাও বহু সময়-সাপেক্ষ। আমি তাঁহাকে ব্যক্তিগত ভাবে যেরূপ জানিয়াছিলাম এবং তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও উপদেশ হইতে জীবনে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে দুই চারিটি কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। যিনি বিস্তৃত ভাবে তাঁহার জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিতে চাহেন, তিনি তাঁহার প্রণীত "আত্মচরিত" এবং "ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাস" নামক দুইখানি পুস্তক পাঠ করিলে এ বিষয়ে কিয়ৎ পরিমাণে সফলমনোরথ হইবেন।

আমার যখন ১৪ বৎসর বয়স, তখন শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। সেই সময়ে স্বর্গগত আনন্দমোহন বসু মহাশয় সবেমাত্র বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়াছেন। তিনি বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম র‍্যাংলার (wrangler) ছিলেন। তাঁহার কৃতীত্বে দেশে ধন্য ধন্য রব উঠিয়াছিল। সেই সময়ে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য শাস্ত্রী মহাশয় আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীটে রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যানবাটীতে এক সভার আয়োজন করেন। বালককাল হইতে সভাসমিতিতে যোগদান করা আমার অভ্যাস, এ বৃদ্ধবয়সেও

* রাঁচি ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু কর্ত্তৃক অভিব্যক্ত।

সেই অভ্যাস আমি পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। তখন আমি তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র, কিন্তু দেশগৌরব আনন্দমোহন বসুকে দেখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারি নাই। শিবনাথ বাবু আমার মত অল্পবয়স্ক বালককে সেই সভায় উপস্থিত থাকিতে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং আনন্দমোহন বাবুকে দেখাইয়া আমাকে বলিলেন—"তুমি এখন হইতে ইঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বড় হইবার চেষ্টা কর।" ইহাই তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় এবং প্রথম আলাপ। পূর্ব্বে তাঁহার নাম শুনিয়াছিলাম এবং তাঁহাকে ভক্তি করিতাম কিন্তু তাঁহাকে দেখিবার সুবিধা হয় নাই।

১৮৭৭ সালে যখন আমি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিই, তখন আমরা কতকগুলি স্কুল ও কলেজের ছাত্র মিলিত হইয়া "ভ্রাতৃ-সম্মিলনী সভা" নামক একটি সভা স্থাপন করিয়াছিলাম। এই সভায় বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ পঠিত ও বক্তৃতা প্রদত্ত হইত। তখনও ছাত্রদিগের মধ্যে স্বদেশী ভাব খুব প্রবল ছিল; তবে তখন এখন-কার মত খুনোখুনি স্বদেশী ছিল না। কবিতা আওড়াইয়া এবং সভাসমিতিতে বক্তৃতার সহিত আমরা আমাদের স্বদেশী ভাব ব্যক্ত করিতাম। তখন হেমবাবুর "ভারতসঙ্গীত" বাহির হইয়াছে, তাহাই আমাদের স্বদেশীয়ানার প্রধান সম্পত্তি ছিল। আমরা গৃহে বাহিরে, সভাসমিতিতে ঐ কবিতার অংশ বিশেষ আবৃত্তি করিয়া স্বদেশী ক্ষুধা মিটাইতাম। ভারত সঙ্গীতের যে পদ আমাদের সভার "মটো" ছিল, তাহা এই,—

"যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে।
বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধরে।
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।"

সেই সভার বাৎসরিক অধিবেশনে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে বক্তা পদে বরণ করিবার ভার আমার উপর অর্পিত হয় এবং আমি এই কার্য্যের জন্য তাঁহার বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। সেই আমার সহিত তাঁহার দ্বিতীয় বার পরিচয়। আমার বয়স তখন ১৬ বৎসর এবং আমি স্কুলের ছাত্র; তথাপি আমি তাঁহার নিকট যে যত্ন, আদর ও সভার কার্য্যে যে উৎসাহ পাইয়াছিলাম, তাহা আমি কখন ভুলিতে পারিব না। তিনি আমাদের বাৎসরিক সভায় "শিক্ষা" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। এল্‌বার্ট হলে আমাদিগের সভা হইল। সভাপতি হইলেন রেভারেণ্ড, কে, এম্ ব্যানার্জ্জি, আর বক্তা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। সভায় গণ্য মান্য অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করিলেন। সেই প্রথম আমি তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতার পরিচয় পাইলাম। তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে অনেকগুলি সার উপদেশ প্রদান করিলেন; তুইটী কথা এখনো আমার হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন যে, যে শিক্ষা ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্ম-জীবন গড়িতে না পারে, সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়। তিনি আরো বলিলেন যে, শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য চরিত্রগঠন, পাণ্ডিত্য অর্জ্জন নহে। হীনচরিত্র সুশিক্ষিত লোক অপেক্ষা সদাচারী অশিক্ষিত লোকের সংসর্গ সহস্রগুণে বাঞ্ছনীয়। সেই কিশোর বয়সে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহার নিকট যে সদুপদেশ পাইয়াছিলাম, পরবর্ত্তী জীবনে তাহার দ্বারা সবিশেষ উপকৃত হইয়াছি।

তার পর তাঁহার সত্যানুরাগ, তাঁহার হৃদয়ের বল, তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান, তাঁহার তেজস্বিতা এবং তাঁহার স্বাধীন ভাবের পরিচয় পাইয়াছিলাম, যখন কেশব বাবুর সমাজ হইতে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ পৃথক হইয়া গেল। কুচবিহার বিবাহ ইহার মুখ্য কারণ হইলেও উক্ত বিবাহের পূর্ব্বে নানা কারণে উভয় দলের মধ্যে মনোমালিন্য পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইয়া উভয় দলে স্থায়ী বিচ্ছেদ সংঘটিত হইল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের পার্শ্বে অবস্থিত ৺উপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের ভবনে যে সভা আহূত হইয়া একটি নূতন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হইল, আমি সে সভায় উপস্থিত ছিলাম এবং ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ মর্ম্মস্পর্শী জ্বলন্ত ভাষায় কেশব বাবুর কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া পৃথক্ সমাজ স্থাপনের জন্য যে সকল যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া, শাস্ত্রী মহাশয় ও তাঁহার ধর্ম্মবন্ধুগণের সত্যানুরাগ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও স্বাধীনচিন্তার প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল।

তার পর নূতন সমাজগৃহ প্রতিষ্ঠার দিবসেও আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। এতদিন উপাসনার নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না, কখন উপেন্দ্র বাবুর বাটীতে কখন বা অন্য কাহারো আশ্রয়ে সাপ্তাহিক উপাসনার ব্যবস্থা হইত; ইহাতে সকলেই হৃদয়ে একটা গভীর ব্যথা অনুভব করিতেন। শাস্ত্রী মহাশয় অদম্য উৎসাহ, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত নূতন মন্দির নির্ম্মাণকার্য্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং নির্ম্মাণকার্য্যের অধিকাংশ ভারই তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছিল। এই সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নবমন্দির নির্ম্মাণের জন্য যে আন্তরিক সহানুভূতি ও উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাসে চিরদিনের জন্য স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। তিনি শাস্ত্রী মহাশয়কে মন্দির নির্ম্মাণোপলক্ষে ৭০০০৲ টাকার চেক্ প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা অপেক্ষা অধিক চাঁদা বোধ হয় আর কেহই এ কার্য্যের জন্য দান করেন নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দির যে দিন প্রতিষ্ঠা হইল, সে দিন সমস্ত দিন ব্যাপিয়া উৎসব হইয়াছিল। এতদিন পরে উপাসনার জন্য তাঁহারা নিজস্ব একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান লাভ করিলেন, ইহা মনে করিয়া শাস্ত্রী মহাশয় প্রমুখ ব্রাহ্মনরনারীগণের নয়ন হইতে যে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে দেখিয়াছিলাম এবং ভগবানের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তাঁহাদের যে প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা শুনিয়াছিলাম, তাহা আজিও মনে হইলে তাঁহাদের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধায় হৃদয় আপ্লুত হইয়া পড়ে। হিন্দুসমাজভুক্ত হইলেও তখন আমি প্রায় প্রতি রবিবারে ব্রাহ্মসমাজে যাইতাম। বিশেষতঃ যে দিন শুনিতাম শিবনাথ বাবু প্রার্থনা করিবেন, সে দিন সকল কার্য্য ফেলিয়া তথায় উপস্থিত হইতাম। তাঁহার প্রার্থনার মধ্যে কি এক আশ্চর্য্য অন্তর্দৃষ্টি ছিল! মনে হইত যেন তিনি আমার হৃদয়কেই লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন, আমার যেখানে যে দুর্ব্বলতাটুকু আছে, যেন সেই টুকু আমার চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া আমাকে সাবধান করিয়া দিতেছেন। শুধু আমি নহি, অনেক লোকই

তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়া চক্ষুর জল নিবারণ করিতে পারিত না। ডাল্ (Dr. Rev. Dall) সাহেব একবার তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি সকলের সমক্ষে বলিলেন যে, সে দিন হইতে তিনি Brahmo follower of Christianity বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছা করেন।

ঈশ্বরে সরল বিশ্বাস ও তাঁহার প্রতি সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভরতা তাঁহার জীবনের প্রধানতম সৌন্দর্য্য ছিল। এই ভাবের অভাব বর্ত্তমান যুগের মানুষের মধ্যে বড় অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। এই যুগে একমাত্র রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনে এই ভাবের পূর্ণতা দেখিয়াছিলাম। তিনি দেহমন প্রাণ সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরে সমর্পন করিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের বলিয়া কোন জিনিস ছিল না। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব শাস্ত্রী মহাশয়কে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং শাস্ত্রী মহাশয়ও পরমহংসদেবের প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত ও শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিনি সুবিধা পাইলেই তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহার মধুর উপদেশ শ্রবণ করিতেন। আমার মনে হয় শাস্ত্রী মহাশয় ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের ভাব পরমহংসদেবের নিকট হইতে লাভ করিয়া ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার কার্য্যে এই আত্মনিবেদনের ভাব শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনে পূর্ণভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি একপ্রকার রিক্তহস্তে হিমালয় হইতে কুমারিকা এবং সিন্ধুদেশ হইতে আসামের প্রান্তপ্রদেশ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। পরমহংসদেবের উপদেশ মত তিনি ঈশ্বরকে "বকলমা" দিয়া ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পাথেয় নাই, কল্য কি খাইবেন, তাহার সংস্থান নাই, অথচ দূর দেশে প্রচারকার্য্যে যাইবার সমস্ত ব্যবস্থা পূর্ব্বদিন স্থির হইয়া গেল। যাত্রা করিবার সময়ে কোথা হইতে বেনামী মনিঅর্ডারে পথের খরচ আসিয়া উপস্থিত হইল, পথে যাইবার সময়ে লোকে গোপনে পকেটের মধ্যে টাকা ফেলিয়া দিল। তিনি কাহারো নিকট কর্জ্জ করেন নাই, কাহারো নিকট অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই, অযাচিত ভাবে যে যাহা দিয়াছে, তাহাতেই তাঁহার প্রচারকার্য্যের ব্যয় সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ভগবানের কার্য্য ভগবান আপনি সম্পন্ন করিয়া দেন, এ বিশ্বাস বোধ হয় অনেকেরই নাই। কিন্তু ইহা যে সম্পূর্ণ সত্য কথা, তাহা আমার নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি। আমার তত্ত্বাবধানে একটী আশ্রম আছে, তথায় প্রায় ১২০টী অনাথ বালকবালিকা প্রতিপালিত হয়। মাসে আমাদের প্রায় ১০০০, টাকা ব্যয় হয়, সমস্তই দানের উপর নির্ভর। অনেক সময়ে এমন হইয়াছে যে আগামী কল্যকার খরচের টাকা নাই—টাকা কর্জ্জ করিবার চেষ্টা করিতেছি, কোথা হইতে ভগবান কোন দানশীল ব্যক্তির হাত দিয়া এত খাদ্যদ্রব্য, এত টাকা পাঠাইলেন যে কিছুদিনের জন্য আমাদের সকল ভাবনা চিন্তা দূর হইয়া গেল। ইহা কাল্পনিক ব্যাপার নহে, ইহা অতি সত্য কথা। যে কেহ সুক্ষ্মভাবে নিজ জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলির প্রতি অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, তিনিই ভগবানের অপার করুণা আমাদের জীবনে কিরূপ কার্য্য করিতেছে, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর আদর্শ জীবন চিরদিন আমাদিগকে এই বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিবে।

আর একটী কথা। তাঁহার জীবন কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও দায়ীত্ব-জ্ঞানের উদাহরণ স্বরূপ ছিল। তিনি শত বিপদ মাথায় করিয়া, শত অসুবিধা ভোগ করিয়া, শত নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া তাঁহার বিবেকবুদ্ধি অনুমোদিত কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ, উপবীত পরিত্যাগ, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচার, পতিতার উদ্ধার প্রভৃতি কার্য্যে প্রচলিত সামাজিক আচারের বিরুদ্ধে যৌবনের প্রারম্ভে যে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিলেন, সেই যুদ্ধকার্য্যে তিনি সারাজীবনটী উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহিত সকল বিষয়ে সকলের মতের মিল না হইতে পারে, কিন্তু একথা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে যাহা তাঁহার সত্য বলিয়া ধারণা হইয়াছিল, যাহা তিনি বিবেকবুদ্ধির অনুমোদিত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণভাবে পালন করিতে কাহারো মুখাপেক্ষা করেন নাই, সুবিধা অসুবিধার উপর দৃক্‌পাত করেন নাই, ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য রাখেন নাই, প্রাণপণ করিয়া কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দুইটী বন্ধু বিধবা বিবাহ করিয়াছিলেন, তিনি এই দুই বিবাহেরই প্রধান উদ্যোগী ও সহায় ছিলেন। তাঁহারা দুই জনেই জাতিচ্যুত হইলেন; নানাবিধ সামাজিক নির্য্যাতনে তাঁহাদের বিষম কষ্ট উপস্থিত হইল। ঝি, চাকর, পাচক ব্রাহ্মণ কেহই তাঁহাদের বাটীতে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইল না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের বিষম অর্থকষ্টও উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহাদের সেই বিষম দুর্দ্দিনে তাঁহাদের বন্ধু শিবনাথ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই। পিতামাতা বন্ধুবান্ধব কাহারো অনুরোধ রক্ষা না করিয়া অনেকদিন তাঁহাদের গৃহে পাচক ও ভৃত্যের কাজ করিয়াছিলেন, পীড়ার সময় নিজ বাসায় তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন এবং নিজের বৃত্তির টাকা হইতে তাঁহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতেন। তিনি বলিতেন যে যখন তিনিই তাঁহাদিগের বিবাহের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, তখন সেই বিবাহের ফলে তাঁহাদের যে সাময়িক দুরবস্থা ঘটিয়াছিল, সেই দুঃসময়ে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করা মনুষ্যোচিত কর্ম্ম নহে। তাঁহার পিতা তাঁহার মাতুল স্বনামখ্যাত দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে শিবনাথকে ডাকাইয়া এই কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য, অনুরোধ করিতে পত্র লিখিয়াছিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ভাগিনেয়ের প্রমুখাৎ সমস্ত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া, শিবনাথ মানুষের মত কাজ করিতেছেন বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং শিবনাথের পিতাকে জানাইলেন যে শিবনাথের কর্ত্তব্যকর্ম্মে বাধা দেওয়া তিনি সঙ্গত বিবেচনা করেন না।

শাস্ত্রীমহাশয় নারীজাতির প্রকৃত সুহৃদ্ ও পরম হিতৈষী ছিলেন। বঙ্গনারীগণের শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি প্রাণপাত করিয়াছেন। বঙ্গদেশের শিক্ষিতা মহিলাগণ তাঁহার নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। নারীজাতির উচ্চ-শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন ও তাঁহাদের শিক্ষোপযোগী যাবতীয় ব্যবস্থা করা তাঁহার জীবনের একটী প্রধান কার্য্য ছিল।

শেষ কথা, বাঙ্গলা সাহিত্যে তাঁহার কৃতীত্ব। তিনি অতি সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিতেন। বাল্যকাল হইতেই কবিতা

লেখা তাঁহার অভ্যাস ছিল। ছাত্রজীবনে লিখিত তাঁহার অনেক ছোট কবিতা "সোমপ্রকাশ" ও "এডুকেশন গেজেটে" প্রকাশিত হইয়াছিল; সুপ্রসিদ্ধ "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" তাহাদের মধ্যে একটী। তাঁহার রচিত "ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস" এবং "রামতনু লাহিড়ীর জীবনী ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত" বাংলাসাহিত্য-ভাণ্ডারে সাহিত্য ও ইতিহাস হিসাবে দুইটী অমূল্য রত্ন। তাঁহার উপদেশ ও বক্তৃতাসমূহ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে; ইহা চিরদিন ধর্ম্ম-পিপাসুদিগের আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা দূর করিবে। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, দার্শনিক ও কবি ছিলেন। তিনি উপন্যাস লেখাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার প্রণীত "মেজবৌ" ও "যুগান্তর" কুরুচি প্লাবিত বাংলার উপন্যাসজগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। বাংলার অধিকাংশ উপন্যাস পুত্রকন্যার সহিত একত্রে বসিয়া পাঠ করা যায় না। তাঁহার রচিত "মেজবৌ" বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের এই কলঙ্ক দূর করিয়াছে। তিনি "তত্ত্বকৌমুদী" নামক পত্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং বহুদিন ইহার সম্পাদকের কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। আরো কয়েকখানি ইংরাজী ও বাংলা সংবাদপত্র তিনি পরিচালনা করিতেন। সংস্কৃত এবং বাংলার ন্যায় ইংরাজী ভাষাতেও তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য এবং মাতৃভাষার ন্যায় অধিকার ছিল। বাংলা এবং ইংরাজী উভয় ভাষাতেই তিনি যেরূপ সুলেখক, সেইরূপ সুবক্তা ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার ভাষা যেরূপ জ্বালাময়ী, বক্তৃতাও সেইরূপ গভীর ভাব ও উপদেশ পূর্ণ। উহার মধ্যে এমন একটী উদ্দীপনা থাকিত, যাহা শ্রোতৃ-বর্গকে নিমেষের মধ্যে তাঁহার ভাবে তন্ময় করিয়া তুলিত।

আজ আমরা সকলে এই সভাগৃহে সমবেত হইয়া করুণাময় পরমেশ্বরের নিকট এই মহাপুরুষের আত্মার সম্যক্ কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের গৌরব-চূড়া খসিয়া পড়িল,—শাস্ত্রী শিবনাথ আর ইহজগতে নাই। পূজার ষষ্ঠীর দিন অপরাহ্নে প্রায় আড়াই ঘটিকার সময় মহাকালের কোলে তিনি চির-বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নামের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নামও ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের পর তাঁহার তুল্য প্রভাব বিস্তার করিতে ব্রাহ্মসমাজে আর কেহ পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ব্রাহ্মসমাজ যাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে এই তিন জন প্রতিভাশালী পুরুষেরই নাম করিতে হয়।

শুধু ব্রাহ্মসমাজের নহে, বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রেরও তিনি একটা দিক্‌পাল-বিশেষ ছিলেন। যখন ৩১।৩২ বৎসর তাঁহার বয়স, তখনই 'প্রসিদ্ধ কবি' বলিয়া তিনি সাধারণ্যে পরিচিত হইয়াছিলেন। সেই সময়েই স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছিলেন,—"নবীনচন্দ্র সেন, বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায় বর্ত্তমান কালের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি।" তাঁহার "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" ও "পুষ্পমালা" প্রভৃতি কাব্য সম্বন্ধে কেবল আধুনিক পাঠক নহে,—আধুনিক লেখকগণও বড় একটা উচ্চবাচ্য করেন না সত্য; কিন্তু এককালে শিক্ষিত-সমাজে উহাদের যথেষ্টই আদরপ্রতিপত্তি ছিল।

সোমপ্রকাশ-সম্পাদক স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁহার মাতুল ছিলেন। এই সূত্রে ছাত্রাবস্থা হইতেই সোমপ্রকাশের সহিত তাঁহার একটা সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। তিনি উহাতে প্রায়ই প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিতেন। এই সময় 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্রের যখন—

"হইতাম যদি আমি যমুনার জল,
হে প্রাণবল্লভ"—

কবিতাটি প্রকাশিত হয়, তখন শিবনাথ উহার অনুকরণে 'সোমপ্রকাশে' একটি বিদ্রূপাত্মক কবিতা লেখেন। এই কবিতার দ্বারাই তাঁহার ভাগ্যে প্রথম খ্যাতি লাভ ঘটে। শুনিতে পাওয়া যায়, ঐ কবিতাপাঠে তখনকার সাহিত্যিক-মণ্ডলী অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন।

তবে কবিতা লিখিয়া তাঁহার যশ হইলেও তাঁহার রচিত উপন্যাসাবলীই তাঁহাকে অধিকতর যশস্বী করিয়াছিল। তারকনাথের পর বোধ হয় তিনিই সামাজিক উপন্যাস-রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার 'মেজ-বউ,' 'যুগান্তর' ও 'নয়নতারা' বাঙ্গলার উপন্যাস সাহিত্যভাণ্ডারে সম্পদরূপে পরিগণিত। ইহা ছাড়া তিনি 'আত্মচরিত' এবং 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামক দুইখানি মূল্যবান জীবনী-গ্রন্থও লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি যেমন উৎকৃষ্ট লেখক ছিলেন, তেমনই উৎকৃষ্ট বক্তাও ছিলেন।

—হিন্দুস্থান।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

গত ১৩ই আশ্বিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, ধর্ম্মপ্রাণ, পণ্ডিতপ্রবর শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। ১২৫৩ বঙ্গাব্দের ১৯শে মাঘ রবিবারে শাস্ত্রী মহাশয়ের জন্ম হয়। সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৭৩ বৎসর হইয়াছিল। যে বয়সে সাধারণ বাঙ্গালীর মৃত্যু হয়, শাস্ত্রী মহাশয় সে বয়স অতিক্রম করিয়াছিলেন; তিনি দীর্ঘকাল ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু অকাল মৃত্যুও নহে—অতর্কিত বা অপ্রত্যাশিত ও নহে। তবুও তাঁহার মৃত্যুতে শোক সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইতেছে। তাহার কারণ, তাঁহার সঙ্গে যাহা গেল, তাহা আর পাইব কি না সন্দেহ। যাঁহারা ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য সর্ব্ববিধ লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন—ধর্ম্মের জন্য হাসিমুখে সব কষ্ট সহ্য করিয়াছেন—সত্যের সন্ধানই জীবনের ব্রত করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের এক জন। যে সকল বাঙ্গালী হিন্দু ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও বাঙ্গালী হিন্দুর শ্রদ্ধার অধিকার দৃঢ় করিয়াছিলেন, সেই দুর্গামোহন, রামতন, দ্বারকানাথ, উমেশচন্দ্র, গুরুচরণ, আনন্দমোহন, বিজয়কৃষ্ণ, রামকুমার—সকলেই শাস্ত্রী মহাশয়ের সহকারী ও সহযোগী। তাঁহারা একদিন যথাবুদ্ধি সকল দিকে সংস্কারের জন্য

জীবন উৎসৃষ্ট করিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদিগের শেষ। এক হিসাবে তাঁহার সহধর্ম্মীদিগের অপেক্ষাও শাস্ত্রীমহাশয়ের আসন উচ্চে। কেন না, আর সকলেই ধর্ম্মপ্রাণতার সঙ্গে বিষয়কার্য্যও করিতেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের কাজই ছিল—ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মপ্রচার। আবার তিনি পুরাতনের ও নূতনের আদর্শ সমন্বয়—সে কালের ও এ কালের সংযোগ সেতু। তিনি ব্রাহ্মণপণ্ডিত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ রামজয় ন্যায়লঙ্কার অধ্যাপক ছিলেন। পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাসাগর তাঁহাদের বংশে প্রথম ইংরাজ সরকারের অধীনে চাকরী করেন। গ্রামের লোক তাঁহাকে তাই "সাহেব" বলিত। শাস্ত্রী মহাশয়ের মাতুল বংশও পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত। তাঁহার মাতামহ হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন একজন সুবিজ্ঞ অধ্যাপক ছিলেন—কলিকাতা কাঁসারিপাড়ায় তাঁহার টোল চতুষ্পাঠী ছিল। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুবিখ্যাত "সোমপ্রকাশ" সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ বঙ্গসাহিত্যে চিরদিনের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। পিতৃকুলের ও মাতুলকুলের এই বিদ্যানুরাগ শাস্ত্রী মহাশয় উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃতে তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার ছিল এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অধীনে সংস্কৃত কলেজেই শিবনাথের বিদ্যারম্ভ হয়। তিনি সংস্কৃতে এম, এ, পাস করেন। কেবল বিদ্যায় নহে—"ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের" সংসার-জ্ঞানানভিজ্ঞতাতেও শিবনাথ প্রসিদ্ধ ছিলেন। পিতাকে তিনি দেবতার মত ভক্তি করিতেন। যখন তাঁহার প্রথমা পত্নী বর্ত্তমানে পিতা দ্বিতীয় বার তাঁহার বিবাহ দেন তখনও তিনি তাহাতে আপত্তি করিতে সাহস করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন—"আমার এরূপ বয়স হইয়াছিল যে বহুবিবাহকে মন্দ বলিয়া জানি। * * * কিন্তু বাল্যাবধি পিতাকে এরূপ ভয় করিতাম যে, তাঁহার ইচ্ছাতে বাধা দেওয়া আমার সাধ্যাতীত ছিল।" কিন্তু যখন ধর্ম্মবিশ্বাস তাঁহাকে প্ররোচিত করিল, তখন তিনি সেই পিতার ত্যাজ্যপুত্র হইলেন জানিয়াও হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিলেন। কেবল তাহাই নহে, ধর্ম্মপ্রচারের জন্য তিনি চাকরী ত্যাগ করিয়া সমস্ত জীবনের জন্য দারিদ্র্য বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। ধন—মান—যশ এ সকলের প্রতি তাঁহার লক্ষ্যই ছিল না; তিনি ধর্ম্মানন্দে বিভোর থাকিতেন। এই চাকরী ত্যাগের কথায় তিনি লিখিয়াছেন—"কত চিন্তা, কত বিভীষিকা মনে আসে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। যাহাদের মুখ চাহিব এরূপ কেহ কোথাও নাই, বৃদ্ধ পিতা-মাতার কথা মনে হইতে লাগিল। তাঁহারা চিরদারিদ্র্যে বাস করিয়াছেন, আমি তাঁহাদের একমাত্র পুত্র, তাঁহাদের দারিদ্র্যদুঃখ ঘুচিবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার দুই স্ত্রী ও শিশু পুত্র কন্যা, তাহাদিগকেই বা কে দেখিবে? আমার সংসার বহন করিব কিরূপে?" কিন্তু তিনি ব্রাহ্মসমাজের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবেন স্থির করিলেন। আর বিলম্ব সহিল না। মার্চ্চ মাসে শেষ পর্য্যন্ত কাজ করিলে তিনি বোনাস্—অনেকগুলি টাকা পাইতেন। কিন্তু ১৫ই ফেব্রুয়ারী পদত্যাগ পত্র দিয়া ১লা মার্চ্চ হইতে স্বাধীন হইলেন। তিনি লিখিয়াছেন—"তদবধি ঈশ্বর আমার ভার সমুচিতরূপে বহিয়া আসিতেছেন।" নিজে দরিদ্র কিন্তু কত দুস্থ ব্রাহ্ম-পরিবারের যে তিনি অভিভাবকত্ব করিয়াছেন—কত ব্রাহ্ম বালকবালিকার বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে ভিক্ষা করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বিশ্বাসের জন্য তিনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সন্তান হইয়া আজন্ম হিন্দু আচার-ব্যবহারে অভ্যস্ত থাকিয়াও হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন তাই যে স্থানে বিশ্বাসবিরুদ্ধ কার্য্য হইত, সেই স্থানেই তাঁহার ব্রাহ্মণ্যতেজ আত্মপ্রকাশ করিত,/ তিনি বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেন। বহু আন্দোলনের পর ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আইনে বরকন্যার বিবাহের যে বয়স কেশব বাবুই নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, যখন সে বয়সের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কেশবচন্দ্র সেন কুচবিহারের রাজার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, তখন যাহারা তাঁহার বিরোধী হইলেন—শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। সে সময়ের সেই উত্তেজনা—সেই আন্দোলন আজ শেষ হইয়াছে। আজ আমরা কালের ব্যবধানে ঘটনাগুলির আলোচনা ধীরভাবে করিতে পারি। কিন্তু আজও সে আলোচনায় কেহ কেহ চাঞ্চল্যের পরিচয় দিয়া থাকেন। এই ব্যাপারে শিবনাথ প্রভৃতি কেশবচন্দ্রের সমাজ ত্যাগ করিলেন—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। এই ব্রাহ্মসমাজের কাজেই শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার জীবন ব্যয় করিয়া গিয়াছেন—ব্যাখ্যা, প্রচার, উপদেশ এই সকলের তিনিই বহুদিন কেন্দ্র ছিলেন। তিনি যেন সমাজের শক্তিকেন্দ্রে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সে শক্তি নিয়ন্ত্রিত করিতেন।

তাঁহার সরলতা, তাঁহার নিষ্ঠা, তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা বা তাঁহার অমায়িক ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করিত। ধর্ম্ম বা আচার সম্বন্ধে যাহাদের সঙ্গে তাঁহার মতের ঐক্য ছিল না, তাঁহারাও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ—তাঁহার আন্তরিকতায় কেহ কখন সন্দেহ করিতে পারিতেন না। তিনি স্বদেশে ও বিদেশে আপনার ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া যশ অর্জ্জন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মসমাজের কাজই শাস্ত্রীমহাশয়ের জীবনের সর্ব্বপ্রধান কাজ। কিন্তু তাহার কথায় আমরা যেন তাঁহার সাহিত্যিক ও রাজনীতিক কার্য্য বিস্মৃত না হই।

তিনি যশস্বী সাহিত্যিক ছিলেন। মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশে' যখন যুবক শিবনাথের খণ্ডকাব্য 'নির্ব্বাসিতের বিলাপ' প্রকাশিত হয়, তখন লোক তাঁহার কবিপ্রতিভায় মুগ্ধ হইয়াছিল। তাহার পর তিনি 'পুষ্পমালা' ও 'হিমাদ্রিকুসুম' কবিতাপুস্তক; 'ছায়াময়ী পরিণয়' রূপককাব্য, 'মেজবৌ,' 'যুগান্তর, 'নয়নতারা, 'বিধবার ছেলে', উপন্যাস এবং 'আত্মচরিত' বাঙ্গলায় রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি বহু পুস্তিকা প্রচার করিয়াছিলেন এবং ইংরাজীতে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। শিবনাথের 'মেজবৌ' ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সুরুচির কুটীর' বাঙ্গালীর স্ত্রীপাঠ্য উপন্যাসের অগ্রণী। 'মেজবৌ'তে তিনি আপনার জীবনের কতিপয় ঘটনাও সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি গল্প করিতে ভালবাসিতেন—তাঁহার গল্প করিবার ক্ষমতাও অসাধারণ ছিল। শেষোক্ত উপন্যাসত্রয়ে তাহার প্রকৃত পরিচয় আছে।

রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ

ব্যক্তিদিগের সহিত একযোগে কাজ করিয়াছেন। তিনি ভারত-সভার প্রতিষ্ঠাতাদিগের অন্যতম। যখন ছোটলাট মেকেঞ্জির সময় কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনে স্বায়ত্ত-শাসন ক্ষুণ্ণকরা হয়, তখন তিনি তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দিয়া টাউন হলে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতির নির্ব্বাসনেরও তিনি প্রতিবাদ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

শাস্ত্রী মহাশয়কে হারাইয়া বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীসমাজ সত্য সত্যই দরিদ্র হইয়াছে। —দৈনিক বসুমতী।

শ্রীমান্ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

[গত ৪ঠা আশ্বিন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শান্তিনিকেতন ব্রহ্মমন্দিরে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীমান্ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করেন। তদুপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহা তিনি লিখিয়া দিয়াছেন। নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল।]

এখানে যারা একসঙ্গে এসে মিলেচি তাদের অনেকেই একদিন পরস্পরের পরিচিত ছিলুম না; কোন্ গৃহ থেকে কে এসেচি তার ঠিক নেই। যে দিন কেউ এসে পৌঁছল তার আগের দিনেও তার সঙ্গে অসীম অপরিচয়। তার পরে একেবারে সেই না-জানার সমুদ্র থেকে জানা-শোনার তটে মিলন হল, তার পরে এই মিলনের সম্বন্ধ কতদিনের কত না-দেখা-শুনোর মধ্যে দিয়েও টিকে থাকবে। এই জানাটুকু কতই সঙ্কীর্ণ, অথচ তার পূর্ব্বদিনের না-জানা কত বৃহৎ।

মায়ের কোলে যেমনি ছেলেটি এল অমনি মনে হল এদের পরিচয়ের সীমা নেই। যেন তার সঙ্গে অনাদি কালের সম্বন্ধ, অনন্তকাল যেন সেই সম্বন্ধ থাকবে। কেন এমন মনে হয়? কেননা, সত্যের ত সীমা দেখা যায় না। সমস্ত "না" বিলুপ্ত করেই সত্য দেখা দেয়। সম্বন্ধ যেখানেই সত্য সেখানে ছোট হয় বড়, মুহূর্ত্ত হয় অনন্ত; সেখানে একটি শিশু আপন পরম মূল্যে সমস্ত সৌরজগতের সমান হয়ে দাঁড়ায়, কেবল জন্ম এবং মৃত্যুর সীমার মধ্যে তার জীবনের সীমা দেখা যায় না, মনের মধ্যে আকাশের ধ্রুব তারাটির মত সে দেখা দেয়। যার সঙ্গে সম্বন্ধ গভীর হয় নি তা'কে মৃত্যুর মধ্যে কল্পনা করতে মন বাধা পায় না, কিন্তু পিতামাতাকে, ভাইকে, বন্ধুকে যে জানি তার মধ্যে সত্যের ধর্ম্ম আছে—সেই সত্যের ধর্ম্মই নিত্যতাকে দেখিয়ে দেয়। অন্ধকারে আমরা হাতের কাছের একটুখানি জিনিষকে একটুখানি জায়গার মধ্যে দেখ্‌তে পাই। একটু আলো পড়বা মাত্র দেখ্‌তে পাই; দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যা-কিছু ভয়ভাবনা সমস্ত অন্ধকার থেকেই হয়েচে। সত্য সম্বন্ধ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সেই আলো ফেলে এবং এই আলোতে আমরা নিত্যকে দেখি।

হৃদয়ের আলো হচ্চে প্রীতির আলো, অপ্রীতি হচ্চে অন্ধকার। অতএব এই প্রীতির আলোতে আমরা যে সত্যকে দেখ্‌তে পাই সেইটিকে শ্রদ্ধা করতে হবে; বাহিরের অন্ধকার তাকে যতই প্রতিবাদ করুক এই শ্রদ্ধাকে যেন বিচলিত না করে। সত্য-প্রীতির কাছে অন্ত বলে কিছু নেই, সত্যপ্রীতি ভূমাকেই জানে। সংসার সেই ভূমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, মৃত্যু সেই ভূমার বিরুদ্ধে প্রমাণ দিতে থাকে কিন্তু প্রেমের অন্তরতম অভিজ্ঞতা যেন আপনার সত্যে আপনি বিশ্বাস না হারায়।

আমাদের যে অতিপ্রিয়, প্রিয়দর্শন ছাত্রটি এখানে এসেছিল—না-জানার অতলস্পর্শ অন্ধকার থেকে জানার জ্যোতির্ম্ময় লোকে—এল তার জাগ্রত জীবন্ত ঔৎসুক্যপূর্ণ চিত্ত নিয়ে, আমাদের কাজে কর্ম্মে সুখে দুঃখে যোগ দিলে—আজ শুনচি সে নেই। কিন্তু যেই শুনলুম সে নেই অমনি তার কত ছোট ছোট কথা বড় হয়ে উঠে আমাদের মনের সাম্‌নে দেখা দিলে। ক্লাসে যখন সে পড়ত তখন সেই পড়ার সময়কার বিশেষ দিনের বিশেষ এক একটি সামান্য ঘটনা, বিশেষ কথায় তার হাসি, বিশেষ প্রশ্নের উত্তরে তার উৎসাহ, এ সব কথা এতদিন বিশেষ ভাবে মনে ছিল না, আজ মনে পড়ে গেল। তার পরে ছেলেদের আনন্দবাজারে যে সব কৌতুকের উপকরণ সে জড় করেছিল সে সমস্ত আজ বড় হয়ে মনে পড়েচে।

বড়লোকের বড়কীর্ত্তি আমাদের স্মরণক্ষেত্রে আপনি জেগে উঠে। সেখানে কীর্ত্তিটাই নিজের মূল্যে নিজেকে প্রকাশ করে। কিন্তু এই বালকের যে সব কথা আমাদের মনে পড়চে তাদের ত নিজের কোনো নিরপেক্ষ মূল্য নেই। তারা যে বড় হয়ে উঠেছে সে কেবল একটি মূল সত্যের যোগে। সেই সত্যটি হচ্চে সেই বালক স্বয়ং। পূর্ব্বেই বলেচি সত্য ভূমা। অর্থাৎ বাইরের মাপে, কোনো প্রয়োজনের পরিমাণে তার মূল্য নয়—তার মূল্য আপনাতেই। সেই মূল্যেই তার ছোটও ছোট নয়, তার সামান্য চিহ্নও তুচ্ছ নয়—এই কথাটি ধরা পড়ে প্রেমের কাছে।

তোমাদের সঙ্গে সে যে হেসেছিল, খেলেছিল, এক সঙ্গে পড়েছিল একি কম কথা! তার সেই হাসি খেলা, তোমাদের সঙ্গে তার সেই পড়াশোনা মানুষের চিরন্তন সৌহার্দ্দ্য ধারারই অঙ্গ, সৃষ্টির মধ্যে যে অমৃত আছে সেই অমৃতেরই অংশ। আমাদের এখানে তোমাদের যে প্রাণপ্রবাহ, যে আনন্দপ্রবাহ, বয়ে চলেছে তার মধ্যে সেও তার জীবনের গতি কিছু দিয়ে গেল, এখানকার সৃষ্টির মধ্যে সেও আপনাকে কিছু রেখে গেল। এখানে দিনের সঙ্গে দিন, কাজের সঙ্গে কাজ, ভাবের সঙ্গে ভাব প্রতিদিন যে গাঁথা পড়চে, নানা রঙে নানা সুতোয় মিলে এখানে একটি রচনাকার্য্য চল্‌চে, সেই জন্যে এখানে আমাদের সকলেরই জীবনের ছোটবড় নানা টুক্‌রো ধরা পড়ে যাচ্চে; সেই বালকেরও জীবনের যে অংশ এখানে পড়েচে সমস্ত আশ্রমের মধ্যে সেইটুকু রয়ে গেল এই কথাটি আজ তার শ্রাদ্ধ দিনে মনে করতে হবে।

তা ছাড়া তার জীবনের কীর্ত্তিও কিছু আছে এখানে। ভুবনডাঙ্গার গরীবদের জন্যে সে এখানে যে নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করে গেছে তার কথা তোমরা সবাই জান। চাঁদা সংগ্রহ করে আমরা অনেক সময়ে মঙ্গল অনুষ্ঠানের চেষ্টা করে থাকি। কিন্তু তার চেয়ে বড় হচ্চে নিজের সাধ্য দ্বারা; নিজের উপার্জ্জনের অর্থের দ্বারা কাজ করা। নৈশবিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে মুলু তাই করেচে। সে পুরোণো কাগজ নিজে বোলপুরে বয়ে নিয়ে বিক্রি করে এই বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ করত। সে নিজে তাদের শেখাত, তাদের আমোদ দিত, এ সম্বন্ধে আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষের কোনো

সাহায্য সে নেয় নি—এই অনুষ্ঠানটি কেবল যে তার ইচ্ছা থেকে প্রসূত তা নয় তার নিজের ত্যাগের দ্বারা গঠিত। তার এই কাজটি, এবং তার চেয়ে বড়, তার এই উৎসাহটি আশ্রমে রয়ে গেল।

পূর্ব্বে বলেছি অপরিসীম অ-জানা থেকে জানার মধ্যে মানুষ আসবামাত্রই সেই না-জানার শূন্যতা এক নিমেষে চলে যায়—সেই না-জানার মহাগহ্বর সত্যের দ্বারা নিমেষে পূর্ণ হয়ে যায়। অন্তরের মধ্যে বুঝতে পারি আমাদের গোচরতা এবং অগোচরতা দুইকেই ব্যাপ্ত করে সত্যের লীলা চল্‌চে। অগোচরতা সত্যের বিলোপ নয়। পাবার বেলায় এই যে আমাদের অনুভূতি ছাড়্‌বার বেলায় এ'কে আমরা ভুলব কেন? ঢেউয়ের চূড়াটি নীচের থেকে উপরে যখন উঠে পড়ল তখন সত্যের বার্ত্তা পেয়েছি, ঢেউয়ের চূড়াটি যখন উপর থেকে নীচে নেমে পড়ল তখন সত্যের সেই বার্ত্তাটিকে কেন বিশ্বাস করব না? এক সময়ে সত্য আমাদের গোচরে এসে "আমি আছি" এই কথাটি আমাদের মনের মধ্যে লিখে দিলে—তার স্বাক্ষর রইল; এখন সে যদি অগোচরে যায় অন্তরের মধ্যে তার এই দলিল মিথ্যা হবে কেন? ঋষি বলেচেন—

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ।"

এই শ্লোকটির অর্থ এই যে, মৃত্যু সৃষ্টির বিরুদ্ধ শক্তি নয়। এই পৃথিবীর সৃষ্টিতে যেগুলি চালক শক্তি তার মধ্যে অগ্নি হচ্চে একটি; অণু পরমাণুর অন্তরে অন্তরে থেকে তাপরূপে অগ্নিযোজন বিয়োজনের কাজ করচেই। সূর্য্যও তেমনি পৃথিবীর সমস্ত প্রাণকে এবং ঋতুসম্বৎসরকে চালনা করচে। জল পৃথিবীর নাড়ীতে নাড়ীতে প্রবহমান, বায়ু পৃথিবীর নিশ্বাসে নিশ্বাসে সমীরিত। সৃষ্টির এই ধাবমান শক্তির মধ্যেই মৃত্যুকেও গণ্য করা হয়েচে। অর্থাৎ মৃত্যু প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রাণকে অগ্রসর করে দিচ্চে—মৃত্যু ও প্রাণ এই দুইয়ে মিলে তবে জীবন। এই মৃত্যুকে প্রাণের থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিভক্ত করে দেখ্‌লে মিথ্যার বিভীষিকা আমাদের ভয় দেখাতে থাকে। এই মৃত্যুও প্রাণের বিশ্বব্যাপী বিরাট ছন্দের মধ্যে আমাদের সকলের অস্তিত্ব বিধৃত হয়ে লীলায়িত হচ্চে; এই ছন্দের যতিকে ছন্দের থেকে পৃথক্ করে দেখ্‌লেই তাকে শূন্য করে দেখা হয়, দুইকে অভেদ করে দেখ্‌লেই তবেই ছন্দকে পূর্ণ করে পাওয়া যায়। প্রিয়জনের মৃত্যুতেই এই যতিকে ছন্দের অঙ্গ বলে দেখা সহজ হয়—কেননা আমাদের প্রীতির ধনের বিনাশ স্বীকার করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। এই জন্যে শ্রাদ্ধের দিন হচ্চে শ্রদ্ধার দিন, এই কথা বলবার দিন যে, মৃত্যুর মধ্যে আমরা প্রাণকেই শ্রদ্ধা করি।

আমাদের প্রেমের ধন স্নেহের ধন যারা চলে যায় তারা সেই শ্রদ্ধাকে জাগিয়ে দিক, তারা আমাদের জীবনগৃহের যে দরজা খুলে দিয়ে যায় তার মধ্য দিয়ে আমরা শূন্যকে যেন না দেখি, অসীম পূর্ণকেই যেন দেখতে পাই। আমাদের সেই যে অসত্য দৃষ্টি যা জীবন মৃত্যুকে ভাগ করে ভয়কে জাগিয়ে তোলে তার হাত থেকে সত্যস্বরূপ আমাদের রক্ষা করুন, মৃত্যুর ভিতর দিয়ে তিনি আমাদের অমৃতে নিয়ে যান।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্রাহ্মসমাজ।

শাস্ত্রীমহাশয়ের স্বর্গারোহণেঃ—গিরিডি—ভক্তিভাজন আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমনের পরের দিন ১লা অক্টোবর গিরিডির ব্রাহ্মগণ ঐ সংবাদ প্রাপ্ত হন। সেই দিনই সন্ধ্যাকালে ব্রাহ্মগণ স্থানীয় ব্রাহ্মমন্দিরে মিলিত হন। একটি সঙ্গীত ও সংক্ষিপ্ত উপসনার পরে, শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য, ব্রাহ্মদিগের কি করা প্রয়োজন, সেই বিষয়ে পরামর্শ হয়।

২রা অক্টোবর অপরাহ্নে স্থানীয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মব্রাহ্মিকা এবং শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ অনেক ভদ্রলোক ব্রহ্মমন্দিরে মিলিত হন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তৎপরে সঙ্গীত ও প্রার্থনান্তে সমস্ত পুরুষ ও মহিলাগণ শ্রদ্ধাপূর্ণ অন্তরে দণ্ডায়মান হন এবং সমস্ত মন্দির এক অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ হইয়া উঠে। এই সময়ে স্বয়ং সভাপতি ব্রাহ্মসমাজের নেতা ও ভক্তিভাজন আচার্য্যের পরলোকগমনের শোকপ্রকাশের প্রস্তাবটি অত্যন্ত ভক্তিপূর্ণ অন্তরে পাঠ করেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হয়।

১৪ই অক্টোবর অপরাহ্ণ ৩টার সময় ব্রাহ্মসমাজ-প্রাঙ্গণে গিরিডির নীতিবিদ্যালয়ের ও ছাত্রীসমিতির ছাত্রী ও বালকগণ শাস্ত্রীমহাশয়ের জীবনের মহত্ব ও দেবভাব স্মরণ করিবার জন্য মিলিত হন। বিস্তর মহিলা ও কতিপয় ব্রাহ্ম তাহাদের পবিত্র অনুষ্ঠানে যোগদান করেন; সর্ব্বাগে বালকবালিকাগণ প্রায় দুইশত ভিখারীকে চাউল ও পয়সা বিতরণ করেন, তাহার পরে সঙ্গীত ও প্রার্থনান্তে বালক ও ছাত্রীগণ দুইটি রচনা, শাস্ত্রীমহাশয়ের দুইটি উৎকৃষ্ট কবিতা এবং তাঁহার আত্মচরিতের কয়েকটি স্থান হইতে পাঠ করিয়া সভাভঙ্গ করেন।

১৫ই অক্টোবর অপরাহ্ণ ৫টার সময়, গিরিডি সহরের সকল সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষ হইতে, হোমভিলার বিস্তৃত প্রাঙ্গণে, এক বৃহৎ শোকসভার অধিবেশন হইয়াছিল। বিস্তর পুরুষ ও মহিলা স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীমহাশয়ের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবার জন্য উক্ত সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ সভাপতির আসনগ্রহণ করেন। তৎপরে সঙ্গীতান্তে শাস্ত্রীমহাশয়ের সংস্কৃত কলেজের বন্ধু পণ্ডিত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম বসু বি, এ, কুমারী সুখলতা দুয়ারা বি, এ, শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র রায় বি, এল, স্থানীয় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসাদ এম, এ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন বি,এ, শ্রদ্ধাপূর্ণ অন্তরে শাস্ত্রীমহাশয়ের মহত্ব বর্ণনা করেন। অবশেষে সভাপতিমহাশয়ের বক্তৃতার পরে একটি সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হয়।

জলপাইগুড়ি ঃ—গত ৩০শে সেপ্টেম্বর মহাত্মা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন জানিয়া-স্থানীয় ব্রাহ্মমণ্ডলী ২রা অক্টোবর বৃহস্পতিবার তাঁহার স্মরণার্থ একটী বিশেষ উপাসনার আয়োজন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্তা কুলদা চট্টোপাধ্যায় সঙ্গীত ও শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে কিছু পাঠ করিয়াছিলেন।

মজিলপুর :—গত ৫ই অক্টোবর রবিবার চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত মজিলপুর (শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বগ্রাম) গ্রামে স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিবার জন্য একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। রায়সাহেব রামপদ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। রায়সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত, রেভাঃ গোপালচন্দ্র দত্ত, পণ্ডিত তারাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল দত্ত প্রভৃতি স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের উন্নত চরিত্র, অসাধারণ স্বার্থত্যাগ, জলন্ত ধর্ম্মপ্রাণতা প্রভৃতির বিষয় উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন। মজিলপুর গ্রামে শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য একটী কমিটি গঠিত হইয়াছে ও অর্থ সংগৃহীত হইতেছে।

সিমলা :—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতিকল্পে, বিগত ৮ই অক্টোবর সিমলায় এক মহতি সভার অধিবেশন হয়। মাননীয় বিচারপতি সার্ আশুতোষ চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মিঃ এম্, আর, দাস, মিঃ ঈশ্বরচন্দ্র মুখার্জ্জী, লালা সুন্দরদাস, রায় সাহেব শ্রীশচন্দ্র লাহিড়ী প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

রাঁচি :—ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমনোপলক্ষে বিগত ৮ই অক্টোবর তারিখে, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে রাঁচি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে একটী বিশেষ স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। সভাগৃহে সকল সম্প্রদায়ের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এরূপ মহতী সভা রাঁচি সহরে অল্পই হইয়াছে। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী সঙ্গীতের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম সঙ্গীতের পর সভাপতি মহাশয় একটী প্রার্থনা করেন। তৎপরে কয়েকজন বক্তা শাস্ত্রী মহাশয়ের বহুমুখী প্রতিভা ও কার্য্যাবলীর আলোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন। সর্ব্বপ্রথমে শ্রীমতী সুমতিবালা রায়ের লিখিত একটী প্রবন্ধ পঠিত হয়। তাহাতে তিনি নারীজাতির কল্যাণ কামনায় শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনব্যাপী সংগ্রাম ও স্বার্থত্যাগের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। রায় বাহাদুর ডাঃ চুণীলাল বসু পরলোকগত মহাত্মার জীবন স্মৃতি এবং কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বর্ণনা করেন। তৎপরে ব্যারিষ্টার মিঃ পি, কে, সেন ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্যে শাস্ত্রী মহাশয়ের স্বার্থত্যাগের উল্লেখ করিয়া বলেন যে আমাদের দেশের ইতিহাসে স্বার্থত্যাগের এরূপ জলন্ত দৃষ্টান্ত অতীব বিরল। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনীর পর্য্যালোচনা করেন। তৎপরে অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার শাস্ত্রী মহাশয়ের কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও নৈতিক সাহস সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় এবিষয়ে একটী উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা করেন।

বাগনান :—গত ১১ই অক্টোবর শুক্রবারে বাগনান ব্রাহ্মসমাজে পরলোকগত ভক্তিভাজন শাস্ত্রীমহাশয়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছিল। ভবানীপুর হইতে শ্রীযুত কালীমোহন বসু মহাশয় শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। স্থানীয় সমাজের আচার্য্য শ্রীযুত শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

দেরাদুন :—গত ১২ অক্টোবর, দেরাদুন ব্রাহ্মসমাজ পূজ্যপাদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন। শ্রীযুক্ত হরিনাথ দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, শাস্ত্রী মহাশয়ের একটী সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত পাঠ করেন।

বিগত ১৩ই অক্টোবর, রবিবার অপরাহ্ন ৩॥ ঘটিকার সময় ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে মহাত্মা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমন উপলক্ষে শোকপ্রকাশের জন্য একটি সভার অধিবেশন হয়। স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত মনোমোহন গুহ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শাস্ত্রীমহাশয়ের রচিত একটি কীর্ত্তনের পর আর একটী সঙ্গীত হইলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সর্ব্ব প্রথমে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র নাগ প্রার্থনা করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত মতিলাল সরকার একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলে, শ্রীযুক্ত হারাণ চন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত সেন, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সরকার, শ্রীযুক্ত জগতচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র নাগ ও সভাপতি মহাশয় পরলোকগত মহাত্মার জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তদনন্তর শাস্ত্রীমহাশয়ের রচিত আর একটি কীর্ত্তন হইলে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদপূর্ব্বক সভার কার্য্য শেষ হয়।

রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা :—বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর শনিবার সায়ংকালে বরিশাল ব্রহ্মমন্দিরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা হয়। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র নাগ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সর্ব্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী "ভাবে সেই একে" এই সঙ্গীত করিলে শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস বি, এ প্রার্থনা করেন। তৎপরে একে একে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল, সত্যানন্দ দাস, বি-এ, মৌলবী মহিউদ্দিন আহাম্মদ এবং সভাপতি রাজার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য বিবৃত করিয়া বক্তৃতা করেন।

বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর সায়ংকালে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে একটি স্মৃতি-সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস, ই, এ, সি, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সঙ্গীত ও প্রার্থনান্তে শ্রীযুক্ত মতিলাল সরকার "তত্ত্ব-কৌমুদী" হইতে মহাত্মার জীবনী সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র সেন আর একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলে, শ্রীযুক্ত জগৎচন্দ্র দাস ও সভাপতি মহাশয় রাজার জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

ভক্তস্মৃতি—বিগত ৩রা আশ্বিন শনিবার সায়ংকালে ছাত্র-সমাজের বিশেষ অধিবেশনে, ভক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের জীবন সম্বন্ধে বক্তৃতাদি হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ দাস বি-এ, শ্রীযুক্ত শ্রীচরণ সেন এবং সভাপতি বক্তৃতা করেন।

ব্রাহ্মিকাসমাজ—বিগত ১১ই আশ্বিন রবিবার অপরাহ্নে বরিশালস্থ সর্ব্বানন্দভবনে ব্রাহ্মিকাসমাজের মাসিক অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "ব্যাকুলতা" বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন।

বিবাহ—বিগত ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৩ই আশ্বিন মঙ্গলবার শ্রীযুক্ত এককড়ি সিংহ রায়ের দ্বিতীয়া কন্যা কুমারী সুরমার সহিত শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেনের প্রথম পুত্র শ্রীমান্ অমিয়কুমারের বিবাহ বানীবনে সম্পন্ন হয়, শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে অন্নদা বাবু নিম্নলিখিত-রূপে দান করিয়াছেন—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগ ৫৲, দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে ৩৲, সাধনাশ্রম ২৲, বানীবন ব্রাহ্মসমাজ ৫৲, বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ (প্রচার ফণ্ড) ৫৲, কলিম্পং অনাথাশ্রম ৫৲, কোন দুস্থ পরিবারের সাহায্যার্থে ৫৲ মোট ৩০৲।

বিগত ১৫ই অক্টোবর বুধবার পরলোকগত দ্বিজদাস বিশ্বাসের পুত্র শ্রীমান্ জিতেন্দ্রকুমারের সহিত শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ করের প্রথমা কন্যা কল্যানীয়া নর্ম্মদার বিবাহ কটক সহরে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত লালমোহন চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিগত ২৫শে অক্টোবর শনিবার পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণের কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী সুখময়ীর সহিত পরলোকগত কৃষ্ণদয়াল রায়ের পুত্র শ্রীমান্ বিমলাংশুর বিবাহ হইয়াছে। ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য আচর্য্যের কার্য্য করেন।

ভগবানের আশীর্ব্বাদ নবদম্পতি সকলের মস্তকে বর্ষিত হউক।

উৎসব—গিরিডি ব্রাহ্মসমাজের মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন উপলক্ষে গত ১১ই অক্টোবর হইতে ১৪ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ব্রহ্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস এম,এ, বি,এল, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা এবং শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কুমারখালী ব্রাহ্মসমাজের সপ্ততিতম বার্ষিক উৎসব নিম্নলিখিত রূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ১৯শে আশ্বিন প্রাতে উদ্বোধনসূচক উপাসনা—অপরাহ্ণে বক্তৃতা বিষয়—"নবযুগ"; ২০শে প্রাতে ও অপরাহ্ণে উপাসনা। ২১শে উষাকীর্ত্তন, প্রাতে উপাসনা ২॥ টায় কাঙ্গালীবিদায় ও নূতন বস্ত্র প্রদান। ২টার সময় সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ প্রামাণিক "ধর্ম্মজীবনে ধৈর্য্যশীলতা" বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন; তৎপর আলোচনা হয়। ৪টায় নগরকীর্ত্তন মন্দির হইতে বাহির হইয়া নগর ভ্রমণান্তে মন্দিরে উপস্থিত হইলে উপাসনা আরম্ভ হয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় তিন দিবসই উপাসনা করেন।

শ্রাদ্ধ—গিরিডি প্রবাসী শ্রীযুক্তা সুবালা ঘোষ পিতৃভবনে স্বামীর বার্ষিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন। ডাক্তার জি, রায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। শ্রাদ্ধকর্ত্রী উক্ত অনুষ্ঠানে কলিকাতা সাধনাশ্রমে ২৲, গিরিডি ব্রাহ্মসমাজে ২৲, ঢাকা ব্রাহ্মসমাজে ১৲ টাকা দান করিয়াছে।

নামকরণ—গত ৭ই অক্টোবর শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দিন্দার প্রথম সন্তানের নামকরণ উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। তারাচাঁদ রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। এতদুপলক্ষে নিম্নলিখিত রূপ দান করা হয়:—কাঁথি ব্রাহ্মসমাজ ১০৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দুর্ভিক্ষ ফণ্ড ৫৲, এবং প্রচারফণ্ডে ৫৲ মোট ২০ টাকা। ভগবান শিশুর মঙ্গলসাধন করুন।

পারলৌকিক—ভাগলপুরের স্বর্গীয় বাবু বামাচরণ ঘোষেরপুত্র শ্রীমান প্রভাতচন্দ্র ঘোষ গত ৪ঠা অক্টোবার সন্ধ্যা ৫—৩৭ মিনিটের সময় নিমোনিয়া রোগে একমাত্র শিশু পুত্র, স্ত্রী, বৃদ্ধমাতা, ভগ্নী, ভাগিনেয় ভাগীনেয়ীকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া মঙ্গলময়ের ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন ও বহুদিন তত্রস্থ সমাজের এসিসটাণ্ট সেক্রেটারী ছিলেন। ভগবান পরলোকগত আত্মার মঙ্গল সাধন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের সান্ত্বনা প্রদান করুন।

সমালোচনা।

আত্মচরিত:—উনবিংশ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত; মূল্য আড়াই টাকা:—প্রাপ্তিস্থান—প্রবাসী আপিস্ এবং ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়।

পরলোকগত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পুণ্যময় জীবন কাহিনী তাঁহারই অমৃতময়ী লেখনী নিঃসৃত। আমরা সমালোচনার জন্য ইহার একখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। এরূপ পুস্তকের সমালোচনা অনাবশ্যক। যাঁহাদের জীবন পথ নানা বিঘ্ন-সঙ্কুল, এই পুস্তক পাঠে তাঁহারা আশার অভয় বাণী অন্তরে উপলব্ধি করিবেন; যাঁহাদের জীবন সংগ্রামময়, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে সবল হইবেন; ধর্ম্মের জন্য যাঁহারা ক্ষুধিত ও তৃষিত এই মধুময় জীবনচরিত পাঠে তাহারা তৃপ্তি লাভ করিবেন। যাহারা ব্রাহ্মসমাজের ক্রমোন্নতির ইতিহাস পাঠ করিতে চান, এই পুস্তক পাঠে তাঁহারা অনেক আবশ্যকীয় উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ বাঙ্গলা সাহিত্য ভাণ্ডারে অতি উচ্চ স্থান লাভ করিবে এবং প্রত্যেক সাহিত্যসেবী ও প্রত্যেক ধর্ম্মার্থীর নিকট ইহা অতি আদরের সামগ্রী হইবে।

বিজ্ঞাপন।

অধ্যক্ষ সভায় সভ্য মনোনয়ন সম্বন্ধে অবান্তর নিয়মের ২য় নিয়মানুসারে জানান যাইতেছে যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে সকল সভ্য অধ্যক্ষ সভায় আগামী বৎসরের (১৯২০) সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় বিবরণ আগামী ১৫ই নবেম্বর ১৯১৯ কিম্বা তৎপুর্ব্বে এই আপিসে পাঠাইবেন। যাঁহারা সভ্যপদপ্রার্থী তাঁহাদের আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম হওয়া প্রয়োজন, সমাজের অন্ততঃ তিন বৎসর মেম্বর থাকা আবশ্যক, এবং অন্যূন ২৫ বৎসরের বয়স হওয়া চাই।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আফিস
২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
২০শে অক্টোবর ১৯১৯।

শ্রীহেরম্বকান্ত বসু,
সহকারী সম্পাদক।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

Registered No C. 65

অসতোমা সদ্গময়,
তমসোমা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—
১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৪শ ভাগ।	১লা অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩২৬, ১৮৪১ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯০	অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲
১৫শ সংখ্যা।	17th November, 1919.	প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে মঙ্গলময় বিধাতা, এ সংসারে আমাদিগকে শোক দুঃখ মৃত্যুর মধ্যে রাখিয়া ও তাহাদিগকে নবজীবনলাভের সহায় ও বন্ধুরূপে নিযুক্ত করিয়া আমাদের কল্যাণের পথ উন্মুক্তই করিয়াছ। আমরা তোমার মঙ্গল ব্যবস্থা বুঝিতে না পারিয়াই অনেক সময় নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়ি ও ইহাদিগকে পরম শত্রু বলিয়া মনে করি। যাহা কিছু অনিত্য ও অসার মৃত্যু তাহাই ধ্বংস করে, যাহা কিছু মলিন ও আবর্জ্জনাময় শোকের আগুন কেবল তাহাই দগ্ধ করে। যাহা কিছু নিত্য ও সার, সুন্দর ও পবিত্র তাহা এই ভাবে আরও জীবন্ত ও উজ্জ্বল হইয়াই আমাদিগের নিকট উপস্থিত হয়,—আমরা নূতন দৃষ্টি, নূতন শক্তি লাভ করিয়া, নূতন জীবনে মণ্ডিত হইয়া, নূতন মানুষ হইয়া উঠি। আমাদের আপন দোষেই সকল সময় তোমার এই শিক্ষা ও মঙ্গলব্যবস্থা আমাদের জীবনে সেরূপ কার্য্যকারী হয় না। হে করুণাময় পিতা, তুমি ভিন্ন আর কে আমাদের সকল ত্রুটি দুর্ব্বলতা দূর করিয়া আমাদিগকে জীবনপথে অগ্রসর করিতে পারে, নবজীবনের পথে লইয়া যাইতে পারে? তোমার মঙ্গল-ব্যবস্থা আমাদের জীবনে ব্যর্থ হইতে দিও না। আমাদের সকল প্রকারের অক্ষমতা দূর করিয়া আমাদিগকে নববলে, নব উৎসাহে পূর্ণ কর, নব তেজে তোমার কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে সমর্থ কর। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

নিবেদন।

সাথী—যাদের উপর নির্ভর করিয়াছিলাম, যারা আমার চিরদিন সঙ্গে থাকিবে ভেবেছিলাম, তারা ত একে একে চ'লে গেল; যাদের সঙ্গে আলাপ ক'রে সুখী হ'তাম, যাদের কত আপনার মনে করিতাম, যাদের সুখী ক'রে অপার আনন্দ লাভ করিতাম, তারা ত আমাকে ত্যাগ করিল। আমি যে এখন একাকী; চারিদিকে অন্ধকার, কাহাকেও খুঁজিয়া পাই না; কতজনকে ডাকি, কিন্তু সাড়া যে পাই না! এই অন্ধকারের মধ্যে, একাকিত্বের মধ্যে কার স্পর্শ পাইলাম? ও কে আমাকে ছুঁইল রে? কে আমার সঙ্গে চলিতেছে, আঁধারের গায়ে গায়ে কার আঁখি জ্বলিতেছে? এ কে? কে আমার অজ্ঞাতে সঙ্গের সাথী হয়ে রয়েছে? এ কি তুমি? এ যে আমার জীবনস্বামী! আমি দেখি নাই, আমি ডাকি নাই; তবুও তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন। হে আমার চিরসঙ্গী, হে আমার চিরসম্বল, আজ আমার তবে কি আনন্দ! আজ আমি তাঁর অভয় লাভ করিলাম।

আশা—তুমি নিরাশ হইতেছ কেন? চারিদিক্ অন্ধকার দেখিয়া ভয় পাইতেছ কেন? যাঁরা পথপ্রদর্শক ছিলেন, তাঁরা একে একে চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া ম্রিয়মাণ হইতেছ কেন? অপ্রেম, কলহ দেখিয়া এত ম্লান হইতেছ কেন? জান না, তিনি সব দেখিতেছেন? জান না, তিনি কত ভালবাসেন? জান না, তিনি নূতন ভাবে সব গঠন করিবেন? জান না, তিনি মরু-ভূমিতে পান্থপাদপ সৃষ্টি করেন? জান না, তিনি পাষাণবক্ষ ভেদ করিয়া স্রোতস্বিনীসকলকে প্রবাহিত করান? জান না, তাঁর প্রেম, তাঁর করুণা অপরাজিত? তবে তাঁর প্রেমের দিকে চাহিয়া আশায় বুক বাঁধ; আপনার দিকে তাকাইও না, ভয় পাইবে; ঊর্দ্ধদিকে তাকাও, তাঁর প্রেমের দিকে তাকাও, তাঁর মুখের দিকে তাকাও। তবে আশা আসিবে, আনন্দ আসিবে, বল পাইবে।

সম্পাদকীয়।

মৃত্যুর মধ্যে জীবন—'এই সংসারে আমরা জীবনের মধ্যে মৃত্যুতেই বাস করিতেছি', ইহা যেমন সত্য, তাহা অপেক্ষাও অধিকতর সত্য—"মৃত্যুর মধ্যেই আমরা প্রকৃত জীবন প্রাপ্ত হই।" প্রতিদিন চারিদিকে মানুষকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখিয়া এবং মরণশীল জীবনের পক্ষে মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও যে মানুষ মৃত্যুকে ভুলিয়া থাকে, ইহা মহাজ্ঞানী যুধিষ্ঠিরের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হইলেও শতসহস্র প্রকার জীবনচেষ্টা ও কর্ম্মবহুলতার মধ্যে এরূপ বিস্মৃতি আমাদের স্থায় চিন্তাবিহীন লোকের পক্ষে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু ইহা যখন অতি নিকটে আসিয়া আপনার প্রিয়জনকে আক্রমণ করে, তখন নিতান্ত মোহাভিভূত ব্যক্তিও আর নিদ্রায় নিমগ্ন থাকিতে পারে না, মৃত্যু সম্বন্ধে সচেতন না হইয়া পারে না। প্রথম দর্শনে উহার বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি প্রাণে মহা আতঙ্ক জন্মাইলেও প্রেম যখন দিব্য দৃষ্টি খুলিয়া হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞান জাগাইয়া দেয়—মৃত্যু অমৃতের সোপান, মৃত্যুর দ্বার দিয়াই অমর লোকে উপস্থিত হইতে হয়—এবং মৃত্যুর সর্ব্বগ্রাসিণী শক্তিকে অস্বীকার করিয়া প্রিয়জনকে প্রিয়তর, সুন্দরতর ও পবিত্রতর রূপে হৃদয়ের অধিকতর নিকটে আনিয়া উপস্থিত করে, তখন আমরা উহাকে সহজেই কল্যাণময়ী দেবতা, হিতকারী বন্ধুরূপেই বরণ করিয়া লই। সত্যই প্রেমের রাজ্যে মৃত্যু নাই, বিচ্ছেদ নাই। প্রেম কোনও প্রকারেই প্রিয়জনের একান্ত বিনাশ, চির বিচ্ছেদ স্বীকার করিতে পারে না। এক দিকে শোকের অনল আমাদের হৃদয়ের সকলপ্রকার ক্ষুদ্রতা ও মলিনতা, অহঙ্কার ও স্বার্থপরতা দগ্ধ করিয়া আমাদিগকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করে, অপর দিকে মৃত্যু প্রিয়জনের জড়ীয় আবরণ ছিন্ন করিয়া, প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশের সমস্ত বাধা দূরীভূত করিয়া আমাদের নিকট তাহার মহত্ব ও সৌন্দর্য্য উজ্জ্বলতর; তখন রূপেই উপস্থিত করে, প্রেম আরও অচ্ছেদ্য ভাবেই প্রেমাস্পদকে হৃদয়ের সঙ্গে যুক্ত করে। ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদের সম্বন্ধে এ কথা আরও সত্য। কেন না, একদিকে যেমন তাঁহাদের বিশেষত্ব ও অসাধারণত্ব দেখিয়া এক শ্রেণীর লোক ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষে পূর্ণ হইয়া তাঁহাদের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হয় এবং তাঁহাদের বিরোধী হইয়া দাঁড়ায়; অপর দিকে তেমনি তাঁহাদের নিকটস্থ বন্ধুগণও তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া ও সাহায্যে নানা মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়া আপনাদের ক্ষুদ্রত্ব ও তাঁহাদের মহত্ব সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারে না। এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, মহাপুরুষগণ মৃত্যুর পরই অধিকতর সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, মৃত্যুর পরই তাঁহাদের শক্তি অধিকতর কার্য্য করিয়াছে, তাঁহাদের ধর্ম্ম অধিকতর বিস্তার লাভ করিয়াছে। অনেক স্থলেই অন্ধ-ভক্তি তাঁহাদিগকে ঈশ্বর বা অবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত অথবা অলৌকিকরূপে প্রেরিত বা বিশেষচিহ্নিত বলিয়া পূজিত করিয়াছে, সন্দেহ নাই। উজ্জ্বল জ্ঞানালোকে আলোকিত এই বিংশশতাব্দীতেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে, সত্য। তথাপি এই মোহান্ধকার আর অধিক দিন লোককে বিপথগামী করিতে পারিবে না বলিয়াই অনুমিত হয়। বিশেষতঃ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যে সেরূপ কোনও আশঙ্কা নাই, তাহা আমরা দৃঢ়তার সহিতই বলিতে পারি—সুতরাং সে বিষয়ে এখানে বিশেষ কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। সেরূপ ভয়ে ভীত হইবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু ইতিহাসের এই সাক্ষ্য কেহই অগ্রাহ্য করিতে পারে না;—মৃত্যু সত্যই নূতন জীবন দিয়াছে। অন্ধ-ভক্তি সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য হইলেও শ্রদ্ধা ও ভক্তি যে ধর্ম্মজীবনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক তাহাও আর বলিতে হইবে না। ইহাও যে একটা পরম লাভ তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এরূপ স্থলে শিষ্য ও অনুচর-বর্গকে যে শুধু অধিকতর নিষ্ঠা ও উৎসাহের সহিত নহে, অধিকতর শক্তির সহিতও কার্য্য করিতে দেখা যায়, তাহার আরও একটা কারণ আছে। পূর্ব্বে মহাপুরুষদের দ্বারা যন্ত্রের ন্যায় চালিত হওয়াতে একদিকে ইহাদের শক্তি সম্যক্‌রূপে বিকশিত হইতে পারে নাই, অপর দিকে আপনাদের অক্ষমতা ভালরূপে বুঝিতে না পারায় ইহারা আকুল প্রাণে হৃদয়দেবতার শরণাপন্ন হইতে ও তাঁহার নিকট বল ভিক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। বলা অনাবশ্যক, আত্মসমর্পণ ও ব্যাকুল প্রার্থনা ব্যতীত কোন প্রকারেই শক্তি সম্যক্ রূপে বিকশিত হইতে পারে না। ইহাও সামান্য লাভ নহে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় মৃত্যু যে জীবনেরই হেতুস্বরূপ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এবার মৃত্যু আমাদের মধ্যে যে প্রকার নিকটতমরূপে উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা যদি আমাদিগকে নবজীবন প্রদান না করে, আমাদিগের নবচেতনার ও নবশক্তিলাভের কারণ না হয়, জীবনে নূতন ত্যাগ ও আত্মসমর্পণ আনয়ন না করে, হৃদয়ে আকুল প্রার্থনা ও জীবন্ত বিশ্বাস না জাগায়, তবে মৃত্যুর মহাশিক্ষা, মঙ্গলবিধাতার কল্যাণ ব্যবস্থা, আমাদের জীবনে ও সমাজে ব্যর্থ হইবে। শুভ বুদ্ধিদাতা আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন, তাঁহার একান্ত শরণাপন্ন করুন। তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছার জয় হউক।

জীবনান্তে।*

ব্রহ্মার্পণ মন্ত্র—এই পবিত্র শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ব্রহ্মেতে অর্পিত হউক। পণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয়কে নানা জনে নানা স্থানে নানাভাবে ব্যক্ত করিতেছেন ও করিবেন। আমার তাঁহার পবিত্র গুণানুকীর্ত্তন করিতে ইচ্ছা থাকিলেও সময় শক্তি সকলই অল্প। দু'একটি কথা না বলিয়া কাজ শেষ করিলে অপরাধ হইবে, তাই সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। জগতে মানবমাত্রেই কিছু কাজ করিয়া যায়; তাহার ইতিহাস কে জানিতে চায়? কিন্তু যাঁহারা নানাদিকে মহাজনবৎ কাজ করিয়াছেন তাঁহাদের ইতিহাসই লোকে জানিতে ও দেখিতে চায়। শিবনাথ কি সেই জাতীয়? এ জাতির যে লক্ষণকে আমি বিশেষ রূপে ধরিয়াছি ও বুঝিয়াছি, ইহার তাহা প্রকাশ হইবার দিন আসিতেছে। সে কি? খৃষ্ট পৃথিবী হইতে চলিয়া গেলেন, তাঁহাকে তাঁহার শিষ্যেরা দেখিল, তিনি

* ব্রহ্মমন্দিরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে ২রা নবেম্বর প্রাতে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস কর্তৃক বিবৃত।

কবর থেকে উঠে দেখা দিলেন। ইহার ব্যাখ্যা এখানে অনেক হয়েছে। কিন্তু মানুষটি যে আড়াই বৎসর সামান্য কাজ করিয়াছিলেন তাহাও ইতিহাসে উঠিবার মত কিছু নয়; তবে মৃত্যুটি বা মৃত্যুর পরের ঘটনাই খৃষ্ট-জগতের অপূর্ব্ব ইতিহাস —এখানেই খৃষ্ট দেখা দিলেন। ইঁহার বিষয়, কি অন্য মহাজনদের বিষয় বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আজ রাজাকে স্মরণ না করিয়া পারি না—রামমোহনের জীবিত কালের কাজ আরও অল্প বোধ হয়; আর কোন মহাজনদের জীবিত কালের কাজ এত অল্প নয়; তিনি অল্প কাজ করিয়া ব্রিষ্টলে দেহরক্ষা করিলেন। তিনি সে সমাধি হইতে উঠিয়াছেন, ইহা কেহ বিলাতের লোক দেখে নাই; কিন্তু বহুদিন পরে তাঁহার পুনরুত্থান ভারতবর্ষের লোক—বাঙ্গালার লোক প্রথম দেখিল। দশ বৎসর পর এক জনের মধ্যে একটুক প্রকাশ হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকের মধ্যে প্রকাশ হইলেন; কিন্তু যেন ভাল করিয়া কেহ তাঁহাকে দেখিল না। ঈশ্বর আপনার মহাপুত্রকে প্রকাশ করিবার জন্যই যেন পণ্ডিত শিবনাথ ও সেই সঙ্গে কয়েক জনকে আনিলেন। ইনি জীবনে সর্ব্বময় কর্ত্তাকে দেখিয়া, বিশ্বজনীন ধর্ম্মের ভাব ও স্বাধীনতার পতাকা হস্তে লইয়া ব্রাহ্মজগতে দাঁড়াইলেন। শিবনাথ জ্ঞানে বা কর্ম্মে যে তাঁহার গুরুদিগকে অতিক্রম করিতে পারিলেন, তাহা নয়; গভীর আধ্যাত্মিকতায়ও তিনি তাঁহাদের পশ্চাতেই থাকিলেন। কিন্তু রামমোহন যে স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, পরিবারে, সমাজে বা ব্যক্তিগতজীবনে সে স্বাধীনতা ভাল করিয়া ধরিলেন এবং ধরাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জনসমাজ নানা শৃঙ্খলে আবদ্ধ; তাহার উপর অনন্ত জীবনের পরম সম্বল যে ধর্ম্মধন তাহাতেও মানুষ শৃঙ্খলাবদ্ধ। তাহা ছাড়াইয়াও যেন ছাড়াইতে পারে না; তাই সেই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মহাজন রামমোহনকে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এখন রামমোহন দেশে বিদেশে মহাজন বলিয়া গৃহীত। শিবনাথের সেই দিন অপেক্ষা করিতেছি—কবে তিনি কাহার বা কাহাদের ভিতর প্রকাশ হইবেন, যাহাতে তাঁহার জীবিত কালের কাজ ছোট হইয়া যাইবে; তখনই তাঁহার স্মৃতি আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে। আর যে লোক চলিয়া গেলে কতকগুলি মৃত কাষ বা বন্ধুদের কতকগুলি মৃত অনুষ্ঠান স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহা কিছুই নয়। তাঁহার ভাব বুঝিতে না পারিয়া সমাজমধ্যে স্বাধীনতার কিছু অপব্যবহার হওয়ায় শেষজীবনে তাহার সঙ্গে সাধুভক্তির যোগ করিয়া দিয়াছেন। ঈশ্বরানুগত জীবন তাহার ছিল। তিনিই স্বাধীনতার পতাকা হাতে ধরিবার যোগ্য লোক ছিলেন। আজ তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে সকলে সেই জীবনে তাঁহার পুনরুত্থান প্রার্থনা করি। আজ অযোগ্য হইয়াও বলিতেছি, "শ্রদ্ধেয় বন্ধু, তোমাকে বিদায় দিতে আসি নাই, শ্রাদ্ধক্রিয়া দ্বারা সম্বন্ধ কাটাইতে আসি নাই, আজ জীবনে তোমাকে গ্রহণ করিতে আসিয়াছি। তুমি যেমন ঈশ্বরের মহাদাসকে প্রকাশ করিয়া গেলে, সর্ব্বময় কর্ত্তার জয় ঘোষণা করিয়া গেলে, আমরা যেন তোমাকে মহাপুত্ররূপে দে'খে কর্ত্তার জয় ঘোষণা করিয়া যাইতে পারি। তোমার কাজ এখন পুনরায় আরম্ভ হউক, তোমাকে সকলে দেখুক। তুমি তোমার প্রিয় ঈশ্বরেতে আছ, তুমি তোমার প্রিয় ব্রাহ্মসমাজে আছ, তুমি তোমার ভাইভগিনীদের মধ্যে আছ। বিশ্বাসী জগৎ জাগ্রত হউক, ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা। তোমার আত্মার কল্যাণ হউক, তোমাকে পেয়ে জগৎ কল্যাণলাভ করুক।"

ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।

আচার্য্য শিবনাথ*।

বিন্ধ্য পর্ব্বত নাকি মাথা তুলিয়া চন্দ্র সূর্য্যের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এই বিপদ্ নিবারণের জন্য দেবতারা বিন্ধ্যের গুরু ঋষি অগস্ত্যের শরণ লইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া শিষ্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। বিন্ধ্য তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া যেমন ভক্তিভরে তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন, অমনি গুরু তাঁহার আনত মস্তকে হাত দিয়া বলিলেন, আমি যাবৎ না প্রত্যাগত হই তুমি এই ভাবে অবস্থান কর। দক্ষিণ দিকে গিয়া অগস্ত্য আর ফিরিলেন না, গুরুর আদেশ অলঙ্ঘ্য মানিয়া বিন্ধ্যও আর মাথা তুলিলেন না। মধ্য ভারতের পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত তাঁহার বিস্তার যতই হউক, হিমালয়ের মত তাহার দূর হইতে দর্শনীয়, গগনস্পর্শী, তুষারশুভ্র শিখররাজির উত্থান অসম্ভব রহিল। এটা পৌরাণিক কাহিনী। কিন্তু এই যুগে, যখন ব্যক্তিত্বের সহিত আত্মপ্রচার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বহুল আয়োজন চারিদিকে প্রবল, সেই সময়ে আমাদের সৌভাগ্যক্রমে, আমাদের চক্ষুর সম্মুখে এমন একখানি জীবন দেখিয়াছি যাহার সঙ্গে এই বিন্ধ্যকাহিনীর কতকটা সাদৃশ্য অনুভব করিতেছি। সেই জীবনখানি ভক্তিভাজন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের।

১২৫৩ সালে ১৯শে মাঘ, কুলীন বৈদিক-ব্রাহ্মণকুলে তাঁহার জন্ম হয়। প্রপিতামহ রামজয় ন্যায়ালঙ্কার, পিতা হরানন্দ বিদ্যাসাগর, মাতুল স্বনামখ্যাত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। পিতৃমাতৃকুলে পাণ্ডিত্যের ও সামাজিক মর্য্যাদার অভাব ছিল না। তিনি স্বয়ং ইংরাজী এবং সংস্কৃতে সুপণ্ডিত, সংস্কৃত কলেজ হইতে এম্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, আইন অধ্যয়ন করিয়া বি, এল্ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। চিরস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মনস্বী ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতি তাঁহার পাঠ্যাবস্থায় যাঁহারা খ্যাতি ও প্রতিপত্তিতে প্রভাবশালী ছিলেন সকলেই তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। তিনি ইচ্ছা করিলে গবর্ণমেণ্টের নিকট উচ্চপদ লাভ করিয়া, অথবা অন্য নানা উপায়ে যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন করিয়া আপন পরিবার প্রতিপালনপূর্ব্বক আরামে জীবন কাটাইতে পারিতেন। পুরাতন সমাজের মতানুবর্ত্তী থাকিয়া, নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ও প্রতিভা বলে, সেই সমাজের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হইতে পারিতেন। কাব্যালোচনায় ও কাব্যরচনায় উপযুক্ত সময় ও শক্তি নিয়োগ করিলে সে দিকেও তাঁহার খ্যাতি ও উন্নতি অসাধারণ হইত।

কিন্তু হইল কি? তিনি বন্ধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে প্রথমে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এবং পরে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের

* সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ২রা নবেম্বর অপরাহ্ণে স্মৃতি-সভা উপলক্ষে পঠিত।

সংস্পর্শে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহার অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক সত্যানুরাগ ও ধর্ম্মভাব কর্ম্মপথে নিঃসারিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইল। তিনি প্রেয়ঃ ত্যাগ করিয়া শ্রেয়ঃকেই বরণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তাহার পর যে দিন প্রাণের সমস্ত ভক্তি ও শক্তি লইয়া জগদ্‌গুরুর চরণে লুণ্ঠিত হইলেন, সেই দিন হইতে কর্ত্তব্যকেই জীবনদেবতার অলঙ্ঘ্য আদেশ বলিয়া জানিলেন। এই আদেশে তিনি আপনার কুলমর্য্যাদা, কবিপ্রতিভা, অর্জ্জিত বিদ্যা, লোকপ্রিয়তা, ধনার্জ্জন ক্ষমতা—এমন কি, স্বজনমমতা পর্য্যন্ত—জীবনের যথাসর্ব্বস্ব খর্ব্ব করিয়া অতি দীনের ন্যায় জীবনদেবতার উদ্দেশেই আমরণ মস্তক অবনত রাখিলেন। সাধ করিয়া দুঃখসঙ্কট জীবনের নিত্যসঙ্গী করিলেন; 'রুধিরশোষিণী' দরিদ্রতাকে আহ্বান করিয়া গৃহে বসাইলেন। আজ সেই স্বেচ্ছাদরিদ্রের ভক্তিনমিত মস্তকে ধর্ম্মরাজ স্বয়ং বিজয়মুকুট পরাইয়া দিয়াছেন।

বাহির হইতে এবং দূর হইতে স্থূলদর্শীর আপাতদৃষ্টিতে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের গভীরতা ও উচ্চতা হয় তো উপযুক্তরূপে প্রতীত নাও হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার কর্ম্মজীবনের বিপুলতা ও প্রসার অস্বীকার করিবার কাহারও সাধ্য নাই। দেশবাসিগণের জীবনের উপরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে, ব্যক্তিবিশেষের ও সাধারণের পক্ষে, সাহিত্যিক, সমাজসংস্কারক, দেশহিতৈষী ও ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মপ্রচারক রূপে তিনি যে প্রভাব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রসার বিদ্যুতেরই মত বহুদূর বিস্তৃত। জগতের সকল মঙ্গল প্রভাবের মত তাহা অলক্ষ্যে আরও বিস্তৃতি ও গভীরতা লাভ করিবে।

তাঁহাকে পিতৃবন্ধু রূপে, দীক্ষাগুরু রূপে, সহানুভূতিকারী ও পরামর্শদাতা রূপে, সকল শুভচেষ্টার উৎসাহবর্দ্ধক রূপে, ত্যাগ ও নিঃস্বার্থতার দৃষ্টান্ত রূপে—অনেক রূপেই বাল্য বয়স হইতে এ পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিয়াছি। আর একখানি এমন জ্ঞানে উজ্জ্বল, সত্যানুরাগে অগ্নিময়, স্বাধীনচিত্ততায় নির্ভীক, প্রেমে সমৃদ্ধ, কর্ম্মে ফলবহুল জীবন স্বচক্ষে দেখি নাই। এই জীবনখানি দেখিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মানিতেছি। আজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেকেরই বোধ হয় এই ভাব মনে হইতেছে।

তাঁহার হৃদয়রক্তে লিখিত কতগুলি কবিতা, তাঁহার সুচিন্তিত গদ্যগ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি, তাঁহার অগ্নিময়ী বক্তৃতা ও হৃদয়স্পর্শী উপদেশদ্বারা দূরের লোকও তাঁহাকে জানিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার স্নেহময় সরল হৃদয়ের পরিচয় নিকটে থাকিয়া যাঁহারা পান নাই, তাঁহার আসক্তি-বিরক্তি-বিরহিত নির্ম্মল ভক্তি ও উদার মানবপ্রীতি, তাঁহার বিনয়সম্মিলিত, ঈর্ষ্যা-দ্বেষ-বর্জ্জিত ব্যঙ্গপটুতা, তাঁহার সদানন্দ মধুর ব্যবহার একত্র থাকিয়া দেখিবার সুযোগ যাহাদের ঘটে নাই, তাঁহারা অনেকখানি শিক্ষা ও আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন।

সাধারণের নিকট কবিযশোলাভের জন্য তিনি প্রথম বয়সে বিশেষ লোলুপ ছিলেন; কিন্তু একবার দেবচরণে আত্মোৎসর্গের পর, যাহা লিখিয়াছেন কেবল কর্ত্তব্যজ্ঞানে অথবা অন্তর্নিহিত ভাবের প্রেরণায় লিখিয়াছেন, যশস্বী হইবার জন্য নহে। তাঁহার আত্মচরিতখানি ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া শেষ বয়সে লেখা। ইহাতে শৈশবের কোন ঘটনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, প্রশংসা তাঁহার চিরদিন ভাল লাগিত; কিন্তু প্রশংসার জন্য আত্মচরিত লিখিলে সে খানি সংশোধন পরিবর্জ্জন ও পরিমার্জ্জনদ্বারা আরও সুন্দর করিয়া রাখিয়া যাইতে পারিতেন। শৈশবের অনেক কথা ইহাতে বিস্তারিত লিখিত আছে, কিন্তু দীপ্তযৌবনের জ্বলন্ত পরীক্ষা ও বিজয়কাহিনী তেমন করিয়া বর্ণিত হয় নাই। এ যেন ঐতিহাসিকের গ্রন্থসূচনার প্রাথমিক আয়োজন, কেবল ঘটনাবলীর সংক্ষেপ নির্দ্দেশ। বৃদ্ধবয়সে শিশুর মত সরল, অপরের সমালোচনা সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন ভাবে এই মহাত্মা তাঁহার জীবনের কথা, যতখানি মনে ছিল, বলিয়া গিয়াছেন। এই সরলতা (art-less art) গ্রন্থখানিকে নূতন একটি মাধুর্য্য ও গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছে।

তাঁহার ঈশ্বরভক্তি, সত্যানুরাগ, স্বদেশপ্রীতি ও অত্যাচারিতের প্রতি সহানুভূতি তাঁহার কবিতায় যাহা প্রকাশ পাইয়াছে দৈনিক জীবনে তাহার অনেক বেশী দেখা গিয়াছে। অনেক লেখক যাহা অনুভব করেন তদপেক্ষা অনেক বেশী লেখেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার প্রতি কথা আপনার প্রত্যক্ষ অনুভূতি বা গভীর সহানুভূতির রসে সিক্ত ও সজীব। সেই জন্য চল্লিশ বৎসর ধরিয়া সেগুলি শত শত তরুণ জীবনকে উচ্চ আদর্শের দিকে অগ্রসর করিতেছে।

নিমাই সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিলে শচীমাতার দুঃখ বর্ণনা করিতে গিয়া তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণে নিজ জননীর দুঃসহ বেদনার কথা তাঁহাকে কাঁদাইয়াছে। তিনি চক্ষু মুছিতে মুছিতে লিখিয়াছেন—

> কেঁদ না লেখনী পেওনা রে ভয়
> লোকে তো বলিবে নিমাই নির্দ্দয়;
> তুমি কি জানিবে, তুমি কি বুঝিবে?
> আমি তো জানি না কিসে যে কি হয়।
> উন্নত আকাশে খধূপ প্রকাশে
> আপনার বেগে সে কি সেথা যায়?
> প্রবল আগুন জ্বলেছে ভিতরে
> আর তারে হেথা কেবা রাখে ধ'রে
> তাই মহাবেগে যায় অনুরাগে
> পাপী জগতের পরিত্রাণ তরে।

নিমাই সম্বন্ধীয় দুইটি কবিতাই কি সরল! কি সুন্দর! কি স্বাভাবিকতাপূর্ণ! ইহাতে তাঁহার আত্মজীবনের সমস্যারও সমাধান হইয়াছে।

তাঁহার কবিতার মধ্যে কাল্পনিক সুখদুঃখ কিছু নাই। যাহা ব্যক্তিগত ভাবে নিজের নহে—সংসারের অধিকাংশ কবিতাই এরূপ ভাবে নিজের নয়—তাহাও সহানুভূতির দ্বারা আপনার করিয়া লইয়াছেন, কেবল কল্পনার দ্বারা নহে। মহাত্মা কেশবচন্দ্রের পত্নী বিলাতযাত্রী স্বামীর ছবিখানি দেখিতে দেখিতে অশ্রুসিক্ত মুখে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, কবি সেই অশ্রুসিক্ত মুখখানি আঁকিয়াছেন। তাঁহার কোন অধ্যাপকের পত্নী স্বামী কর্ত্তৃক অবহেলিতা হইয়া শিশু কন্যাটিকে বুকে করিয়া "অভাগীর কেউ

নাই কার কাছে কাঁদিব"—বলিয়া রজনীর আঁধার-অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছেন, তিনি সেই অভাগীর মূক বেদনাকে সঙ্গীতে মুখরিত করিয়াছেন।

"যদি কাজে আসি তবে বেঁচে যাই"—"খাটিতে বাঁচিব খাটিয়া মরিব"—"প্রাণ ব্রহ্মপদে হস্ত কাজে তাঁর" 'কর্ত্তব্য বুঝিব যাহা নির্ভয়ে করিব তাহা'—ইত্যাদি তাঁহার প্রাণের অনেক কবিবাক্য মন্ত্রের ন্যায় তরুণ বয়স্কদিগের জীবন ঠিক পথে চালাইয়া লইবার পক্ষে সহায় হইয়াছে। তখন ছিল ভাব ও উন্নত আকাঙ্ক্ষার (emotion and aspiration) দিন। খাঁটি ভাবের নেশায় কবি লিখিতেন, ভাবুক পাঠক পড়িয়া রস গ্রহণ করিতেন, আর্টের দিকে লক্ষ্য কমই ছিল। এখনকার দিনে ভিতরে ভাব ও চিন্তা না থাকিলেও তথাকথিত কবিতা রচনা করা যায়। কবি মধুসূদনের ভাষায় "ঘটকালি করি শবদে শবদে বিয়া" দিয়া শব্দরূপী বরকন্যাকে নানা অলঙ্কারে সাজাইয়া, নানা ভঙ্গীতে দাঁড় করাইতে পারিলেই কবিত্ব ও কবিতা হয়। পদের সুমিল ও বলিবার ভঙ্গীই বর্ত্তমানে অনেকের মতে সাধনার চরম বস্তু। কিন্তু যে কবিতা পাঠকের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেখানে আপনার স্থায়ী স্থান করিয়া লয় না, আপনার একটা ছাপ রাখিয়া যায় না, একটু ফুরফুরে হাওয়ার মত মনের উপর দিয়া একবার-মাত্র বহিয়া চলিয়া যায়, কলা হিসাবে তাহা কবিতা হইলেও তাহার মূল্য কম। যাহা পড়িতে পড়িতে নিদ্রিত চিত্ত জাগিয়া উঠে, যাহা অলসকে কর্ম্মেচ্ছায় চঞ্চল করিয়া তোলে, বিপদে ধৈর্য্য দেয়, পরীক্ষায় দৃঢ়তা দেয়, ত্যাগের মহত্ব শিখায়, দুঃখ সহিবার এবং দায়িত্বভার বহন করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি সঞ্চার করে, শাস্ত্রী মহাশয়ের কবিতায় সেই বস্তু—কবির জলন্ত প্রাণটা যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

বহুদিন হইতেই তাঁহার মধ্যে ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনের আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার কর্ম্মশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে। এই সমাজের জন্ম হইতে তিনি ইহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান আচার্য্যরূপে যে কর্ত্তব্যভার মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন যতদিন দেহে শক্তি ছিল তত দিন সে ভার অপরাজিত চিত্তে অক্ষুণ্ণ গৌরবে বহন করিয়াছেন। যেমন কবিতায় তেমনি তাঁহার উপদেশ ও বক্তৃতায় সামাজিক জীবনে ধর্ম্মপিপাসা, উন্নত আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহার সরস উপাসনার দ্বারা তিনি বহুবৎসর ধরিয়া সাধারণ সমাজের ব্রাহ্মমণ্ডলীর এবং সমাজের বাহিরের বহু নরনারীর ধর্ম্মভাব সরস ও সজীব রাখিয়াছেন। এক এক বৎসর মাঘোৎসবের সময় মনে হইয়াছে যেন আমরা একটা নিম্নভূমিতে বিশ্রাম করিতেছিলাম ভূগর্ভস্থ আগ্নেয় শক্তির ন্যায় তিনি সমস্ত সমাজটাকে একটা উন্নত ভূমিতে উঠাইয়া আনিলেন। অথচ পর্ব্বতচূড়ার ন্যায় তিনি নিজে মাথা তুলিয়া দাঁড়ান নাই। সকলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া সকলের মধ্যে আপনাকে বণ্টন করিয়া এক উচ্চ অধিত্যকাই রচনা করিয়াছেন। গুরু হইয়া, দলের একনায়ক হইয়া পূজা গ্রহণের ইচ্ছা তাঁহার কোন দিন দেখি নাই। তিনি আপনার ভিতরের আগুন চারিদিকের মানুষের প্রাণে ছড়াইয়া সমস্ত সমাজটাকে উদ্দীপ্ত দেখিতে চাহিতেন।

তাঁহার ধর্ম্ম কেবল ভক্তির ধর্ম্ম ছিল না, ভক্তির সহিত বিশুদ্ধ জীবন এবং সেবাই তাঁহার ধর্ম্ম ছিল। তিনি সেই ধর্ম্ম বাক্যে ও জীবনে প্রচার করিতেন।

বালক ও বালিকাদিগকে জ্ঞান ও নীতি শিক্ষা দিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের যতগুলি প্রতিষ্ঠান আছে তাহাদের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংসৃষ্ট ছিলেন। সাধারণ সমাজের অপর অগ্রণীদের সহিত উচ্চ স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে ও অবরোধপ্রথার উচ্ছেদে তিনি আপনার শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। তিনি নারী সাধারণের পরম বান্ধব, জাতিভেদের পরম শত্রু ও পতিত জাতির মিত্র ছিলেন। কেবল মতে ও বক্তৃতায় নহে, জীবনের নানা অনুষ্ঠানে তাহা দেখাইয়াছেন। যাহা ন্যায় ও সত্য বুঝিয়াছেন অপ্রীতির ভয়ে বা প্রীতির প্রলোভনে কোন দিন এক চুল তাহা হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। এজন্য তাঁহার মমতাময় প্রাণ অনেক ব্যথা সহিয়াছে। তিনি লিখিয়াছিলেন

> সত্য, ধনমান চাহে না এ প্রাণ
> যদি কাজে আসি তবে বেঁচে যাই,
> এই আশীর্ব্বাদ কর হে ঈশ্বর,
> বহু কষ্টে পূর্ণ আমার অন্তর,
> খাটিতে বাঁচিব খাটিয়া মরিব
> এই বড় আশা, পূর্ণ কর তাই।

এই আশা ঈশ্বর অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করিয়াছেন। "তস্মিন্ প্রীতি তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" তিনি যথার্থ উপাসক ছিলেন, এবং সেই জন্যই আদর্শ আচার্য্য হইতে পারিয়াছেন।

শ্রীকামিনী রায়।

অমৃত কথার দুই একটি।

১৮৭২ সালে আমি কলিকাতায় আসি। তাহার চারি বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মকেই সত্যধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং ব্রাহ্মপ্রচারকদিগকে বিশেষতঃ অঘোরনাথ গুপ্ত মহাশয়, কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়দিগকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতাম ও ব্রাহ্মদিগকে নিজের আত্মীয় স্বজন অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতাম।

কলিকাতায় আসিয়া দেখিলাম, তিন ব্যক্তি ব্রাহ্মদের বড় অপ্রিয় হইয়াছেন। গুরুস্থানীয় ব্যক্তিগণের মুখে শুনিতাম, রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত যুবকদের মেশামেশি হইলে অকল্যাণ হইবে; সুতরাং আমি ঐ তিনজনের কাছে যাই নাই, তাঁহাদিগকে দেখিতেও ইচ্ছা করি নাই।

যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করে তাহার প্রাণেই স্বাধীন চিন্তার উদয় হইয়া থাকে। আসল কথা এই, স্বাধীন চিন্তা না হইলে কেহ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না। ১৮৭২ সালে ব্রাহ্মসমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন উপস্থিত হয়। তখন স্ত্রীলোকদিগকে ব্রহ্মমন্দিরে পর্দ্দার অন্তরালে রাখিয়া উপাসনা করিতে হইত। বাবু দুর্গামোহন দাস, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রজনীনাথ রায়, ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগির প্রভৃতি পর্দ্দার বাহিরে স্ত্রীলোকদের আসন

করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। সে অনুরোধ উপেক্ষিত হওয়াতে তাঁহারা বহুবাজার ষ্ট্রীটে খাস্তগির মহাশয়ের ভবনে এক স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন। ঈশ্বরানুগত স্বাধীনতা আমার বড় ভাল লাগিত। আমি চিরদিন যাঁহাদিগকে বড় ভক্তি করিতাম তাঁহাদের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া নূতন সমাজে উপাসনা করিতে যাইতাম।

একদিন সেখানে দেখিলাম রাজনারায়ণ বসু মহাশয় উপাসনা করিতে আসিয়াছেন। তাঁহার সরল উপাসনায় মন ভিজিয়া গেল। আর একদিন দেখিলাম শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা করিতেছেন। তাঁহার প্রত্যেক কথা প্রাণে বিদ্যুতের ন্যায় প্রবেশ করিতে লাগিল।

আগে যাঁহাদের উপদেশ অকল্যাণকর বলিয়া মনে করিতাম, তাঁহাদের কথাই প্রাণের কথা বলিয়া মনে হইল। সেই সময় হইতে ইঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিলাম। আর ভাবিতে লাগিলাম ইঁহারা ব্রাহ্মনেতৃবর্গের অপ্রিয় কেন?

শাস্ত্রী মহাশয় 'সমদর্শী' নামক একখানি পত্র প্রকাশ করিতেন। ইহার প্রবন্ধগুলি স্বাধীনচিন্তার উদ্রেক করিত। উহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত যে সকল কবিতা উহাতে প্রকাশিত হইত তাহা পাঠ করিয়া এক নূতন রাজ্যের ছবি দেখিতাম। শাস্ত্রী মহাশয়কে ভালবাসিতে লাগিলাম, কিন্তু পাছে গুরুস্থানীয় ব্যক্তিগণ অসন্তুষ্ট হন, এই ভয়ে তাঁহার সঙ্গ করিতাম না।

এইরূপে ৪।৫ বৎসর কাটিয়া গেল। ব্রাহ্মসমাজ বড় ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। সকলের প্রাণেই বড় অতৃপ্তি দেখা যাইতে লাগিল। কয়েকটি যুবক সত্য রূপে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া সত্য জীবন যাপন করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন।

১৮৭৮ সালে শাস্ত্রী মহাশয় কয়েক জন যুবকসহ বরাহনগরে মণি মল্লিক মহাশয়ের গঙ্গাতীরস্থ উদ্যানে আগমন করিয়াছেন। উদ্যানে এক ক্ষুদ্র গৃহ ছিল। রাত্রি ক্রমে গভীর হইল। গৃহে একটিও প্রদীপ নাই। চারিদিক নীরব, কেবল গঙ্গার স্রোতের কুল-কুল-রব কর্ণে পহুছিতেছে। এমন সময় কাষ্ঠদ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করা হইল। শাস্ত্রী মহাশয় ও তাঁহার সঙ্গিগণ অগ্নির চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় বুক চিরিয়া রক্তদ্বারা একখণ্ড কাগজে লিখিলেন,—"একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও উপাসনা করিব না। সরকারী চাকুরী করিব না। বরের ২১ ও কন্যার ১৬ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে যে বিবাহ হইবে তাহাতে যোগ দিব না। জাতিভেদ রক্ষা করিব না।'

ব্রহ্মোপাসনানন্তর বুকের রক্তে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। ঈশ্বরসেবায় আপনাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করার চিহ্নস্বরূপ নিজ নাম অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। তখন এক প্রবল শক্তির আবির্ভাব হইল, তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। আমি নিকটে বসিয়া এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলাম, কিন্তু নিজে সে দলভুক্ত হইলাম না।

১৮৭৮ সাল। আনন্দমোহন বসু মহাশয় কলিকাতার অন্তর্গত মট্‌স্ লেনের এক বাড়ীতে বাস করিতেন। একদিন দিবাবসানে শাস্ত্রী মহাশয়, রজনীনাথ রায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও আমি তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়াছি। কলিকাতায় একটি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব হইল। বিদ্যালয়ের লক্ষ্য সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে—অর্থোপার্জ্জন নয়, কিন্তু মানুষগঠন যাঁহাদের জীবনের ব্রত, তাঁহারাই ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইবেন, এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময় আনন্দমোহন বাবু বলিলেন,—"শিবনাথ বাবু, আপনি কি বলেন?" কোন উত্তর না পাইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "শিবনাথ বাবু, আপনি যে চুপ করিয়া রহিলেন?" শাস্ত্রী মহাশয় নিদ্রিত হন নাই। তাঁহার চক্ষু উন্মীলিত, তিনি নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। অনেক ডাকাডাকির পর তিনি বলিলেন, "আপনাদের সিদ্ধান্ত কি হইল?" শাস্ত্রী মহাশয় জড়রাজ্যে বাস করিতেন বটে, কিন্তু তিনি মনন রাজ্যের লোক ছিলেন।

অনেকেই দেখিয়াছেন তিনি কথা কহিতে কহিতে অকস্মাৎ মৌন হইয়া যাইতেন। তখন বাহিরের কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতে না। কেহ সম্মুখে আসিলে, তাহাকে দেখিতে পাইতেন না। তাঁহাকে অভিবাদন করিলে, তিনি প্রত্যভিবাদন করিতেন না। যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন না, তাঁহারা মনে করিতেন শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিলেন। বাহিরের লোক-কোলাহলের মধ্যে তিনি মনন রাজ্যে প্রবেশ করিয়া তন্ময় হইয়া যাইতেন। দিব্যদৃষ্টিতে কি দেখিতেন, তাহার সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইতেন। যখন মনন রাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিতেন, তখন অতৃপ্তির আগুনে পুড়িয়া মরিতেন।

দেশের অবস্থা, প্রিয় ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা তাঁহার মনন রাজ্যের মত হইল না কেন, এই খেদে তিনি প্রায়ই বলিতেন, "আমাকে জুতা মার! আমাকে জুতা মার!" ধর্ম্মরাজ্যের যে মনোহর মূর্ত্তি তিনি দেখিতেন, জগতে তাহা প্রতিষ্ঠিত না দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে কি প্রাণভেদী রবে তিনি বলিতেন,—"আমার কাণ মলিয়া দেও!"

শাস্ত্রী মহাশয় অধ্যাত্মলোকে বাস করিতেন, সে লোকের সৌন্দর্য্যে আসক্ত হইয়াছিলেন; তাই তিনি বলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন,—"যে যায় যাক্, যে থাকে থাক্, শুনি চলি তোমারই ডাক;" "কর্ত্তব্য বুঝিব যাহা, নির্ভয়ে করিব তাহা, পিতারে ধরিয়া র'ব পর্ব্বত সমান রে;" "এমন কোন জিনিষ নাই যাহা তাঁহাকে দিতে পারি না, এমন কোন কর্ম্ম নাই যাহা তাঁহার জন্য করিতে পারি না।"

মুখে যাহা বলিয়াছেন কাজেও তাহা করিয়াছেন। চারি বৎসর পূর্ব্বে মাঘোৎসবের দিন তিনি বলিয়াছিলেন,—"তোমাতে জ্ঞানিগণের জ্ঞানের সার্থকতা, প্রেমিকের প্রেমের সার্থকতা, ব্যাকুলপ্রাণের জুড়াইবার স্থান, ভাল বাসার চরম তৃপ্তি; তুমিই প্রেমসমুদ্র তাই তোমাতে প্রেমানন্দ; তুমিই জ্ঞানসমুদ্র তাই তোমাতে জ্ঞানানন্দ; তোমাতে ভোগের সকল তৃপ্তি, তাই তোমাতে ভোগানন্দ; তোমার সহিত যোগেতেই পরমানন্দ, তাই তুমি যোগানন্দ।"

দেখিয়াছি, তিনি এই অবস্থা পাইয়াছিলেন; এই অবস্থা পাইয়া তাঁহার প্রিয় মনন-ধামে গমন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র।

পরিবারে ধর্ম্মসাধন।

(১৪)

পরোপকার।

(২) অন্ধ আতুরের প্রতি দয়া মানুষের অতি উচ্চ অধিকার। পরের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হ'তে পারা আত্মার অতি উন্নত অবস্থা। দয়াবৃত্তির বিকাশের জন্য বিধিপূর্ব্বক চেষ্টা করা আবশ্যক। এ জন্য (ক) রবিবার পরসেবার বিশেষ দিনরূপে নির্দ্দিষ্ট রাখা উচিত। (খ) সে দিন সন্তানগণ স্বহস্তে গরিব দুঃখীকে সাধ্যমত দান করবে ; (গ) দানের সময় সহৃদয় ও কোমল ব্যবহার ও শান্তভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। এ কার্য্যে পিতামাতার হৃদয় র'য়েছে, এ যেন প্রকাশ পায়। (ঘ) সংসারের আবশ্যকীয় চাল ডাল কেনার সময়ই গরিব দুঃখীদের জন্যও যেন কিছু নিয়মিত রূপে কেনা হয় ; এবং (ঙ) কিছু অর্থও যেন তাদের জন্য রাখা হয়; (চ) তাদের জন্য যেন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা হয়।

(৩) বিশেষ বিশেষ দুর্ঘটনার সময় ক্লিষ্ট নরনারীর জন্য যেন ত্যাগ স্বীকার ক'রেও কিছু দান করা হয়। দান কেবল করলেই হয় না, অন্নজলের সঙ্গে, কাতর প্রার্থনার সঙ্গে, পবিত্র সেবার ভাবে, বিনীত অন্তরে দান করলেই সে দান গৃহের শ্রীবৃদ্ধি করে। দীনদুঃখীদের সাহায্য ক'রে আমরাই ধন্য হই, এ ভাব সর্ব্বদা জাগ্রত রাখা বাঞ্চনীয়।

(৪) গরিব দুঃখীদের কথা, বন্ধুদের শোকদুঃখের কথা, স্বদেশ বা বিদেশের বিশেষ দুর্ঘটনার কথা সন্তানদের মর্ম্মস্পর্শী ক'রে শান্তভাবে বলতে হবে। দান অপেক্ষা প্রাণে অনুভূতি অনেক গভীরতর হওয়া আবশ্যক।

এইরূপে বিবিধ উপায়ে সপ্রেম সম্বন্ধ সাধনের প্রয়াস উপাসনার শ্রেষ্ঠ উপকরণ, ধর্ম্মশিক্ষার প্রধান উপায়।

আধ্যাত্মিক সাধনা

ব্রত।

এইরূপ দৈনিক সাধন ব্যতীত—বিশেষ বিশেষ ব্রতগ্রহণ আবশ্যক হয়, যেমন,—বাক্-সংযম, ক্রোধদমন, বিনয়-সাধন, কৃতজ্ঞতাসাধন। প্রয়োজন অনুসারে, দৈনিক উপাসনান্তে এরূপ সাধন ক'দিনের মত গ্রহণ ক'রে, নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে সাধন করতে হয়।

আত্মপরীক্ষা, আত্মচিন্তা এবং ব্রতসাধন উপলক্ষ্যে, ব্যাকুল সাধককে কত সময় গোপনে কাঁদতে হয়, কত সময় রাত জাগতে হয় ;—কিন্তু তার ফলে নবশক্তি, নব আশা ও উৎসাহ জেগে উঠে। সাধন-পরায়ণ আত্মার ব্যাকুল সংগ্রামে আত্মার তেজ বৃদ্ধি হয়।

দিনব্যাপী-সাধনা।

ব্যাকুল সাধকের পক্ষে সমস্ত দিনের সকল ব্যাপারই ধর্ম্মসাধনের উপলক্ষ্য। প্রভাতে জাগরণ, স্নান, আহার, বিষয়-কর্ম্ম, সেবা, জ্ঞানার্জ্জন, বস্ত্রপরিচ্ছদ, শয্যা, প্রিয়জন—সবই আত্মপরীক্ষা প্রার্থনা ও আত্মনিবেদনের সুযোগ। এই সাধনে তৎপর হওয়ার জন্যও ব্রতগ্রহণ করা উচিত।

স্মরণ।

প্রতিদিন, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে, বিশেষ ভাবে প্রিয়জন-গণকে স্মরণ ও তাদের জন্য প্রার্থনা করা প্রেমযোগ সাধনের একটি বিশেষ ব্রত। এই ব্রত গ্রহণে ও সাধনে বিশেষ কল্যাণ হয়।

সমবেত সাধনা—পরিচয়।

ব্যক্তিগত সাধনের পথে অগ্রসর হ'তে গেলেই দেখা যায়, অপরের সাহায্য না হ'লে চলে না। সাধুভক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গ ও উপদেশ, সমবিশ্বাসীদের সঙ্গে সাধন ভজন ও আলোচনা, পতিপত্নী, পিতামাতা ও সন্তানগণ এবং ভাইবোনদের সহযোগিতা ব্যতীত পরিপূর্ণ ধর্ম্মসাধন হয় না। এই ভাব হ'তে সমবেত সাধনের উৎপত্তি। কিন্তু, কেবল কয়েকজন লোক একত্র হ'লেই সমবেত সাধন হয় না, সাধনের সহায়তাও হয় না। শারীরিক সান্নিধ্য অপেক্ষা অন্তরের পরিচয় না হ'লে সমস্ত সাধন বৃথা হ'য়ে যায়, মানবীয় সম্বন্ধসকলও অসার হ'য়ে থাকে। এজন্য সম্বন্ধ সাধন, পরিচয় সাধন বিশেষ ব্রতরূপে সাধনের বিষয়। অন্তরের পরিচয় ও আত্মীয়তা না থাকলে পারিবারিক জীবন ও সমবেত সাধন কিছুই সফল হয় না।

সাধনচক্র।

ধর্ম্মসাধন একটি চক্রের ন্যায় ব্যাপার। (১) কেন্দ্র স্থলে ভগবান—এবং আমি একাকী তাঁর কাছে ; (২) তারপর আমি ও আমার নিকটতম আত্মীয়—মাতাপিতা, পত্নী বা সন্তান, অথবা ধর্ম্মবন্ধু—দুজন মাত্র ; (৩) তারপর পরিবারের সকলকে নিয়ে, (৪) তারপর, সমসাধকগণ সঙ্গে ; (৫) তারপর, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ; (৬) তারপর সমবিশ্বাসী উপাসকগণের সঙ্গে—গৃহে বা সমাজে। এইরূপ নানাপ্রকার সমবেত সাধনের দ্বারা নানাপ্রকার ফললাভ হয়। এজন্য এইরূপ বিবিধ সাধন-অঙ্গের সঙ্গে সাধকের যোগ থাকা আবশ্যক। প্রত্যহ পরিবারের সকলে মিলে একসঙ্গে উপাসনা বা ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করলে যা হবে, প্রত্যেকের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে জীবন প্রসঙ্গ ও উপসনাদি করলে আরও গভীরতর কিছু হবে। এজন্য সপ্তাহ ও মাসব্যাপী রুটিন আবশ্যক—যেন শান্ত স্থিরভাবে বিবিধ স্তরের সাধন করা সম্ভবপর হয়। ব্যবসাদারের কেনাবেচা দেনা পাওনার মত সাধকের ধর্ম্মসাধন।—এজন্য কত নিয়ম রুটিন ব্যবস্থা করতে হয় ; আবার সুযোগ সুসময় অবস্থার পরিবর্ত্তন—শোক দুঃখ আনন্দের কারণ সংঘটনের জন্য, সাময়িক ব্যবস্থাও করতে হয়।

জীবন ও সাধন।

জীবনের অবস্থার সঙ্গে ধর্ম্ম সাধনের, উপাসনা, প্রার্থনা, প্রসঙ্গ ও ব্রতের সামঞ্জস্য থাকা উচিত। নিজের ও পরিবারের অবস্থা, সুখ দুঃখের কারণ যা কিছু হ'য়েছে বা রয়েছে, সমাজে যা কিছু উল্লেখ যোগ্য ঘটেছে—সে সকলের সঙ্গে যুক্ত ক'রে সাধন করতে হবে, প্রার্থনা করতে হবে। এই সাধনে জনক জননী, পতিপত্নী সর্ব্বদা পরস্পরের সহায় হ'তে বাধ্য, নতুবা পবিত্র উদ্বাহ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করা হয় না—সাধন সম্বন্ধে ব্যভিচার হয়। পিতা-

মাতার সাধন, চেষ্টা, পরস্পর সহায়তা, আত্মপরীক্ষা, অনুতাপ, কৃতজ্ঞতা অর্পণ, ব্যাকুল প্রার্থনা,—জীবনের সত্য ঘটনা সংগ্রাম ও আনন্দ অবলম্বন ক'রে আলোচনা ও প্রার্থনা, নানা ভাবে নানা প্রকারে আত্মনিবেদন, সর্ব্বদা ভগবানের অভিপ্রায় বু'ঝে চল্‌বার জন্য চেষ্টা, এবং সন্তানগণকে সেই পথের পথিক করবার জন্য ব্যাকুলতা—পৃথিবীতে স্বর্গের ব্যাপার। এজন্য গৃহে এবং মাতা-পিতার জীবনে সাধন প্রতিষ্ঠিত ও জীবন্ত থাকা আবশ্যক।

সাধনের একতা, সমতা।

ধর্ম্ম সাধনের সবই নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত। স্থান, কাল, আসন, পাঠ্যগ্রন্থ, সঙ্গীত, স্তোত্র প্রভৃতি কিছুকাল ধ'রে একই থাকা উচিত; তাহ'লে সাধনে স্থিরতা ও গভীরতা লাভ হয়। কিন্তু এক প্রণালী-বদ্ধ উপাসনা বা প্রার্থনায় সকল সময় আত্মার সজীবতা থাকে না ব্যক্তিগত সাধনে অবস্থা অনুসারে কোন দিন কেবল প্রার্থনা, কোন দিন অনুতাপ, কোন দিন স্তোত্র আবৃত্তি, কোন দিন একটি সঙ্গীত, কোন দিন কেবল আরাধনা ও ধ্যান আবশ্যক হ'তে পারে। এবিষয়ে স্বেচ্ছাচারী ভাবুক হ'তে নাই—কিন্তু প্রকৃত অবস্থাকেও অগ্রাহ্য করতে নাই।

পারিবারিক উপাসনাতে ও কিছু দিনের মত কয়েকটি সঙ্গীত ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট ক'রে রাখতে হয়। অবস্থা অনুসারে কোন দিন আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা সবই হবে, জীবনের অবস্থার সঙ্গে সাধন, সঙ্গীত, উপদেশ ও প্রার্থনার সঙ্গে জীবনের আচরণের মিলন রক্ষণীয় ও সাধনীয়।

নৈমিত্তিক সাধন।

নৈমিত্তিক সাধনও অতি গুরুতর বিষয়। অনেক সময়, দৈনিক সাধন অপেক্ষা নৈমিত্তিক সাধন জীবনের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর হয়। সমাজে সাপ্তাহিক উপাসনা ও উৎসব, সাধুভক্ত মহাপুরুষ-গণের মৃত্যুদিন, পরিবারের সকলের ও প্রিয়জনদের জন্মদিন ও মৃত্যুদিন প্রভৃতি নৈমিত্তিক সাধনের উপলক্ষ্য।

জন্মদিন, মৃত্যুদিন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, বিদ্যারম্ভ, দীক্ষা, বিবাহ, ব্রতগ্রহণ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি পারিবারিক অনুষ্ঠান, উৎসব ও সাধুভক্তগণের মৃত্যুদিন, নববর্ষ, নবান্ন, ভাইফোঁটা প্রভৃতি সামাজিক ব্যাপাররূপেই গণ্য হয়েছে; কিন্তু এই সকল ব্যাপারও পরিবারের মধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। উৎসবাদি যদি পরিবারে প্রবেশ না করে, তা হ'লে জীবনে বসবে না, সন্তান শিক্ষার কারণ হবে না,—বাহিরের বিষয় হ'য়েই থাক্‌বে।

নিয়মাবলী।

এই সকল অনুষ্ঠানে সকল দিক রক্ষা করা অতি কঠিন। এজন্য কয়েকটি নিয়ম পালন করা আবশ্যক। (১) অনুষ্ঠানের কয়েক দিন পূর্ব্বে অনুষ্ঠান প্রণালী, কে উপাসনা করবেন, কে গান করবেন, কে পাঠ করবেন, কে জায়গা ঠিক করবেন, কাকে কাকে বলা হ'বে প্রভৃতি স্থির করা; (২) স্থান ও অবস্থা বুঝে এমন কয়জনকে বলা, যাতে ভেগ পেতে না হয়, (৩) আহারাদির ব্যবস্থা সংক্ষেপে করা উচিত,—আহার ও আমোদ আহ্লাদটাকেই প্রধান করা উচিত নয়; (৪) নির্দ্দিষ্ট সময়ের দুচার মিনিট পূর্ব্বেই গৃহের সকলের স্থির হওয়া উচিত; (৫) সন্তানগণকে শান্তভাবে থাকতে বলা উচিত, (৬) দাসদাসীগণকে ব'লে দেওয়া কর্ত্তব্য যে, সে সময় যেন তারা কিম্বা অপর কেহ গোলমাল না করে। (৭) নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাজ আরম্ভ করা উচিত; বিশেষ কারণ ব্যতীত কাহারও জন্য অপেক্ষা করা ঠিক নয়। (৮) পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট লিখিত প্রণালী অনুসারে প্রণালীটী উপস্থিত সকলকে জানিয়ে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা উচিত। (৯) আহারের ব্যবস্থা থাকলে, এমন সময় উপাসনার ব্যবস্থা করা উচিত যে, আহারের অসময় না হয়।

উৎসবাদি।

উৎসব ও সাধুভক্তগণের মৃত্যুদিন প্রতি পরিবারে বিশেষ দিন রূপে গণ্য হওয়া উচিত। এই সব দিনে গৃহের সাজসজ্জা, স্নান আহার, বস্ত্রপরিচ্ছদ, প্রভৃতি একটু বিশেষ শুদ্ধসংযত হবে, বাক্যালাপ ও ব্যবহার শান্ত হবে, উপাসনাদির আয়োজন বিশেষ রূপ ধারন করবে। সন্তানগণ স্নান ক'রে, শুভ্রবস্ত্র প'রে, সুশ্রী হ'য়ে, উপাসনার স্থানের আয়োজন ক'রবে; যথা সময়ে তাদিগকে তাদের মত ক'রে বিশেষ দিনের বিশেষত্ব বুঝিয়ে দিতে হবে; বয়স্কগণ যথা সময়ে সবান্ধবে শুদ্ধশান্ত ভাবে বিশেষ দিনের বিশেষ আলোচনা ও উপাসনাদি ক'রবেন। এইসব দিনের অনুষ্ঠানাদির জন্য অন্ততঃ একবেলা গৃহে যাপন করা একান্ত আবশ্যক। এই সকল বিশেষ অনুষ্ঠানের সঙ্গে দৈনিকজীবনের সাধনের যোগ স্থাপন করা দরকার;—সে জন্য প্রতি উৎসব বা সাধুভক্তদের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ উপলক্ষে, হয় নূতন ব্রত বা সাধনা বা সংকল্প গ্রহণ করতে হয়, নতুবা পুরোণো সংকল্পাদিই নূতন ক'রে গ্রহণ করতে হয়।

পাঠ প্রসঙ্গাদি।

এই সকল সাধন জীবন্ত রাখবার জন্য, প্রতি পরিবারে, নিয়মিতরূপে, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ও শান্তভাবে পাঠ, জীবনপ্রসঙ্গ, ভক্ত-জীবনপ্রসঙ্গ, ভগবৎ প্রসঙ্গ, সাধুসঙ্গ, সঙ্গীত, সংকীর্ত্তন হওয়ার সুব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। সন্তানদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলবার এবং প্রার্থনা করবারও ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

এইরূপ বিবিধ উপায় অবলম্বন ক'রে গৃহে ধর্ম্মকে সত্য ও জীবন্তরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হ'বে এবং সেই সঙ্গে সন্তানগণের বয়স ও শক্তি অনুসারে তাদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করতে হবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রশশী গুপ্ত।

অপরে কি বলেন।

(১)

আমরা হিন্দু ব্রাহ্মণ, "নায়ক" গোঁড়া ব্রাহ্মণের মুখপত্র। প্রথম কিশোরকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত, জীবনের অর্দ্ধেকটা আমরা যেরূপ প্রতিবেশ প্রভাবের অধীন থাকিয়া মানুষ হইয়াছি, তাহাতে আমাদিগকে আগা-গোড়া পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ধর্ম্মগত এবং সমাজগত মতের প্রতিবাদ করিতেই হইয়াছে। তথাপি আমরা সোজা সরল ভাষায় ব্যক্ত করিব যে, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোক গমনে বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজের একটা দিক্‌-পালের পাত হইল। যে সকল অসাধারণ মনীষী এবং প্রতিভাশালী পুরুষ বিলাতী বিদ্যার এবং বিজাতী সভ্যতার

সভ্যাতে আসিয়া অপূর্ব্ব পুরুষকারের প্রভাবে পুরাতন বাঙ্গালাকে ভাঙ্গিয়া নূতন বাঙ্গালা গড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, যাঁহাদের মনীষার ছাপ এখনও শিক্ষিত বাঙ্গালীর সর্ব্বস্বে এবং সর্ব্বাঙ্গে মুদ্রিত রহিয়াছে, পণ্ডিত শিবনাথ তাঁহাদের শেষ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে শিক্ষিত বাঙ্গালী যাহা হারাইল, তাহা আর মিলিবে না। সে কর্ম্মী, ভাবুক এবং রসিক সু-জনের পরম্পরা এইবার শেষ হইল। * * *

তাঁহার জীবন কাহিনীর এই কয়টা মোটা কথা বলিলে পণ্ডিত শিবনাথ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলা হইল না, তাঁহার বিশিষ্টতার কোন পরিচয় দেওয়া হইল না। যে একদল Iconoclast বা ধ্বংসবাদী রাজা রামমোহন রায় মহাশয়কে পুরোভাগে রাখিয়া বাঙ্গালার পুরাতন হিন্দু সমাজের রেক্তার গাঁথুনী ভাঙ্গিয়া ইউরোপের আদর্শে একটা নূতন সমাজ গড়িয়া তুলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, পণ্ডিত শিবনাথ সেই দলের শেষ কর্ম্মবীর। তিনি Iconoclast এর বা ধ্বংসবাদের অবতার স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার লিখিত অসংখ্য পুস্তকে ধ্বংসবাদের তত্ত্ব যেন ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিতেছে। তাঁহার জীবনটাও ধ্বংসবাদীর জীবন। এ পক্ষে তিনি সত্যই একজন প্রথম শ্রেণীর বীরপুরুষ ছিলেন—নির্ভয়ে, অসঙ্কোচে তিনি স্বমত প্রতিষ্ঠা করিতে এবং প্রচার করিতে কখনই পশ্চাৎপদ হইতেন না। এ জন্য তাঁহাকে পারিবারিক এবং সামাজিক অনেক রকমের উৎকট ও অসহ্য নিগ্রহ সহিতে হইয়াছে। সে নিগ্রহের পরিচয় এবং প্রগাঢ়তা আধুনিক যুবকগণ লইতে এবং বুঝিতে পারেন না। পণ্ডিত শিবনাথ সে সব অম্লান মুখে সহ্য করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন স্রষ্টা, সমাজ-সংস্কারের একজন অগ্রণী প্রচারক, সাহেবীয়ানা প্রচলনের একজন প্রধান প্রবর্ত্তক, ব্রাহ্মসাহিত্যক্ষেত্রের একজন প্রধান পুরোহিত ও প্রবর্ত্তক। এমন দিন ছিল যখন শিবনাথ শাস্ত্রীর নাম বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজের অর্দ্ধেকটা ঢাকিয়া ছিল। আমাদের বাল্য, কিশোর এবং যৌবনকাল পণ্ডিত শিবনাথ প্রমুখ মনীষী সকলের বক্তৃতা ও সারমান, প্রবন্ধ ও নিবন্ধ শুনিতে এবং পড়িতে কাটিয়া গিয়াছে। ইদানীং গত দশ বৎসর কাল পণ্ডিত শিবনাথের জীবন ও মনীষা প্রদীপ নিভিয়া আসিতেছিল, তাই আধুনিক যুবকগণ তাঁহাকে তেমন ভাবে—আমাদের মতন চিনিতে পারে নাই। পণ্ডিত শিবনাথ সম্বন্ধে কথা কহিতে হইলে বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজের গত অর্দ্ধ শতাব্দীর ইতিবৃত্তের একাংশের আলোচনা করিতে হয়। আমাদের তেমন স্থান নাই;—সাধ হইলেও তাহা মিটাইতে পারিলাম না।

শেষ কথা বলিব পণ্ডিত শিবনাথের মৃত্যুতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যাহা হারাইলেন, তাহা আর পাইবেন না; ব্রাহ্মসমাজের স্ফটিকস্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পড়িল, ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ এবং প্রতিভা দুই নষ্ট হইল। যাহা গেল তাহা আর মিলিবে না, তেমনটি আর গড়িয়া উঠিবে না—কেন এমন ঘটিতেছে, তাহা প্রয়োজন হইলে পরে বুঝাইয়া বলিতে পারি। আজ আমরাও পণ্ডিত শিবনাথের মৃত্যুতে মর্ম্মাহত হইয়াছি, কেন না,—নূতন বাঙ্গালার শেষ প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল।—নায়ক।

প্রাপ্ত

মহাত্মা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

মা'র আবাহনে মায়ার বন্ধন
ছিন্ন করি আজ ছুটিলা সন্তান,
কর্ম্মক্ষেত্র থেকে বীরের মতন
স্বকার্য্য সাধিয়া করিলা প্রস্থান।

কর্ম্মে মহাকর্ম্মী শান্ত শিষ্ট ধীর
ধর্ম্ম মহাধনে কেবা হেন ধনী?
কারু কাছে কভু নহে নত শির
সকলের নেতা সমাজে অগ্রণী।

মতেতে অটুট—বিশ্বাসে অটল,
প্রশান্ত প্রকৃতি মধুর স্বভাব;
দেব-ঋষি তুল্য চরিত্রের বল,
ধরম প্রচারে কি জীবন্ত ভাব!

সুবক্তা সুকবি অতি সুরসিক,
বরণীয় যিনি ধরম সমাজে;
বিচারে সুবিজ্ঞ সাহসে নির্ভীক
অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা স্বদেশের কাজে।

সাধনেতে সিদ্ধ—ভাবে গদ্‌গদ,
প্রেমে আত্মহারা সরস হৃদয়;
যোগধ্যানে হেরি হৃদে ব্রহ্মপদ
ভক্তপ্রাণে নিত্য মহা ভাবোদয়।

এ হেন পুরুষ—হারাইয়া বঙ্গ
শোকে ম্রিয়মাণ বিষাদে মলিন,
ধন্য মোরা পেয়ে হেন সাধুসঙ্গ
পুণ্যস্মৃতি প্রাণে রবে চিরদিন।

যাও যাও দেব! দেবতার দেশে
জননীর কোলে মঙ্গল আলয়ে,
অনন্ত আরাম লভি অবশেষে
মজে থাকো চিরশান্তির আলয়ে।

জরামৃত্যু শোক কিছু নাহি সেথা
নিত্য সুখ শান্তি আনন্দ উৎসব,
সুর নরনারী বিহরিছে যেথা
ভুঞ্জ সুখশান্তি-স্বর্গের বৈভব।

শ্রীচন্দ্রনাথ দাস।

ব্রাহ্মসমাজ।

তর্পণ—বিগত ২রা নবেম্বর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কলিকাতায় ও মফঃস্বলের নানা স্থানে নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন:—

১লা নবেম্বর অপরাহ্ণে কলেজ স্কোয়ার হইতে নগর সঙ্কীর্ত্তন। সকলে সমবেত হইলে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী একটি সঙ্গীত এবং শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ প্রার্থনা করেন। তৎপরে শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত কয়েকটি সঙ্কীর্ত্তন প্রমত্ত ভাবে গাহিতে গাহিতে বেণেটোলা লেন, হ্যারিসন রোড,

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের কিছু অংশ, সুকিয়া ষ্ট্রীট ও কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইয়া ব্রহ্মমন্দিরে উপস্থিত হইলে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র আচার্য্যের কার্য্য করেন। ২রা নবেম্বর প্রাতে কীর্ত্তন ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া উদ্বোধন করেন। আরাধনান্তে জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকার পিতার জীবনী পাঠ করিলে আচার্য্য মহাশয় প্রার্থনা ও শ্রদ্ধার্পণ করেন। মধ্যাহ্নে ভারতমহিলা সমিতির কতিপয় সভ্য প্রার্থনা ও শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশ পাঠ করেন। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সভাপতির কার্য্য করেন। শ্রীযুক্তা কামিনী রায় বি,এ ও শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত গুরুদাস চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বক্তৃতা করেন। সায়ংকালে সংকীর্ত্তন ও নিয়মিত সাপ্তাহিক উপাসনা। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। তিনিও উপদেশে বিশেষ ভাবে শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনের শিক্ষার কথাই বলেন। ৩রা নবেম্বর সায়ংকালে ছাত্রসমাজের উদ্যোগে আর একটি স্মৃতি-সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত ডাক্তার স্যার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি তাঁহার অভিভাষণের পর চলিয়া গেলে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার সভাপতি আসন গ্রহণ করেন। শ্রীমতী সুবালা আচার্য্য ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রেয় দুইটি প্রবন্ধ ও শ্রীমান্ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং শ্রীমান্ সুকুমার রায় ও শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বক্তৃতা করেন। বিগত ৯ই নবেম্বর নিয়মিত প্রাতঃকালীন উপাসনার পর মহিলাগণ বিশেষ ভাবে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। তাহাতে শ্রীমতী সরোজিনী দত্ত এম্,এ আচার্য্যের কার্য্য করেন। পুত্রবধূ শ্রীমতী অবন্তী দেবী একটি প্রার্থনা ও শ্রীযুক্তা বসন্তকুমারী বসু একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

মফঃস্বলের সকল স্থানের বিবরণ আমাদের হস্তগত হয় নাই। নিম্নে কোন কোন স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল—

নোয়াখালী ব্রাহ্মসমাজে—প্রাতে উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্নে স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। তাহাতে শ্রীমতী নীরপ্রভা চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী কুসুমকুমারী সরকার ও অপর অনেকে বক্তৃতাদি করেন। সায়ংকালে নিয়মিত উপাসনা হয়। তাহাতে শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

টাঙ্গাইলে—একটি স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত মতিলাল সোম সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

জলপাইগুড়ি ব্রহ্মমন্দিরে—স্মৃতিসভার অধিবেশন ও তৎপরে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল। ডাঃ পি, চাটার্জ্জি সভাপতির কার্য্য করেন। জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রভৃতি ও শ্রীমতী কুলদা চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ করেন। ব্রহ্মোপাসনায়ও ডাঃ চাটার্জ্জি আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বহরমপুরে অধ্যাপক এস্, সিংহের বাড়ীতে শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষালের পত্নী উপাসনা করেন। শ্রীযুক্তা প্রীতিলতা বসাক বি-এ, একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

ধুবড়ী ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে—প্রাতে নগরের পথে-পথে উষা কীর্ত্তন ও তৎপরে উপাসনা হয়; শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। মধ্যাহ্নে কয়েক জন সদাশয় ব্যক্তির দানে কাঙ্গালী বিদায় হইয়াছিল। অপরাহ্নে জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সন্ধ্যায় কীর্ত্তন ও উপাসনা; শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র নাগ আচার্য্যের কার্য্য করেন।

কুমারখালী ব্রহ্মমন্দিরে—প্রাতে কীর্ত্তন, বিশেষ প্রার্থনা, স্তুতিগান, ও 'জীবনালোক' পাঠ। অপরাহ্নে সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ প্রামাণিক শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনী পাঠ করিলে কীর্ত্তন হইয়া উপাসনা ও স্তুতিগান হইলে পর শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মজুমদার শাস্ত্রী মহাশয় সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

গোয়ালপাড়া—প্রাতে সঙ্গীত ও উপাসনা। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। মধ্যাহ্নে জীবন সম্বন্ধে আলোচনা। সন্ধ্যায় গোয়ালপাড়া ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী হলে স্মৃতি সভার অধিবেশন হয়।

বরিশাল ব্রাহ্মসমাজে—প্রত্যূষে উষাকীর্ত্তন। প্রাতে কীর্ত্তন ও উপাসনা; বাবু সত্যানন্দ দাস বি, এ, আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। অপরাহ্নে কীর্ত্তন ও পাঠ; বাবু সত্যানন্দ দাস বি, এ, শাস্ত্রী মহাশয়ের আত্মচরিত হইতে এবং রায় সাহেব হরকিশোর বিশ্বাস "ধর্ম্মজীবন" হইতে শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশ পাঠ করেন। সায়ংকালে কীর্ত্তন ও উপাসনা—বাবু সত্যানন্দ দাস বি, এ, আচার্য্যের কার্য্য করেন।

মুর্শিদাবাদ ব্রাহ্মসমাজে—পূর্ব্বাহ্নে উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কাব্যপুরাণতীর্থ। মধ্যাহ্নে ব্রহ্মসঙ্গীত। অপরাহ্নে—বক্তৃতা। সায়াহ্নে—উপাসনা। আচার্য্য—শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কাব্যপুরাণতীর্থ।

মুর্শিদাবাদ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে বিগত ১৮ই এবং ২৫শে আশ্বিনও বিশেষ উপাসনাদি এবং তাঁহার জীবনী আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কাব্যপুরাণতীর্থ আচার্য্যের কার্য্য করেন।

রামপুরহাট ব্রাহ্মসমাজে—বিশেষ উপাসনা হয়। শাস্ত্রী মহাশয়ের বাল্যপরিচিত ও স্বদেশীয় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সোম উপাসনার পর তাঁহার বাল্যজীবনের ঘটনার বিষয় উল্লেখ করেন। অপর একজন একটু সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করেন।

নারায়ণগঞ্জ ব্রাহ্মসমাজে—রাত্রি ৪টা হইতে নগরের নানাস্থানে উষাকীর্ত্তন করা হয়। পরে মন্দিরে উপাসনা ও প্রার্থনাদির পর পূর্ব্বাহ্নের কার্য্য শেষ হয়। অপরাহ্নে কীর্ত্তন ও উপাসনা হয় এবং তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনারাজির উল্লেখ করিয়া উপদেশ দেওয়া হয়।

তেজপুর ব্রাহ্মসমাজ—উক্ত দিবস শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াছেন।

গিরিডি ব্রাহ্মমন্দিরে সর্ব্বাগ্রে শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রীমহাশয়ের রচিত পরকাল সম্বন্ধীয় একটী কবিতায় কীর্ত্তনের সুর দিয়া সেইটি গান করেন। তৎপরে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত উপাসনা এবং কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী, মিষ্টার দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ দেব শাস্ত্রী মহাশয়ের মহৎ জীবনের পুণ্যকাহিনী বর্ণনা করেন।

দেওঘর—৪ঠা নভেম্বর দেওঘর ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে একটি স্মরণার্থ সভার অধিবেশন হয়। লেফ্‌টেন্যান্ট কর্ণেল ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অনেক স্থানীয় শিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তি সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। রায় রাজেন্দ্রকুমার বসু বাহাদুর সংক্ষেপে জীবনবৃত্তান্তের উল্লেখ করেন। বাবু সুকুমার ঘোষ এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে বাবু শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু ও ডাক্তার হীরালাল চট্টোপাধ্যায় এল্, এম্, এস্ এবং অবশেষে সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন।

কটক—বিগত ১০ই কার্ত্তিক (২৭শে অক্টোবর) 'কটক টাউন ভিক্টোরিয়া হাই স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণ শাস্ত্রী মহাশয়ের পুণ্যচরিত্রের আলোচনা ও তৎপ্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের জন্য উক্ত স্কুলগৃহে সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ কর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

ডিব্রুগড়—ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে ৫ই ১২ই ১৯শে ও ২৬শে অক্টোবর উপাসনা, জীবনী ও উপদেশ আলোচনা। ১৭ই অক্টোবর শোকপ্রকাশার্থ সাধারণ সভার অধিবেশন। রায় সদয়চরণ দাস বাহাদুর সভাপতির কাজ করেন এবং অনেকে বক্তৃতা করেন। ২রা নভেম্বর প্রাতে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাসের গৃহে শ্রাদ্ধোৎসব সায়াহ্নে সমাজ-মন্দিরে উপাসনা, জীবনী পাঠ ও উপদেশ বর্ণনা। একদিন রায় সদয়চরণ দাস বাহাদুর ও অন্যান্য দিনে রায়সাহেব শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌ—বিগত ১২ই অক্টোবর লক্ষ্ণৌ নগরীতে বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বল আচার্য্যের কার্য্য করেন ও শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় জীবনী পাঠ করেন।

নলহাটী—বিগত ১২ই অক্টোবর প্রাতে নলহাটী শ্রীযুক্ত কালিদাস সরকারের গৃহে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় শাস্ত্রীমহাশয়ের সম্বন্ধে কিছু বলেন।

বরমা—৪ঠা নবেম্বর বরমা মধ্য ইংরাজি স্কুলে শোকসভার অধিবেশন হয়। সভ্যগণ সকলেই শোকচিহ্ন ধারণ করেন ও তাঁহার গুণাবলী কীর্ত্তন ও বিদেহী আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

কাঁথি—ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ ৮ঠা অক্টোবর শনিবার সন্ধ্যায় তাঁহার আত্মার কল্যাণকামনা করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তৎপরে ২রা নবেম্বর তাঁহার পারলৌকিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে মন্দিরে প্রাতে সংকীর্ত্তন, উপাসনা এবং সন্ধ্যাকালে উপাসনাদি হইয়াছিল।

গৌহাটী—ব্রহ্মমন্দিরে ২রা নভেম্বর অপরাহ্ণে স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। স্যার্ ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লশঙ্কর গুহ, অধ্যাপক পি, সি, রায় এবং সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন। তৎপর উপাসনা হয়।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ২রা নবেম্বর কলিকাতা নগরীতে ব্রাহ্মবন্ধু চট্টগ্রামের সুবিখ্যাত যাত্রামোহন সেন পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে ব্রাহ্মসমাজ ও বঙ্গদেশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। ৫ই নবেম্বর বরমা ব্রহ্মমন্দিরে তাঁহার পারলৌকিক কল্যাণ কামনার উপাসনা হয়।

বিগত ৪ঠা নবেম্বর মধুপুর নগরীতে পরলোকগত মিঃ ডব্লিউ এম্ দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেনের পত্নী সৌদামিনী সেন তিনটি কন্যা ও মেসোপটেমিয়াতে সৈনিক কর্ম্মে নিযুক্ত একমাত্র পুত্রকে রাখিয়া অকস্মাৎ হৃদরোগে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। অসুস্থ স্বামীকে লইয়া পূর্ব্ব দিবসমাত্র তিনি মধুপুরে পৌঁছিয়াছিলেন।

বিগত ৪ঠা নবেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের পত্নী নির্ম্মলা কয়েকটি শিশুসন্তান রাখিয়া ইহসংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

বিগত ৫ই অক্টোবর বারাণসী নগরীতে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসুর মাতা ৯১ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বিগত ৪ঠা নবেম্বর ব্রহ্মমন্দিরে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। পুত্রবধূ শ্রীমতী সুশীলা বসু জীবনী পাঠ ও পুত্র প্রার্থনা করেন। তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ ২০০ দুই শত টাকার একটি স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপিত হইবে।

বিগত ২৫শে অক্টোবর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পত্নী নলিনীবালা দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া শান্তিধামে চলিয়া গিয়াছেন। বিগত ৫ই নবেম্বর তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। পূর্ণ বাবু সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করিয়া প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে সাধনাশ্রমে ৫৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের প্রাণে সান্ত্বনা বিধান করুন।

প্রচার—বিগত ২৫শে অক্টোবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র ধুলিয়ান গমন করেন। শনিবার প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত আশুতোষ পালের পুত্র ও কন্যার নামকরণ উপলক্ষে উপাসনা করেন। পুত্রের নাম রণেন্দ্রনাথ ও কন্যার নাম শান্তিপ্রভা রাখা হইয়াছে। সন্ধ্যায় বাজারে "ভারতের সাধনা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। রবিবার প্রাতে শ্রীযুক্ত আশুতোষ পালের নূতন বাড়ীর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা করেন। সন্ধ্যায় সমাজগৃহে উপাসনা করেন। সোমবার প্রাতে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মল্লিকের পরলোকগতা স্ত্রীর বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উপাসনা করেন। অপরাহ্ণে শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত ঘোষ ব্রহ্মদাসের বাড়ীতে উপাসনা করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বসুর বাড়ীতে সৎপ্রসঙ্গ করিয়াছিলেন। মঙ্গলবার প্রাতে এলাহিগঞ্জের ষ্টেশন-মাষ্টার শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষের বাসায় প্রার্থনা ও সৎপ্রসঙ্গ হইয়াছিল। সন্ধ্যায় মুর্শিদাবাদ ব্রহ্মমন্দিরে "বঙ্গবাসীর আদর্শ" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং কয়েক জন ব্রাহ্মবন্ধুর বাড়ী যাইয়া সৎপ্রসঙ্গ করিয়াছিলেন।

বুধবার কাল্‌নায় শ্রীযুক্ত রাদিকাপদ পানের বাড়ীতে সন্ধ্যায় উপাসনা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কাল্‌না টাউন হলে "বিলাতের অভিজ্ঞতা" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

শ্রীযুক্ত মহেশমোহন চক্রবর্ত্তী নিম্নলিখিত ভাবে প্রচারকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন ;—

বিগত ২৪শে আশ্বিন হইতে ২৭শে আশ্বিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে বাগেরহাটে রিলিফ ওয়ার্কে অবস্থান কালে উকীল বাবু গিরিশচন্দ্র সেনের গৃহে স্থানীয় উপাসকগণকে লইয়া দুই তিন দিন সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন, উপাসনা এবং এক দিবস সমাজগৃহে উপাসনা সঙ্গীত ও উপদেশ। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা ও ব্যবস্থা। ২৭শে আশ্বিন খুল্‌নাতে ব্রহ্মোপাসকগণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ এবং খুল্‌না ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা সঙ্গীত ও "ধর্ম্মগুলার শক্তি" বিষয়ে উপদেশ প্রদান। নিয়মিত সাপ্তাহিক উপাসনা সম্বন্ধে ব্যবস্থা। ৩০শে আশ্বিন হইতে ৮ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত রিলিফ্ ওয়ার্কে কোটালীপাড়া অবস্থান কালে বালিয়াবন্ধ গ্রামে একটি বিশেষ সভাতে সঙ্গীত এবং "প্রীতি ও সেবা" এই বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান। শাস্ত্রী মহাশয়ের পারলৌকিক অনুষ্ঠানে আহুত হইয়া ১৫ই কার্ত্তিক হইতে ২১শে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কলিকাতা অবস্থান কালে উক্ত অনুষ্ঠানে দুই তিন দিন সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন এবং এক দিবস বক্তৃতা। তিন চারিটী ব্রাহ্মপরিবারে উপাসনা ও সঙ্গীত। এক দিবস সঙ্গত সভায় আলোচনা। সাধনাশ্রমে সঙ্গীত। বিশ পঁচিশটি ব্রাহ্মপরিবারে গমন, দেখা সাক্ষাৎ ও আলোচনা এবং সঙ্গীত শিক্ষাদান প্রভৃতি।

নলহাটী নৈশবিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বার উদ্ঘাটন—বিগত ৪ঠা নবেম্বর নলহাটী নৈশবিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বার উদ্ঘাটন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। প্রাতে শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ আচার্য্যের কার্য্য করেন। সন্ধ্যায় প্রার্থনা অন্তে ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টর মিঃ গুরুসদয় দত্ত সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। এবং তাঁহার পত্নী বিদ্যালয়টির দ্বার উদ্ঘাটন করেন। সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালিদাস সরকার সংক্ষেপে নলহাটী নাইট স্কুলের ও বালিকা বিদ্যালয়ের রিপোর্ট ও অন্যতম ট্রাষ্টী শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ট্রাষ্টডিড্ হইতে কিছু পাঠ করেন। সম্পাদক কালেক্টর ও চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট ২৫০৲ টাকা (১৫০) ডিঃ বোর্ড এবং ১০০) টাকা মহারাজা বাহাদুর নসীপুর) সাহায্য পাইয়াছেন। গৃহের উন্নতির জন্য আরও তিনশত টাকার অঙ্গীকার পাইয়াছেন। কালেক্টার পত্নী সম্পাদকের হস্তে মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষ হইতে ৫০৲ টাকার চাউল খরিদ করিয়া খরিদ অপেক্ষা একসের অধিক দিয়া বিক্রয়ের জন্য দিয়া যান। উপস্থিত মিসেস্ কে, ডি, সরকার ও শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ গুহের কনিষ্ঠা কন্যা বালিকা বিদ্যালয়ে অবৈতনিক কার্য্য করিতে রাজী হইয়াছেন।

বিদ্যারম্ভ—২৩শে সেপ্টেম্বর গিরিডিতে শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসুর দ্বিতীয়পুত্র শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ বসুর বিদ্যারম্ভ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ডাক্তার ডি, রায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। এতদুপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগে ১৲ দান করা হইয়াছে। ভগবান্ বালককে আশীর্ব্বাদ করুন।

একটি নিবেদন।

আমি আমার স্বর্গগত পিতৃদেব পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনচরিত লিখিবার জন্য ব্রতী হইয়াছি। ব্রাহ্মসমাজের নানা দেশের লোকের নিকট তাঁহার পত্র প্রভৃতি আছে। যদি কাহারও নিকট জীবনচরিতে ব্যবহারোপযোগী কোন চিঠিপত্র থাকে, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া যদি আমার ভ্রাতা শ্রীমান্ প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্যের নিকট ২৬ নং বীডন্ ষ্ট্রীটে প্রেরণ করেন তাহা হইলে যারপর নাই অনুগৃহীত হইব। ইতি—

নিবেদিকা
শ্রীহেমলতা সরকার।

নিবেদন!

প্রায় ৫০ বৎসর দেরাদুনে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। এখন এই সহরে কয়েক ঘর ব্রাহ্ম স্থায়ী ভাবে বাস করিতেছেন। কিন্তু কিন্তু এত কালেও এই স্থলে একটি সমাজ-মন্দির নির্ম্মিত হয় নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই নিমিত্ত অর্থসংগ্রহ করিয়া দুই বিঘা জমি ক্রয় করা হইয়াছিল ; কিন্তু জমির স্বত্ব লইয়া মামলা উপস্থিত হওয়ায় মন্দির নির্ম্মাণ স্থগিত থাকে। উক্ত মামলা মীমাংসায় ও জমির মূল্যে পূর্ব্ব-সংগৃহীত অর্থ নিঃশেষ হইয়া এখন মাত্র আনুমানিক ৩০০৲ টাকা হাতে রহিয়াছে। একণে মন্দির নির্ম্মাণ এবং সম্মুখস্থ আর একখণ্ড জমি ক্রয় করিতে প্রায় ৩,০০০৲ টাকা আবশ্যক। এই সদনুষ্ঠানের নিমিত্ত আমরা সাধারণের নিকট অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি সকলের যথাশক্তি আনুকূল্যে অচিরে এই কার্য্য সম্পন্ন হইবে। সহৃদয় দাতৃগণ নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারীদের যে কোন ব্যক্তির নামে অর্থ প্রেরণ করিলে উহা সাদরে গৃহীত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র, (কলিকাতা)
শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, (কলিকাতা)
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার, (লাহোর)
শ্রীনীলমণি চক্রবর্ত্তী, (শিলং)
শ্রীঈশানচন্দ্র দেব, (দেরাদুন)
শ্রীঅতুলানন্দ দাস, (দেরাদুন)

বিজ্ঞাপন

আগামী ২৪শে নবেম্বর সোমবার সন্ধ্যা ৫॥০ ও ৬ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে অধ্যক্ষ সভার ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দুইটি বিশেষ অধিবেশন হইবে।

আলোচ্য বিষয়—(১) গিরিডি বালিকা স্কুল। (২) বিবিধ।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ
৩১।১০।১৯ সহকারী সম্পাদক।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

Registered No C. 65

অসতোমা সদ্গময়,
তমসোমা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—
১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৪শ ভাগ।	১৬ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩২৬, ১৮৪১ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯০	অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩.
১৬শ সংখ্যা।	2nd December, 1919.	প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে অন্তর্যামী পিতা, আমাদের অন্তরের অবস্থা যদিও লোক-চক্ষুর অগোচর থাকে, এমন কি অনেক সময় আমাদের আপনার দৃষ্টিরও বাহিরে থাকে, তথাপি তোমার নিকট কিছুমাত্র লুক্কায়িত থাকে না। আমাদের হৃদয়ের গূঢ় প্রদেশে যাহা কিছু গুপ্ত থাকে তাহাও তোমার নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তাই অধিকাংশ সময় আমরা নিজের গুরুতর দোষসকলও দেখিতে পাই না, অথবা দেখিলেও উপেক্ষা ও ক্ষমার চক্ষেই দেখি; অথচ অপরের অতি সামান্য ত্রুটিও আমাদের নিকট অতি বৃহৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়—অতি অকিঞ্চিৎকর বিষয়েও অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিতে আমরা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হই না। ইহার জন্যই যে আমাদের জীবন ও সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না—আমাদের মধ্যে অশান্তি ও অপ্রেম বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহা আমারা বুঝিতেও পারি না, দূর করিবার উপযুক্ত উপায়ও অবলম্বন করিতে পারি না। হে করুণাময় পিতা, তুমি ভিন্ন আর কে আমাদের এই মোহান্ধকার দূর করিবে? আমাদের অন্তরদৃষ্টি খুলিয়া দিবে? তুমি আমাদিগকে প্রকৃত দৃষ্টি প্রদান কর; আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ দোষ ত্রুটির প্রতিই অধিকতর তীব্রদৃষ্টি রাখিতে এবং অপরকে প্রেম ও ক্ষমার চক্ষে দেখিতে শিক্ষা করি। আমাদিগের হৃদয়ে তোমার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হউক। আমাদের সকল প্রকার ক্ষুদ্রতা বিদূরিত হউক, হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হউক। তোমার মঙ্গল ইচ্ছাই আমাদের প্রত্যেকের জীবনে ও সমাজে জয়যুক্ত হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

সম্পাদকীয়।

ক্ষমা ও অভিযোগ—উন্নতিপ্রয়াসী মানব কিছুতেই তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। সুতরাং আমরা সর্ব্বদাই লোকের মুখে নানা প্রকার অভিযোগের কথাই শুনিতে পাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রায় সকল সময়ই অপরের বিরুদ্ধেই এই সকল অভিযোগ উপস্থিত করা হয়,—কাহাকেও নিজের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগের কথা বলিতে দেখা যায় না। যত দোষ ত্রুটি যেন সবই অপরের,—জগতের সকল প্রকার অবনতির কারণই অপরে, নিজের কোনও অপরাধই নাই, থাকিলেও তাহা ক্ষমার যোগ্য। নিজের কোনও দোষত্রুটি কখনও স্বীকার করিতে হইলেও ইহাকে যতটা সম্ভব লঘু করিবার জন্যই সকলে ব্যস্ত হই। কিন্তু অপরের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব। তাহাদের দোষকে ক্ষমা করিবার বা লঘু বলিয়া মনে করিবার যে সকল যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে তাহাও কেহ গ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত নহি। এরূপ অবস্থায় যে নিজের উন্নতিসাধন একেবারে অসম্ভব, তাহাত সহজেই বুঝা যায়। ইহাতে যে সমাজের বা জগতের উন্নতি সাধিত হইতে পারে না, তাহাও অধিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেই যে তাহাদের সকল দোষত্রুটি দূর হইয়া যাইবে, ইহা কখনও সম্ভবপর নহে। বরং এরূপ ব্যবহারে অপ্রেমই বর্দ্ধিত হয়, সুতরাং ইহাতে সংশোধনের পক্ষে ব্যাঘাতই উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ এরূপ অপ্রেমের বৃদ্ধি সকলের পক্ষেই অনিষ্টকর—অবনতির কারণ। এরূপ অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও নিজের প্রতি ক্ষমা যে ন্যায়সঙ্গতও নহে, তাহাও একটু চিন্তা ও পরীক্ষা করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে। আমরা নিজের সকল বিষয় যতটা

সত্যরূপে জানিতে পারি অপরের সম্বন্ধে তাহা কোনও প্রকারেই সম্ভবপর নহে। এই জন্যই খৃষ্টীয় সাধু টমাস এ, কেম্পিস (Thomas A Kempis) সাধককে উপদেশ দিতে যাইয়া বলিতেছেন—"তোমার নিজের দোষ কি প্রকারে ক্ষমা ও লঘু বলিয়া প্রতীয়মান করিতে হয়, তাহা তুমি বেশ ভালরূপেই জান, কিন্তু অপরের স্বপক্ষে কোনও ওজর শুনিতে তুমি প্রস্তুত নও। তুমি যদি নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে এবং তোমার ভাইকে ক্ষমা করিতে, তবে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত কাজ হইত। ("You know well enough how to excuse and palliate your own faults, but you are not willing to accept excuses for others. It would be more just were you to accuse yourself, and excuse your brother.") কথাগুলি যে আমাদের ন্যায় সাধারণ লোকের পক্ষে অতি সত্য, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধু ধার্ম্মিক লোকদের জীবনে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা সর্ব্বদাই অপরকে—ঘোর পাপীকেও—ক্ষমার চক্ষেই দেখিয়াছেন; কিন্তু আপনাকে কখনও ক্ষমা করেন নাই, বরং অপরাধীই মনে করিয়াছেন—সর্ব্বাপেক্ষা পাপী বলিয়াই বিলাপ করিয়াছেন। পুরাকালে শুধু যিশু প্রভৃতি মহাপুরুষদের জীবনেই যে এরূপ দেখা গিয়াছে, তাহা নহে। বর্ত্তমানকালেও ধার্ম্মিক পুরুষদের জীবনে ইহারই সাক্ষ্য পাওয়া যায়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সমাজের কাহারও কোনপ্রকার দোষত্রুটির কথা শুনিলে সেজন্য আপনাকে কিরূপ দোষী বলিয়া মনে করিতেন, কিপ্রকার গভীর আন্তরিক ক্ষোভের সহিত নিজের "কাণ মলিয়া" দিতে, নিজেকে "জুতা মারিতে" বলিতেন এবং অপরকে কত ক্ষমার চক্ষে দেখিতেন, তাহা আমরা সকলেই অবগত আছি। বাস্তবিক ইহাই স্বাভাবিক, ইহাই ধার্ম্মিকজীবনের লক্ষণ, জীবন-পথে উন্নতির পরিচায়ক। যাহারা জীবনে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, ভগবৎকৃপার বিবিধ নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট আপনার সামান্য অপরাধও গুরুতর বলিয়াই অনুভূত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু অপরেও তাঁহাদের অনুরূপ সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছে, ইহা নিশ্চিতরূপে জানিতে না পারায় তাঁহারা অপরের দোষকে ক্ষমার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। আপনার সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান থাকাতে আপনাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরাধী বলিয়া অনুভব করেন। এই জন্যই সাধু টমাস এ কেম্পিস অন্য একস্থলে বলিয়াছেন:—You must not consider yourself to have made any advancement, unless you feel that you are inferior to every one else"—"তুমি অপর সকলের অপেক্ষা নিকৃষ্ট—এরূপ যদি তুমি অনুভব না কর, তবে তুমি কিছুমাত্র উন্নতিলাভ করিয়াছ বলিয়া নিশ্চয়ই মনে করিও না।" এখানে বাহিরের বিনয়প্রকাশের কথা বলিতেছেন না, হৃদয়ের অনুভূতির কথাই বলিতেছেন। নিজেকে সকলের অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া হৃদয়ে অনুভব না করিতে পারিলে বুঝিতে হইবে উন্নতিপথে কিছুমাত্র অগ্রসর হওয়া হয় নাই। অতীব সত্য কথা। সুতরাং আমরা যখন আপনার দোষটাকে ছোট এবং অপরের ত্রুটিটাকে বড় বলিয়া দেখি, নিজেকে ক্ষমা করি আর অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করি—তখন বুঝিতে হইবে আমরা প্রকৃত ধর্ম্মজীবনে কিছুমাত্র অগ্রসর হই নাই। এই কথাটা আমাদের স্মরণে থাকে না বলিয়াই আমরা উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতির দিকেই যাই, প্রেমের পরিবর্ত্তে অপ্রেমের আগুনই আমাদের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে; আমাদের অপর সকল প্রকার চেষ্টা ও আয়োজন ব্যর্থ হইয়া যায়। এদিকে আমাদের সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক—আমাদের আত্মদৃষ্টি খুলিয়া যাউক, আমাদের মধ্যে প্রেম ও ক্ষমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক। আমরা যেন প্রত্যেকে আপনার দোষত্রুটির দিকে অধিকতর লক্ষ্য করি, অভিযোগ করিতে হইলে যেন আপনার বিরুদ্ধেই করি; এবং অপরের দুর্ব্বলতা যেন প্রেম ও ক্ষমার চক্ষে দর্শন করি। আমাদের মধ্যে পুণ্যময়ের, প্রেমময়ের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হউক। তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক।

ভক্তিভাজন আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী।

মহত্ত্বের প্রতি অনুরাগ।

শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবন আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহার প্রকৃতির যে লক্ষণটি আমার সকলের চেয়ে বেশী চোখে পড়ে, সেটি এই যে, মানুষের সহিত মানুষের ব্যবহারে যাহা কিছু মহৎ ও সুন্দর, তাহার ছাপ তাঁহার প্রাণে অতি সহজে ও অতি গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়া যাইত। মহৎ আচরণের প্রতি হৃদয়ের এই আকর্ষণ, মহত্ত্বের দ্বারা মুগ্ধ হইবার স্বভাব, শৈশব হইতেই তাঁহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার আত্মচরিত পাঠ করিলে দেখা যায়, নিজের বাড়ীতে ও মামার বাড়ীতে তিনি যে সকল আত্মীয়ের ক্রোড়ে শৈশবে লালিত পালিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে নিঃস্বার্থ ও উদার দয়া, নির্ভীক তেজস্বী ও সরল স্বভাব, সঙ্কল্পে দৃঢ়তা, অন্যায়াচরণে ঘৃণা প্রভৃতি মহামনা প্রকৃতির লক্ষণ অনেক বিদ্যমান ছিল। চুম্বকের আকর্ষণের মত এক স্বাভাবিক আকর্ষণে বালক শিবনাথের মন তাঁহাদের মহত্ত্বপ্রকাশক আচরণগুলির দিকে আকৃষ্ট হইত। তাঁহার মাতামহী বৃদ্ধাবস্থায় প্রতিদিন আধ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেন; নিজের হাত-খরচের টাকা হইতে কিছু পয়সা সঙ্গে লইতেন ও ফিরিবার সময় পথের দুই পাশের পরিচিত দরিদ্র পরিবারদের দেখিয়া আসিতেন, ও আবশ্যকমত অর্থ সাহায্য করিতেন। শাস্ত্রী মহাশয় আত্মচরিতে তাঁহার বিষয়ে লিখিয়াছেন, "বলিতে কি, তাঁহাকে আমি যখন স্মরণ করি, আমার হৃদয় পবিত্র ও উন্নত হয়, এবং এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, আমাতে যে কিছু ভাল আছে, তাহার অনেক অংশ তাঁহাকে দেখিয়া পাইয়াছি।" (১৬ পৃঃ)

শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতা হরানন্দ বিদ্যাসাগর স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণগ্রাহী বন্ধু ছিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ হইলেও পূর্ণ ব্রহ্মতেজ তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। "শর্ম্মা কারো বশ নয়!" এই গর্ব্বিত বচন তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই শোনা যাইত; এই বাক্য বলিয়া তিনি মানুষকে তো অগ্রাহ্য করিতেনই, বোধ হয় মৃত্যুকেও অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন। শিবনাথ তাঁহার

একমাত্র পুত্র। এই পুত্র সম্বন্ধে একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "ভিটামাটি বিক্রয় ক'রেও আমার পুত্রকে চূড়ান্ত শিক্ষা দিব"; এবং পরে আর একদিন এই পুত্রই যখন ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিল, তখন তিনি তাহার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন;—দীর্ঘ আঠারো বৎসর তাহার মুখ দর্শন করেন নাই; ইহার মধ্যে পুত্র একবার যখন রোগে মৃত্যুমুখে পতিত, তখন চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন কিন্তু তবু কাছে আসেন নাই; কঠোর দারিদ্র্য সত্ত্বেও সে পুত্রের প্রেরিত অর্থসাহায্য ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কি তেজস্বিতা! কি প্রতিজ্ঞার বল!

শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রপিতামহ রামজয় ন্যায়ালঙ্কার ১০৩ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য ও অপূর্ব্ব ধর্ম্মানুরাগের দৃষ্টান্ত ছিলেন। জরাজীর্ণ বার্দ্ধক্যেও প্রতিদিন প্রাতঃকালে একঘণ্টা জপতপে, আধঘণ্টা পিতৃপুরুষের তর্পণে, এবং আর আধঘণ্টা মাটিতে মাথা ঠুকিয়া ইষ্টদেবতার চরণে প্রণাম ও প্রার্থনায় যাপন করিতেন। মাথা ঠুকিয়া ঠুকিয়া তাঁহার কপালে আবের মত একটা মাংসের গুলি জমিয়া গিয়াছিল। প্রণাম ও প্রার্থনার পর তিনি শিশু প্রপৌত্র শিবনাথের হাত ধরিয়া ইষ্টদেবতার নাম গান করিতে করিতে নৃত্য করিতেন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধু ছিলেন। তিনি তেজস্বী নির্ভীক ও ধর্ম্মভীরু মানুষ ছিলেন। সেকালের অল্পসংখ্যক বিধবাবিবাহের সমর্থকদের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন। সোমপ্রকাশের সম্পাদকরূপে তিনি অপক্ষপাত তেজস্বিতার অনেক পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

বালক শিবনাথকে অল্প বয়সেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্রবে আসিতে হইয়াছিল। তাঁহার তেজস্বিতা, সরলতা, কৃত্রিমতায় ঘৃণা, পার্থিব বিত্তে নিস্পৃহতা, দরিদ্র ও বিধবার প্রতি দয়া ও আত্মীয়বৎ ব্যবহার, এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার মহৎ লক্ষ্যসাধনে আত্মোৎসর্গ,—এ সকল গুণ বালক শিবনাথের মনকে একেবারে অধিকার করিয়া ফেলিল। অনেক বিষয়ে যে বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রী মহাশয়ের আদর্শ পুরুষ ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই; এবং এই আদর্শের অনুরূপ অনেক গুণ তাঁহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

এই মহৎ আচরণের প্রতি শ্রদ্ধা, ও তদ্বিপরীত চরিত্রে অনাস্থা, শাস্ত্রী মহাশয়ের সারাজীবনে একটি প্রচ্ছন্ন প্রবল শক্তির মত কার্য্য করিয়াছে। উচ্চপদস্থ মানুষ, জনসাধারণের নেতা, নিকট আত্মীয়, গুণগ্রাহী বন্ধু, ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মবন্ধু, সাধনাশ্রমের একান্ত অনুরক্ত শিষ্য,—যেই হউক, কাহারও মধ্যে এবং কিছুরই খাতিরে, তিনি ক্ষুদ্রায়তন প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা করিতে পারিতেন না। নির্ম্মম ব্যবহার, অসরলতা, অন্যায় ও অনুদার বিচার, স্বার্থপরতা,—প্রভৃতি ক্ষুদ্রাশয় ও সঙ্কীর্ণ প্রকৃতির লক্ষণ সকল দেখিলে শাস্ত্রী মহাশয় চিরদিন অতিশয় ব্যথিত ও বিচলিত হইতেন।

তাঁহার 'নয়নতারা' উপন্যাসে (১৩০ পৃঃ) রায় মহাশয়ের গৃহে মণিলাল বাবুর আগমন বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন, "রায় মহাশয়ের সন্তানগণ পিতার, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার, বিশেষতঃ হরেন্দ্রের প্রশস্ত ললাট দেখিয়া অভ্যস্ত; তাই ভয় হয় বুঝি বা তাঁহার [অর্থাৎ মণিলাল বাবুর] ক্ষুদ্রায়তন মস্তকটি তাহাদের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করার পক্ষে বিঘ্ন উৎপাদন করে।" এটা তো গল্প; কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বন্ধে এ কথা সত্য যে, তিনি বাল্যকাল অবধি পিতা মাতা, মাতুল, মাতামহী, প্রপিতামহ ও বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রশস্ত ও উদার প্রকৃতি দেখিয়া অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। মানুষের ক্ষুদ্রায়তন মন তাঁহার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারিত না।

মহত্ত্বের ছাপ মনে ধরিয়া রাখা।

শাস্ত্রী মহাশয়ের হৃদয় যে কেবল মহত্ত্বের ছাপ সহজে গ্রহণ করিত, তাহা নহে; একবার সে ছাপ মনে বসিয়া গেলে আজীবন তাহা পাষাণের রেখার মত অঙ্কিত থাকিত। তাঁহার লেখায়, উপদেশে, বক্তৃতায়, বিশেষতঃ আলাপে,—আজীবন শ্রদ্ধায় ধৃত সেই ঘটনাবলী, উচ্ছ্বসিত ভাষায় বর্ণিত ও সহস্রবার পুনরুক্ত হইয়াছে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য তাঁহার তাজা শ্রদ্ধার গুণ যে, বার বার শুনিয়াও কখনও আমাদের কাছে তাহা পুরাতন লাগে নাই। সেই যে 'জালসি' গ্রামের এক যুবক ও তাঁহার বৃদ্ধ পিতামাতা ঝড়ের সময় গৃহহীন স্ত্রীলোক বালক ও পথিকদিগকে আশ্রয়দান ও তাহাদের সেবা করিয়াছিলেন (আত্মচরিত ৯০—৯৩ পৃঃ); দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ যে 'ভারতসভা' প্রতিষ্ঠার দিন একটি পুত্রসন্তান হারান, এবং এই শোক সত্ত্বেও যথাসময়ে সভার কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য উপস্থিত হন (২১৯ পৃঃ); বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী যে ছুতারের বিধবা মেয়েকে কোলে করিয়া আদর করিয়াছিলেন, (১২১ পৃঃ); আচার্য্য কেশবচন্দ্রের ঈশ্বরে ঐকান্তিক নির্ভর (১৮০ পৃঃ) ও উত্তেজনারহিত আত্মসংযম (১৭৫, ১৭৬ পৃঃ); চাকর 'খোদাইয়ে'র মহত্ত্ব ও প্রভুভক্তি (২২৯, ২৩০, পৃঃ); কোকনদায় রোগের সময় একটি ব্রাহ্মণযুবক যে এক মুহূর্ত্তে সমাজভয় তুচ্ছ করিয়া ম্যাথরাণীর হাত হইতে শাস্ত্রী মহাশয়ের শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করেন (৪২৫ পৃঃ);—প্রভৃতি আত্মচরিতে উল্লিখিত অনেক ঘটনা, এবং রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর মহাশয়, রামতনু লাহিড়ী মহাশয় প্রভৃতির জীবনের অনেক ঘটনা, শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখ হইতে কতবার যে শ্রবণ করিয়াছি তাহার সংখ্যা নাই। এ সকল ঘটনা লুপ্তপ্রায় স্মৃতি হইতে শেষজীবনে সংগ্রহ করিয়া তিনি আত্মচরিতে লিপিবদ্ধ করেন নাই; এ সকল সারাজীবনে তাঁহার অন্তরকে অনুপ্রাণিত রাখিয়াছে। মহত্ত্বের পরিচায়ক ঘটনাবলীর দ্বারা স্মৃতির ভাণ্ডারকে এমন করিয়া পূর্ণ রাখিতে আর কাহাকেও আমরা দেখি নাই।

বাস্তবিক তাঁহার হৃদয় সাধুতা ও মহত্ত্বের ছাপ লইতে মোমের মত কোমল, ও সে ছাপ আপনাতে রক্ষা করিতে প্রস্তরের মত দৃঢ় ছিল।

মানুষকে মানুষ হিসাবে বিচার করা।

শাস্ত্রী মহাশয় যে সকল মানুষের সংস্রবে আসিয়াছিলেন, সকলকেই প্রধানতঃ মানুষ হিসাবেই বিচার ও গ্রহণ করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিষয়ে তাঁহার যে প্রবন্ধ আছে, তাহাতে

(প্রবন্ধাবলী ২১ পৃঃ) তিনি বলিতেছেন, "আমরা মানুষ, আমরা আসল মানুষ ধরিতে পারিলে বড় সুখী হই। এইজন্য বড় লোকদিগের জীবনচরিত পাঠ করিবার সময়ে তাঁহারা দশের মাঝে কি কাজ করিয়াছিলেন, প্রকাশ্যসভায় কি বলিয়াছিলেন, উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কি করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য তত ব্যগ্র হই না; কিন্তু গৃহে, পরিবারে, বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কি করিয়াছিলেন বা কি বলিয়াছিলেন, তাহা শুনিতে ভালবাসি; কারণ সেখানে আসল মানুষটি ধরিতে পারা যায়।" শাস্ত্রী মহাশয় মানবচরিত্র অধ্যয়ন ও বিচার করিবার সময় সর্ব্বদা এই আসল মানুষটির দিকে দৃষ্টিকেই সর্ব্বপ্রধান স্থানে রাখিতেন।

ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্ত্তকগণের সম্বন্ধেও এই কথা। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের দিক্ দিয়া যে দেখিবে সে বলিবে, শাস্ত্রী মহাশয় রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের অনুবর্ত্তী; এবং তাহার দেখিবার বিষয় হইবে যে, কার্য্যগত জীবনে শাস্ত্রী মহাশয় ঐ পূর্ব্বগামীদিগের কাজের কখনও অনুসরণ, কখনও বিস্তার, কখনও বাধাপ্রদান করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের অন্তরের জীবন আলোচনা করিতে গেলে এ কথা বলা নিতান্তই ভুল হইবে যে, ঐ মহাপুরুষগণের সঙ্গে তাঁহার জীবনের সম্বন্ধ ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তের সীমারেখার দ্বারা পরিমিত। যেমন অন্যান্য মহাপুরুষগণকে, তেমনি ব্রাহ্মসমাজের ঐ অগ্রগামী মহাজনদিগকে, শাস্ত্রী মহাশয় নিজ হৃদয়ে তাঁহাদের কার্য্য ও তাঁহাদের বাণী অপেক্ষা, তাঁহাদের চরিত্রের জন্যই অধিক মূল্য দিয়াছেন। উনত্রিশ বৎসর শাস্ত্রী মহাশয়ের অতি নিকটে নিকটে থাকিয়া তাঁহার মুখ হইতে ঐ মহাপুরুষগণের মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বের পরিচায়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলীর কথাই বার বার শুনিয়াছি; মহাত্মা কেশবচন্দ্র সম্বন্ধেও এই কথা। যাঁহারা মনে করেন, কেশবচন্দ্রের প্রতি শাস্ত্রী মহাশয়ের মনের ভাবের প্রধান অংশ ছিল তাঁহার প্রতি বিরোধ, তাঁহারা শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রকৃতি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই।

ইতিহাসে মানুষটির স্থান কি, তাহার দ্বারা তাহার বিচার ও তাহার ব্যক্তিগত জীবনের বিচার,—এই দুইকে শাস্ত্রী মহাশয় পৃথক্ করিতেন। তাঁহার মনের ভাব যেন কতকটা এইরূপ ছিল,—"দেশের, জাতির, অথবা ধর্ম্মমণ্ডলীর চিন্তা ও ভাবের ক্রমোন্নতির ধারা বিধাতার হস্তে; সে ধারার মধ্যে কোন্ বিন্দু হইতে কোন্ বিন্দু পর্য্যন্ত কাহার জীবন বিস্তৃত, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপিত হইবে। কিন্তু তাহার ব্যক্তিগত জীবনের মূল্য অন্যরূপ; সে মানুষটি নিজ আলোকের কাছে, নিজ আদর্শের কাছে, কতটা বিশ্বস্ত থাকিতে পারিল, তাহা দেখিয়াই এই মূল্য নিরূপণ কর।" এক ধর্ম্মবিধানের অন্তর্গত হইলেও কাহারও নিজস্ব ব্যক্তিত্ব লুপ্ত হইয়া যায় না; সে ব্যক্তিত্বকে বাদ দিয়া মানুষের বিচার করা ভুল,—শাস্ত্রী মহাশয় এইরূপ বিশ্বাস করিতেন।

বাধ্যতা ও দৃঢ়তা।

শাস্ত্রী মহাশয়ের বয়স যখন ১২।১৩ বৎসর, তখন তাঁহার পিতা একদিন প্রহার করিবার অভিপ্রায়ে বলিয়া গেলেন, "এই খানে দাঁড়িয়ে থাক্, নড়িস্ নে, আমি আস্‌চি;" এই আদেশ করিয়া মারিবার জন্য লাঠি খুঁজিয়া আনিতে গেলেন। পরিবারের মেয়েরা বলিতে লাগিলেন, "ওরে, পালা! পালা! মার খাবার জন্য কেন দাঁড়িয়ে আছিস্?" তেজস্বী বালক শিবনাথ বলিলেন, "না, আমি পালাব না, বাবা আমাকে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে বলেছেন।" আধ ঘণ্টা পরে পিতা একখানা চেলা কাঠ লইয়া আসিয়া নিদারুণ প্রহারে পুত্রকে সংজ্ঞাশূন্য করিয়া ফেলিলেন; সকলে মনে করিল প্রাণ গিয়াছে। সে প্রহার পুত্র দাঁড়াইয়া সহ্য করিলেন, কিন্তু পলায়ন করিলেন না।

শাস্ত্রী মহাশয়ের ১২ বৎসর বয়সে প্রথম বার বিবাহ হয়। তাঁহার বয়স যখন ১৮।১৯ বৎসর তখন তাঁহার শ্বশুরকুলের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া পিতা তাঁহার দ্বিতীয় বার বিবাহ দেন। পুত্রের আপত্তি পিতা শুনিলেন না, পুত্র তখন এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিলেন যে, রামচন্দ্র পিতৃ-আজ্ঞায় চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসের কষ্ট পাইয়াছিলেন; আমি না হয় আজীবন কষ্ট পাইব।

কিন্তু ইহার অল্পদিন পরেই ধর্ম্মভাবের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মনের এই সান্ত্বনা ঘুচিয়া গেল। মন বলিতে লাগিল, "আমি নিজের কষ্টের কথাই ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু নিরপরাধা প্রথমা স্ত্রীর জীবন যে বিষময় করিয়া ফেলিলাম, এ অপরাধের ক্ষমা নাই।" ঘোর বিষাদে ও অনুতাপে মন জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। অবশেষে হৃদয়ের শান্তির জন্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। এই যে জীবনে প্রার্থনাকে সম্বল করিলেন, এই সম্বল কখনও পরিত্যাগ করেন নাই।

ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের ঈশ্বরোপাসনাতে যাইতে আরম্ভ করিলেন। পিতা নিষেধ করিলেন, কিন্তু তাঁহার মন হইতে তখন মানুষের ভয় চলিয়া গিয়াছে; বিশ্বাস অনুসারে কাজ করিবার সাহস প্রাণে আসিয়াছে। তখন তাঁহার মন্ত্র এই,—"কর্ত্তব্য বুঝিব যাহা, নির্ভয়ে করিব তাহা, যায় যাক্ থাকে থাক্ ধন প্রাণ মান রে!" ইহার কিছুদিন পরেই ছুটীর সময় বাড়ী যাইতে হইল। অন্যান্য বার বাড়ী গেলে তাঁহাকেই বাড়ীর ঠাকুর পূজার কাজ করিতে হইত। এবার তাহা করিতে অসম্মত হইলেন। পিতা কুপিত হইয়া লাঠি হস্তে ধাবিত হইয়া আসিলেন। তিনি ধীরভাবে বলিলেন, "কেন বৃথা আমাকে প্রহার করিবেন? আমি অকাতরে আপনার প্রহার সহ্য করিব। আমার দেহ হইতে এক একখানা হাড় খুলিয়া লইলেও আর আমাকে ঠাকুরঘরে লইয়া যাইতে পারিবেন না।" পুত্রের কথা শুনিয়া ও দৃঢ়তা দেখিয়া পিতা থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন ও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আধ ঘণ্টা ধরিয়া কুপিত ফণীর ন্যায় ফুলিতে লাগিলেন; তৎপরে তাঁহাকে ঠাকুর পূজার কাজ হইতে নিষ্কৃতি দিলেন।

বংশ ও আবেষ্টন হইতে শাস্ত্রী মহাশয় যে তেজস্বিতা ও অজেয় ইচ্ছাশক্তি লাভ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মভাবের অনুগত হইয়া তাহা আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। তখন হইতে তাহা প্রধানতঃ আত্মশাসনে ও আত্মবিলোপে নিযুক্ত হইল। যাহা মিষ্ট লাগে তাহা হইতে মনকে সবলে ফিরাইতে হইবে, 'মনের কাণ মলিয়া' মনকে বশ করিতে হইবে, অন্যের অবজ্ঞা, অপমান, বিরুদ্ধাচরণ নীরবে সহ্য করিতে হইবে, এই সঙ্কল্পে মন বাঁধিলেন। যে প্রখর তেজ পিতৃমহাশয়ের চরিত্রে ব্রাহ্মণোচিত উগ্রতা ও দর্পের আকারে প্রকাশ পাইত, শাস্ত্রী মহাশয়কে তাহাই সকলের পদতলে লুণ্ঠিত করিল।

ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ।

মহাত্মা কেশবচন্দ্রের জলন্ত ধর্ম্মভাবের সংস্পর্শে আসিয়া শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনে ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভর, ও ঈশ্বরের সেবায় আত্মসমর্পণের আকাঙ্ক্ষা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। মহত্বে অনুরাগ, উদারতা, প্রতিজ্ঞার বল প্রভৃতি স্বাভাবিক সদ্গুণ, ধর্ম্মভাবের অগ্নি লাভ করিয়া তাঁহার জীবনকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। সেই দিন হইতে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত, সুখে দুঃখে সংগ্রামে ঈশ্বরের উপরে একান্ত হৃদয়ে নির্ভর,—নিজের, পরিবারের আশ্রিত জনের, ও সঙ্কল্পিত সকল সাধুকার্য্যের সকল অভাব পূরণের জন্ত কেবল তাঁহারই মুখ চাহিয়া থাকা, তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষণ হইল।

জীবনের শ্রম ও সংগ্রাম।

তাঁহার জীবন যে কিরূপ সংগ্রামে ও পরিশ্রমে কাটিয়াছে, তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব। পিতার বিরাগ, দুই পত্নী লইয়া সংসার করার নানাবিধ জটিলতা, ধর্ম্মমণ্ডলী হইতে বিচ্ছেদের কঠিন ক্লেশ ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বেগ, প্রবল আন্দোলনের মধ্যে পতিত হওয়া, নূতন সমাজ স্থাপন ও তাহার নিয়মাবলী প্রণয়ন, সে সমাজের জীবন ও কার্য্য গঠন করা, তাহার দুইখানি পত্রিকা চালানো; ইহার সঙ্গে সঙ্গে কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে বাস, তদুপরি নানা বন্ধুর সন্তানসন্ততির ভার, পরিবার পরিদর্শনের ভার, অর্থসাহায্যের ভার, এবং কয়েকটি নিরাশ্রয় অনাথ ও দুঃস্থ ব্রাহ্মপরিবারগুলির আশ্রয় ও অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা; প্রচারার্থ ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে ভ্রমণ; ব্রহ্মমন্দিরের জন্ত অর্থ সংগ্রহ, ভারতসভা ও তৎপরে ছাত্রসমাজ, সিটী স্কুল, নীতি-বিদ্যালয়, ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়, ব্রাহ্মমিশন প্রেস, ব্রাহ্মসাধনাশ্রম ও বাঁকিপুর রামমোহন রায় সেমিনারী, এই সকল প্রতিষ্ঠানের কল্পনা ও সংস্থাপন, ইহাদের বিষয়ে মানুষকে অনুরাগী করিবার প্রয়াস, ইহাদের জন্ত অর্থসংগ্রহ, এবং ইহাদের কার্য্যপরিচালন; আচার্য্য রূপে উপাসকমণ্ডলীর পরিচর্য্যা; জলন্ত উপদেশ ও বক্তৃতা দ্বারা দেশকে আন্দোলিত ও আলোড়িত করা; ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ও ইতিহাসবিষয়ক পুস্তক প্রণয়ন, ও অবসর মত সাহিত্য সেবা;—যখন তাঁহার জীবনের এই সকল ব্যাপারের কথা চিন্তা করি, বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া যাইতে হয়।

শক্তির মূল।

কোন্ শক্তির বলে মানুষ এত সংগ্রাম, এত শ্রম করিতে পারে? কোন্ অগ্নিতে জীবন প্রদীপ্ত হইলে তাহার এমন উজ্জ্বল আলো, এমন প্রতাপ, এমন প্রভাব হয়? সে কি শক্তি ছিল শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনে, যাহাতে তাঁহার মুখের কথা শুনিবার জন্ত আমরা পাগলের মত ছুটিয়া আসিতাম? যাহার বলে কত জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, হৃদয়ের মহৎ আকাঙ্ক্ষা-রাশি, মথিত জলধির ন্যায়, উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, সেবাতে আপনাকে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত মানুষ উন্মত্ত হইয়াছে, অনুতাপের ক্রন্দনে মানুষ আকুল ও উচ্ছ্বসিত হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়াছে? বেদীতে বসিয়া শাস্ত্রী মহাশয় কোন্ অনল বর্ষণ করিতেন? তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া মানুষ কোন্ মোহন মন্ত্রে আত্মহারা হইয়া যাইত?

আত্মবিলোপ।

যদি শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনে কোনও অনল থাকিয়া থাকে, তবে তাহা তাঁহার আত্মদান। তাঁহার প্রভাব, তাঁহার বেদী ও বক্তৃতামঞ্চ হইতে উচ্চারিত বাণীর নিগূঢ় শক্তি, ঐ এক মূল হইতে,—তিনি যে আপনাকে একেবারে দিয়াছিলেন। এমন করিয়া আপনাকে দিতে, আপনাকে হারাইতে, আপনাকে লুপ্ত করিতে আর কাহাকেও দেখি নাই।

তিনি শুধু যে চাকরী পায়ে ঠেলিয়া ঈশ্বরের সেবায় আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহাই নহে। সাধনাশ্রমের আদর্শ ব্যক্ত করিতে গিয়া তিনি যে লিখিয়াছিলেন, 'ঈশ্বরের সেবার জন্ত না করিতে পারি এমন কাজ থাকিবে না, না ছাড়িতে পারি এমন সুখ থাকিবে না',—এ আদর্শ নিজ জীবনে অক্ষরে অক্ষরে ফলাইয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। শরীরের দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই; দুরন্ত শ্রমে স্বাস্থ্য ভগ্ন হইতেছে, সে দিকে দৃষ্টি নাই; দিবসে বিশ্রাম নাই, রাত্রিতে নিদ্রা নাই; সর্ব্বদা একই ধ্যান, একই জ্ঞান,—এরূপ আত্মোৎসর্গ, এমন করিয়া আপনাকে ঈশ্বরের কাজে সমর্পণ কি আর দেখিতে পাইব? আপনার সর্ব্বস্ব দিয়া ব্রাহ্মসমাজের জন্ত খাটিতেছেন, তবুও কোনও নূতন কাজ হাতে লইয়া তাঁহার প্রথম ভাবনা এই হইত, 'আমি কি দিতে পারি?' তিনি কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটাইয়াও, ব্রাহ্মসমাজের কত কার্য্যে কষ্টে উপার্জ্জিত নিজের কত টাকা ঢালিয়া দিয়াছেন। নিজ পরিবারের আর সকলের আরাম সুখ সুবিধা আগে দেখিতেন; বাড়ীর প্রধান ব্যক্তি যে তিনি, তাঁহারই সুখসুবিধা সকলের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিত। এমন নিরভিমান ছিলেন যে, কথা কহিতে কহিতে নিতান্ত ছেলে ছোকরাও যদি তাঁহার মুখের কথা ফুরাইতে না দিয়া প্রতিবাদ করিত, কিংবা প্রশ্নের উত্তর না দিয়াই চলিয়া যাইত, তবু ধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা বই আর কিছু করিতেন না। কাহাকেও ডাকিয়া পাঠাইলে, সে যদি না আসিত, 'আমারই কি অপরাধ হইয়া থাকিবে, নতুবা সে কেন আসিল না',—এই চিন্তা তাঁহার মনকে আকুল করিত।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের পর হইতে নানা রকমের এত অধিক কাজ এক এক সময়ে তাঁহার উপর পড়িত যে, তাহার সব-গুলিকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করা একজন মানুষের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। এই কথা মনে করিয়া অপর যে কোনও লোক নিজ কার্য্যের দোষ ত্রুটির মধ্যে সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিত; কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় এই চিন্তাদ্বারাও আপনাকে মার্জ্জনা করিতেন না। আরও অধিক শ্রম, যাহা মানুষের অসাধ্য, তাহাই করিবার জন্ত সঙ্কল্পে প্রাণকে বাঁধিতেন। তাঁহার এইরূপ সময়ের ডায়েরীতে দিনের পর দিন কেবল এই প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায়, 'আমাকে আরও বিশ্বাসী কর; আরও তোমার হাতে আপনাকে দিতে শিখাও।" কিসে আপনাকে ঈশ্বরচরণে আরও অধিক বিশ্বস্ততার সহিত দিতে পারিব, কিসে আরো বেশী খাটিতে পারিব, সুখ স্বার্থ আরো ছাড়িতে পারিব, মান অভিমান আরো ভুলিতে পারিব',—এই তাঁহার নিয়ত ধ্যান, এই তাঁহার দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর এক প্রার্থনা, এই তাঁহার এক বুলি, এই তাঁহার এক নেশা। আপনাকে এখনও সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের

হাতে দেওয়া হইল না, এই তাঁহার এক বিলাপ। তাঁহার 'প্রভু হে, আনিলে যে কাজ করিতে, প্রাণ তাতে দিলাম কই?' এই সঙ্গীতে এই বিলাপ অতি কাতর ভাষায় ধ্বনিত হইয়াছে।

দশজনে মিলিয়া কোনও কাজ করিতে গেলে তিনি আপনাকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দায়ী বলিয়া অনুভব করিতেন; নিজেকে বাঁচাইয়া চলিবার যে মানব-মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তাহা তিনি সমূলে উৎপাটিত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে অকল্যাণকর কোনও ব্যাপার ঘটিলে, 'আমি অধম, আমি অপদার্থ, তাই এমন ঘটিতেছে' বলিয়া নিজের কেশ ছিন্ন করিতেন; সমস্ত অপরাধের বোঝা নিজের মাথায় লইতেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক ও আচার্য্য ছিলেন; কমিটিতে মতবিরোধস্থলে কত সভ্য তাঁহার সে পদের প্রাপ্য সম্মান বিস্মৃত হইতেন; শাস্ত্রী মহাশয় সে সব অবমাননা অগ্রাহ্য করিয়া নিজ অভীপ্সিত কার্য্যের প্রতিই দৃষ্টি করিতেন। কতবার তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে মর্ম্মে বিদ্ধ হইয়াও তিনি বলিয়াছেন, 'সেখানে তো সবাই সমান; সংঘর্ষণ ও তাহার উত্তাপ সহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াই সেখানে যাইতে হয়।'

তাঁহার সঙ্গে মিলিয়া তাঁহারই নির্দ্দেশ অনুসারে কার্য্য করিয়া আমরা যদি সফলতা লাভ করিতাম, তিনি সফলতার সম্পূর্ণ গৌরব আমাদিগকেই দিতেন; কত বাড়াইতেন, কত উৎসাহ দিতেন; একবার আভাসেও এ কথা প্রকাশ পাইত না যে, তাঁহারই সংস্পর্শে আসিয়া আমরা শক্তিলাভ করিয়াছি; বরং কত সময়ে তাহার বিপরীত কথাই তাঁহার মুখে শ্রবণ করিয়া অতিশয় লজ্জিত বোধ করিতে হইয়াছে। তাঁহার নিজ দোষ ত্রুটির অনুভব এত তীক্ষ্ণ ছিল, ও আত্মাবমাননাসূচক কথা এতবার এত অধিক বলিতেন যে, আমরা তাহা শুনিয়া এক এক সময় অতিশয় ক্লেশ অনুভব করিতাম। একদিন তাঁহার মুখে এরূপ কথা শুনিতে শুনিতে আমার মনে হইতে লাগিল, ইহা শ্রবণ করাতে আমার অপরাধ হইয়াছে। অশ্রুপূর্ণ নয়নে আমি তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া বলিলাম, 'তবে কি আমরা নিরাশ হইব?' তিনি তুলিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, 'তা কেন? আমি তো নিরাশ হইতেছি না! নিরাশা তো নাস্তিকতা। আমি শুধু আমার অপদার্থতার কথাই বলিতেছি।' আমাদের জীবনে এমন দিন গিয়াছে, যখন শাস্ত্রী মহাশয় ইঙ্গিত করিলে আগুনে ঝাঁপ দিতেও পারিতাম; তিনি আমাদের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক নিকটতার মধ্যে ছিলেন যে, পক্ষিমাতা ডিমে তা দিবার সময়ও বুঝি তেমন থাকে না; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এক মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি আমাদের কাছে আপনাকে প্রচার করেন নাই; দূরতম ইঙ্গিতের দ্বারাও কখনও এমন ভাব প্রকাশ করেন নাই যে, তাঁহার মধ্যে আমাদের অনুকরণের যোগ্য কিছু আছে। তাঁহার গুণ, তাঁহার দান, তাঁহার পরোপকার, তাঁহার ত্যাগ আমাদের কাছে আবরণ করিয়া রাখিতেই যেন তাঁহার প্রয়াস ছিল। হায়, এমন আত্ম-বিলোপ কি আর দেখিতে পাইব? কতবার আমাদের মনে হইয়াছে, তিনি যদি সাধনাশ্রমে আমাদের উপর তাঁহার ব্যক্তিত্বের চাপ একটু প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে হয় তো আমাদের আরো কল্যাণ হইত। কিন্তু তিনি সেরূপ করিবার মানুষই ছিলেন না।

শুধু কি নিজের গুণই আবরণ করিয়া চলিতেন? দারিদ্র্য, সংগ্রাম, মানুষের অসদ্ভাব ও অন্যায়-বিচারজনিত ক্লেশ, পারিবারিক অশান্তি, শোকের আঘাত, রোগের ক্লেশ, কিছুই কখনও প্রকাশ করিতেন না। এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে, কিন্তু সব যেন মনের ভিতর বিশ হাত গভীর স্থানে পুঁতিয়া রাখিতেন; চোখের মুখের ভাব, কিংবা ভাষা তাহা প্রকাশ করিবার অধিকার পাইত না। এই সকল লইয়াই তিনি পরের জন্য খাটিয়াছেন; পরের অশ্রু মোচন করিয়াছেন। কেবল তাঁহার কবিতায় কখনও কখনও তাঁহার সংগ্রামের আভাস পাওয়া যায়:—

আমি বড় দুঃখী, তাতে দুঃখ নাই,
পরে সুখী ক'রে সুখী হ'তে চাই।
নিজে তো কাঁদিব, কিন্তু মুছাইব
অপরের আঁখি, এই ভিক্ষা চাই।

এই আত্মবলিদান, আত্মোৎসর্গ, আত্মবিলোপ, শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনের সকল শক্তির উৎস। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে তাঁহার স্থান যে অতি গৌরবময়; সমাজসংস্কার কার্য্যের তিনি যে একজন অগ্রণী; দেশের মধ্যে তিনি যে একজন প্রধান বাগ্মী ও জন-নায়ক; সমসাময়িক যুবকগণের মনুষ্যোচিত জীবনগঠনে তিনি যে একজন প্রধান সহায়; তাঁহার এ সকল গৌরব তাঁহার এই অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের গৌরবের তুলনায় কিছুই নহে।

ক্রমশঃ

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পিতৃদেবের জীবনে বিধাতার লীলা। *

এই সেই ব্রহ্মমন্দির—যেখানে আশৈশব পিতৃদেবের জ্বলন্ত উপদেশ ও অগ্নিময় বক্তৃতাসকল শ্রবণ করিয়াছি। আজ যে সেই মন্দিরে এমনি করিয়া তাঁর পবিত্র শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। পিতার মহৎ জীবনের সম্যক্ চিত্র আমার ন্যায় অযোগ্য কন্যার কি অঙ্কন করা সাধ্য? আমি আশৈশব কথায় কথায় পিতাকে বলিতাম, "বাবা, আমি তোমার জীবনচরিত লিখিব।" ১৮৮৮ সালে পিতৃদেব যখন বিলাতে ছিলেন, তখন এক পত্রে আবার ঐ কথা লিখি। তদুত্তরে পিতৃদেব আমায় যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"3rd August, 1888.—মা লক্ষ্মি, আমি কি জানি না আমার জীবনের মূল্য আছে? এই দেহ রক্ষা করিলে এখনও অনেক দিন ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিতে পারা যাইবে। আমার এখন মনে হইতেছে, আমি আজ পর্য্যন্ত যাহা করিয়াছি তাহা কিছুই নহে। তুমি তোমার এক পত্রে লিখিয়াছ যে, তুমি আমার জীবনচরিত লিখিবে। ছি! ছি! এমন কাজ করিও না। তোমার পিতার জীবনচরিত লিখিবার সময় এখনও হয় নাই। ঈশ্বরের সেবাতে আমার এই শ্মশ্রু যখন শুভ্রবর্ণ হইয়া যাইবে, এই রসনা তাঁহার গুণ গান করিতে করিতে যখন বার্দ্ধক্য বশতঃ

* সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ২রা নবেম্বরের উপাসনার পর শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকার কর্ত্তৃক পঠিত।

নিস্তেজ ও অসমর্থ হইয়া আসিবে, এই চক্ষু তাঁহার বিশ্বাসী দলের মুখ দেখিতে দেখিতে যখন নিস্তেজ ও অন্ধ হইয়া যাইবে, যখন আমি তোমাদের স্কন্ধে হাত দিয়া ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে যাইব, এবং এখন যাহারা জননীর গর্ভে আছে তাহারা আচার্য্যের কার্য্য করিবে, সেই জীবনের সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত যদি বাঁচিয়া থাকি, এবং তুমি মা যদি বাঁচিয়া থাক, তবে তোমার বাবার সামান্য জীবনের বৃত্তান্ত লিখিবে। তোমার পিতার জীবনে জগদীশ্বরের করুণা কিরূপ কাজ করিয়াছে তাহার সাক্ষ্য দিও। আবার, আমার জীবনচরিত লেখা হইবে ভাবিলেও আমার লজ্জা হয়।"

কি আশ্চর্য্য! তাঁর এই সকল কথা কি অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয় নাই? ভগবানের সেবা করিতে করিতে তাঁহার দেহ কি ভগ্ন, শ্মশ্রু কি শুভ্র হয় নাই? ভগবানের গুণ গান করিতে করিতে সেই রসনা বার্দ্ধক্যবশতঃ নিস্তেজ ও অসমর্থ হইয়া যায় নাই কি? একদিন যে কণ্ঠের স্বরে এই মন্দির প্রতিধ্বনিত হইত, তাহা অস্ফুট শিশুর ভাষার ন্যায় অস্পষ্ট হয় নাই কি?—বিশ্বাসিগণের মুখ দেখিতে দেখিতে সেই চক্ষের জ্যোতি কি নির্ব্বাপিত হয় নাই? তাঁর সাধ ছিল, আমাদের স্কন্ধে ভর দিয়া মন্দিরে আসিবেন; গত মাঘোৎসবে আমার পুত্রের স্কন্ধে ভর দিয়া তিনি এই মন্দিরে কি আসেন নাই—এবং ফিরিবার সময় দুর্ব্বলতা বশতঃ পড়িয়া গিয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন নাই কি? ১৮৮৮ সালে—আজ ৩১ বৎসর পূর্ব্বে—লিখিয়াছিলেন, তখন যাহারা জননীর গর্ভে ছিল তাহারা যখন আচার্য্যের কার্য্য করিবে, তখনই তাঁর জীবন বৃত্তান্ত লিখিবার সময় হইবে। বাবার ভাগ্যে সবই বর্ণে বর্ণে পূর্ণ হইয়াছে—শ্রীমান্ সুকুমার রায় এই মন্দিরে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন, বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় সুকুমার প্রার্থনা করিয়াছিলেন; এটাও বাবার প্রার্থনার বিষয় ছিল। ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে—সকলই পূর্ণ হইয়াছে। আমি ত আজ বাঁচিয়া আছি, তাঁর জীবনচরিত লিখিয়া উঠিতে পারিব কি না, জানি না। তবে একটি কাজ আমি আজ করিব, পিতা যাহা বলিয়াছিলেন, "তোমার পিতার জীবনে জগদীশ্বরের করুণা কিরূপ কার্য্য করিয়াছে তাহার সাক্ষ্য দিও।" আজ আমি সেই কথাই বলিব। আমার পিতার জীবনে বিধাতার লীলা।

আমার সৌভাগ্যবশতঃ আমার জন্মের ৩।৪ বৎসরের পূর্ব্বে—বাবার ধর্ম্মজীবনের উন্মেষসময়ের কয়েক খানি পত্র আমার নিকট আছে। সন ১২৭১ হইতে ১২৭৬ সালের মধ্যে এই পত্রগুলি লিখিত হইয়াছে। এই পত্রগুলি অতি অপূর্ব্ব জিনিষ; বাবার হৃদয়ের এমন সুন্দর চিত্র আর কোথাও পাওয়া যাইবে না। ভগবান কিসে যে কি করেন তাহা বোঝা যায় না। ১৭।১৮ বৎসর বয়সে বাবা যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন, তখন হইতেই বাবার আত্মা উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে—এই শোচনীয় ঘটনা তাঁর প্রাণে নিদারুণ অনুতাপের উদয় করে। হৃদয়ের যাতনায় তিনি অস্থির হইয়া ভগবানের শরণাপন্ন হন; ভগবান্ই তাঁহাকে তুলিয়া ধরিলেন। এই সময়কার কথা তাঁহারই সেই সময়ে লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। পত্রখানি তাঁহার পিসতুতো ভাইকে অনুমান ১৮৬৯ সালে লেখেন।

"মেজদাদা, আপনারা কিরূপে বিশ্বাস করিলেন যে, আমি বাবাকে ঠাট্টা করিয়াছি? আমি "ধর্ম্ম ধর্ম্ম" করিয়া এতদিন পরে কি এই ফল পাইলাম? কিন্তু এ কথা বলি যে, বাবার সহিত এতদিন যে আমার বিরোধ হইতেছে তাহাতে আমি নির্দ্দোষ নই। আমার যখন দ্বিতীয় বার বিবাহ করিবার কথা হয়, তখন যে সে কাজটাকে অতি জঘন্য বলিয়া বুঝি নাই, এমন নয়; কারণ, যার একটু বুদ্ধি আছে সেই বুঝিতে পারে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আমি বাবাকে এত ভয় করিতাম যে, কিরূপে বাবার অবাধ্য হইতে হয় জানিতাম না। সুতরাং বাবা যখন অনুরোধ করিলেন তখন "না" বলিতে সাহস হইল না। এ বিষয়ে লোকে বাবাকে দোষে, কিন্তু আমি আমাকে অধিক দোষ দিই—বাবাত তখন ক্রোধে অন্ধ হইয়াছিলেন—আমি বুঝিয়া সুঝিয়া স্থির ভাবে করিয়াছি। কিন্তু সেই বিবাহের সময় আমার কিরূপ কষ্ট হইয়াছিল তাহা বাবার মনে থাকিতে পারে। যখন হাতে হাতে কন্যা সম্প্রদান করে তখন সেই হাতের উপর আমার চক্ষের জল পড়ে। সে যাহা হউক, বিবাহের পর আমার মন বড় অস্থির হইয়া উঠিল। কোথাও শান্তি পাই না। সে সময়ে বাবাকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলাম, ফাইল হইতে লইয়া দেখিবেন, তাহাতে হয় ত আজিও চক্ষের জল আছে। সেই মনের কষ্টের সময় কে যেন মন হইতে বলিতে লাগিল, "আর আপনার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের জন্য পরের উপর নির্ভর করিও না, যাহা সত্য ও কর্ত্তব্য হয় কর। তোমার দিকে আমি আছি।" আমি তদবধি স্বাধীন ভাবে নিজ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভাবিয়া কাজ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম। এবং সেই ঘোর মনোযন্ত্রণার সময় আপনা হইতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা আরম্ভ করিলাম। ক্রমে গোপনে ও প্রকাশ্যে সমাজে গিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতে আরম্ভ করিলাম। বাবা কলিকাতায় আসিলেন ও আসিয়া আমাকে সমাজে যাইতে নিষেধ করিলেন। আমি তখন মনের কষ্টে একপ্রকার ক্ষিপ্তপ্রায় ছিলাম, সুতরাং রুক্ষভাবে বাবাকে আমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা জানাইলাম। সেই আমার প্রথম অবাধ্যতা। আমার আজিও মনে আছে, বাবা সে দিন মনে কি ক্ষোভ পাইয়াছিলেন ও কত কাঁদিয়াছিলেন। যে পুত্র এত বাধ্য ছিল, যে দাঁড়াইয়া মার খাইতে খাইতে অজ্ঞান হইয়া পড়িত তথাপি একবারও পলাইবার চেষ্টা করিত না, যে পুত্র এত বাধ্য ছিল যে, তাঁহার অনুরোধে মস্তকে চিরজীবনের যন্ত্রণা পাইতে কুণ্ঠিত হইল না, সেই পুত্রের অবাধ্যতা!—নিশ্চয় বাবার প্রাণে সে দিন বড় লাগিয়াছিল। যাহা হউক, বাবা একপ্রকার হতাশ হইয়া ঘরে ফিরিয়া গেলেন। ইহাতেই বিবেচনা করুন সব সময় পিতা মাতার ভয়ে কাজ করা কিরূপ সঙ্গত? যাহা হউক, এ দিকে আমি অব্যাহতে নিজের কর্ত্তব্য জ্ঞানের অনুসারে ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে লাগিলাম। তার পর দুই বৎসরের মধ্যে বিশেষ কোন অবাধ্যতা মনে হয় না। কেবল বাবা কয়েক বার কালীনাথ বাবুদের বাড়ীতে উপাসনা করিতে যাইতে নিষেধ করেন—আমার কর্ত্তব্য বোধ হওয়াতে যাই। পরে মহালক্ষ্মীদের সঙ্গে থাকা—এ বিষয়ে বাবা আমাকে বিশেষ করিয়া নিষেধ করেন, আমি শুনি নাই। ফলতঃ, সে সময়ে যে বাবার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে সাহস হইয়াছিল, তজ্জন্য আনন্দিত আছি। কিন্তু ইহার মধ্যে বলিয়া রাখা উচিত যে, দ্বিতীয়বার বিবাহের পর হইতে

বাবার প্রতি কিছু কিছু অপ্রীতি জন্মিতে আরম্ভ হইয়াছিল। আমি তাহার জন্য মনে বড় কষ্ট পাইতাম এবং কত দিন চক্ষের জলে ভাসিয়া ঈশ্বরের নিকট এরূপ প্রার্থনা করিয়াছি,—"হে জগদীশ্বর, আমার পিতাকে আবার প্রীতি ও ভক্তি করিতে শিখাও; যাঁহার সহিত এরূপ অনুল্লঙ্ঘনীয় সম্পর্ক ও জীবনে প্রতিদিন যাঁহার সহিত সহবাস, তাঁহাকে অপ্রীতি করিলেও চলিবে না"—এ কথা মিথ্যা লিখিলাম না। ভবানীপুরের শ্রীশ্‌ এ সমুদায় ভাব জানে। কারণ তাহাকে মধ্যে মধ্যে বলিতাম, "ভাই শ্রীশ্‌ বাবাকে আবার কিরূপে প্রীতি ভক্তি করিব? কিন্তু দুঃখের বিষয়, যাই বাবার প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় প্রীতি ও ভক্তি হইল তখনি আবার একটি বিরোধের কার্য্য ঘটিল!—আমার কন্যা জন্মিল। কুলসম্বন্ধ বরাবর অকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা ছিল, সুতরাং তাহা করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলাম। বাবা লুকাইয়া করিলেন। আমি ক্ষুব্ধ হইলাম বটে; কিন্তু তাঁহার প্রতিহিংসা করিব, একবারও এরূপ মনে আসিল না।

"তাহার পর আমার উপবীত পরিত্যাগ—এ বিষয় সম্পর্কে যাহা সত্য ঘটনা তাহা লিখিতেছি। উপবীত ফেলা যে উচিত ও আমিও যে ফেলিব, তাহা আমি দুই বৎসর পূর্ব্বে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম; শুধু মুখে নয়, খাতায় লেখাপড়া ছিল। এত দিন কেবল মার কষ্টের ভয়ে ও বাবার ভয়ে ফেলি নাই। পরে ৭ই ভাদ্র যখন ব্রহ্মমন্দির খোলে তখন সাধারণের সমক্ষে সমাজে প্রবেশ করি—তখনও উপবীত ছিল। ফেলিব কি না ভাবি নাই। পরে দুই তিন দিন পরে ফেলি, কিন্তু তখনও না ফেলিলে নয় এরূপ মনে হয় নাই। সুতরাং মার অনুরোধে আবার লই। লইয়া অবধি এ বিষয় যতই ভাবিতে লাগিলাম ততই উচিত বোধ হইতে লাগিল এবং হৃদয় হইতে কেহ স্পষ্টাক্ষরে বলিতে লাগিল,—"পরিত্যাগ কর, তোমার ভবিষ্যতের জন্য আমি আছি।" এই কথাগুলি পাগলামির মত বোধ হইবে, কিন্তু সত্য গোপন করা যদি আমার স্বভাব হইত, ইহাও গোপন করিতে পারিতাম। যাহা বাস্তবিক ঘটিয়াছিল তাহাই অকপটে বলিলাম। এইরূপ মনের পরিবর্ত্তন হইলে, যখন লইয়াছি তখন আর শীঘ্র ফেলিব না, ভাবিয়া রাখিলাম। মধ্যে বলিয়া রাখি—আমার এই মনের পরিবর্ত্তন হইবার পূর্ব্বে আমি নিজে কেশব বাবুদিগকে লিখিয়াছিলাম যে, 'আমি নিতান্ত কর্ত্তব্য ও অবশ্য পরিহার্য্য বোধ না হইলে অনর্থক বাপ মাকে এত কষ্ট দিতে ভালবাসি না; অতএব উপবীত রাখা যদি আপনাদের নিতান্ত মতবিরুদ্ধ হয় আপনাদের মণ্ডলী হইতে আমার নাম কাটিয়া দিবেন।' আবার উপবীত ফেলিতে কেহ কেহ উপদেশ দেন, কিন্তু আমি সকলকে এক উত্তর দিই। যতদিন অবশ্য পরিহার্য্য না হইতেছে, ফেলিতেছি না। অবশেষে সেই অবস্থাই আসিল। আমার বিশ্বাস জগদীশ্বর আদেশ করিলেন, আমি তাহা পালন করিতে বাধ্য হইলাম। আর দুইটি বিষয় অবশিষ্ট আছে—যাহাতে আমি বাবার অপমান করিয়াছি। প্রথম আমার স্ত্রীকে আনা, দ্বিতীয় মধুবাবুদিগের সহিত থাকা।

এই ত আমার কয় বৎসরের ইতিহাস দিলাম। এখন আপনারা বিবেচনা করুন, আমি সরল জ্ঞানে ও কর্ত্তব্য জ্ঞানে বরাবর কাজ করিতেছি কি না? বাহাদুরী দেখাইবার যদি ইচ্ছা হইত তাহা হইলে অন্য অনেক উপায় ছিল। মেজদাদা, স্নেহময়ী পুত্রবৎসলা মাতার হৃদয়ে ছুরি দিয়া, এত বিরোধেও যে পিতার অনুগ্রহ একদিনের জন্যও কমে নাই তাঁহার প্রসন্নদৃষ্টি হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হইয়া, এমন প্রাণপ্রিয় চিরদিনের বন্ধুবান্ধব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কি আমি এতই সুখী হইব যে, তাহার জন্য বাবার সহিত সমকক্ষতা করিলাম? একদিকে সাংসারিক আর একদিকে পিতামাতার হাহাকার ও লোকনিন্দা, ইহার মধ্যে কি এমন সুখ পাইব যাহার জন্য এত সুখ হইতে বঞ্চিত হইলাম? তবে কেন এরূপ কাজ করিলাম? তাহার উত্তর এই—আমি ত সুখের আশায় করি নাই। কর্ত্তব্যবোধ হইল, তাই করিলাম। উপবীত ফেলিয়াই যে পদ্য কয়টি লিখি তাহার দুই একটি তুলিয়া দিতেছি; তাহা দেখিয়া আমার যথার্থ ভাব বুঝিবেন—

ভাসায়ে জীবন-তরি বিপত্তির সাগরে
যাই দেব, দেখ দেখ রক্ষা করো আমারে,
মোর পক্ষ ছিল যারা
বিপক্ষ হইল তারা
ঘেরিল সকল দিক্ অপবাদ-আঁধারে
বহিল প্রবল ঝড় মস্তকের উপরে।

মাতার নয়ন জলে ভেসে গেল ধরণী—
নিশ্বাস বহিতে আর পারে না গো জননী!
সর্ব্বসাক্ষী দয়াময়
দেখিতেছ সমুদয়
হৃদয়ে সংগ্রাম মোর চলে দিবা রজনী
কাতর হইয়া কাঁদি ধর আসি আপনি।

হে ঈশ্বর, "দয়াময়" নাম না কি ধরিয়া
অপার বিপদ্-সিন্ধু শিশু যায় তরিয়া?
আমি ত বালক বই,
জগদীশ, কিছু নই,
দেও হে অভয় নাম ধরি ভাল করিয়া—
হাসি হাসি জলে ভাসি, যাই পাল তুলিয়া।

"মেজদাদা, এখন বলিলে কেহ মানিবেন না, কিন্তু তথাপি আমি বলি,—যদি কেহ বলেন যে, আমা অপেক্ষা তাঁর পিতৃভক্তি বা মাতৃভক্তি অধিক তাহা স্বীকার করি না; তবে আমি পিতা মাতার আদেশ অপেক্ষা ভগবানের আদেশ প্রতিপালন অধিক উচিত বলিয়া বিবেচনা করি। সে যাহা হউক, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে; বড় দুঃখ রহিল যে, বাবা বুঝিবার উপায় থাকিতেও এতদিনে আমার অভিপ্রায় ও কার্য্য বুঝিতে পারিলেন না। মনের দুঃখ মনেই রহিল।

"মেজদাদা, যে সব কথা আমি আজ আপনাদিগকে বলিলাম দুই ঠোঁট খুলিয়া সে কথা কাহাকেও বলি নাই, বলিবও না। কেবল ঈশ্বরকেই সকল ডাকিয়া বলি। আরও মনে অনেক দুঃসহ যন্ত্রণার কথা রহিল। মরিলে, তাহা আমার চিতার সহিত মিশাইবে। মেজদাদা, আমি জানিয়া শুনিয়া পিতা মাতার ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া বিপদ্‌সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। আমি

যদিও দুর্ব্বল সে সব সহ্য করিবার শক্তি জগদীশ্বর দিবেন সন্দেহ নাই। তিনি বাবা ও মাকে সান্ত্বনা দিন ও তাঁহাদিগের মনোযন্ত্রণা দূর করুন। তাঁহারা এতকাল আমাকে যে আশীর্ব্বাদ দিয়া আসিতেছেন, তাহা এখন আমার প্রিয়তমা ভগিনীদিগকে—আপনাদিগকে দিন। যদিও একমাত্র পুত্র হয়ে পিতামাতার গৃহে স্থান পাইলাম না ভাবিলে বড় ক্লেশ হয়, তথাপি জগদীশ্বর তাহাও সহিবার শক্তি দিবেন। এ প্রাণ যতদিন থাকিবে ততদিন সত্য ও সৎ বলিয়া যাহা বোধ হইবে তাহা করিব। কর্ত্তব্যজ্ঞানের নিকট স্নেহময়ী জননীকে বলি দিতে যে প্রস্তুত, কার সাধ্য তাহাকে সত্যপথ হইতে নিবৃত্ত করে? ত্রিভুবনের লোক একত্র হইলেও আমি যাহা উচিত বলিয়া ভাবিব তাহা হইতে আমাকে কেহ ফিরাইতে পারে না। কিন্তু আমি বার বার—পিতার দ্বারা বার বার তাড়িত হইয়া আসিব—যতকাল তাঁহারা থাকিবেন এইরূপ করিব; অবশেষে যখন মরিব তখন যদি আপনারা বাঁচিয়া থাকেন কেহ আমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিবেন, যাহা করিয়াছিলাম সরল ভাবে কর্ত্তব্যজ্ঞানেই করিয়াছিলাম; মনে কিম্বা কার্য্যে পারৎ পক্ষে কপটতার লেশমাত্র রাখি নাই। আর লিখিতে পারিতেছি না। বাবাকে হাতে পায়ে ধরিয়া এই পত্রখানি শুনাইবেন; কারণ শুনিয়া যদি তিনি প্রসন্ন হন। বিশেষ পরে লিখিব। ইতি—শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য।"

এই পত্রখানি তাঁহার ২২ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিস্তুতো ভাইকে লিখিয়াছিলেন। বাবা ঠাকুর দাদাকে ব্রাহ্ম হইবার পর যত পত্র লিখিতেন, ঠাকুর দাদা তাহা খুলিয়া পড়িতেন না, ছিঁড়িয়া ফেলিতেন। আমার নকটে যে কয়খানি পত্র আছে তাহা তাঁহার রোষবহ্নি হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। সেই সময় লিখিত পত্রগুলিতে যে বাণী,—কি আশ্চর্য্য ৫০ বৎসর পরেও ঠিক্ সেই কথা! সেই যে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে দুর্জ্জয় বললাভ করিলেন, সেই প্রচণ্ড শক্তি তাঁহাকে চিরদিন শক্তিশালী করিয়া রাখিয়াছিল। বাবার ন্যায় অকপট হৃদয়ে সত্যের সেবা কয়জন করিতে পারিয়াছেন?

২২ বৎসরের যুবার মুখে যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার কথা—৭২ বৎসরে তাহারই প্রতিধ্বনি—৭২ বৎসরেও সেই দুর্জ্জয় বাণী—ব্রাহ্মব্রাহ্মিকা, কি শোনেন নাই? ৫৫ বৎসর একই মন্ত্র জপ করিয়াছেন। ১৮ বৎসরের বালক প্রাণের নিদারুণ যাতনায় কাতর হইয়া ভগবানের চরণে পড়িলেন; ভগবান্ তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন, "আমি তোমার সহায়, আমার ডাক্ শুনিয়া চল, তোমায় বিনাশ করে সাধ্য কার?" সেই অবধি ভগবানের দাস ভগবানের নিকট জীবন বিক্রয় করিয়াছিলেন। এমন সত্য ভাবে পূজা এবং এমন খাঁটি ভাবে ভগবানের সেবা কয়জন করিতে পারিয়াছেন? বাবা বলেছিলেন,—

ঈশ্বর বাড়ান্ যারে, কে তারে মারিতে পারে?
বজ্রদেহী হয়ে সে যে নাচিয়া বেড়ায় রে,
তাহার নাচের বাদ্য জগতে বাজায় রে।

দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান—আজন্ম দরিদ্র শিবনাথকে কেহ মারিতে পারে নাই। ভগবানের আশীর্ব্বাদে সেই দুর্ব্বল দেহে দুর্জ্জয় বলের আবির্ভাব হইয়াছিল। বাবা আমায় 28th September, 1888, Bristol হইতে লিখিতেছেন,—"মা, তোমাকে আমি আর কি লিখিব? আমি ভারতবর্ষের কথা যতই ভাবিতেছি ততই আমার ক্ষোভ বাড়িতেছে যে, আমার একটা শরীরে দশটা মত্ত হস্তীর বল হইল না কেন? আমার একটা মনে দশটা রামমোহন রায়ের শক্তি আসিল না কেন? আমি তা'হলে প্রাণ জুড়াইয়া দেশের জন্য খাটিতে পারিতাম।" ভগবানের সেবায় এইরূপ অসীম আকাঙ্ক্ষা বাবার প্রাণে চিরজাগ্রত ছিল।

১৮৬৫ সাল হইতে বাবার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করে—১৮৬৯ সালে ৭ই ভাদ্র তিনি দীক্ষিত হন। ১৮৭৮ সালে যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়, তখন বাবা এমনি প্রাণের আবেগে শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। সেই সময়কার প্রাণের আবেগের কথা আত্মচরিতে লিখিয়াছেন, দুই মাস বিলম্ব করিলে অনেকগুলি টাকা পাইতেন। দুই মাস অপেক্ষা করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব হইল। তাঁর পরম বন্ধু স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় তাঁহাকে হঠাৎ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করেন। বাবা তাঁহার পরামর্শও শুনিতে পারিলেন না। ১৮৮৮ সালে পিতৃদেব বিলাত গমন করেন। সেই ৬ মাসের ধাক্কা এই ৩১ বৎসর চলিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

অপরে কি বলেন।

(২)

যে নামে অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল বাঙ্গালা-সাহিত্যের এবং ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রায় অর্দ্ধেক অংশ পূর্ণ হইয়াছিল, সে নাম এবং সেই নামধেয় দেহী আজ অনন্তের ক্রোড়ে লুকাইল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বাঙ্গালার এবং আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের একটা বড় নাম—শ্রদ্ধার এবং শ্লাঘার নাম। সাহিত্যে শিবনাথ একটা অতি বড় নাম; তিনি ব্রাহ্মসমাজের সাহিত্যের একজন সৃষ্টিকর্ত্তা। সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে শিবনাথের নাম চূড়ার উপর ময়ুরপাখার প্রদীপ্ত অক্ষরে লিখিত; এ পক্ষে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ অগ্রণী। ধর্ম্মজীবনে শিবনাথ নাম সঞ্জীবন মন্ত্রের মত শক্তিধর নাম; পণ্ডিত শিবনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন স্রষ্টা, পাতা, ধারক, এবং বাহক। মনীষী; মেধাবী মনীষী প্রতিভাশালী শিবনাথ দেশের ও জাতির জন্য তাঁহার সবটা পণ করিয়াছিলেন, স্বেচ্ছায় সাধ করিয়া তিনি দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন করিয়া দেশসেবায় প্রমত্ত হইয়াছিলেন। এখনকার ছেলেরা বুঝিবে না, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মসমাজের জন্য জীবন পণ করিয়া কতটা ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গোড়ার অবস্থার এম্-এ এবং শাস্ত্রী; তিনি শিক্ষাবিভাগেই যদি থাকিতেন, তাহা হইলে মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের পরে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হইতে পারিতেন। হাইকোর্টের উকীল হইলে হাইকোর্টের জজীয়তী তাঁহার পক্ষে দুষ্প্রাপ্য পদ হইত না। এই ত গেল আর্থিক ও অভ্যুদয় ঘটিত ক্ষতি। তাহার উপর পণ্ডিত শিবনাথ ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ভাগিনেয়, সুপণ্ডিত এবং সুচরিত জনকের পুত্র; বৈদিক ব্রাহ্মণসমাজে তাঁহার পদমর্য্যাদা খুব ছিল।

তিনি সামাজিক ও সাংসারিক পদমর্য্যাদার সকল লোভ ছাড়িয়া পণ্ডিত পিতার উৎকট বিরক্তি, আত্মীয় স্বজনগণের উপেক্ষা, সামাজিক নিন্দা এবং অবনতি সহ্য করিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন। এখন সে হিন্দুসমাজ নাই, সে সমাজের শাসন নাই; এখনকার লোকে বুঝিতে পারিবে না, গোড়ায় ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মসমাজের জন্য কতটা ক্ষতি স্বীকার করিয়াছিল, কি কঠোর সমাজনিগ্রহ সহ্য করিয়াছিল। এই সকল ত্যাগী পুরুষের ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব ঘটিয়াছিল, ব্রাহ্মসমাজ এক সময়ে শিক্ষিত সমাজের সেবা ও পূজ্য সমাজ হইয়াছিল।

কেবলই কি এইটুকু? ব্রাহ্মসমাজ গড়িয়া উঠিবার পরে কোচবিহার বিবাহকাণ্ডে ৺কেশবচন্দ্রের সহিত ঘোর বিরোধ ঘটাইয়া গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ, ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মিঃ এ, এম্ বসু, বাবু দুর্গামোহন দাস প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া পণ্ডিত শিবনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি করেন। সে দ্বন্দের কথা এখনও মনে আছে; সে দ্রোহ, সে আন্দোলন, সে তিরস্কার ও তর্জ্জন গর্জ্জন, দলাদলি ও গালাগালি এখনও আমাদের মনে আছে। তাহার ফলে কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, সে ভাঙ্গন সামলাইবার চেষ্টায় নব-বিধানের উদ্ভব হয়। তখন বাঙ্গালীর প্রকৃতি এত হীন হয় নাই, কথায় কথায় মানহানির নালিশ করিতে যাইত না, বিচারালয়ে স্বীয় যোগ্যতার এবং পবিত্রতার যাচাই করিতে যাইত না। তখনকার আড়া-আড়িতে অপূর্ব্ব পুরুষকারের উন্মেষ ঘটিত। সেই আড়া-আড়ির ফলে একদিকে গোস্বামী বিজয়কৃষ্ণ, অন্য দিকে শিবনাথ, নগেন্দ্রনাথ ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন। সে আড়া-আড়ির ফলে পণ্ডিত শিবনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্য একটা স্বতন্ত্র সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন; সংস্কৃত সাহিত্য ভাল করিয়া জানিতেন বলিয়া তাঁহার গদ্যে পদ্যে ভাষার পবিত্রতা পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ সাহিত্যের হিসাবে একজন বিরাট পুরুষ ছিলেন।

চলিয়া গেল—একে একে ব্রাহ্মসমাজের সকল স্ফটিকস্তম্ভ খসিয়া পড়িল। যাহারা ব্রাহ্মসমাজের স্রষ্টা, যাহারা ছিল বলিয়া ব্রাহ্মসমাজ এত বড় হইয়াছিল, যাহাদের মনীষার দ্যুতিতে সমগ্র বাঙ্গালার ধর্ম্মক্ষেত্র সমালোকিত ছিল, একে একে তাহারা সবাই চলিয়া গেল। ব্রাহ্মসমাজের সে আকর্ষণ শক্তি, সে বিশ্বজনমোহনা প্রভাব আর রহিল না। পণ্ডিত শিবনাথ ইদানীং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শিবরাত্রির সলিতার মতন ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্টতা রক্ষিত হইয়াছিল; তিনি ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনেকের একটা মোহ ছিল। তিনি চলিয়া গেলেন, এখন রহিল কেবল ঘোষণা। আমরা হিন্দু, চিরদিনই শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছি; পরন্তু তাঁহার মনীষা তেজস্বিতা, একনিষ্ঠা ও ধর্ম্মপরায়ণতা দেখিয়া ও সে সকলের পরিচয় পাইয়া শ্রদ্ধায় আমাদের মস্তক অবনত হইত। আজ ব্রাহ্মসমাজের যাহা গেল, তাহা আর মিলিবে না; ব্রাহ্মসমাজ এইবার সত্যই পঙ্গু হইয়া পড়িল—বাঙ্গালী জাতি অমূল্যনিধি হারাইল।—"বাঙ্গালী।"

ব্রাহ্মসমাজ।

কৃতী ছাত্র—শ্রীযুক্ত হরকান্ত বসুর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান্ নলিনীকান্ত এম্-এস্ সি পরীক্ষায় মিশ্রগণিতে ও শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেনের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ অমিয়কুমার এম্-এ, পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে ১ম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম।

এম্-এ ও এম্ এস-সি পরীক্ষায় ব্রাহ্মছাত্র ও ছাত্রী—আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত এম্-এ ও এম্ এস্সি পরীক্ষায় কুমারী সুজাতা বসু ও শ্রীমান্ মোহিতকুমার মুখোপাধ্যায় ইংরাজী-সাহিত্যে, কুমারী মনীষা রায় দর্শনশাস্ত্রে, কুমারী আশালতিকা হালদার পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানে, শ্রীমান্ প্রমথনাথ সরকার অর্থনীতি শাস্ত্রে, শ্রীমান সুধাবিন্দু বিশ্বাস পদার্থবিদ্যায় ও শ্রীমান্ সুবিমলচন্দ্র ঘোষাল রসায়নশাস্ত্রে দ্বিতীয় বিভাগে এবং শ্রীমান্ অমলকুমার সিদ্ধান্ত দর্শনশাস্ত্রে, কুমারী মৃণ্ময়ী সেন উদ্ভিদ্‌বিদ্যায়, শ্রীমান্ তরুণকুমার রায় ও সুশান্ত রাও পদার্থবিদ্যায় তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কুমারী আশালতিকা হালদার ও শ্রীমান্ অমলকুমার সিদ্ধান্ত ইতিপূর্ব্বে অপর বিষয়েও এম্-এ উপাধিলাভ করিয়াছিলেন।

শুভবিবাহ—বিগত ২৪শে নবেম্বর কুষ্টিয়া নগরীতে পরলোকগত হরিদাস রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অমূল্যকুমারের ও শ্রীযুক্ত বিপিনমোহন সেহানবীশের কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী প্রতিভার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে।

বিগত ২৭শে নবেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সিংহের জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রতিভার ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুবিমলের শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বঙ্কচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু আচার্য্যের কার্য্য করেন।

প্রেমময় পিতা নবদম্পতীদিগকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

দান—শ্রীযুক্ত হরকান্ত বসু তাঁহার পত্নীর বার্ষিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে মিসন ফণ্ডে ৩৲, দাতব্য বিভাগে ২৲ ও দুঃস্থ ব্রাহ্মপরিবার ফণ্ডে ৫৲ দান করিয়াছেন। ঈশ্বর পরলোকস্থ আত্মার তৃপ্তি বিধান করুন।

প্রচার—হাওড়া হীরাপুর গ্রামে গত ২২শে কার্ত্তিক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার নিজ বাটীতে ব্রহ্মোপাসনা, 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' পুস্তক পাঠ ও তাঁহার পরলোকগত পূর্ব্বপুরুষগণের আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা, পরে ভাউকা গ্রামে রামশশী লস্করের ও গগনচন্দ্র চালির বাটীতে ব্রহ্মোপাসনা ও পুস্তক পাঠ করিয়াছেন।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে—

বিগত ১৩ই নবেম্বর গিরিডি নগরীতে পরলোকগত বঙ্কুবিহারী দাসের কনিষ্ঠা কন্যা নয়নতারা পরলোক গমন করিয়াছেন।

বিগত ২২শে নবেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকারের পত্নী লাবণ্যপ্রভা সরকার দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া শান্তিধামে গমন করিয়াছেন। তিনি নানা প্রকারে ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিতেছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে সমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

বিগত ২৩শে নবেম্বর লাহোর নগরীতে ডাক্তার মৃগেন্দ্রলাল মিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রলাল মিত্র ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন।

বিগত ২৩শে নবেম্বর কলিকাতা নগরীতে ডাক্তার দক্ষিণারঞ্জন দাসের মাতা হঠাৎ হৃদ্‌রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

বিগত ২৫শে ও ২৬শে নবেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষালের ১০ বৎসর বয়স্কা দ্বিতীয়া কন্যা ও ১৪ বৎসর বয়স্কা জ্যেষ্ঠা কন্যা কল্যাণী দূষিত জ্বরে ইহসংসার ত্যাগ করিয়াছেন। গতবৎসরও ইঁহার দুইটি পুত্র কালগ্রাসে পতিত হন। কি ভীষণ অগ্নির মধ্যদিয়াই পিতামাতাকে যাইতে হইতেছে!

বিগত ২২শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম নগরীতে ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগিরের পত্নীর আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। পুত্র জীবনী পাঠ করেন। অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে সমাধিস্থলে বিশেষ প্রার্থনাদি হয়। এই উপলক্ষে "খাস্তগির-বালিকাবিদ্যালয়ে"র একটি বালিকাকে পুরস্কার দেওয়ার জন্য ২০০্ টাকার একটি স্থায়ী ফণ্ড স্থাপিত হইবে ও ব্রাহ্মসমাজের নানা কাজে ৪০্ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে তাঁহার চিরশান্তিতে রাখুন এবং আত্মীয় স্বজনদের প্রাণে শান্তিবিধান করুন।

তর্পণ—বাঁকিপুর—গত ৩০শে সেপ্টেম্বরের পর হইতে প্রতি রবিবার বাঁকিপুর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ ভাবে শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনপূর্ব্বক সামাজিক উপাসনা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। ২রা নবেম্বর প্রাতঃকালে ৮ ঘটিকার পূর্ব্ব হইতে শাস্ত্রী মহাশয়ের রচিত দুইটি কীর্ত্তনের পর উপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্-এ আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় তাঁহার জীবনী বিষয়ে আলোচনা হয়। সন্ধ্যায় স্থানীয় নববিধান ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনায়ও বিশেষ ভাবে শাস্ত্রী মহাশয়কে স্মরণ করা হয়। শ্রীযুক্ত পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পাদন করেন। তাঁহার অমূল্যজীবনের এক এক দিক অবলম্বনপূর্ব্বক সতীশ বাবু সাপ্তাহিক উপাসনায় উপদেশ দিয়াছেন। সতীশ বাবুর এই সব তত্ত্বকথা "তত্ত্বকৌমুদীতে" ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে, আশা আছে।

নাগপুর—গত ২রা নবেম্বর সন্ধ্যাকালে মহাত্মা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমনে দুঃখ প্রকাশ ও তাঁহার প্রতি ভক্তিপ্রদর্শনার্থ নাগপুরের 'দীননাথ স্কুলে' এক সভা হইয়াছিল। অনারেবল্ সার্ বিপিনকৃষ্ণ বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় রাঁচির শ্রীযুক্ত জয়কালী দত্ত বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সভায় অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলির নাম এই স্থলে উল্লেখ করিতেছি;—লেডী বসু, মিষ্টার এম্, এল্, গুপ্ত, (ব্যারিষ্টার), মিসেস্ এম্, এল্, গুপ্ত, মিসেস্ দে, মিসেস জে, সেন, মিসেস্ জে, এন্, ঘোষ, মিষ্টার ও মিসেস্ জে, কে, দত্ত, মিষ্টার ও মিসেস্ এন্, মজুমদার, মিসেস্ জি, কে, ঘোষ, মিস্ অমিয়া ঘোষ, মিস্ জ্যোতির্ম্ময়ী ঘোষ, রায়সাহেব এন্, এন্, মুখোপাধ্যায় (ডিষ্ট্রীক্ট এঞ্জীনীয়ার), রায় বাহাদুর ডাক্তার এচ্, এন্, রায়, ডাক্তার ডি, এম্, মুখোপাধ্যায়, এম্, বি, ডাক্তার এম্, এল্, ঘোষ, অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র রায়, এম্.এ, বি, এল্, অধ্যাপক সারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এন্, এ, অধ্যাপক ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী, এম্, এ, অধ্যাপক নন্দলাল গঙ্গোপাধ্যায় এম্.এ, অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্, এ, মিষ্টার জে, এন্, ঘোষ, মিষ্টার অতুলচন্দ্র রায়, বি-এল্, মিষ্টার সতীশচন্দ্র দত্ত, বি-এল্, মিষ্টার সুধীশচন্দ্র দত্ত, এল্, এল্, বি, মিষ্টার এন্, সি, দেব, এল্, এল্, বি, মিষ্টার অনিলচন্দ্র পালিত, এম্, এ, এবং রায়বাহাদুর নবগোপাল সরকার।

ময়মনসিংহ—পরলোকগমন-সংবাদ প্রাপ্তির পর দিনই ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার এক বিশেষ অধিবেশনে গভীর শোক ও মর্ম্মবেদনা প্রকাশ এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সহিত আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহার পর হইতে প্রায় প্রতি রবিবারই উপাসনায় তাঁহার বিষয়ে প্রসঙ্গ হইয়াছে। ২রা নভেম্বর বিশেষ ভাবে পারলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন হয়। প্রত্যূষে একটি কীর্ত্তন ব্রাহ্মপল্লীর বালকবালিকা ও যুবকদের দ্বারা প্রমত্ত ভাবে গীত হয়। কীর্ত্তনান্তে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথচন্দ মহাশয়ের গৃহপ্রাঙ্গণে চন্দ মহাশয় প্রার্থনা করেন। তাহার পর মন্দিরে বিশেষ ভাবে ব্রহ্মোপাসনা হয়। উহাতে শ্রীযুক্ত হরানন্দ গুপ্ত আচার্য্য ছিলেন। অপরাহ্নে শ্রীমান্ বিনয়ভূষণ ব্রহ্মব্রত লিখিত একটি প্রবন্ধ শ্রীমান্ অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, টি কর্ত্তৃক পঠিত হয়। তৎপরে হরানন্দ বাবু শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রন্থাদি হইতে পাঠ ও আলোচনা করেন। সংকীর্ত্তনান্তে সন্ধ্যায় উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। পরদিন সন্ধ্যায় মনোরঞ্জন বাবু "শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনের শিক্ষা" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ৮ই নভেম্বর রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ রায়ের সভাপতিত্বে একটি প্রকাশ্য সভা হয়। প্রার্থনান্তে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত লেফ্‌টেনান্ট খগেন্দ্রচন্দ্র নাগ, বি-এ, বার-য়্যাট্-ল, শ্রীযুক্ত রায় সারদাচরণ ঘোষ বাহাদুর, এম্ এ, বি-এল, (গবর্ণমেণ্ট উকীল) নববিধান সমাজের শ্রীযুক্ত ডাক্তার বৈদ্যনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ রায় বি-এল্, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত রায় সুরেশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, এম্-এ, বিদ্যার্ণব, শ্রীযুক্ত হরানন্দ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, ও সভাপতি মহোদয় বক্তৃতা করেন।

ফরিদপুর—গত ২রা নবেম্বর, সন্ধ্যার সময়ে ফরিদপুর ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মিত্র আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। উপাসনান্তে শাস্ত্রীমহাশয়ের জীবন ও কার্য্যসম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ প্রদত্ত হয়। স্থানীয় বহুলোক শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত এই উপাসনায় যোগদান করেন।

শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজ——বিগত ১২ই অক্টোবর শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ ব্রহ্মমন্দিরে শাস্ত্রী মহাশয়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা করেন। তৎপর ২রা নবেম্বর প্রাতে কীর্ত্তন ও উপাসনা, অপরাহ্ণে তদীয় জীবনী আলোচনা এবং সায়াহ্ণে বিশেষ ভাবে উপাসনা হইয়াছিল। প্রাতে শ্রীমতী নলিনীবালা চৌধুরী উপাসনা করেন এবং তদীয় জীবনী সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

বিগত ৩১শে আগষ্ট প্রাতে পরলোকগত কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা (প্রিন্সিপাল এ, সি, দত্তের পত্নী) কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র চৌধুরী আচার্য্যের কার্য্য করে। শ্রীমতী বীণাদত্ত স্বর্গগত মাতামহের জীবনী পাঠ করেন।

বিগত ২৭শে সেপ্টেম্বর শ্রীহট্ট ব্রহ্মমন্দিরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভা হয়। শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুক্তা হেমন্ত- কুমারী চৌধুরী প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

বিগত ৮ই অক্টোবর পূর্ব্বাহ্ণে স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে পরলোকগত নবগোপাল দত্তের প্রথম বার্ষিক পারলৌকিকী ক্রিয়া তদীয় পত্নী এবং পুত্রকন্যাগণ দ্বারা সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দত্ত জীবনী এবং পুত্র শ্রীমান দেবপ্রসাদ দত্ত জনৈক বন্ধুর প্রেরিত তদীয় স্মৃতিলিপি পাঠ করেন। প্রথমা কন্যা শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা দাস এই উপলক্ষে মন্দিরের বেদী নির্ম্মাণের জন্য ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা দান করেন। স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ কমিটি "নবগোপাল ফণ্ড" নামক একটি ফণ্ড স্থাপন করেন। এই ফণ্ড কয়েকজন ট্রাষ্টীর হাতে থাকিবে।

বিগত ৯ই অক্টোবর অপরাহ্ণে স্থানীয় ব্রহ্মমন্দিরে পরলোকগত ভারতচন্দ্র চৌধুরীর পরলোকগমন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র চৌধুরী প্রার্থনা করেন। ভারতবাবু অসহায়া বিধবা পত্নী এবং চারিটী শিশু কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় শ্রীহট্ট ব্রাহ্মসমাজের সাগ্রহ আহ্বানে শিলং হইতে কলিকাতা ফিরিবার পথে বিগত ৫ই নবেম্বর শ্রীহট্ট গমন করেন এবং তিনি দুই দিবসমাত্র তথায় অবস্থান করেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজ, স্থানীয় টাউন হল, কলেজ হোষ্টেল প্রভৃতি স্থানে ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা ও উপদেশাদি দিতে হইয়াছিল। ৫ই তারিখ সন্ধ্যায় স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ এবং প্রারম্ভে একটি সঙ্গীত করেন। ৬ই নবেম্বর মধ্যাহ্ণে ব্রহ্মমন্দিরে মহিলাসমিতির অধিবেশনে মহিলা- দিগকে উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীহট্ট সহরের মহিলাগণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্তা নলিনীবালা চৌধুরী একটী অভিনন্দন পাঠ করেন। একটি সুন্দর রৌপ্যাধারে অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হয়। ৭ই নবেম্বর প্রাতে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত গোবিন্দনারায়ণ সিংহ মজুমদারের বাসভবনে তদীয় পৌত্রের শুভ নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। এবং শিশুটির নাম "শুভব্রত" প্রদান করেন। ভগবান্ শিশুটিকে নিরাপদে রক্ষা করুন। এতদুপলক্ষে গোবিন্দ বাবু "বোলপুর শান্তি- নিকেতন আশ্রম" ফণ্ডে ৩০৲ ত্রিশ টাকা দান করেন।

পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসম্মিলনী—বিগত ১লা, ২রা ও ৩রা অক্টোবর তারিখে শ্রীহট্ট সহরে পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসম্মিলনীর উনত্রিংশত্তিতম বার্ষিক অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কলিকাতা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, শিলং, শিলচার এবং সুদূর পঞ্জাব (লাহোর ও পাতিয়ালা), পাটনা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় দেড় শত ধর্ম্মবন্ধুগণের সমাবেশ হইয়াছিল। বিদেশস্থ বহু মহিলা যোগদান করিয়া সম্মিলনীর কৃতকার্য্যতার সহায়তা করিয়াছিলেন। সম্মিলনীর অধিবেশনের পূর্ব্বাহ্ণে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমন সংবাদে একটি বিষাদের ছায়া পতিত হয়। ঐ সংবাদ পাওয়ামাত্র ৩০শে সেপ্টেম্বর রাত্রে যাত্রিনিবাসে সকলে একত্র হইয়া শোকাকুল মনে সঙ্গীত ও প্রার্থনাদি করেন। এই ঘটনা সম্মিলনীর সমস্ত কার্য্যে অধিকতর গাম্ভীর্য্য ও আবেগ দান করিয়াছিল। দিনের দুর্য্যোগ সত্ত্বেও ভগবানের বিশেষ করুণায় এবং সেবকগণের ঐকান্তিক উৎসাহে সম্মিলনীর সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। মহিলাগণ, তন্মধ্যে বিশেষ ভাবে শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারী চৌধুরী ও শ্রীযুক্তা সারদামঞ্জরী দত্ত মহাশয়া আলোচনাদিতে যোগদান করেন। শ্রীযুক্তা সারদামঞ্জরী দত্ত ও শ্রীযুক্ত সারদাচরণ নন্দী ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সঙ্কল্প প্রকাশ করেন। এবার মহিলাসমিতির অধিবেশন ও মহিলা-শিল্পপ্রদর্শনী বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মহিলাসমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা নলিনী- বালা চৌধুরীর বিশেষ উদ্যোগে অল্প সময়ের মধ্যে এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট বালিকাবিদ্যালয় গৃহে সমিতির অধিবেশন ও শিল্পাদি সজ্জিত হয়। শ্রীযুক্তা হেমন্তকুমারী চৌধুরী সভানেত্রীর কার্য্য করেন। স্থানীয় ও বিদেশাগত প্রায় দুই শতাধিক মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। সম্মিলনীর অধিবেশনের প্রথম দিবস অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র চৌধুরীর বহু তথ্যসম্বলিত বক্তৃতা হইয়াছিল। সম্মিলনীর সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ ধর্ম্মজীবনের অতি গভীর তত্ত্বকথায় পূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ। ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন, ব্রাহ্ম- ধর্ম্ম প্রচার, ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ রক্ষা, 'সেবক' পত্রিকা সম্পাদন, অনাথ ব্রাহ্মপরিবার ধনভাণ্ডারের কার্য্য, আচার্য্য ও উপাসক- মণ্ডলী এবং তাঁহার পরস্পর সম্পর্ক, ১৯২১ সনের লোকগণনা সম্বন্ধে ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়। এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র "ভারতবাসীর পতনের ইতিহাস" বিষয়ে স্থানীয় কলেজ হলে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। "ছাত্রসমিতির" যুবকবৃন্দের অনুরোধে শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা করেন। শ্রীহট্টবাসী ব্রাহ্মবন্ধুগণ একত্র মিলিত হইয়া শ্রীহট্ট অঞ্চলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থে একটি স্থায়ী ফণ্ড স্থাপনের সঙ্কল্প করেন।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

Registered No C. 65

তত্ত্ব-কৌমুদী

অসতোমা সদ্গময়,
তমসোমা জ্যোতির্গময়,
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব-বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ—

১২৮৫ সাল, ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮ খ্রীঃ, ১৫ই মে প্রতিষ্ঠিত।

৪৪শ ভাগ। ১লা পৌষ, বুধবার, ১৩২৬, ১৮৪১ শক, ব্রাহ্মসংবৎ ৯০

১৭শ সংখ্যা। 17th December, 1919.

অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲
প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

হে প্রেমময় পিতা, তোমার অতুল প্রেম আমাদিগকে তোমার করিবার জন্য কতরূপেই সর্ব্বদা ব্যস্ত রহিয়াছে আমরা যে ভাবে যে পথেই চলিতে যাই না কেন, তোমার প্রেম আমাদিগকে তোমার পথে আনিবার জন্য সকল সময়েই নিযুক্ত রহিয়াছে। তোমার আলো বাতাস প্রভৃতি যেমন পাপী-পুণ্যাত্মা সকলেরই জন্য আছে, তোমার প্রেমও তেমনি সকলের জন্য সমভাবেই রহিয়াছে। আমরা যদিও অনেক সময় তোমার প্রেমের আহ্বান অগ্রাহ্য করিয়া চলি, অথবা শুনিয়াও শুনি না, তথাপি তুমি আমাদিগকে স্নেহভরে আহ্বান করিতে ক্ষান্ত হও না। তাই আবার তোমার মহা উৎসবের আহ্বান আমাদের কর্ণে আসিয়া পৌছিতেছে। তুমি সকল সময়েই মুক্তহস্তে তোমার করুণা বিতরণ করিলেও ব্যাকুল-আত্মা ভক্তগণের এই সম্মিলন-ক্ষেত্রেই তাহা প্রচুর পরিমাণে পাইবার মহা সুযোগ। তাই তুমি দীনহীনদের জন্য সে সুযোগ আবার আনিতেছ। হে পিতা, তুমি জান, আমরা জীবনে কত সুযোগ নষ্ট করিয়াছি, কতবার তোমার অজস্র করুণা পাইয়াও তাহা গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমরা ঘুমের ঘোরে নিমগ্ন থাকিয়া সে জন্য কিছুমাত্র চেষ্টিত হই নাই। তুমি কৃপা করিয়া এবার আমাদের মোহঘোর ভাঙ্গিয়া দেও, তোমার মধুর আহ্বান আমাদিগকে জাগাইয়া তুলুক; তোমার প্রেমের মহা উৎসব সম্ভোগ করিয়া আমরা কৃতার্থ হই; আমরা সে দিনের জন্য ব্যাকুল অন্তরে প্রতীক্ষা করি। আমাদের জীবনে ও সমাজে তোমার মঙ্গল ইচ্ছারই জয় হউক। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

সম্পাদকীয়

উৎসবের আহ্বান—প্রেমময়ের মহা মহোৎসবের আহ্বান আবার আমাদের কর্ণে আসিয়া পৌছিয়াছে। পৌষের প্রথম হইতেই ব্রাহ্মজগৎ এই উৎসবের জন্য উদ্গ্রীব হইয়া উঠেন। প্রেমিক ভক্তগণ নিত্য উৎসবে নিমগ্ন থাকিতে পারেন, তাঁহারা প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রেমময়ের মধুর আহ্বান শুনিতে পারেন। কিন্তু আমরা অধিকাংশ সময়ই সংসারের নানা মোহ-কোলাহলে নিমগ্ন থাকি বলিয়া আমাদের পক্ষে তাহা সম্ভবপর হয় না। বিশেষ ঘটনা বা অবস্থা ব্যতীত আমাদের মন সংসারাতিরিক্ত অপর কোনও দিকে আকৃষ্ট হয় না। তাই সম্বৎসর সে আহ্বান আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতে পারে না। এই সময় সকলের চিন্তাই স্বভাবতঃ এই দিকে ধাবিত হয়, প্রায় সকলের মুখেই এই কথা শুনিতে পাওয়া যায়; আবার ভক্তসাধকদের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ ভাবে সকলকে আহ্বান করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়া দ্বারে দ্বারে তাঁহার বাণী প্রচার করেন। কাজেই নিতান্ত বধির না হইলে, ইচ্ছা করিয়া হৃদয়দ্বার রুদ্ধ করিয়া না রাখিলে, অতি ক্ষীণ ভাবে হইলেও সে আহ্বান হৃদয়ে প্রবেশ না করিয়া পারে না। কিন্তু এরূপ ক্ষণিক অস্পষ্ট বাণী শ্রবণ করিলেই যথেষ্ট হইল না, তাহাতে আমরা উৎসব সম্ভোগের যথার্থ অধিকারী হইব না। অবশ্য বিশ্বজননীর উৎসবে সকলেরই নিমন্ত্রণ আছে, তাঁহার উৎসবদ্বার অবারিত; সেখানে নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে। কিন্তু প্রবেশাধিকার থাকিলে কি হইল? সে ডাক শুনিয়া ব্যাকুলহৃদয় না হইলে ত আমরা সেখানে প্রবেশ করিতে যাইব না; আর প্রবেশ করিলেও সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ দান যাহা, সর্ব্বোপরি আকাঙ্ক্ষার বস্তু যাহা,

তাহা পাইবার ও গ্রহণ করিবার জন্য কখনও ব্যস্ত হইব না; বাহিরের আমোদ আহ্লাদ, ক্ষণিক উচ্ছ্বাস প্রভৃতি লইয়াই হয় ত তৃপ্ত থাকিব। হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে সাক্ষাৎ ভাবে তাঁহার প্রাণমনোমোহনকারী আহ্বান শুনিতে না পাইলে কোনও প্রকারেই আর সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া উৎসবক্ষেত্রের গূঢ়তম গৃহে প্রবেশ করিবার জন্য, উৎসবদেবতাকে প্রাণের অন্তরতম প্রদেশে পাইবার জন্য গভীর আকাঙ্ক্ষা জাগিবে না। যেখানে আকাঙ্ক্ষারই অভাব সেখানে চেষ্টা যত্ন থাকিতে পারে না, এবং সফলতা লাভেরও কোনই সম্ভাবনা নাই, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে সে আহ্বান শুনিতে হইবে। কিন্তু বাহিরের অপর সকল কোলাহল হইতে মনকে প্রতিনিবৃত্ত না করিলে, নানা প্রকারে বিক্ষিপ্ত বহির্মুখী চিত্তকে শান্ত ও অন্তর্মুখী করিতে না পারিলে, তাহা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। এই জন্যই সাধুগণ বলিয়াছেন, "যিনি মহান্ ঈশ্বরের বাণী শুনিতে ইচ্ছুক, তাঁহাকে আপনার গৃহে যাইয়া দ্বাররুদ্ধ করিতে হইবে।" বাহিরের গৃহে প্রবেশ বা দ্বাররুদ্ধ করিলেই যে এ ক্ষেত্রে সকল লব্ধ হয় না, তাহা বলা অনাবশ্যক। লোকালয় হইতে বহুদূরে নির্জ্জন প্রদেশে যাইয়া গৃহদ্বার রুদ্ধ করিলেও হৃদয়দ্বার রুদ্ধ হয় না, মনের কোলাহল নিবৃত্ত হয় না। আবার মহা কোলাহলের মধ্যে বাস করিয়াও হৃদয়দ্বার এমনি ভাবে রুদ্ধ করা যায় যে, সেখানে পূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করে, সে রাজ্যের গভীর শান্তি কিছুতেই বিচলিত হয় না। শাস্ত্রী মহাশয় যে বহুবার মহাকোলাহলপূর্ণ মেলার মধ্যে সন্তানহারা জননীর কথা আমাদিগকে বলিয়াছেন, তাহা সকলেরই স্মরণে আছে। সকল প্রকার মহাকোলাহলের মধ্যেও সন্তানের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর জননীর কর্ণে পৌঁছছে। কেন না, একমাত্র তাহাই তাঁহার লক্ষ্য, অপর কোনও আকর্ষণে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট নহে। এই সংসারকোলাহলের মধ্যে আমাদিগকে এই ভাবেই উৎকর্ণ হইয়া সেই একমাত্র বাণী শুনিবার জন্যই যত্নশীল হইতে হইবে। বাহিরের নির্জ্জনতা অপেক্ষা অন্তরের নির্জ্জনতা সর্ব্বোপরি প্রয়োজনীয়। তাহা যে পর্য্যন্ত লব্ধ না হইবে, সে পর্য্যন্ত আমাদের অপর সকল আয়োজনই ব্যর্থ হইবে। যদি আমরা যথার্থই উৎসব সম্ভোগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া থাকি, যদি আমরা আমাদের বর্ত্তমান জীবন লইয়া প্রকৃত পক্ষেই তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকিতে না পারি, তবে আমাদিগকে অপর সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া জীবনে একনিষ্ঠ ভাব আনিতে হইবে; সকলের উপরে প্রেমময় দেবতার প্রেমের আহ্বান শুনিবার জন্য সর্ব্বদা উৎকর্ণ হইয়া থাকিতে হইবে। তাঁহার আহ্বান শুনিতে না পাইলে আমাদের "অবশ প্রাণ" কিছুতেই জাগিবে না, আমাদিগকে "নিশিদিন অচেতন ধূলিশয়ান"ই থাকিতে হইবে; উৎসব আসিবে আর যাইবে, আমরা যাহা আছি তাহাই থাকিয়া যাইব—প্রকৃত উৎসব সম্ভোগ আমাদের জীবনে কোনও প্রকারেই ঘটিবে না। তাই আমরা সকলে নিজ নিজ হৃদয়ে সেই উৎসবের আহ্বান শুনিবার জন্য ব্যাকুল হই। আর সকল কোলাহল নির্ব্বাপিত হউক। একমাত্র তাঁহার বাণীই সকল হৃদয়ে জাগুক। তাঁহার ইচ্ছাই সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউক।

ভক্তিভাজন আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী।

(২)

জীবনের একমন্ত্র।

আমার অনেক সময় মনে হইয়াছে, শাস্ত্রীমহাশয়ের সমগ্র-জীবনের গতির মধ্যে একটি সঙ্কল্পের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই, "আমাতে যাহা মহত্তম, আমি তাহার অনুসরণ করিবই।"

এই কথাটি আরো তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। প্রথম কথা আমাতে, অর্থাৎ আমার সত্য জীবনে, যাহা মহত্তম। মানুষের মত মানুষ যাঁহারা, তাঁহারা অন্যের কাছে ধার-করা আদর্শ লইয়া জীবন পরিচালিত করিতে পারেন না। ধার-করা আদর্শ বলিতে আমি কি বুঝি, তাহা বলিতেছি। নিজের জীবনের ঘটনা ও অবস্থা, নিজের কর্ত্তব্য ও ভার, মানুষের সঙ্গে নানা সম্বন্ধ ও সংঘর্ষ, নিজের প্রকৃতির বিকাশ,—এক কথায় নিজ জীবনের সত্য ব্যাপার সকল, অন্তরে যখন যে যে আদর্শ উদয় করিয়া দেয়, সে সকল আমার নিজের আদর্শ। আর যাহা আমার বর্ত্তমান জীবনের সঙ্গে সংসৃষ্ট নয়, অথচ কোনও সাধুপুরুষের মুখ হইতে শুনিতেছি, অথবা চারিদিককার মণ্ডলীর হাওয়া হইতে আমার মনে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা আমার পক্ষে ধার-করা আদর্শ। আবার অনেক সময় মানুষ নিজেই নিজ জীবনের অবস্থা ও কর্ত্তব্যসকলের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন মন-গড়া একটা আদর্শকে সম্মুখে খাড়া করিয়া তাহার সাধনায় নিযুক্ত হয়; তাহা ধার-করা আদর্শ না হইলেও কৃত্রিম আদর্শ।

শাস্ত্রীমহাশয় এইরূপ বাহির হইতে যোগানো কিংবা কল্পনায় গড়া আদর্শকে অধিক মূল্য দিতেন না। "তুমি ধর্ম্মসাধন করিতে চাও? তবে নিজ জীবনের দিকে আগে তাকাও", এই যেন তাঁর ভাব ছিল। শাস্ত্রীমহাশয়কে অনেক প্রতিভাবান্ পুরুষের সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছিল; এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের গুরুভার চল্লিশ বৎসরের অধিক কাল তাঁহার চিন্তা ও অবসরের অধিকাংশকে গ্রাস করিয়াছিল; তথাপি দেখিতে পাই তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রের ও ধর্ম্মভাবের ছাঁচটি (type) গড়িয়া দিবার পক্ষে এই দুইয়ের কোনটিই বিশেষ ভাবে কার্য্য করে নাই। তিনি স্বীয় জীবনের সকল প্রশ্নে ও সঙ্কটে, মানুষের সহিত সকল সম্বন্ধে, ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুচি ও অভ্যাস দ্বারা নিজের বিশিষ্ট স্বভাবটি গড়িয়া তুলিবার বিষয়ে, নিজ অন্তরের মহত্তম ভাব ও আকাঙ্ক্ষারই অনুসরণ করিয়াছেন, কাহারও অনুকরণ করেন নাই। এ জন্যই, যখন ব্রাহ্ম বন্ধুগণ মনে করিতেছিলেন তিনি সমাজের কাজে আসিয়া বসিবেন, তখন তিনি মাতুলের সকল কাজের ভার লইবার জন্য হরিনাভিতে চলিয়া গেলেন। এই জন্যই, যখন অনেকে বলিতেছিলেন, ধর্ম্মাচার্য্যের পক্ষে রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগদান করা শোভা পায় না, তখনও তিনি গভর্ণমেণ্টের বিনা-বিচারে নির্ব্বাসন প্রথার বিরুদ্ধে আহূত সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। বস্তুতঃ তাঁহার জীবনের কক্ষ-রেখা তাঁহার নিজ প্রকৃতির অন্তর্নিহিত বেগেই নিরূপিত হইয়াছিল; সে রেখার নানা অংশ ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বগামিগণকে

স্পর্শ করিয়া গিয়াছে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসকেও ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহাদের কাহারও সহিত একান্ত ভাবে লিপ্ত হইয়া গিয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলে নাই।

অপরের সম্বন্ধেও শাস্ত্রীমহাশয় সর্ব্বদা এই ইচ্ছাই করিতেন যে, নিজ জীবন হইতেই সে নিজের আদর্শ ও সাধনা বাছিয়া লউক। বেদী হইতে হয় তো উপদেশ দিলেন, মুমুক্ষু আত্মার লক্ষণ কি কি; কিন্তু নামিয়া আসিয়া তোমাকে এ প্রশ্ন করিবেন না যে, উপদেশটি তোমার কেমন লাগিল, অথবা তোমার মুমুক্ষু অবস্থা হইয়াছে কি না। হয় তো জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তুমি আজকাল ঠিক সময়ে দেশে মাকে টাকা পাঠাইতেছ কি না, অথবা অমুকের সঙ্গে তোমার যে মনান্তর হইয়াছিল তাহা মিটমাট করিয়া ফেলিয়াছ কি না।

দ্বিতীয় কথা, আমাতে ম্যাহা মহত্তম। জীবনকে যত পার' উঁচু কর', জীবনের লক্ষ্যকে যত পার' উঁচু কর', চিন্তাকে যত পার' উঁচু কর', অন্যের বিচার করিতে গিয়া যত উচ্চ ও যত উদার ভাবে সম্ভব, বিচার কর', নিজ ইচ্ছা রুচি সকলের মধ্যে যেটী সর্ব্বোচ্চ তাহারই অনুসরণ কর',—এই তাঁহার জীবনের প্রধান ভাব ছিল। এই মহত্তম বৃত্তির অনুসরণ করিতে গিয়াই তিনি ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া পড়িলেন; এ জন্যই বার বার আহত হইয়াও আঘাতকারীর কল্যাণ চিন্তা করিতেন; এ জনাই নিতান্ত অপদার্থ বন্ধুকেও কখনও ত্যাগ করিতে পারেন নাই; এ জন্যই ঋণ শুধিয়া দিতে তাঁহার টাকা এত গিয়াছে; মুখ ফুটিয়া কখনও বলেন নাই যে,আমার উপরে এত চাপ দেওয়া অন্যায় হইতেছে; ইহারই প্রেরণায় চাকরীর পথ পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরসেবার পথে আসিলেন, ও একমাস অপেক্ষা করিলে যে bonus পাওয়া যাইত তাহাও তুচ্ছ করিয়া চলিয়া আসিলেন; ইহারই প্রেরণায়, কতবার বিবাদের সময় অন্যায় ব্যবহার ও অন্যায় বিচার করিতে দেখিয়া স্বপক্ষীয় লোকদেরই তিরস্কার করিয়াছেন।

ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ব্যাপারেই এই মহত্তম পথ অনুসরণ করা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। একবার তাঁহাকে আশ্রমের খরচের চিন্তায় নিতান্ত ভারাক্রান্ত দেখিয়া আশ্রমের একজন অবিবাহিত পরিচারক বলিলেন, 'আমাকে আদেশ করুন, চাকরী করিয়া টাকা আনিয়া আপনার হাতে দিতেছি; আপনি অর্থচিন্তা হইতে মুক্ত হইলে অন্য কত কাজে সময় দিতে পারিবেন।' শাস্ত্রীমহাশয় ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন; প্রস্তাবকারীর প্রতি প্রসন্নতার হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'তাহা হইবে না, আমি নিজের ভার নিজেই বহিব।' নিজের ভার অপরের স্কন্ধে ফেলিয়া দেওয়া তাঁহার কাছে ক্ষুদ্রতার পথ বলিয়া বোধ হইল; অথচ সেই পরিচারক তখন এ অধিকার পাইলে আপনাকে কৃতার্থ অনুভব করিতেন। কতবার শাস্ত্রীমহাশয় পরস্ব লোকের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে কিরূপ সাহস ও স্পষ্টবাদিতার পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু লোকের যে সকল গোপন দোষ তাঁহার গোচর করা হইত, কাহারও সাধ্য ছিল না যে, তাঁহার নিকট হইতে কৌশলে তাহার এক বর্ণও কখনও বাহির করে। যেখানে বলাই মহত্তর কার্য্য সেখানে তাঁহাকে থামায়, কার সাধ্য; যেখানে রসনায় দ্বার বন্ধ করাই মহত্তর, সেখানে তাঁহাকে বলায়, কার সাধ্য?

শাস্ত্রীমহাশয়ের কাছে গিয়া আমরা কত সময় নিজেদের আচরণের জন্য লজ্জা পাইতাম, তাহার সংখ্যা নাই। মনে করিতেছিলাম, আমি যাহা করিয়া যাইতেছি, এ তো বেশ,; ইহাতে কেহই মন্দ বলিতে পারিবে না। তাঁহার সঙ্গে দুটি কথা কহিয়াই বুঝিলাম, আরো মহত্তর পথ আছে; তখন নিজেদের সেই 'বেশ!' কথাটি কত ছোট হইয়া যাইত। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া প্রাণের সকল মহৎ ভাব যেমন সহজে জাগিয়া উঠিত, এমন আর কাহারও কাছে গিয়া হয় নাই। মানুষে কত ভাল আছে, জগতে কত মহত্ত্ব আছে, আমারই মধ্যে কত মহত্ত্বের সম্ভাবনা আছে, তাঁহার কাছে গিয়া যেন এ সকল দেখিবার নূতন চক্ষু পাইতাম।

মানুষের সহিত ব্যবহার ও মানুষের প্রতি মনের ভাবকে কত ঊর্দ্ধে লইয়া যাওয়া সম্ভব, শাস্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টান্ত ও উপদেশে তাহার নিদর্শন আমরা প্রাপ্ত হইতাম। দুই জনের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত, শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে মীমাংসার জন্য যাওয়া গেল। দেখিলাম,উভয়ের স্বার্থ কিসে মিলাইতে পারা যায়,শাস্ত্রী মহাশয়ের চিন্তা সে পথ দিয়াই যাইতেছে না; প্রত্যেকের হৃদয়ে অপরের প্রতি মহত্তম ভাব (noblest attitude) কি হইতে পারে, তাহাই তিনি দেখাইয়া দিতে লাগিলেন; তাঁহার মহৎ ভাবে অনুপ্রাণিত কথাগুলি শেষ হইতে না হইতেই উভয়ের মনের মেঘ কোথায় মিলাইয়া গেল।

অন্যের কার্য্যের বিচার করিবার সময় তাহাতে অকারণে কোনও মলিন বা ক্ষুদ্র অভিসন্ধি আরোপ করা শাস্ত্রী মহাশয় অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। এজন্য অনেকে এই অভিযোগ করিতেন, যে, শাস্ত্রীমহাশয় অন্যায়কারীদিগকেও প্রশ্রয় দিয়া থাকেন; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। যতক্ষণ বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাইব, ততক্ষণ মানুষকে ভাল বলিয়াই মনে করিতে হইবে, এবং মানুষ এক বিষয়ে মন্দ হইলেও অপর দশ বিষয়ে ভাল হইতে পারে, এই বিশ্বাসে তিনি চলিতেন।

মানবের স্বাভাবিক জীবনে, সত্য জীবনে, তাহার কাছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য ও মহত্তম ভাব বলিয়া যাহা প্রতিভাত হয়, তাহাই তাহার জন্য ধর্ম্ম নিয়ম; এবং তাহারই অনুসরণ করিয়া সে ঈশ্বরের প্রসন্নতা উপার্জ্জন করিতে পারে, শাস্ত্রী মহাশয়ের সমগ্র জীবন এই বিশ্বাসের সাক্ষ্যদান করে।

এই স্বাভাবিক জীবনে স্বীয় ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ও এই স্বাভাবিক জীবনের ধর্ম্মকেই প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া শাস্ত্রীমহাশয় জন সাধারণের এমন প্রীতি ও শ্রদ্ধা উপার্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা জানি, যাঁহারা জীবনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য মন গড়া সাধনের পক্ষপাতী, ও সেইরূপ সাধনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অবস্থাভেদ, অধিকারিভেদ প্রভৃতির গহন জটিলতায় প্রবেশ করিতে যাঁহাদের রুচি, এমন অনেক লোক শাস্ত্রীমহাশয়ের কাছে আসিয়া আসিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন।

মানবত্বের কোনও অংশকে তিনি জীবন হইতে বাদ দেন নাই। পিতামাতার প্রতি, পরবিারের প্রতি, বন্ধু জনের প্রতি, ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি, ব্রাহ্ম সমাজের বাহিরে তাঁহার যে বিস্তৃত বন্ধু মণ্ডল ছিল তাহার প্রতি, দেশের প্রতি, মানব সমাজের প্রতি

তাঁহার সকল কর্ত্তব্য তিনি সর্ব্বদা সজাগ হইয়া পালন করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞানানুশীলনে তাঁহার আজীবন বিদ্যালয়ের ছাত্রের মত যত্ন ছিল। মানুষের সকল সুখে দুঃখে সহানুভূতি, সৌন্দর্য্য চর্চ্চা, আমোদ করা ও অপরকে আমোদ দেওয়া, প্রভৃতি সবই তাঁহাতে ছিল। এমন পূর্ণাঙ্গ মানুষ অল্পই দেখিয়াছি।

এই পূর্ণাবয়ব জীবনে, প্রতি অবস্থায় মহত্তম যাহা তাহারই অনুসরণ তিনি সর্ব্বদা করিয়া গিয়াছেন। জীবনের মহৎ আকাঙ্ক্ষা ও মহৎ বৃত্তি সকলকে সর্ব্বদা সতেজ রাখা, ও যাহা কিছু নীচ ও ক্ষুদ্র তাহাকে সবলে চাপিয়া রাখা, ইহাই তাঁহার জীবনের সাধনা ছিল। তিনি কখনও আত্মতৃপ্তির দ্বারা এ চেষ্টাকে শিথিল হইতে দেন নাই; জীবনের অতি গুরুভার কার্য্যের মধ্যে পড়িয়াও কখনও এ বিষয়ে অমনোযোগী হন নাই। নিরন্তর অধ্যয়ন, চিন্তা, প্রার্থনা, আত্মদৃষ্টি, কঠোর আত্মশাসন, প্রভৃতির দ্বারা এই সাধনাকে জীবনে সর্ব্বদা জাগাইয়া রাখিয়া ছিলেন।

এখানে ঐ কথার শেষ অংশ চিন্তা করা যাক্,—আমাতে যাহা মহত্তম, আমি **তাহার অনুসরণ করিবই**—এই সাধনাই শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনব্যাপী সাধনা ছিল। এই সাধনায় তিনি সাধন-বীরগণের অগ্রগণ্য। তাঁহার প্রকৃতির প্রত্যেক বৃত্তি অতিশয় সতেজ ছিল। এজন্য প্রকৃতিতে যাহা কিছু ক্ষুদ্র, যাহা কিছু নীচ, সে সকলকে দমন করিয়া রাখিতে তাঁহাকে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। কিন্তু তিনি মানবপ্রকৃতির নিম্নতর ভাগকে 'শত্রু' বলিয়া মনে করিতেন না। তাহার মতে এ সংগ্রাম শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম নয়। মাধ্যাকর্ষণ আছে বলিয়া দাঁড়ান' ও চলা মানুষের পক্ষে চেষ্টাসাপেক্ষ হইয়াছে; কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের সঙ্গে আজীবন এই কসরৎ করিতে না হইলে মানুষের শরীর গড়িত না। তেমনি নীচবৃত্তি সকল আছে বলিয়া মন সেইদিকেই গড়াইতে চায়, কিন্তু তাহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেই আত্মা সবল ও পুষ্ট হয়। তিনি সবল ও সতেজ প্রকৃতিই ভালবাসিতেন; দুর্ব্বল মিন্‌মিনে প্রকৃতি তাঁহার ভাল লাগিত না।

এ বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের মনের ভাব কিরূপ ছিল, তাহা তাঁহার বিলাতের বন্ধু মিস্ ক্যাথারিন ইম্পীর এক পত্র, ও সে পত্রের সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয়ের ডায়েরীতে লিখিত মন্তব্য পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। এই ক্যাথারিনের কথা আত্মচরিতের ৩৬৯—৩৭৪ পৃষ্ঠায় লেখা আছে; ডায়েরীতে শাস্ত্রী মহাশয় ইঁহাকে আদর করিয়া কাথুরাণী নাম দিয়াছিলেন। "[লণ্ডন, ১০ই অক্টোবর, ১৮৮৮] আজ প্রাতে কাথুরাণীর এক পত্র পাইলাম। কি চমৎকার! কি সুন্দর! কি মনস্বিতা! কি বিচারশক্তি! এই গুণেই ইংরেজের মেয়েরা এত বড়, এবং এইজন্যই ইংরাজ জাতির এত উন্নতি! পত্রের একটা স্থান অতি চমৎকার বোধ হইল, তাহা এই,—'I believe the mightiest for good are those who exercise a wise and strong control of their affections,—those who have strong and generous impulses and yet control them,—not those who have none to control." স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার মত কথা। কি আশ্চর্য্য! আমাতে যে সকল দুর্ব্বলতা আছে, ইহাতে তাহাও আছে। এমন আর একটি লোক পাওয়া কঠিন, যাহার সঙ্গে এত মিল হয়।"

একদিকে এই সতেজ মনোবৃত্তিসম্পন্ন প্রকৃতি, অপরদিকে কি দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞার বল! যাহা মহত্তম, তাহা হইতে মনকে এক চুল সরিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। যে যায় যাক্ যে থাকে থাক্, যাহা যায় যাক্ যাহা থাকে থাক্, আমি যাহা মহত্তম তাহারই অনুসরণ করিব, মনের সকল ক্ষুদ্রভাব ক্ষুদ্র সুখাসক্তিকে দমন করিয়া চাপিয়া রাখিব,—এ সঙ্কল্প তিনি এক দিনের জন্যও শিথিল হইতে দেন নাই। হয়তো সিটী কলেজের চাঁদার খাতা বগলে করিয়া কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইতেছেন, হয়তো প্রেসের হরফ কিনিবার জন্য গলিতে গলিতে ঘুরিতেছেন; লোকে মনে করিতেছে, এই মানুষটির মনে এই কাজগুলির চিন্তা ছাড়া আর কোনও চিন্তা প্রবেশের পথ পায় না। কিন্তু হয়তো ঠিক সেই সময়েই তাঁহার মনের মন আপনাকে লইয়া মহা সংগ্রামে নিযুক্ত; পথে চলিতে চলিতেও তাঁহার 'মনের কাণ মলা' চলিয়াছে, মনকে কিছুতেই নীচু হইতে দেওয়া হইবে না! ১৮১০ শকাব্দা হইতে ১৮১৬ শকাব্দা পর্য্যন্ত তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত তাঁহার কবিতাগুলি পাঠ করিলে এ কথার সত্যতা সকলে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তাঁহার এই সকল কবিতার মধ্যে "সহেনা সংগ্রাম, আমি নারিনু রোধিতে দুরন্ত প্রবৃত্তিকুলে মোর; কত দিন এ দুরন্ত সংগ্রামে যুঝিব, কত দিন রব হুঁশিয়ার; দেও শক্তি শক্তিশালী-প্রবৃত্তি-দলনে, দেও জ্যোতিঃ জ্যোতিস্ময় এ অন্ধ নয়নে; জনপূর্ণ এ নগর, পরিজন পূর্ণ ঘর, সব শূন্য,—পশে না পরাণে, রহিয়াছে গ্রন্থরাশি পড়িতে না ভালবাসি, নাহি শক্তি সান্ত্বনা বিধানে; আছ কোথা ব্রহ্মশক্তি, উরগো হৃদয়ে, প্রতিজ্ঞায় কর অধিষ্ঠান, এসগো আত্মার রথে হওগো সারথি, প্রবৃত্তির মুখে রশ্মি দিয়ে; ভুলেও ইন্দ্রিয় সুখ ভুলিবারে নারি, সে মিষ্টতা প্রাণে লেগে আছে; বিশ্বমাতা, যৌবন সঙ্কটে পিছে পিছে বাহু প্রসারিয়া কি সজনে কি নির্জ্জনে রয়েছ নিকটে, এ দুর্ব্বলে রাখ আগুলিয়া," প্রভৃতি পদগুলির মর্ম্মভেদী কাতরতা আমাদের অস্থির করিয়া তুলিত; এই সকল কবিতা পাঠ করিতে করিতে হৃৎকম্প উপস্থিত হইত।

শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার ছায়াময়ী পরিণয়ে যে ছায়াময়ীকে কামনা ও সাধনা নামে দুই সঙ্গিনী দিয়াছেন, তাহারাও তাঁহার ঐ সতেজ হৃদয়বৃত্তি ও দৃঢ় সঙ্কল্পেরই অন্য মূর্ত্তি।

সাধনা ও সাধন।

'সাধনা' ও 'সাধন' এই দুইটি কথার পার্থক্য শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবন আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত হইয়া চলিবার জন্য, সকল বিষয়ে মানব মনের মহৎ আদর্শগুলির অনুসরণ করিবার জন্য, তিনি নিরন্তর 'সাধনা'য় নিযুক্ত ছিলেন। নিজের সকল শিষ্যের মধ্যে তিনি এই সাধনা দেখিতে ভালবাসিতেন; সাধনা-বিহীন ধর্ম্মালোচনা, ধর্ম্মচর্চ্চা অসার বলিয়া অনুভব করিতেন; সাধনাশ্রমকেও তিনি প্রধানতঃ 'সাধনা' শিক্ষা দিবার স্থান বলিয়া মনে করিতেন।

আবার জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় তিনি নিজেও বিশেষ বিশেষ সাধন অবলম্বন করিয়াছেন; অপরকেও তদ্বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। সরল ও ব্যাকুল প্রার্থনাই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান সাধন ছিল। যখন যখন জীবনে কোনও প্রার্থনার বিশেষ প্রয়োজন

অনুভব করিতেন, প্রায়ই তাহা কবিতার আকারে গ্রথিত করিয়া জপের মন্ত্রের মত ব্যবহার করিতেন। এইরূপ একটি কবিতা একবার আমাদের কাছে বলিয়াছিলেন :—

"ভুল চুক দুষ্প্রবৃত্তি দুর্ম্মতি দুষ্কৃতি,
যা করেছি তা করেছি ; ফিরিবার নয়।
মাপ কর, মুছে ফেল, দাও হে নিষ্কৃতি,
নব ভক্তি নব শক্তি দাও প্রেমময়!
নব প্রেমে নব চক্ষু পেয়ে প্রাণ খুলে
জগতে মানবে জীবে পুনঃ ভালবাসি,
পেয়েছি তিক্ততা যত সব যাই ভুলে,
প্রেম দিয়ে প্রেম পেয়ে প্রেমানন্দে ভাসি।"

কোনও সময়ে তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, একবার তাঁহার মন ঈশ্বরে নির্ভরের অভাব অনুভব করিয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিল। এক দিন সারা দিনের পর বাড়ী ফিরিবামাত্র তাঁহার শিশু সন্তানগুলি তাঁহাকে ঘিরিয়া আনন্দ করিতে লাগিল। সকলের ছোটটি তখনও দাঁড়াইতে পারে না বলিয়া দেয়ালে পিঠের ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আর সকলের আনন্দ কোলাহলে যোগ দিল। এই দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার মনে একটি কথা আসিল, 'Lean on the divine will, O my soul' অর্থাৎ হে আত্মন্! (ঐ শিশুর মত) ঈশ্বরের ইচ্ছাতে ভর দিয়া দাঁড়াও। এই কথা কয়টি তখন হইতে কিছুকালের জন্য তিনি জপের মন্ত্রের মত ব্যবহার করিয়াছিলেন, ও বড় বড় অক্ষরে লিখাইয়া বাঁধাইয়া নিজের টেবিলে রাখিয়াছিলেন।

এইরূপে নামসাধন, মন্ত্রজপ, নির্জ্জনে ধ্যান, এক একটি তত্ত্বে গভীর ভাবে নিমগ্ন হইবার জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহাতে চিত্তকে নিবিষ্ট করিয়া রাখা, দীর্ঘকাল একই ধর্ম্মগ্রন্থ নিয়মপূর্ব্বক পাঠ করা, প্রবৃত্তিকে সংযত করিবার জন্য আত্মনিগ্রহ, ধর্ম্মজীবনের বিশেষ বিশেষ অভাব পূরণের জন্য বিশেষ বিশেষ সাধুজনের সঙ্গ করা, প্রতিদিন নিয়মপূর্ব্বক সাধুভক্তগণকে ও যাঁহাদের দ্বারা উপকৃত হইয়াছেন তাঁহাদের সকলকে স্মরণ করা ও তাঁহাদিগকে প্রণাম করা,—প্রভৃতি নানাবিধ সাধন, প্রয়োজন অনুসারে নিজেও অবলম্বন করিয়াছেন, ও অপরকেও অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার নিজের একটি 'নামমালা' ছিল ; তাহাতে তিনি জগতের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাজনগণের, ব্রাহ্মসমাজের সকল অগ্রণীর, বর্ত্তমান যুগের সকল দেশের সাধুভক্তগণের, এমন কি পার্কার মার্টিনোর নাম পর্য্যন্ত সংস্কৃত অনুষ্টুপ্ ছন্দে গ্রথিত করিয়াছিলেন। এটি তিনি প্রতিদিন প্রভাতে নিজ উপাসনার সময় পাঠ করিতেন।

কিন্তু এই সকল সাধনকে তিনি উপায়মাত্র মনে করিতেন, ও উপায়ের মতই মূল্য দিতেন। জীবনের মহৎ আদর্শের নিকটে বিশ্বস্ততা ও অভিসন্ধির বিশুদ্ধতা প্রভৃতি চরিত্রগুণের প্রাপ্য যে মূল্য, তাহা কখনও তিনি এই 'সাধন' সকলকে দেন নাই ; এবং যাহাতে উভয়ের আপেক্ষিক মূল্য সম্বন্ধে কাহারও মনে কোনও ভ্রান্ত ধারণা না হয়, নিজ উপদেশ আলাপ প্রভৃতিতে সে বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতেন।

এমন কি, তাঁহার চক্ষে যে 'সাধন' অপেক্ষা 'সাধনা'র মূল্য অধিক ছিল, ও বলিতে গেলে তাঁহার নিজের জীবন যে 'সাধনা'র মূর্ত্তি-স্বরূপ ছিল, ইহা সত্ত্বেও, তিনি তাঁহার উপদেশে ও ধর্ম্মালাপে সাধনাকে সর্ব্বপ্রধান স্থানে রাখিতেন না। ঈশ্বরের ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ ও একান্ত নির্ভর, মানবমনের মহত্তম ভাব ও আকাঙ্ক্ষাসকলের হাতে আত্মসমর্পণ, এই সকলকেই তিনি সর্ব্বদা প্রধান স্থান দিয়াছেন। তাঁহার মতে 'সাধন' অর্থ উপায়; 'সাধনা' সেই উপায় অবলম্বনে একাগ্রতা ও দৃঢ়তা ; কিন্তু ধর্ম্মজীবনে দেখিবার প্রধান বিষয় এই যে, মনের গতিটা কোন্ দিকে ; মনটা ঈশ্বরের হাতে দেওয়া হইয়াছে কি না ; লোকটি মানব-প্রকৃতির মহৎভাবগুলির অনুসরণ করিতে চায়, না ক্ষুদ্রতর কিছু লইয়া মজিয়া আছে। ক্রমশঃ

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পিতৃদেবের জীবনে বিধাতার লীলা।

(২)

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্য পিতৃদেব যাহা করিয়াছেন তাহা সর্ব্বজনবিদিত, তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। এই মন্দির নির্ম্মাণ করিবার সময় তিনি ভিক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছেন, সিটী কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় সকল কার্য্যে প্রাণ দিয়া পড়িয়াছেন, তত্ত্বকৌমুদী ও মেসেঞ্জার সময় সময় আগাগোড়া নিজেই লিখিয়াছেন, ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ব্রাহ্মবালকদিগের জন্য বিদ্যালয় করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কষ্টার্জ্জিত পরীক্ষকের বৃত্তি হইতে বাড়ী ভাড়ার দেনা তিন শত টাকা এককালীন আমার সাক্ষাতেই দিয়াছেন। Sunday School তাঁর প্রতিষ্ঠান, ছাত্রসমাজ তাঁরই উৎসাহ ও যত্নের ফল; ব্রাহ্মমিশন প্রেস তিনি নিজের অর্থে কিনিয়া পরে ব্রাহ্মসমাজের হস্তে দেন ; সাধনাশ্রম তাঁরই বিশ্বাসের নিদর্শন। আর কত বলিব ? ইহা ত গেল বাহিরের কাজ—তাঁর অক্ষয় কীর্ত্তি! কিন্তু ইহা অপেক্ষা যাহা আমি অধিক মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচনা করি—তাহা যে সকল অমূল্য জীবন তাঁহার সংস্পর্শে, তাঁহার অনুপ্রাণনায় ভগবানের চরণে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে—তাঁহার মত অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়া যাঁহারা অগ্নিময় হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবনই বাবার অক্ষয় কীর্ত্তি। কার্য্যের সূচনা করা সহজ, বিশ্রাম ভুলিয়া দিবানিশি পরিশ্রম করা সহজ, ভিক্ষা করিয়া প্রাসাদ নির্ম্মাণ করা সহজ; কিন্তু কঠিন কর্ম্ম—নরনারীর চিত্তে ছাপ দেওয়া—মানুষ গড়া। এই মানুষ গড়ার কথা বলিলেই সকলের গুরু-শিষ্যের কথা মনে পড়ে। আমাদের এই ভারতবর্ষ গুরুপ্রধান দেশ। উপদেষ্টা হইলেই লোকে অভ্রান্ত গুরু হইয়া বসেন, মহাপুরুষ হইলেই তিনি ভগবানের অবতার হইয়া বসেন ; তাঁহার বাণী ভগবানের বাণীর ন্যায় অভ্রান্ত ও অকাট্য হয়। যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শক্তিশালী প্রচারকগণ প্রচারকার্য্য হইতে সরিয়া পড়িলেন তখন অনেককে বলাবলি করিতে শুনিয়াছি, "এবার শাস্ত্রীর পালা।" কিন্তু শাস্ত্রী সে ধাতুতে গঠিত ছিলেন না। তিনি শত শত নরনারীর হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, কত মানুষ গড়িয়াছেন, কত মনস্বিনী নারী গড়িয়াছেন—তিনি কাহারও

অভ্রান্ত গুরু ছিলেন না। তিনি সদা সর্ব্বদা শিশুর নিকটও ভুল ভ্রান্তি স্বীকার করিতেন। আমি কতদিন অগ্নিহোত্রীকে বাবার সহিত গৈরিক বসন লইয়া তর্ক করিতে শুনিয়াছি। অগ্নিহোত্রী বলিতেন, "গৈরিক বসন পরিলে প্রচারের বড় সুবিধা হয়, পথে ঘাটে লোকে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া নিকটে আসে। প্রচারকদিগের গেরুয়া পরা ভাল।" বাবা বলিতেন, "আমি বৈরাগ্যের ছাপ লাগাইতে চাহি না, বিশ্বাস বৈরাগ্য সেবা জীবনে ঘোষণা করিতে হইবে—গেরুয়া পরিয়া না।"

ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সম্মান তিনি আজীবন রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেকের স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিবার অধিকার আছে.—এই সত্য স্বীকার করিতে গিয়া বাবাকে পুত্রস্থানীয় লোকের নিকট কত প্রতিবাদ, কত কটুকথা, কত তিরস্কার শুনিতে হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া যৌবনের প্রারম্ভ হইতে যে সত্য হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছেন, শত বিঘ্ন বাধা শত পরীক্ষার মধ্যেও তাহা হইতে এক চুল স্খলিত হন নাই। বাবা আপনাকে কখনও ধর্ম্মবিষয়ে অগ্রসর বলিয়া ভাবিতেন না। তাঁহার নিজের সাধন ভজন ধর্ম্মচিন্তার কথা কাহাকেও বলিতেন না। আমরা তাঁহার ডায়েরি পড়িয়া জানিতে পারিয়াছি পথে ঘাটে যখন তখন ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতে ভালবাসিতেন না। আমাদিগকে কখনও উপাসনা করিতে বলিতেন না, উপাসনা করি কি না জিজ্ঞাসা করিতেন না; কাহাকেও আজ্ঞা করিয়া নিয়ম শৃঙ্খলে বাঁধিতেন না। পারিবারিক উপাসনায় পরিবারস্থ সকলে যোগ দিলে অত্যন্ত সুখী হইতেন, না দিলে মনে মনে দুঃখিত হইতেন, কিন্তু যোগ দিবার জন্য কখনও কাহাকেও বলেন নাই। লোকে প্রত্যেক কার্য্য স্বাধীন ভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করিবে, এই তাঁর মত ছিল। শাসন করা অপেক্ষা স্বাধীনতা দেওয়াই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। পিতৃদেবের অভিভাবকত্বে যাঁহারা বাস করিয়াছেন তাঁহাদের সুখের আর সীমা ছিল না—যেমন প্রেম, তেমনি সহানুভূতি ও তেমনি স্বাধীনতা সম্ভোগ। দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিদিগকে তিনি যেমন সহানুভূতির চক্ষে দেখিতেন, এমন কেহ পারে না। ও দিকে তাঁর মত গুণগ্রাহী কয়জন আছেন? তিনি প্রাণ খুলিয়া অপরের গুণকীর্ত্তন করিতেন। অপরাধীকে ঘৃণা করিতেন না, শাসন করিতেন না বলিয়া আমরা সকলেই বাবাকে তিরস্কার করিতাম,—"তুমি লোকের মাথা খাও"! বাবা তিরস্কৃত হইয়া সর্ব্বদাই বলিতেন "ভালকে ভালবাসতে সকলেই পারে, মন্দকে ভালবাসাই শক্ত।" বলিতেন, "To love the godly is human," "To love the ungodly is divine"

১৮৯১ ১৫ই মার্চ্চ আমায় মধুপুর হইতে এক চিঠিতে লিখিয়া ছিলেন,—"দেখ, নরম প্রকৃতির লোকদিগকে প্রেমের দ্বারাই ফুটাইতে হয় ও চালিত করিতে হয়। কিন্তু আমাদের মধ্যে সে প্রেম বিরল। যাহার প্রেম আকর্ষণ করিবার উপযোগী গুণ আছে, আমরা তাকেই প্রেম করিতে পারি, কিন্তু যাহারা প্রেমকে বাধা দেয় তাহাকে আমাদের প্রেম পরিত্যাগ করে। যীশুর চরণধূলি একটু আমাদের ব্রাহ্মসমাজের উপর না পড়িলে আমাদের উদার প্রেম জন্মিতেছে না।"

যিনি নিজের দোষত্রুটি কখনও উপেক্ষা করেন নাই, কখন ক্ষুদ্র বলিয়া ভাবেন নাই, তিনি অপরের দোষ দুর্ব্বলতা কি সহানুভূতির চক্ষে দেখিতেন! বাস্তবিক এমন সকল বিরোধী গুণের সমাবেশ বাবার চরিত্রে দেখিয়াছি তাহা আর বলিবার নয়। একদিকে যেমন তেজস্বিতা দৃঢ়তা, অপর দিকে তেমনি বিনয়—অপরের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা। সত্য বলিয়া যাহা বুঝিতেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লোক একদিকে হইলেও তাঁহাকে এক চুল সরাইতে পারিত না। ও দিকে সামান্য সামান্য বিষয়ে অপরের মতামতের উপর নির্ভর করিতেন। সহজেই মানুষ তাঁকে লওয়াইতে পারিত বলিয়া আমরা তাঁহাকে "কাণপাতলা" বলিয়া অপবাদ দিতাম। আর কি দেখিয়াছি—এ দিকে কি সহ্যশক্তি! ও আত্মসংবরণের ক্ষমতা! ও দিকে কিন্তু প্রত্যেক কঠোর ব্যবহার প্রত্যেক কটুকথা তাঁহার হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত দিত। তিনি অল্পেই বিচলিত হইতেন। অপব্যয় ও ঋণ অতিশয় ঘৃণা করিতেন, অথচ অর্থের প্রতি একেবারে মমতাশূন্য; চিরদিনই মুক্তহস্তে অপরের জন্য সর্ব্বস্ব দিয়া আসিয়াছেন। তিনি ছিলেন সুরসিক, প্রেমিক, আমোদপ্রিয় মানুষ; কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে আজীবন নির্য্যাতন, নিষ্পেষণ, ও দুঃখ কষ্টের ভার পুঞ্জীকৃত হইয়াছিল। ভক্তিমান্ সুপুত্র হইয়াও পিতামাতার আদর যত্ন সম্ভোগ করিতে পারেন নাই, প্রেমিক হইয়াও দাম্পত্যসুখে বঞ্চিত ছিলেন; সম্ভোগের শক্তি প্রচুর থাকিলেও সর্ব্বসুখে বঞ্চিত ছিলেন; নিজে মর্ম্মপীড়ায় কাতর থাকিয়াও প্রসন্নবদনে চারিদিকে আমোদ বিতরণ করিয়াছেন।

"আমি বড় দুঃখী তাতে দুঃখ নাই"

এ কেবল কবিত্ব নয়, ইহার প্রত্যেকটি বাক্য অন্তর ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। ধন্য বিধাতায়! বাবাকে নিদারুণ দুঃখ দিয়া ভগবান্ তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। ১৭।১৮ বৎসর বয়সে দ্বিতীয় বার বিবাহরূপ একটিমাত্র শোচনীয় ঘটনাতে তাঁহার জীবনের গতি আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, এই দুঃখ ও অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হইয়া তিনি অনিন্দ্য সুন্দর অধ্যাত্মজীবন লাভ করিয়াছিলেন; নচেৎ তাঁর মত প্রেমিক, সুকবি, সুরসিক ব্যক্তি আজ আত্মীয় স্বজন পরিবৃত হইয়া ধনৈশ্বর্য্যে ভোগসুখে নিমগ্ন থাকিতেন। সংসারে যেমন শত শত উদারহৃদয় প্রেমিক দাতা আছেন, তিনি তেমনই একজন হইতেন। পার্থিব সুখে মগ্ন হইয়া স্বর্গের সুখের জন্য তিনি লোলুপ হইতেন কি না সংশয় করি।

হৃদয়ের বিশালতায় পিতা আমার অদ্বিতীয় ছিলেন। রামমোহনের হৃদয়খানা কত বড় ছিল! বিদ্যাসাগরের হৃদয় কি বিশাল! হৃদয়ের বিশালতা,—উচ্চতায়, পিতা ইঁহাদের কাহারো অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। কিন্তু ভগবানের সেবার জন্য কি ব্যাকুলতা! কি আত্মত্যাগ! বাবার জীবন কেবল বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিবার শক্তির পরীক্ষা। একটা করিয়া বাধা উত্তীর্ণ হন, ভগবান্ তদপেক্ষা গুরুতর আর একটি পরীক্ষা সম্মুখে উপস্থিত করেন; শিবনাথ ভগবানের নাম উচ্চারণ করিয়া অবলীলা ক্রমে একটার পর একটা করিয়া সকল বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিলেন। অবশেষে বিজয়ী বীরের বেশে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের রঙ্গভূমিতে সেই মহাপুরুষকে আমরা দেখিয়াছি। সেই "ধর্ম্ম-

বীর" ও "কর্ম্মবীরে"র হৃদয়ে প্রচণ্ড বল ও মনে দুর্জ্জয় শক্তি ছিল। দেহ তাঁর দুর্ব্বল—ক্ষীণ ছিল, হৃদয় অমিত বলের আধার! অপর দিকে কি দেখিয়াছি? শিশুর মত সরল অকপট হৃদয়! আত্মঘোষণা—আত্মপ্রদর্শনের শক্তি তাঁহার একেবারে ছিল না। ব্রাহ্মসমাজের লোকের ত্রুটি, অপরাধ, দুর্ব্বলতার কথা শুনিয়া তিনি আপনাকে অপরাধী ভাবিতেন। "আমি যদি মানুষ হতাম, এমন হত না," "আমার অপরাধে কিছু হইল না"—এই তাঁর কথাই ছিল। লোকে নিজের আত্মীয় স্বজনকে আপনার বলিয়া জানে, তাঁর আপনার ছিল ব্রাহ্মসমাজের সমুদয় নরনারী। কত লোকের অভিভাবক হইয়া গুরুভার মস্তকে বহন করিয়াছেন। কোন কর্ত্তব্যকেই তিনি ক্ষুদ্র বলিয়া ভাবিতেন না! যে তাঁর প্রতি নির্ভর করিত, যেমন করিয়া পারেন, যত কষ্ট করিয়াই হউক তাঁহার আশা পূর্ণ করিতেন। নির্ধন হইয়াও লোকের অর্থকষ্ট দূর করিতেন, নিজের না থাকিলে ভিক্ষা করিয়া দিতেন। দূরদেশ হইতে লোক বিপন্ন হইয়া অর্থসাহায্য চাহিয়াছে—বাবা যেমন করিয়া হউক, তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ না করিয়া অন্নজল গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কি দায়িত্ব জ্ঞান!

বাস্তবিক চিন্তা করিয়া দেখিলে, এত শক্তি, এত সদ্গুণের আধার ব্যক্তি দেখা যায় না। উচ্চশ্রেণীর কবি, উৎকৃষ্ট লেখক, শ্রেষ্ঠ বক্তা, সুরসিক, সদালাপী, সেবাপরায়ণ, স্বার্থজ্ঞানশূন্য, সরল, অমায়িক, আড়ম্বরশূন্য, জনহিতৈষী, ত্যাগী, নির্ভীক মহাপুরুষ সহজে কি আর দেখা যাইবে? আত্মত্যাগের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি তিনি ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে তাঁহার আত্মত্যাগের কাহিনী চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। আমরা যত অধম হই, তাঁর চরিত্রের গৌরব কখন বিস্মৃত হইতে পারিব না; বরং তিনি যেন এখন আরও উজ্জ্বল হইয়া আমাদের হৃদয়ে উপস্থিত হইয়াছেন। এতদিন যাহা বুঝি নাই এখন বুঝিতেছি, এতদিন যাহা দেখি নাই এখন তাহা দেখিতেছি। তিনি যে মুমূর্ষু অবস্থায় এতদিন শয্যায় পড়িয়াছিলেন, তবু এতখানি স্থান জুড়িয়াছিলেন; সহসা যেন সব শূন্য হইয়া গিয়াছে, আর যেন ভরসা পাই না। মনকে তুলিয়া ধরি, বাবার মেয়ে যদি হই নিরাশার কথা বলিব না। তিনি ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে মানুষকে প্রধান বলিয়া দেখেন নাই, আমরা কেন দেখিব? বিধাতার ডাকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়া, তিনি দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। যদি ব্রাহ্মসমাজে ভগবানের লীলা দেখি, তবে নিরাশ হইব কেন? মৃত্যু তাঁহাকে আমাদের নিকট হইতে হরণ করিয়া লইয়া যায় নাই। তাঁর সেই ক্ষীণ দেহযষ্টি পঞ্চভূতে বিলীন হইয়াছে, তাঁহার পবিত্রাত্মা ত ভস্মীভূত হয় নাই! এখনও আরও প্রভাব আমাদের হৃদয়ে বিস্তার করিবে। তাঁর মৃত্যুতে আমরা নবজীবন লাভ করিব। বিশ্বাস, বৈরাগ্য সেবার মন্ত্র কি তিনি আমাদের জন্য রাখিয়া যান নাই?

পিতৃদেব কত সময় পরিতাপ করিয়া করিতেন "আমার কথায় লোকের প্রাণ জাগে না কেন? আমি অপদার্থ তাই আমার বাণী লোকের প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করে না।" তিনিও জানিতেন না যে, মৃত্যুর দ্বারে যখন তিনি প্রবেশ করিবেন তখনই তাঁর বাণী জাগ্রত হইয়া আমাদের প্রাণকে জাগাইয়া তুলিবে। লোকে যেমন মূল্যবান্ সম্পত্তি উত্তরাধিকারীর জন্য রাখিয়া যায়, এবং যতক্ষণ না সে ব্যক্তি গতাসু হয় সম্পত্তিতে কাহারও অধিকার জন্মে না; তেমনি কি তিনি আমাদের জন্য মূল্যবান্ সম্পত্তি উত্তরাধিকার-সূত্রে রাখিয়া যান নাই? এখনই সেই সম্পত্তি অধিকার করিবার সময় আসিয়াছে। আজ আমাদের অনুভব করা উচিত যে, আমরা তাঁহার উত্তরাধিকারী, তাঁহার গচ্ছিত ধন রক্ষা করিবার জন্য আমরা দায়ী। বৃথা এই শ্রদ্ধানুষ্ঠান, যদি তাঁহার প্রাণের সম্পত্তি রক্ষার জন্য দৃঢ়ব্রত না হই! বৃথাই আমার পিতৃভক্তি, তাহা মৌখিক বচন ভিন্ন আর কিছুই নয়, যদি পিতার প্রাণের মূল্যবান্ সামগ্রী রক্ষার জন্য প্রাণে বাসনার উদয় না হয়; ধিক্ আমাকে শতবার ধিক যদি সেই পিতার কন্যা হইয়া জীবনদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া দিই যে, আমার পিতা "ধর্ম্ম" "ধর্ম্ম" করিয়া বৃথাই জীবনাহুতি দিয়াছিলেন—তিনি যে অগ্নি আজীবন হৃদয়ে বহন করিয়াছিলেন তাহা রাখিবার পাত্র পান নাই, কি সঙ্গে লইয়া চলিয়া গিয়াছেন! তিনি ত কেবল আমার পিতা ছিলেন না, তিনি যে আমার জীবনের সর্ব্ব উন্নতির দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন, তিনি হাত ধরিয়া আত্মধামে লইয়া যাইবার জন্য আজীবন প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁর প্রিয় কবিতাপুস্তক 'হিমাদ্রিকুসুম' এই অধম কন্যাকে উৎসর্গ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

হিমাদ্রিতে আসিয়া এবার
তুলেছি চারিটি ফুল; এ ফুল তুলিতে—
ঘুরেছি অনেক বন; মনেতে আমার
এই ছিল, হেন ফুল করিব চয়ন—
যাহা পেলে খুসী হবে, যাহার সুঘ্রাণ
না ফুরাবে, না শুখাবে; সে আশা পূরণ
হ'ল কি না নাহি জানি। যা হোক এ দান
লও বৎসে, ফুল ক'টি হৃদয়েতে ধরি
প্রেম শান্তি গন্ধ তুমি পাবে আশা করি।

আমাকে প্রাণের ধর্ম্মধন দেবার জন্য তাঁর আজন্মের এই প্রয়াস! আমার বিবাহের দিন তিনি আমায় বলিয়াছিলেন,—"বৎসে, আজ তোমায় বিদায় দিবার দিন। পিতা মাতা এমন সময় কত মূল্যবান্ সামগ্রী যৌতুক দিয়া থাকেন। তোমার পিতা মাতা তোমাকে কিছুই পার্থিব সম্পদ্ যৌতুক দিতে পারিলেন না। কিন্তু আমার গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া ও বর্দ্ধিত হইয়া যদি ধর্ম্মকে ও ঈশ্বরকে সত্য বলিয়া জানিয়া থাক তবে তাহাকেই মহামূল্য রত্ন বলিয়া জ্ঞান করিবে। ইহার গুণে তুমি সংসারে সকল বিপদের মধ্যে রক্ষা পাইবে।"

আমি কি আজ বলিব যে, রিক্তহস্তে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়াছিলাম, পিতা আমাদের জন্য কিছুই রাখিয়া যান নাই? আমার পিতা যেরূপ মূল্যবান্ সম্পত্তি আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা রক্ষা করিবার যোগ্য আমরা নহি। এ সম্পত্তি কেবল আমাদের জন্য রাখিয়া যান নাই—ব্রাহ্মসমাজের আপামর নরনারীর জন্য সে দুর্লভ সম্পত্তি রক্ষিত আছে। আজ আমাদিগকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে তাহার যথার্থ সদ্ব্যবহার করিব।

অনেককে বলিতে শুনিয়াছি, তাঁর আত্মচরিতে জীবনের সাধনের দিকের কোন কথা বলেন নাই; বলেন নাই তাহা সত্য—পিতৃদেব কিরূপ সাধন করিতেন তাঁর ডায়েরীতে তাহার পরিচয় পাই। একদিন উপাসনা সরস না হইলে তিনি কিরূপ ব্যাকুল হইতেন! ইংলণ্ডে পীড়িত হইয়া কয়েক দিন একাকী শয্যায় ছিলেন, তখন হৃদয়ে শুষ্কতা অনুভব করিয়া কাতর হইয়া বলিয়াছিলেন,—

"আমি আঁচল ধরা ছেলে ব'লে যেতে হয় কি একূল ফেলে?
মায়ের মুখ না দেখ্‌তে পেলে ভয়ে ছাওয়াল হয় যে সারা!
যদি বল কি গুণ আছে, বাঁধা র'বে আমার কাছে?
তুমি আপনার গুণে আপনি বাঁধা, ও আমার মা চমৎকারা!"

প্রাণভরে এই গান একা একা করিলেন। ভগবান্ মাতৃরূপে তাঁর অন্তরে আবির্ভাব হইয়া তাঁহাকে শান্তি দিলেন। তিনি নিরন্তর নামজপ করিতেন। কত স্থানে দেখি লিখিতেছেন ১০৮ বার কোন বিশেষ নাম জপ করিলেন। তিনি সংস্কৃত শ্লোকের আকারে "গুরু-কীর্ত্তন" বলিয়া এক স্তোত্র করিয়াছিলেন, প্রতিদিন প্রাতে তাহা আবৃত্তি করিতেন; সেই স্তোত্র ক্রমশঃ দীর্ঘ হইতেছিল। গুরু-কীর্ত্তনের গুরুদিগের নাম;—

আর্য্য ঋষি, মুনি, শাক্যসিংহ, মহম্মদ খ্রীষ্ট, কবীর, নানক, গৌরাঙ্গ, তুকারাম, পিতৃপিতামহ, পিতা, মাতা, মাতামহী, মাতুল, বিদ্যাসাগর, মহেন্দ্রনাথ সরকার, উমেশচন্দ্র, কাশীনাথ, মহর্ষি ব্রহ্মানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ, অঘোরনাথ, গৌরগোবিন্দ, কান্তিচন্দ্র, বৃদ্ধ রামতনু, রাজনারায়ণ, শিবচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, কালীনারায়ণ, দুর্গামোহন, আনন্দমোহন, রামকৃষ্ণ পরমহংস, জর্জ্জ মূলার, মার্টিনো, ফ্রান্সিস্ কব্, সোফিয়া কলেট্। ইঁহাদের সকলের নাম উচ্চারণ করিয়া তিনি বলিতেন যে, ইঁহারাই আমার গুরু; ইঁহাদের স্মরণ করিয়া আমি ধর্ম্মজীবনে মহাশক্তি লাভ করিয়াছি।

এ সকল সাধনের কথা তাঁহার গোপন ছিল। তিনি প্রাণের নিগূঢ় মর্ম্মকথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতেন না। বাস্তবিক ধর্ম্মজীবনের নিগূঢ় কথা গভীর বিষয় কেহ কাহাকেও বলে না। বৃক্ষের পুষ্প শাখাই বাহিরে দেখা যায়, শিকড় গভীরে লুক্কায়িত থাকে, তাহা কেহ বাহির করিয়া দেখায় না; কিন্তু তাহাই হইল বৃক্ষের প্রাণ; কাহারও তাহা দেখিবার আশা করা উচিত নয়; কারণ ইহা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয়। আমরা অতি সহজ উপায়ে ধার্ম্মিক হইতে চাহি! ধর্ম্মের পথ সহজ নয়। অনেকে নানাপ্রকার সাধন প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকেন। যেন কোন অলৌকিক উপায়ে ধর্ম্মধন লাভ করা যায়। এর চেয়ে আর অলৌকিক কি হইতে পারে যে, বৎসরের পর বৎসর, মাসের পর মাস, দিনের পর দিন প্রতিমুহূর্ত্তে ভগবানের সান্নিধ্য অনুভব করিয়া তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হইয়া চলিতে চেষ্টা করা ব্রাহ্মদিগের জন্য এই সাধনসঙ্কেত—ইহা ভিন্ন আর অন্য পন্থা নাই। পিতৃদেব এইপ্রকার সাধন গ্রহণ করিয়াছিলেন। জীবনে একদিনের জন্যও তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই, একদিনের জন্য প্রাণ বেসুর গাহে নাই, একদিনের জন্যও অসত্যের সেবা করেন নাই, একদিনের জন্যও প্রাণের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে দেন নাই। আজ কি সত্য সত্যই নিবিয়া গিয়াছে? কখনই নয়! কখনই নয়! মরিয়া বাঁচিবার তাঁর বড়ই বাসনা ছিল। তিনি না বলিয়াছিলেন?—

না মরিলে না পচিলে, সুধু বীজে জল দিলে
তাতে কোন ফল তো ফলে না।
মরে বাঁচি এ মোর প্রার্থনা।

এখন তবে তিনি আমাদের মধ্যে জীবন ধারণ করুন, তাঁর আজীবনের আশা পূর্ণ হউক!

জীবনের উদ্দেশ্য।*

খুব ছেলে বয়সের একটী ঘটনা জীবনে খুব কাজ করেছে, সেই জন্যে ঘটনাটীর উল্লেখ কচ্ছি। বয়স তখন বারো। পল্লীগ্রামে থাক্‌তাম। কল্‌কাতা-প্রবাসী একটী আত্মীয় মধ্যে মধ্যে দেশে যেতেন, তাঁর কাছে ব্রাহ্মসমাজের কথা শুন্‌তাম। একবার তাঁর হাতে দুখানা কাগজ দেখ্‌লাম—একটা পরীক্ষার প্রশ্নের কাগজ। তখন কেশবচন্দ্রের যে ব্রহ্মবিদ্যালয় ছিল, যাতে ব্রাহ্মসমাজের মত আর সাধন শিক্ষা দেওয়া হোত, সেই বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নের কাগজ। এক খানা কাগজ মতবিষয়ক, আর একখানা সাধনবিষয়ক। দ্বিতীয় কাগজখানায় প্রথম প্রশ্ন ছিল—"তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কি?" প্রশ্নটীর অর্থ আমার সেই ব্রাহ্ম আত্মীয়কে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বল্‌লেন "প্রত্যেক মানুষ বিশেষ কোন কাজ কর্‌বার জন্যে ঈশ্বরকর্ত্তৃক সংসারে প্রেরিত হয়; সে কাজটী কি, তা প্রার্থনা করে ঈশ্বরের কাছ থেকে জেনে নিতে হয়। সে কাজটীই হোচ্ছে জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য। মানুষমাত্রেরই জীবনের সাধারণ উদ্দেশ্য হোচ্ছে ঈশ্বরকে পাওয়া,—জ্ঞান, প্রীতি, ইচ্ছায় ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়া। কিন্তু এই সাধারণ উদ্দেশ্য ছাড়া প্রত্যেকের জীবনের একটী একটী বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, সেটী না জানা পর্য্যন্ত জীবনে বিশেষ ভাবে শৃঙ্খলা ও একাগ্রতা আসে না। ক্রমাগত প্রার্থনা কর্‌লে আর জীবনের সাধারণ উদ্দেশ্য পালনে যত্নবান্ থাক্‌লে ক্রমশঃ ঈশ্বর জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য প্রকাশিত করেন।" এই যে কথাটা ছেলেবয়সে শুনেছিলাম, এটা ভোলা দূরে থাক্ এটা সেই থেকে জীবনতরণীর হাল্ হয়ে রয়েছে। কাঁচা মাটির পাত্রে বসান ছাপের মত এটা মনে বসে গিয়েছিল, বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে কঠিন আর স্পষ্টই হয়েছে। বিষ্ণুশর্ম্মা রাজার ছেলেদেরে কথাচ্ছলে হিতোপদেশ দিবার হেতু দেখাতে গিয়ে বলেছেন "যন্নবে ভাজনে লগ্নে সংস্কারো নান্যথা ভবেৎ"—"যেহেতু নূতন পাত্রে অঙ্কিত দাগ অন্যথা হয় না, যেমন তেমনিই থাকে।" ঐ উপদেশটী আমার পক্ষে তাই হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে ঐ সময়ের বছর চারেকের মধ্যেই এমন সঙ্গে এসে পড়্‌লাম যাতে এই সংস্কার না মিলিয়ে গিয়ে দৃঢ় হবারই সাহায্য হোল। ষোল বছর বয়সে কল্‌কাতায় এসে এক দিকে কেশবচন্দ্র আর তাঁর অনুবর্ত্তীদের ন্যায় পরিণতবয়স্ক সাধক, আর এক দিকে এক দল উৎসাহী যুবক সাধকের সঙ্গে পড়্‌লাম। এই যুবকেরা আমার চেয়ে কেবল বয়স আর শিক্ষায় নয়, ধর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতায়ও বড় ছিলেন। তাঁরা সকলেই বল্‌তেন তাঁদের জীবনের বিশেষ

* সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ১৬ই নবেম্বর সায়াহ্নে পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ-প্রদত্ত উপদেশ।

উদ্দেশ্য তাঁরা জান্তে পেরেছেন। আমি তাঁদের তুলনায় নিজেকে বড়ই ছোট মনে কত্তাম। বিশেষতঃ আমার জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য আমি তখনও জান্তে পারি নি; এতে আমার মনে একটা ধিক্‌কার আস্‌তো, তবে মাঝে মাঝে এমনও ভাবতাম্ যে, এই যুবকেরা হয় ত বিশেষ চিন্তা আর অনুসন্ধান না ক'রে সহসাই এই বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, হয় ত এই সিদ্ধান্তটা ক্রমশঃ টলে যাবে। কারো কারো দেখ্‌লাম টলেই গেল, কিন্তু তাতে আমার কোন অনিষ্ট হোল না। কেবল মুখে নয়, কাজেও যাঁরা দেখাতেন যে, তাঁরা জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য বুঝ্‌তে পেরেছেন, এমন লোক কয়েক জন উজ্জ্বল ভাবে চোখের সাম্‌নে ছিলেন, সুতরাং যুবক বন্ধুদের মধ্যে কারো কারো চঞ্চলতা দেখেও মন টল্‌লো না। বিশেষতঃ তখন মহাপুরুষদের কথা খুব শুন্‌তাম। বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য এঁরা যে নিজ নিজ জীবনের বিশেষ ব্রত স্পষ্ট বুঝে অটল ভাবে সেই ব্রত পালন করে গেছেন, সে বিষয়ে কখনও বিন্দুমাত্রও সন্দেহ হোত না। আর এ'ও ভাব্‌তাম—"What man has done, man may do"—"যা এক জন করেছে তা অন্যেও কত্তে পারে।" প্রতিভায় একজন আর এক জনের সমান না হোতে পারে, কিন্তু সাধননিষ্ঠায়, কর্ম্মনিষ্ঠায়, কেন যে এক জন আর এক জনের সমান হোতে পারে না, তা জানি না। আর প্রতিভাও কার ভিতরে কতটুকু আছে তা চেষ্টা না কল্লে বোঝা যায় না। যে আগে থাকৃতেই নিজেকে অক্ষম সামান্য লোকের মধ্যে ধরে,—মনে করে "আমাদ্বারা আর বিশেষ কি হবে?"—তার মধ্যে গোড়া থেকেই চেষ্টার অভাব। কেবল জীবনব্যাপী চেষ্টাতেই জানা যায় কার ভিতর দিয়ে ঐশী শক্তি কতটা প্রকাশ হবে। যাহোক্, মানবজীবনের সকল বিভাগে নিষ্ঠাবান্ ঈশ্বরানুপ্রাণিত মানব-সেবকদিগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সাম্‌নে রেখে ক্রমাগত প্রার্থনা কত্তে লাগ্‌লাম এই জান্‌বার জন্যে যে, কি বিশেষ কার্য্যসাধনের জন্যে আমি সংসারে প্রেরিত হয়েছি। নানাপ্রকার উদ্দেশ্য চোখের সম্মুখে আস্‌তে লাগ্‌লো, আর যখনই যেটা আসত, তখন কিছু দিন ধরে মনে হোত এটাই বুঝি আমার জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই ঈশ্বরাদেশের সত্যতায় বিশ্বাসী হয়েছিলাম, সুতরাং যা কেবল নিজ চিন্তায় জীবনের উদ্দেশ্য বলে বোধ হোত, যার সম্বন্ধে স্পষ্ট ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝ্‌তাম না, তাকে সহসা জীবনের উদ্দেশ্য মনে ক'রে আত্মপ্রতারিত হোতাম না। এই দোলায়মান ভাবে অনেক বৎসর গেল। ইতিমধ্যে জীবনের সাধারণ উদ্দেশ্যসাধন—উপাসনা, আত্মোন্নতি, যথাসাধ্য পরসেবা—চল্‌লো। অবশেষে বয়স যখন ২৭।২৮, তখন জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝ্‌তে লাগ্‌লাম। সে বোঝা যে ভুল হয় নি, নিজের কল্পনাকে ঈশ্বরাদেশ ব'লে মনে করা হয় নি তা, এই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতায়—জীবনের সুখদুঃখ, জয়পরাজয়, উত্থান-পতন, নিন্দাযশ, আত্মগ্লানি, আত্মপ্রসাদ প্রভৃতি দ্বারা—যথেষ্ট সপ্রমাণ হয়েছে। যাহোক্, আমার জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য কি, সে কথা বলা আমার আজকার বিষয় নয়, ফলতঃ সে কথা বলার কোন প্রয়োজনই নেই। প্রত্যেক জীবনের এক একটী বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, সাধননিষ্ঠ ও প্রার্থনাশীল হোলে যথাসময়ে সে উদ্দেশ্য ঈশ্বর প্রকাশিত করেন, আর এই প্রকাশের দ্বারা জীবন বিশেষ ভাবে ধন্য হয়, এই সত্যটী আপনাদের সুমুখে বিশেষ ভাবেই ধরাই আমার আজকার কার্য্য। যাকে দিয়ে যা করান ঈশ্বরের ইচ্ছা, তা তিনি কোন না কোন কালে করাবেনই এটা নিশ্চিত, সে সেই কাজ নিজের কাজ বলে বুঝুক আর নাই বুঝুক্। সূর্য্যচন্দ্র জানে না তাদের কাজ কি। আমগাছ তেঁতুলগাছ জানে না তারা কিসের জন্যে সৃষ্ট হয়েছে; অথচ ঈশ্বর তাদের দিয়ে সেই সেই কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। তুমি না জান্‌তে পার তোমার জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য কি, কিন্তু ঈশ্বর নিশ্চয়ই তোমাকে দিয়ে তোমার জীবনের বিশেষ কার্য্য করিয়ে নিবেন। অনেকের মধ্যে এ জীবনে ঈশ্বর-নিষ্ঠা একেবারেই ফুটে না, অথচ দেখা যায় এমন লোকের দ্বারাও শিল্প, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, সমাজসংস্কার প্রভৃতি বিভাগে ঈশ্বর খুব বড় বড় কাজ করিয়ে নেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাপারে এ কথা খাটে না। এক জন জীবনের উদ্দেশ্য বুঝ্‌বে না, অথচ ঈশ্বর তাকে দিয়ে একটা আধ্যাত্মিক কার্য্য করিয়ে নিবেন, তা সম্ভব নয়। কারণ আধ্যাত্মিকতা, আত্মানুসন্ধান, ব্রহ্মজ্ঞান, সাধননিষ্ঠা প্রভৃতি ব্যাপার সজ্ঞান আভ্যন্তরিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে; সুতরাং জীবনে এটা একান্ত আবশ্যক যে, যাকে দিয়ে ঈশ্বর যে কাজ করাবেন সে তা স্পষ্টরূপে বুঝে। আর, সকল কাজ সম্বন্ধেই নিয়ম এই যে, কাজটা সজ্ঞান বা অজ্ঞান ভাবে, ইচ্ছার সহিত বা ইচ্ছানিরপেক্ষ ভাবে, হোতে পাল্‌লেও যখন সেটা সজ্ঞান ভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছানুগত হয়ে করা হয় তখনই তদ্দ্বারা জীবন ধন্য হয়। ফলতঃ এরূপ কাজ জীবনের যে বিভাগেরই হোক, ইহা আধ্যাত্মিক কাজ নামের উপযুক্ত। কেউ যদি ঈশ্বর ইচ্ছার অনুগত হয়ে মেথরের কাজ করে তবে সে কাজ বস্তুতঃ আধ্যাত্মিক কাজ, আর তদ্দ্বারা কর্ম্মীর আত্মা উন্নত হয়, পবিত্র হয়; আর যদি কেউ ঈশ্বরের ইচ্ছা না বুঝে কেবল নিজের রুচি বা ধনমান লাভের উপায় বলে ধর্ম্মপ্রচার করে, তবে সে কাজ আধ্যাত্মিক কার্য্য নয়, প্রকৃত পক্ষে তা ধর্ম্মপ্রচারই নয়। যাহোক্ জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য বোঝা সম্বন্ধে আমি আমার সামান্য অভিজ্ঞতামূলক কয়েকটী মন্তব্য ক'রে আমার বক্তব্য শেষ কর্‌বো।

প্রথমতঃ, জীবনের বিশেষ কার্য্য বোঝার আগে এমন কোন ব্যবসায় অবলম্বন করা উচিত নয় যা পরে অনুপযোগী বোধ হোলে ছাড়া কঠিন। কোন কোন ব্যবসায়—যেমন বাণিজ্য, ওকালতি, ব্যারিষ্টারি,—জীবনকে এমন জড়ায় যে, তা পরে অনুপযোগী বোধ হোলেও ছাড়া যায় না, অন্ততঃ সহজে ছাড়া যায় না। এরূপ ব্যবসায়ে প্রবেশ ক'রে পরে অন্তশ্চক্ষু খোলাতে অনেক ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিকে ঘোর সংগ্রামে পড়্‌তে দেখা গিয়েছে। এরূপ সংগ্রামে প'ড়ে জয়ী হয়েছেন, অর্থাৎ অনুপযোগী ব্যবসায় ছেড়ে উপযোগী ব্যবসায় অবলম্বন করেছেন অথবা অনুপযোগী ব্যবসায়ে থেকেই জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করেছেন, এরূপ লোক বোধ হয় খুব কম। সেই জন্যে তরুণ বয়সে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তির ব্যবসায় অবলম্বন সম্বন্ধে খুব সাবধান হওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যবসায় সম্বন্ধে যেমন, বিবাহ সম্বন্ধে তেমনি বা

ততোঽধিক সাবধান হওয়া আবশ্যক। জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য বুঝ্‌বার আগে বিবাহ করার ক্লেশকর ফল বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি ঐতিহাসিক মহাত্মাদের জীবনে দেখা যায়। জীবনের ব্রত বুঝে ইঁহারা সন্ন্যাস অবলম্বন কত্তে বাধ্য হোলেন। যীশুখ্রীষ্ট সেন্টপল্‌ প্রভৃতি চিরকৌমার ব্রতকেই জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের উপযোগী বোধ কল্লেন। সক্রেটিসের ন্যায় ধৈর্য্যের অবতার অতি অল্পই দেখা যায়—যাঁরা যৌবনে অনুপযোগী পারিবারিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়েও সেই সম্বন্ধের প্রতিকূলতা প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে জয় কত্তে পেরেছিলেন। মানবের আধ্যাত্মিক ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা ইহাই বলে যে, জীবনের বিশেষ কার্য্য স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহ করাই ঠিক্‌ নয়; আর ঐ কার্য্য স্থির হোলে কার্য্যসাধনের অনুকূল-স্বভাব ব্যক্তির সহিতই বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য।

তৃতীয়তঃ, দেখা যায় নিজের অভাব বা পার্শ্ববর্ত্তীদের অভাব-বোধ থেকেই জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়। আধ্যাত্মিক কার্য্য আধ্যাত্মিক সংগ্রাম আর অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝা যায়। আমি দেখ্‌লাম আমার ভিতরকার অভাববোধ আর সেই অভাব-মোচনের জন্যে দীর্ঘ সংগ্রাম থেকেই ক্রমশঃ জীবনের বিশেষ কার্য্য বোঝা গেল। ফলতঃ এক দিকে সূক্ষ্ম আত্মপরীক্ষা, অপর দিকে মানবসাধারণের সহিত গভীর সহানুভূতি, এ দুটী না থাকলে জীবনের ব্রত কেমন ক'রে বোঝা যাবে? নিজের আরাম আর সুখ নিয়ে যে ব্যস্ত, গভীর চিন্তা আর আত্মানুসন্ধানে যার আলস্য, তাকে ঈশ্বর নিজ কার্য্যের সহায়রূপে কেন ডাকবেন—স্বার্থবর্জ্জিত শ্রমসাপেক্ষ কাজের ভার কেন দিবেন? যার খেলা ফুরায় নি, তার কাজের অবসর কোথা, কাজের ক্ষমতাই বা কোথা? সুতরাং সাধনশীলতা যেখানে নেই, সেখানে প্রতিভা আর যৌবনসুলভ কার্য্যব্যগ্রতা দেখ্‌লেও জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ঈশ্বরানুপ্রাণনের আশা করি না। সেখানে আত্মা জাগেনি, মোহঘুম ভাঙেনি। আত্মা না জাগ্‌লে পরমতত্ত্ব কেমন করে দেখ্‌বে? ঈশ্বরবাণী কেমন করে শুনবে?

চতুর্থতঃ, জীবনের বিশেষ কার্য্য বুঝ্‌বার আগে সাধারণ কার্য্য সম্বন্ধে অভিসন্ধির শুদ্ধতা (purity of purpose) যত্নপূর্ব্বক সাধন কত্তে হবে। প্রত্যেক কার্য্যে প্রবৃত্ত হবার আগে আত্ম-পরীক্ষাদ্বারা দেখ্‌তে হবে ঠিক্‌ কি অভিপ্রায়ে—কোন্‌ প্রবৃত্তিদ্বারা চালিত হয়ে—আমি এ কাজে যাচ্ছি। এমন লোক অনেক দেখা যায় যারা নিজ প্রতিভা, ধনবল, বা জনবলের প্রভাবে অনেক ভাল কাজ কচ্ছে—যে সকল কাজের দ্বারা অনেক লোকের উপকার হোচ্ছে। কিন্তু কাজগুলির মূলে—কর্ত্তার অভিসন্ধির ভিতরে—যশোলাভ সম্মানলাভ ব্যতীত আর কিছু নেই—কোন উচ্চতর লক্ষ্য নেই। পরের হিতসাধন বা ঈশ্বরের সেবার অভিপ্রায়ে কোন কার্য্যই করা হোচ্ছে না, নিজের বাসনা-তৃপ্তিই সমস্ত কার্য্যের লক্ষ্য। যার জীবনের গতি আর আত্মার অবস্থা এরূপ, তার নিকট যে জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরাদেশরূপে প্রকাশিত হবে, এ' অসম্ভব। আদেশ জানা আর আদেশপালন যার লক্ষ্যই নয়, তার কাছে আদেশ কি রূপে প্রকাশিত হবে? তার কাণ ঈশ্বরাভিমুখী নয়, সুতরাং আদেশশ্রবণ তার পক্ষে অসম্ভব। আর কতকগুলি লোক দেখা যায়, যারা ধনমানাদি সম্বন্ধে দুরাকাঙ্ক্ষ নয়, যারা পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতার উপযোগী অর্থোপার্জ্জনে ব্যস্ত, আর অবসরমত পরোপকারেও অনিচ্ছুক নয়। সেবার আকাঙ্ক্ষা বিশেষ ভাবে তাদের মধ্যে জাগ্রত না হোলেও তাদেরে নানা পরহিতকর কার্য্যে ব্যস্ত দেখা যায়। প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ নিজ প্রতিভাবলে লোকসমাজে এমন উচ্চ স্থান অধিকার করেন যে, তাঁদেরে স্বভাবতঃই লোকে নানা কাজে ডাকে। নিজের স্থান (position) রক্ষা কর্‌বার জন্যে, লোককে খুসী রাখ্‌বার জন্যে, বাধ্য হয়েই তাদেরে সে সকল কাজে হাত দিতে হয়। তাঁদের কথাবার্ত্তা শুনলেই—ধরণ ধারণ দেখলেই—বোঝা যায় তাঁদের কাজের অভিসন্ধি (motive) সেবা নয়, বিশুদ্ধ কর্ত্তব্যবোধ নয়, কেবল নিজের মানরক্ষা আর পরের মনরক্ষা। এরূপ বেগার খাটার প্রলোভন অল্পাধিক পরিমাণে আমাদের সকলের সম্মুখেই আসে। এরূপ কাজে নিজেকে ছেড়ে দিলে আর ঈশ্বরানুপ্রাণনলাভের আশা থাকে না, ঈশ্বরাদেশ পালনের বিমলানন্দ তো দূরের কথা। আদেশশ্রবণের দ্বার খোলা রাখ্‌তে গেলে প্রত্যেক কাজের আগেই আত্মপরীক্ষা দ্বারা দেখ্‌তে হবে এই কাজ আমি কেবল অন্যকে খুসী রাখ্‌বার জন্যে কচ্ছি কি বিশুদ্ধ কর্ত্তব্যজ্ঞানে কচ্ছি। নিঃস্বার্থ পরহিতৈষণা আর নিজের মানরক্ষার জন্যে পরের মনরক্ষা এই দুয়ে খুব তফাৎ, কিন্তু আমরা সূক্ষ্মানুসন্ধানের অভাবে এই দুইকে এক ক'রে ফেলি। যিনি ঈশ্বরের দাস হোতে চান তাঁকে "অনুরোধে ঢেঁকি গেলা" থেকে একেবারে মুক্ত হোতে হবে, তাতে লোকে রুক্ষ বলে, কঠোর বলে, বলুক্‌। রুক্ষ ও কঠোর বল্‌বে না যখন ব্রহ্মকৃপার বাতাস ও উত্তাপে জীবনবৃক্ষে সুফল ফল্‌বে। তার আগে কিছু দিন, হয় ত অনেক দিনই, কঠোর তপস্যায় লোকের উপেক্ষা ও অপ্রিয়ত্বকে বরণ কত্তে হবে।

পঞ্চম আর শেষ কথা এই। অনুপ্রাণন লাভের আগে যে কঠোর তপস্যা, পরে তার চেয়ে বেশি বৈ কম নয়। জীবনের বিশেষ কার্য্য বুঝ্‌লেই দেখা যায় সেটা প্রকৃত রূপে কত্তে গেলে অনেক কাজ, অনেক ভাল কাজও, ছাড়্‌তে হবে। এমন শক্তি আর সময় অল্প লোকেরই থাকে যাঁরা নিজ জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করেও অসংখ্য সাধারণ কাজ সম্পাদন কত্তে পারেন। অনেক স্থলেই দেখা যায় লোকে অনেক কাজে হাত দিতে গিয়ে কোনও কাজই ভাল করে কত্তে পারে না। সুতরাং অসাধারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছাড়া প্রত্যেককে ঈশ্বরের বিশেষ আদেশ পালন কত্তে হোলে কার্য্যের পরিসর কমিয়ে দিতে হবে। নিজের শরীররক্ষা, পরিবার-প্রতিপালন আর সামাজিক জীবনের ভদ্রতা ও সৌজন্য রক্ষার জন্য যে কার্য্য অত্যাবশ্যক, তা ছাড়া তাঁকে হয় ত আর সকল কার্য্যই ছাড়্‌তে হবে। পরিবার-প্রতিপালন সম্বন্ধেও তিনি এমন আদেশ পেতে পারেন যে, তার জন্যে তাঁকে অন্য কোন কার্য্য কত্তে হবে না, তাঁর বিশেষ কার্য্যই তাঁর আবশ্যকীয় গ্রাসাচ্ছাদন এনে দিবে। কিন্তু এমনও হোতে পারে—যা ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত সেন্ট্‌পল্‌ আর সেন্ট্‌পিটারের সম্বন্ধে ঘটেছিল—যে প্রত্যাদিষ্ট কার্য্য এমন নূতন, সাধারণের পক্ষে এমন নিন্দনীয় বা আকর্ষণশূন্য যে, সেই কার্য্যকারী ব্যক্তিকে

লোকে সাহায্য কত্তে চায় না, সুতরাং তাঁর জীবিকার জন্যে তাঁকে এমন কিছু কাজ কত্তে হবে যার মূল্য লোকে বুঝে, যার জন্যে লোকে অর্থ দিতে সম্মত হয়। এই কারণেই সুসমাচার-প্রচারের ভারপ্রাপ্ত হয়েও সেণ্ট্‌পলকে জীবিকার জন্যে তাঁবু বুন্‌তে হয়েছিল আর সেণ্ট্‌পিটারকে একাধারে মনুষ্যধারী আর মৎস্যধারী হোতে হয়েছিল। আমাদের দেশের কবীর আর রবিদাসও জোলা আর মুচির ব্যবসায় ছাড়্‌তে পারেন নি। আমি এতে অসঙ্গত কিছু দেখি না। লোকহিতকর কোনও কার্য্যের সঙ্গে ধর্ম্মপ্রচারের অসামঞ্জস্য নেই; কিন্তু খুব বাঞ্ছনীয় ব্যবস্থা ইহাই যে, ঈশ্বর-সেবক তাঁর ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কার্য্য এমন একাগ্র একনিষ্ঠ ভাবে কত্তে পারেন যে, তাঁকে জীবিকার জন্যে অন্য কাজ কত্তে হবে না। মহৎ কার্য্যমাত্রই সমগ্র জীবনব্যাপী চিন্তা ও শ্রমের ফল। যে সমাজে ঈশ্বর প্রেরণাপ্রাপ্ত একনিষ্ঠ সেবকের অন্ন জুটে না সে সমাজের গঠনপ্রণালীতে নিশ্চয়ই দোষ আছে। যাহোক্, ঈশ্বর-প্রেরিত ব্রতধারীকে যেমন নানাকার্য্যের বিক্ষেপ থেকে নিজেকে রক্ষা কত্তে হবে, তেমনি সুখের লালসা থেকেও মুক্ত থাক্‌তে হবে। জীবনধারণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার সঙ্গে সেবার কোন বিরোধ নেই, বরঞ্চ শরীর সুস্থ সবল না থাকলে সেবা অসম্ভব। কিন্তু বিলাসের সঙ্গে, সুখপ্রিয়তার সঙ্গে, সেবার চির-বিরোধ। সেবায় মন ঢাল্‌তে গেলেই দেখা যায় পদে পদে নিজের সুখ বিসর্জ্জন কত্তে হয়। সুখপ্রিয় ব্যক্তি সেবা কত্তে গিয়ে ক্রমাগত "আঃ, উঃ, গেলাম রে, মোলাম রে," করেন; ধৈর্য্য ও আত্মপ্রসাদ তাঁর ভাগ্যে নেই। সেবা-নিষ্ঠ ব্যক্তি এই সংঘর্ষণ (friction) পরিহার কর্‌বার জন্যে একেবারে সুখের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন, জীবন আর স্বাস্থ্যরক্ষার চেষ্টা ছাড়া তিনি নিজের জন্যে আর কিছুই রাখেন না। বিশেষতঃ সুখী হোতে গেলেই টাকা চাই, আর টাকা পেতে গেলেই এমন কাজ করা চাই যে কাজ লোকে চায়, এমন মাল যোগান চাই বাজারে যার কাট্‌তি (demand) আছে। তাঁকে এ ক্ষেত্রে কৃতকার্য্য হোতে গেলে এতে খুব বেশি চিন্তা আর শ্রম দিতে হবে। কিন্তু এই গৌণ অবান্তর কার্য্যে বেশি মন আর চেষ্টা দিতে গেলে তাঁর মুখ্য কার্য্য কখনও ভাল করে করা হবে না। কাজেই তাঁকে তাঁর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনে কৃত-কার্য্য হোতে গেলে গৌণকার্য্যে যতদূর সম্ভব কম সময় দিতে হবে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল দরিদ্রতা ও সাংসারিক ত্যাগ-স্বীকার। ত্যাগস্বীকার ছাড়া কোন ভাল আর বড় কার্য্যই হয় না। সংসারের কোন সুখেরই অভাব হবে না, পাণ থেকে চুণটুকু খসবে না, অথচ উচ্চাঙ্গের সাধন ও সেবা হয়ে যাবে, এ অসম্ভব। ত্যাগের দৃষ্টান্ত আমরা সচরাচর সেখানেই দেখি যেখানে মানুষ ধর্ম্মার্থে প্রাণ বিসর্জ্জন করে, অথবা রাজপদ ছেড়ে সন্ন্যাস অবলম্বন করে, বড় চাকরি ছেড়ে প্রচারব্রত গ্রহণ করে। কিন্তু "martyrdom by inches"—ধর্ম্মার্থে একটু একটু ক'রে প্রাণত্যাগ—বলে একটা ব্যাপার আছে। সেটা অধিকাংশ স্থলেই লোকচক্ষুর আড়ালে ঘটে, সংসার তার কোন খবর নেয় না। অনেক সুখের আশা, লাভের আশা, যশের আশা, মানের আশা ছাড়্‌তে হয়, নির্জ্জনে গোপনে, কেবল অন্তরদর্শী ভগবানের প্রসন্নতার দিকে চেয়ে। এরূপ ত্যাগস্বীকারের আরো কাঠিন্য এই যে ধর্ম্মবীর, সন্ন্যাসী এবং বিষয়কর্ম্মত্যাগী প্রচারক তাঁদের ত্যাগের জন্যে সাধারণের কাছে যে সম্মান ও কৃতজ্ঞতা পান, সেই সম্মান ও কৃতজ্ঞতা এই নির্জ্জন অজানা ত্যাগের ভাগ্যে নেই, এর পুরস্কার কেবল অন্তরের আত্মপ্রসাদ আর পরম প্রভুর সান্নিধ্য-লাভ। যাহোক্, এই বলে শেষ করি—যা এমেরিকার প্রসিদ্ধ দার্শনিক রয়স্ তাঁর এক খানা বইয়ে পরিষ্কাররূপে দেখিয়েছেন—যে জীবনের সফলতা যেমন আছে, তেমনি নিষ্ফলতাও আছে। মানুষের যদি স্বাধীনতা না থাক্‌তো, সে যদি প্রকৃতির অঙ্গীভূত একটা কল (automaton) হোত, তবে তার জীবন নিষ্ফল না হোতে পাত্তো। কিন্তু সে স্বাধীন, সে স্বেচ্ছাচারিতাদ্বারা তার জীবনকে নষ্ট কত্তে পারে, সে তার জীবনের উদ্দেশ্য বুঝ্‌তে চেষ্টা না ক'রে কেবল পশুপক্ষীর ন্যায় জীবিকা উপার্জ্জন ক'রে অথবা কেবল নিজের সুখান্বেষণ ক'রে, কেবল পরের মন জুগিয়ে, জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারে। অবশ্য এরূপ জীবনেও কোন না কোন কালে, হয় ত যুগ যুগান্তরে, লোক লোকান্তরে, ঈশ্বরকৃপায় জাগরণ ও সফলতা আস্‌বে, কিন্তু তার আগে, হয় ত এ জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে, হয় ত পরলোকে, তাকে এই অনুতাপ ভোগ কত্তে হবে—"হায়, জীবনটা বৃথা কাটিয়েছি, জীবনটা নিষ্ফল হয়েছে।" এই দারুণ অনুশোচনা থেকে ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করুন্। আমরা গভীর আত্মানুসন্ধান আর ব্যাকুল প্রার্থনাদ্বারা জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য জেনে, আর ঈশ্বর-কৃপায় সেই উদ্দেশ্য সাধন ক'রে, ধন্য হই।

ব্রাহ্মসমাজ।

পারলৌকিক—আমাদিগকে গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইতেছে যে, বিগত ৪ঠা ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে ব্রাহ্মবন্ধু কামিনীকুমার দত্ত অল্প কয়েক দিনের অসুখে পরলোক গমন করিয়াছেন। বিগত ১৬ই ডিসেম্বর তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে।

বিগত ৬ই ডিসেম্বর ধুবড়ী নগরীতে শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র নাগের জ্যেষ্ঠা কন্যা অশোকা দীর্ঘকাল রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া শান্তিধামে গমন করিয়াছেন। বিগত ১৩ই ডিসেম্বর তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে।

বিগত ১০ই ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ দেবের মধ্যমা পুত্রবধূ, শ্রীমান্ সরোজকুমার দেবের পত্নী, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে ইহসংসার ত্যাগ করিয়াছেন।

বিগত ৯ই ডিসেম্বর লণ্ডন নগরীতে লর্ড সিংহের মধ্যমা পুত্রবধূ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। বিগত অক্টোবর মাসে মাত্র তাঁহাদের বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল।

বিগত ৬ই ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে পরলোকগতা লাবণ্যপ্রভা সরকারের আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। স্বামী সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন বসু প্রার্থনা করেন ও শ্রীযুক্তা কামিনী রায় কিছু বলিয়া প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে তাঁহার ভগিনী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারবিভাগে ৩০৲, সাধনাশ্রমে ৩০৲ ও অনাথ ব্রাহ্মপরিবারের সাহায্যার্থ ৩০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বরিশাল নগরীতে বিগত ৭ই অগ্রহায়ণ অধ্যাপক ক্ষেত্রনাথ ঘোষের মাতার আদ্য পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আচার্য্যের কার্য্য করেন। ক্ষেত্রবাবু, বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ বিভাগে ২৲, প্রচার বিভাগে ২৲ এবং নাইট্‌স্কুলে ১৲ টাকা দান করেন।

বিগত ৭ই ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত কালীমোহন

ঘোষালের কন্যাদের আদ্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। কালীমোহন বাবু প্রার্থনা করেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রশশী গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল তাহাদের সম্বন্ধে কিছু বলিয়া প্রার্থনা করেন।

বিগত ১৩ই ডিসেম্বর কলিকাতা নগরীতে শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন দাসের মাতার আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্রদাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। দক্ষিণা বাবু প্রার্থনা করেন ও দ্বিতীয়া কন্যা মাতার জীবনী পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ শাস্ত্রপাঠ করেন। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন কার্য্যে ২৫০৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

বিগত ২৮শে নবেম্বর চট্টগ্রাম ব্রহ্মমন্দিরে ব্রাহ্মবন্ধুগণ মিলিত হইয়া পরলোকগত যাত্রামোহন সেনের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। পণ্ডিত রাজেশ্বর গুপ্ত, পণ্ডিত কমলচন্দ্র সেন ও রমেশচন্দ্র সেন প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যার সময় উক্ত ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে স্মৃতি সভা হয়। সভাপতি মহাশয় প্রার্থনা করিলে শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র দত্ত যাত্রামোহন বাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন এবং অপর বক্তাগণ ও শ্রীমতী সরোজিনী দত্ত এম্, এ, তাঁহার জীবনের বিভিন্ন দিক্ বিবৃত করেন। এই উপলক্ষে জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে দীন দুঃখী ও গরীব ছাত্র ছাত্রীদের সাহায্যার্থে জনসাধারণের অর্থদ্বারা "যাত্রামোহন স্মৃতি ভাণ্ডার" স্থাপিত হইয়াছে। ইহার মূলধন স্থায়ীভাবে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত থাকিবে। তাহার আয় হইতে সাহায্য দেওয়া হইবে। ৩০শে নবেম্বর প্রাতে তাঁহার পুত্রকন্যাগণ আদ্যশ্রাদ্ধানুষ্ঠান ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত সঙ্গীত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র দত্ত শাস্ত্র-পাঠ ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন প্রার্থনা করেন। যাত্রামোহন বাবুর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত জীবনচরিত পাঠ করেন এবং তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রার্থনা করেন। তৎপর শ্রাদ্ধমণ্ডপ হইতে চিতাভস্ম লইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে যাত্রামোহন বাবুর পরলোকগতা সহধর্ম্মিণী বিনোদিনী দেবীর সমাধিস্থলে যাওয়া হয়। তথায় হরিশ বাবু প্রার্থনা করিলে যতীন্ বাবু উক্ত সমাধির দক্ষিণ পার্শ্বে চিতাভস্ম প্রোথিত করেন। তৎপর আচার্য্য মহাশয় একটি প্রার্থনা করিলে সকলে সমাধিতে পুষ্পপ্রদান করেন। পুনরায় তথা হইতে কীর্ত্তন করিয়া শ্রাদ্ধমণ্ডপে আসা হয়। হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান্ প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং অনুষ্ঠানান্তে সহস্রাধিক লোক আহার করিয়াছেন। এই উপলক্ষে পুত্রগণ উক্ত যাত্রামোহন স্মৃতিভাণ্ডারে ১০০৲ কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৫০৲ চট্টগ্রাম ব্রাহ্মসমাজের 'নলিনী প্রচারাশ্রমে' স্মৃতিফলক স্থাপনার্থ ২৫৲ সমাজফণ্ডে ২৫৲ মোট ৫০৲ বরমা ব্রাহ্মসমাজে ২৫৲ স্থানীয় নববিধান ব্রাহ্মসমাজের দরিদ্র ভাণ্ডারে ৫৲ সমাজফণ্ডে ১০৲ মোট ১৫৲ এবং একটি নিরাশ্রয়া ছাত্রীকে ১০৲ দান করিয়াছেন; এতদ্ব্যতীত প্রায় সহস্র নরনারীকে চাউল বিতরণ করা হইয়াছে।

শান্তিদাতা পিতা পরলোকগত আত্মাদিগকে চিরশান্তিতে রাখুন ও আত্মীয় স্বজনদের প্রাণে সান্ত্বনা বিধান করুন।

নামকরণ—বিগত ১লা ডিসেম্বর চট্টগ্রামে ফণীন্দ্রমোহন সেন গুপ্তের ১০ মাস বয়স্ক পুত্রের নাম করণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। শিশুর নাম শ্রীমান্ সলিল রাখা হইয়াছে। এই উপলক্ষে শিশুর পিতা বরমা ব্রাহ্মসমাজে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বিগত ২রা ডিসেম্বর মঙ্গলবার প্রাতে রমেশচন্দ্র সেনের চট্টগ্রামস্থ বাস ভবনে তাঁহার ১ বৎসর ১মাস বয়স্কা কন্যার নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন কন্যার নাম শ্রীমতী সুরমা রাখা হইয়াছে। এই উপলক্ষে কন্যার পিতা ব্রাহ্ম সমাজে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

প্রেমময় পিতা শিশুদিগকে কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন

তর্পণ—বিগত ২রা নবেম্বর প্রাতে চট্টগ্রাম ব্রহ্মমন্দিরে শাস্ত্রী মহাশয়ের পারলৌকিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র দত্ত আচার্য্যের কার্য্য ও শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন প্রার্থনা করেন। অপরাহ্নে তদীয় জীবনী আলোচিত হইয়াছিল।

বিগত ২৮শে কার্ত্তিক প্রাতঃকালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পরলোকগমন উপলক্ষে রাজসাহী ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত ব্রজলাল দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন।

গত ২১শে অগ্রহায়ণ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পবিত্র স্মৃতিপূজার জন্য কুমারখালী সাহিত্যসম্মিলনী-মন্দিরে একটি বিশেষ সভার অধিবেসন হয়। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ প্রামাণিক সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মৈত্রেয় ও শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মজুমদার বক্তৃতা করেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় প্রার্থনা করেন।

বরমা যাত্রামোহন চিকিৎসালয়—বিগত ৩রা নবেম্বর সোমবার বরমা গ্রামে পরলোকগত যাত্রামোহন সেনের প্রদত্ত অর্থে চট্টগ্রাম বোর্ড কর্ত্তৃক "যাত্রামোহন দাতব্য চিকিৎসালয়" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন প্রার্থনা করিয়া এই শুভানুষ্ঠানের কার্য্যারম্ভ করেন।

স্মৃতিসভা—বিগত ১০ই ডিসেম্বর মেরি কার্পেণ্টার হলে পরলোকগতা লাবণ্যপ্রভা সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ জন্য একটি স্মৃতিসভা হইয়াছিল। তাঁহার বন্ধু ও ছাত্রীগণের মধ্যে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী কামিনী রায় বি-এ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন; একটি সঙ্গীত ও প্রার্থনান্তে তিনি স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করেন। তৎপর নিম্নলিখিত প্রস্তাব দুইটি গৃহীত হয়। বক্তাগণ তাঁহার নানাবিধ গুণ ও কার্য্যাবলী বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করেন।

"পরলোকগতা লাবণ্যপ্রভা সরকারের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রী, ছাত্র ও বন্ধুগণ তাঁহার মৃত্যুতে গভীর দুঃখপ্রকাশ করিতেছেন। তিনি সমগ্র জীবন স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার, বালকবালিকাদিগের ধর্ম্ম ও নীতি-শিক্ষায় ও বিবিধ সৎকার্য্যে অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে নীতিবিদ্যালয় ও ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব—পরলোকগতা লাবণ্যপ্রভা সরকারের স্মৃতি-চিহ্নস্বরূপ তাঁহার ভূতপূর্ব্ব ছাত্রী, ছাত্র ও বন্ধুগণের স্বতঃপ্রবৃত্ত দান সংগ্রহ করিয়া মেরী কার্পেণ্টার হলে একখানি প্রতিকৃতি রক্ষা করা হউক। শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ, শ্রীমতী হিরণ্ময়ী সেন, শ্রীমান্ বিনয়ভূষণ ব্রহ্মব্রত, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী ও শ্রীমতী বাসন্তী মিত্র বি-এ, সম্পাদিকাকে লইয়া একটি কমিটি করা হউক; তাঁহাদের উপর এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার ভার দেওয়া হউক। এই কমিটি আবশ্যক হইলে সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।"

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ সভাপতিকে ধন্যবাদ ও সঙ্গীতান্তে সভাভঙ্গ হয়।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেস হইতে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।